তুলি থেকে বেয়নেট

মদনমোহন গুহ

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

TULI THEKE BAYONET

(A Life-sketch of Hitler)

By : Madan Mohan Guha

প্রথম প্রকাশ :

আশ্বিন, মহালয়া—১৩৬৭

প্রকাশক :

রমানাথ ঘোষ

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

২৫-২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭

মুদ্রক :

শ্রীশুভেন্দু রায়

রামকৃষ্ণ-সারদা প্রিণ্টার্স

৯এ, রামধন মিত্র লেন

কলিকাতা-৪

শ্রীমান সৈকতকে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

হিটলার পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। একনায়কত্বের মূর্ত প্রতীক। তিনি ও তাঁর নাৎসী জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান হোতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত এতবড় মহাযুদ্ধ এবং সামগ্রিক যুদ্ধ পৃথিবীতে আগে কোনদিন সঙ্ঘটিত হয়নি। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ৬১টি দেশ জড়িয়ে পড়েছিল। এ যুদ্ধে নিহত নরনারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ কোটীর কাছাকাছি।

কারও কারও মতে হিটলার আলেকজাণ্ডার, সিজার এবং নেপোলিয়ন প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত একনায়কদের সর্বশেষ নায়ক। সম্ভবত তাঁর সৃষ্ট তৃতীয় রাইখ হচ্ছে পৃথিবীতে একনায়কত্বের সর্বশেষ সাম্রাজ্য।

হিটলার দম্ভসহকারে বলতেন তাঁর সৃষ্ট তৃতীয় রাইখ হবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর। নাৎসীরা একে 'থাউজেণ্ড ইয়ার রাইখ' নামে অভিহিত করত।

কিন্তু জার্মান তৃতীয় রাইখ টিকে ছিল মাত্র ১২ বছর ৪ মাস। অবশ্য এই স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে জার্মানী তথা সমগ্র বিশ্বে যে সমস্ত ঘটনার প্লাবন ঘটেছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। কোন কোন ঐতিহাসিক হিটলারকে বিকৃত মস্তিকের রাজনীতিবিদ্ বলে আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁদের মতে ভগবান যাকে ধ্বংস করতে চান প্রথমেই তাকে তিনি পাগল করে সৃষ্টি করেন।

হিটলার পাগল ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করা শক্ত তবে তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ১২ বছর সময়ের মধ্যে (১৯৩৩—১৯৪৫) জার্মান জাতি যে সমগ্র বিশ্বে এক অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জার্মান রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে মুক্ত করেন। হৃতশক্তি জার্মানীকে ইউরোপের মধ্যে প্রতাপশালী এবং ভার্সাই চুক্তি অস্বীকার করে জার্মানীর পূর্ব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

হিটলারী সৈন্যরা সমগ্র ইউরোপকে যেন তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছিল। আটলান্টিক উপকূল থেকে ভল্গা নদীর তীর পর্যন্ত এবং নরওয়ের উত্তর প্রান্ত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড জার্মান জাতির করতলগত হয়েছিল।

একথা সত্যি যে বৃটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া একযোগে তাদের সমস্ত শক্তি হিটলারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় ঘটত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

হিটলার ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের সন্তান। শিক্ষাদীক্ষাও তাঁর বিশেষ কিছু ছিল

না। তাঁর মধ্যে অনন্যসাধারণ মনীষা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা মানবিকতাবোধও ছিল না। কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রখরতা, সামরিক বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান এবং বক্তৃতাদানের আশ্চর্য রকমের ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি নিজে ছিলেন কর্মকুশলী। কাজের যথাযথ লোক চেনবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যে-কোন লোককে আকর্ষণ করার অসীম ক্ষমতাও ছিল তাঁর। চোখ দুটি ছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভার চিহ্নস্বরূপ। **Paul Preston** হিটলারের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, **"Many witnesses** say that **when talking to Hitler it was impossible to resist** falling under the spell **of his eyes."**

তাঁর চরিত্রে এইসব নেতৃত্বসুলভ এবং রাজনীতিবিদ্‌সুলভ প্রভৃত গুণের সমাবেশ না ঘটলে তদানীন্তন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্‌দের তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিশ্বযুদ্ধ আবর্তিত হয়েছিল।

হিটলার ও তাঁর নাৎসীদলের কর্মসূচী জার্মানজাতির মনোভাবের দ্যোতক ছিল। তিনি যে কেবল সৈন্যবাহিনীর আস্থাভাজন ছিলেন তা নয়—সমগ্র জার্মানজাতিই তাঁর অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর জার্মানীর শতকরা ৯০ ভাগ লোক হিটলারকে তাঁদের রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তারূপে মেনে নিয়েছিলেন।

জার্মানীর তৃতীয় রাইখ সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে হিটলারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বজ্রকঠিন সংকল্প, আশ্চর্যরকমের বুদ্ধিমত্তা ও গগনচুম্বী আকাঙ্ক্ষা। তাই ফ্রেডারিক মিনেকে (জার্মান ঐতিহাসিক) মন্তব্য করেছেন যে, "It is one of **the great examples of** the singular **and** incalculable power **of personality in historical** life."

স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হিটলার যে-কোন প্রকার নিষ্ঠুর কাজ করতে বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। পরবর্তীকালে এইরকম কয়েকটি বিভ্রমাত্মক পদক্ষেপের জন্য তিনি নিজের এবং সমগ্র জার্মানীর বিপদ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর একজন প্রতিভাধর রাষ্ট্রনায়ক বলা যায়। তাই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক G. M. Gathhorne Hardy যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, **"If we may............overlook the few but fatal mistakes which he made as errors of judgement, from which even the wisest are not immune we can hardly deny to him the attribute of real Genius, even if that genius was diabolical rather than devine."**

হিটলার ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, ২০শে এপ্রিল ব্রায়ুনাউ (Braunau) শহরে ইন নদীর ধারে এক সরাইখানায় জন্মগ্রহণ করেন। এই নদী অষ্ট্রীয়া ও জার্মানীর সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ইন ও ডানিয়ুব নদীর সঙ্গমস্থলে পাসায়ু শহরে হিটলার

ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে। পরবর্তীকালে আপার অস্ট্রীয়ার ল্যাম্বাক এবং পরে লিঞ্জ শহরে চলে যান।

আপার অস্ট্রীয়া ছিল চিরাচরিতভাবে জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। বন, পাহাড়, সবুজ মাঠ, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, প্রলয়ঙ্করী নদী, বিশাল দুর্গ, মঠ, ক্ষুদ্র পল্লী ও বিশাল শহর, পণ্ডিত ধর্মযাজক সম্প্রদায়, প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনী কৃষককুল পরিবেষ্টিত এই আপার অস্ট্রীয়া ছিল এখানকার অধিবাসীদের সুখ-শান্তির আবাসস্থল।

গথিক ও রেনেসাঁ আমলের সৃষ্ট সম্পদ যেন এই আপার অস্ট্রীয়াকে ঢেকে রেখেছে। এ যেন মোৎসারেটে-এর গানের মতই মিষ্টি বলশালী এবং কোমল। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে সুপ্রসিদ্ধ কবি এডালবার্ট ষ্টিফ্‌টার (Adalbert Stifter) অস্ট্রীয়াকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

যদিও আপার অস্ট্রীয়াতে মানুষের মনোরঞ্জনের এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণের কোন অভাব ছিল না তথাপি এখানকার অধিবাসীদের অনেকেই এখানে জন্মগ্রহণ করায় নিজেদের অদৃষ্টকে দায়ী করত। আপার অস্ট্রীয়ার কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ কোন কিছুই তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। সম্ভবত মানুষের অনুভূতি যুক্তিদ্বারা বিচার করা যায় না।

এর পেছনে অবশ্য বিশেষ কিছু কারণও বর্তমান ছিল। ফ্রান্সের মত অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্য এক জাতির রাষ্ট্র ছিল না। অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্য অস্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী এই দুই রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে অন্তত ১২টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল—জার্মান, চেক, ম্যাগিয়ার, পোল, শ্লোভাক, ইটালিয়ান, রুশিয়ান ইত্যাদি। চেকরাই ছিল এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। তারপরই সংখ্যাগুরু জাতি হিসাবে জার্মান এবং ম্যাগিয়ারদের স্থান। এই সমস্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী স্ব স্ব অচরিতার্থ জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অসন্তুষ্ট অবস্থায় বাস করত। তাই অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের ঐক্য কোনদিন সুসংহতভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা অস্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতির মনে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্জলিত করে। সবাই নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অস্ট্রীয়ার জার্মানজাতির মনে এই ভাবধারা আরও প্রবল আকার ধারণ করে।

তাই ফরাসী বিপ্লব কেবল রক্তক্ষরণের ইতিহাস নয়। রক্ত-বিপ্লব এর শেষ কথা নয়। এই বিপ্লব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের প্রচলিত সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিপ্লব ঘটিয়েছে নিষ্পেষিত মানুষের চিন্তাধারায়। জনমানসে সৃষ্টি করেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী পরাধীন দেশগুলির মধ্যে জুগিয়েছে শৃঙ্খলমুক্তির প্রেরণা।

অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্য প্রধানত জার্মান দেশ ও লোক নিয়ে গঠিত ছিল। জার্মানীর ঐক্যবন্ধনে অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই ধারণা অস্ট্রীয়া সম্রাটের মনে বদ্ধমূল

ছিল। হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয়দের প্রাচীন বাসস্থান ছিল অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল। এই অঞ্চলটি ছিল রাজবংশ ও শাসকশ্রেণীর পীঠস্থান। এখানেও আবার জার্মানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্যই ছিল বর্তমান।

অষ্ট্রীয়ার প্রধান নগরী ভিয়েনা ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী। জার্মানভাষা ছিল এখানকার রাষ্ট্রভাষা। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ জার্মানভাষাকে সমগ্র অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে বিফলকাম হন।

১৮০৯—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার ছিলেন যুগন্ধর রাজনীতিবিদ্‌ মেটারনিক। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে কোবলেঞ্জ-এর এক প্রাচীন অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। ফরাসী বিপ্লব এবং বিপ্লবোদ্ভুত ভাবধারাকে তিনি বা তাঁর সম্রাট কোনদিন স্বীকার করতে পারেননি। জার্মানীর ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল জার্মানীর ঐক্যবন্ধন স্থগিত রেখে জার্মানীকে চিরকাল বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে রাখা। জার্মানীতে নেপোলিয়ন যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন সে সমস্ত পরিবর্তনকে মেটারনিক অস্বীকার করলেন। অষ্ট্রীয়ার নেতৃত্বে ৩৯টি জার্মান রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হল একটি দুর্বল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে পরিচালনা করার ভার ছিল ডায়েট (Diet) নামক একটি প্রতিনিধি সভার ওপর। এখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মনোনীত প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করতেন। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থান এখানে ছিল না। তদুপরি ডায়েট (Diet)-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অষ্ট্রীয়ার স্বীকৃতি ব্যতিরেকে আসতে পারত না।

জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য মেটারনিক ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত কার্লসবাদ বিধান (Carlsbad Decree) নামক এক দমনমূলক বিধান জার্মানীতে প্রয়োগ করেন। অবশ্য জার্মানীতে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এই সমস্ত পথ অবলম্বন করা ছাড়া মেটারনিকের উপায় ছিল না।

অষ্ট্রীয়া ছিল ক্যাথলিক সাম্রাজ্য। সুতরাং অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের অনুরাগ ছিল ক্যাথলিক চার্চের প্রতি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমন্বিত অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের ঐক্যবন্ধনের দুটি পথ ছিল। একটি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য অন্যটি রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতি ভক্তি। এই কৃত্রিম বন্ধন অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মনে একরাষ্ট্রীয়তার বোধ জাগাতে পারেনি।

উপরন্তু ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্নিহিত দোষত্রুটি এবং অষ্ট্রীয়া সম্রাটের দমনমূলক নীতির জন্য অষ্ট্রীয়ার জার্মান তথা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মনে ক্রমশ বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে।

হিটলার নিজেই বলেছেন, "It was enough to state here that from my early youth I was convinced that Austria's destruction was a necessary condition for the security of the German race………"

হিটলারের মনে ছোটবেলা থেকেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে জার্মানীর স্বার্থে হ্যাপস্‌বার্গ বংশ এবং অষ্ট্রীয়াকে ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন।

বিসমার্ক ও হিটলারের পরম শত্রু ছিল ফ্রান্স। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবই জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পথ সুগম করে দিয়েছিল—যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিটলারের স্বপ্নের 'হাজার বছরের রাইখ'। নেপোলিয়নের চেষ্টায় ৩০০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানী মাত্র ৩৯টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়—যা বিসমার্ককে এনে দিয়েছিল জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের সহজতম সুযোগ।

অস্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক কেবল ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিকটাই লক্ষ্য করেছেন। এর মধ্যে যে ইউরোপের নতুন রাষ্ট্রবিন্যাসের প্রতিশ্রুতি আছে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। যুগের অবদানকে কঠোরহস্তে দমন করার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পরিবর্তনশীল জগতে প্রগতিশীল মতবাদকে স্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলতেন ইউরোপের জনসাধারণ স্বাধীনতা চায় না, চায় শান্তি। তাই মেটারনিক তথা অস্ট্রীয়ার নীতি ছিল ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা।

কিন্তু মেটারনিকের এই মনোভাবের জন্য তাঁর সারা জীবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নীতি বিফলতায় পর্যবসিত হয়। ইউরোপের রাজনীতিতে যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক মেটারনিক না পারলেন অপস্রয়মান কালকে ত্যাগ করতে, না পারলেন আগত প্রগতিশীল যুগকে স্বীকৃতি দিতে। এখানেই রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ মেটারনিকের জীবনের ট্র্যাজেডি।

মেটারনিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে কিছু আগে বা পরে এলে তাঁর পক্ষে ভাল হত। কিছু আগে আসতে পারলে তিনি যুগকে উপভোগ করতে পারতেন—কিংবা কিছু পরে এলেও যুগ-সংগঠনে সহায়ক হতেন। আজ শুধু ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানসমূহকে দাঁড় করিয়ে রাখতে তাঁকে জীবনপাত করতে হচ্ছে।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার হাতে স্যাডোয়ার ও কনিগগ্রাটজ (Sadowa and Koniggrataz)-এর যুদ্ধে অস্ট্রীয়া চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ফলে জার্মানীর চিরশত্রু এবং জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের প্রধান অন্তরায় অস্ট্রীয়া চিরকালের জন্য জার্মানীর কর্তৃত্বপদ থেকে বিদায় নেয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন হয়। এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ অস্ট্রীয়ার জার্মানবাসীর মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য অস্ট্রীয়ার মধ্যবিত্ত জার্মানবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

অস্ট্রো-জার্মান সীমান্তে ইন্ নদীর ধারে হিটলারের জন্ম। তাঁর জীবনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যৌবনে হিটলারের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে অস্ট্রীয়া ও জার্মানী—এ দুটি জার্মান ভাষাভাষী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকবে না। এ দুটি দেশ একই জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, "German Austria will have to return to the Great German Motherland."—Hitler.

কিন্তু হিটলারের পিতা ছিলেন গোঁড়া অস্ট্রীয়ান। হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের সমর্থক।

প্রাশিয়া জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ার ওপর প্রভুত্ব করুক এটা তিনি কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের আবগারী বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। ভিয়েনার উত্তর-পশ্চিমে ওয়াল্ডভিয়েটেঁল (Waldviertel) নামক এক দরিদ্র জেলাতে তাঁর জন্ম।

হিটলারের পিতামহরূপে পরিচিত জোহান জর্জ হিয়েলডার ছিলেন একজন মিলার। ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। কামাসক্ত লোক। এই ভদ্রলোক অনেক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন এবং অনেক জারজ সন্তানের পিতাও বটে। এ্যাডলফ হিটলারের পিতা এ্যালয়িসও এরকম একজন জারজ সন্তান। "One of these illegitimate children was to be Adolf Hitler's father."– Kornard Heiden.

এ্যাডলফ হিটলারের পিতা এ্যালয়িস ১৮৩৭ সালে ৭ই জুন লোয়ার অষ্ট্রীয়ার স্ট্রোনস্ শহরে ম্যারিয়া এ্যানা শিকলগ্রুবার নাম্নী এক অবিবাহিতা কৃষক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ্যালয়িস-এর জন্মের ৫ বছর পর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে যোহান জর্জ ম্যারিয়া এ্যানাকে খ্রীষ্টধর্মমতে বিয়ে করে বৈধ স্বীকৃতি দেন।

এ্যালয়িসের জন্মের অল্পকাল পরেই ম্যারিয়া এ্যানা ধরাধাম ত্যাগ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর এ্যালয়িস স্ট্রোন্স্-এর নিকটবর্তী স্পাইটল শহরে তাঁর পিতারূপে বর্ণিত যোহান জর্জ হিয়েলটার বা হিয়েলডারের গৃহে লালিতপালিত হতে থাকেন। খুব সম্ভবত যোহান জর্জই এ্যালয়িসের পিতা। কিন্তু এই জারজ সন্তানের আসল পিতা কে তা আজ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয়নি। William L. Shirer বলেছেন যে, "It is most probable that father of Alois is Johan George Hielder, though conclusive evidence is lacking"

যোহান জর্জ প্রথমে এ্যালয়িসকে তাঁর পদবীতে ভূষিত করেননি। কেনইবা প্রথমে তিনি এ্যালয়িসকে পুত্ররূপে স্বীকৃতি দেননি এবং পরেইবা কেন আবার তাকে পুত্ররূপে স্বীকৃতি দিলেন তা বোঝা মুস্কিল। কেননা এ ব্যাপারে কোন প্রামাণিক তথ্য আজ অবধি পাওয়া যায়নি।

তবে এ্যালয়িসকে তাঁর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের পদবী শিকলগ্রুবার নিয়েই কাটাতে হয়েছে। এ্যালয়িসের মায়ের মৃত্যুর পর যোহান জর্জ প্রায় ত্রিশ বছর অজ্ঞাতবাসে কাটান। পরে ওয়াল্ডভিয়েটেঁল জেলার উয়েট্রা শহরে যখন ফিরে আসেন তখন তিনি ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ। এই বয়সে যোহান জর্জ এ্যালয়িসকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে খ্রীষ্টধর্মমতে স্বীয় পদবীতে ভূষিত করে ছেলে হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দেন।

নামে মানুষের কিছু আসে যায় না—কর্মই তার জীবনের প্রকৃত স্বীকৃতি দান করে। তবুও অনেক জার্মান মনে করেন যে, এ্যাডলফ শিকলগ্রুবার পদবীধারী কোন লোক বিসমার্কের পদে হোহেনজালর্ণ বংশের সিংহাসনে বসবেন একথা ভাবতেও অবাক লাগে।

যতটুকু জানা যায় হিটলার নিজেও এই ব্যাপারে স্পর্শকাতর ছিলেন। যৌবনে তিনি তাঁর এক নিকটতম বন্ধুর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর পিতার হিটলার পদবীগ্রহণ তাঁকে দিয়েছে অপূর্ব মানসিক শান্তি।

জানা যায় যে, পূর্ব ইউরোপে হিটলার পদবীধারী অনেক ইহুদী পরিবারের বাস ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি পরিবারের পদবী ছিল যেমন 'হিটলার', 'হিয়েটলার' বা 'হাটলার'। তাই অনেকের ধারণা এরকম এক ইহুদী পরিবারে হিটলারের জন্ম। কিন্তু ফ্যাসিস্ট বা অফ্যাসিস্ট কোন লেখক এই ব্যাপারে কোন আলোকপাত করেননি।

জনসাধারণ বিশেষত ইহুদীরা মনে করেন যে হিটলারের মানসিকতা শিক্ষাদীক্ষা বা বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্যে এমন কোন চিহ্ন নেই যাতে তাঁদের ধারণা হতে পারে যে হিটলার ইহুদী বংশোদ্ভূত। তবে এ্যাডলফ হিটলার কোন সময় তাঁর পারিবারিক কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করতেন না বা কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করুক তাও তিনি চাইতেন না। "Except in Mein Kampf where the sparse biographical material is often misleading and omissions monumental, Hitler rarely discussed or permitted discussion of in his presence his family background and early life."—William L. Shirer.

তাই হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত যে সমস্ত তথ্য এ যাবৎ ছাপা হয়েছে তা যে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা বলা শক্ত। কেননা এর অনেক কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন —আবার অনেক কিছুই ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। হিটলারের নিজের লেখা তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীও তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্যের সন্ধান দিতে পেরেছে এ কথা বলা যায় না।

হিটলার কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বা লেখাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পল্লবিত করতে বা বাক্‌বহুল শব্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত করতে চাইতেন। এরকম একজন লোকের কাছ থেকে তাঁর শৈশব বা জন্মের উৎস সংক্রান্ত ব্যাপারে এরূপ নীরবতা সত্যি সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে।

এটা সত্যি যে হিটলারের অতি উৎসাহী হিতৈষীগণ ব্রায়নাউ শহরে—যেখানে হিটলার জন্মগ্রহণ করেন সেটাকে তীর্থস্থান হিসেবে স্মরণ করেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতা হিটলারের পূর্বপুরুষদের পরিচিতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। একমাত্র ভিয়েনার এক উদার মতাবলম্বী সাংবাদিক তাঁর পত্রিকায় হিটলারের পূর্বপুরুষদের পরিচয় সম্বলিত একটা লেখা বের করেন। এ লেখকের মতে হিটলারকে 'হেইল হিটলার' বলে সম্বোধন না করে 'হেইল শিকলগ্রুবার' বলে সম্বোধন করাই যুক্তিযুক্ত।

ভিয়েনার ন্যাশনেল সোস্যালিষ্টরা কিন্তু তাঁদের প্রিয় নেতার পদবী সম্পর্কিত এ সমস্ত লেখা সুস্থ মনে নিতে পারেননি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সমস্ত কাহিনী

উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ইহুদীদের দ্বারা তাঁদের প্রিয় নেতা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার কাহিনী মাত্র। ন্যাশনেল সোস্যালিষ্টদের দুজন যুবনেতা এ ঘটনায় এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে তাঁরা লেখককে এক হোটেল কক্ষে হঠাৎই আক্রমণ করেন।

হিটলার অবশ্য তাঁর জীবনীসংক্রান্ত এ সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ তর্কযুদ্ধের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবন আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকের পদ গ্রহণ করার পর থেকে। সামান্য একজন সৈনিকের পদ থেকে হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর শৈশব কেটেছে অসহনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে।

হিটলারের পিতা এ্যালয়িস ওয়াল্ডাভিয়েটাল জেলার একজন অতি দীনদরিদ্র লোক ছিলেন। ১৩ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। মুচির কাজ দিয়ে তাঁর জীবন শুরু। পরিশেষে অষ্ট্রীয়া সরকারের আবগারী বিভাগের কর্মচারী নিযুক্ত হন।

হিটলার তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতার এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ১৭ বছর বয়স থেকে ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত সময় লেগেছিল। এ সময়ে এ্যালয়িস কিছুদিনের জন্য অষ্ট্রীয়ার সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। হিটলার তাঁর পিতার সৈন্যবিভাগের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। সরকারী হিসেবে তাঁর পিতার পদ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব। সম্ভবত তিনি পাঠকমনকে তাঁর পিতা বা পরিবার-সংক্রান্ত এ সমস্ত তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত করতে চাননি।

এ্যালয়িস (শিকলগ্রুবার) হিটলারের তিন বিয়ে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী এ্যানা গ্ল্যাসল হোরের নামে সমধিক পরিচিতা। এ্যালয়িস অপেক্ষা এ্যানা ১৪ বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু এ্যালয়িসের এই দাম্পত্যজীবন খুব সুখকর হয়ে ওঠেনি। পরিণামে ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদ। অষ্ট্রীয়াতে এই সময়ে বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্যাথলিক আইনই প্রযুক্ত হত। বিবাহ-বিচ্ছেদ কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর পৃথকভাবে বাস করা ব্যতীত আর কিছুই বোঝাত না।

সুতরাং প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ্যালয়িস দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অনুমতি পাননি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ঠা এপ্রিল ইন নদীর ধারে ব্রায়ুনাউ শহরে এ্যানা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর একমাস পর এ্যালয়িস ৪ঠা মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানজিসকা ম্যাট্জেলস্বার্গার নাম্নী এক হোটেলের চাকরাণীকে বিয়ে করেন। ফ্র্যানজিসকা অবশ্য বিয়ের অল্পদিন পরে মারা যান ১৮৮৪ সালের আগষ্ট মাসে।

দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর ছয় মাস পর ৭ই জানুয়ারী ১৮৮৫ সালে এ্যালয়িস ক্লারা পোজেল নাম্নী এক মহিলার পানিগ্রহণ করেন। ক্লারা এ্যালয়িস অপেক্ষা ২৩ বছরের ছোট ছিলেন। বিয়ের সময় এ্যালয়িসের বয়স ছিল ৪৭ আর তৃতীয়া পত্নী ক্লারার ২৪।

এ্যালয়িস শিকলগ্রুবার (এ্যাডলফ্ হিটলারের পিতা যিনি ১৮৭৬ সালে তাঁর পদবী পাল্টিয়ে এ্যালয়িস হিটলার নামে পরিচিত হন) সাত সন্তানের পিতা ছিলেন।

তাঁর প্রথম পুত্র এ্যালয়িস ১৩ই জানুয়ারী ১৮৮২ সালে ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন, কন্যা এ্যাঞ্জেলা ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন ২৮শে আগষ্ট, ১৮৮৩। তৃতীয় সন্তান গুস্তাবের জন্ম ১৭ই মে, ১৮৮৫ ব্রায়ুনাউ শহরে। ইডার জন্ম ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬। এ্যাডলফ হিটলারের জন্ম ব্রায়নাউ শহরে ১৮৮৯ সালের ২০শে এপ্রিল। এ্যাডমুণ্ডের জন্ম পাসায়ু শহরে ১৮৯৪ সালে এবং শেষ সন্তান পাওলার জন্ম ২১শে জুন, ১৮৯৬।

এ্যালয়িসের দ্বিতীয়া কন্যা এ্যাঞ্জেলা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের তিন মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিটলার-এর সদ্‌ভাই এ্যালয়িস যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন হিটলারের বাবার প্রথমা স্ত্রী জীবিতা। তখনো বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেনি।

এ্যাঞ্জেলা এবং এ্যালয়িস হিটলারের পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। প্রথম পক্ষের কোন সন্তান ছিল না। এ্যাডলফ হিটলারের মা ছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী। এ্যাডলফ মায়ের তৃতীয় সন্তান। তার মধ্যে গুস্তাব, ইডা এবং অ্যাডমুণ্ড শৈশবেই মারা যান।

সব ভাই বোনদের মধ্যে কেবলমাত্র এ্যাঞ্জেলা (Angela) যিনি বিয়ের পর ফ্রাউ রাউবেল নামে পরিচিতা হন হিটলারের সঙ্গে শেষপর্যন্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। লী নদীর ধারে ল্যাণ্ডসবার্গ দুর্গে হিটলার যখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন সে সময় একমাত্র এ্যাঞ্জেলাই তাকে দেখতে যেতেন।

এ্যাঞ্জেলার এক কন্যা ছিল। নাম গেলী। হিটলার গেলীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হিটলারের জীবনে গেলীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। ১৯৩০ সালে গেলী হঠাৎ আত্মহত্যা করে। হিটলার গেলাকে জীবন সঙ্গিনী করতে চেয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে গেলীর কতটা সম্মতি ছিল তা বোঝা শক্ত।

শাইরার, এলন বুলক এবং হিটলারের বন্ধু ফটোগ্রাফার হফ্‌ম্যানের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, ভিয়েনাতে গেলা একজনের কাছে গান শিখতে যেতেন। তার সঙ্গে গেলার প্রেম ছিল গভীর। হিটলার সেটা পছন্দ করতেন না। হিটলার একবার গেলীকে ভিয়েনায় তার সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে যেতে দিতে দৃঢ়কণ্ঠে অসম্মতি জানান। এর পরিণতি গেলার আত্মহত্যা। হফ্‌ম্যানের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, গেলীর মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গেলী হিটলারকেই গভীরভাবে ভালবাসত। হিটলারের ইভা ব্রাউনের (হিটলার যাকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে যাকে তিনি স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন) সঙ্গে বন্ধুত্ব গেলী সুস্থ মনে নিতে পারেনি। ফলে গেলা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শাইরার স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, গেলীর মৃত্যুর প্রায় বছর খানেক পর ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় হয়। অতএব গেলীর মায়ের এই বিশ্বাস কতটুকু সত্য তা বলা মুস্কিল।

গেলীর মৃত্যুতে হিটলার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই সময়ে বন্ধু হফ্‌ম্যান তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করে নানান ভাবে তাঁর মানসিক অবসাদ দূর করার

চেষ্টা চালান। তা না হলে হিটলারের এই মানসিক অবসাদ তাঁকে আত্মহত্যার দিকে যে ঠেলে দিত না তাও জোর করে বলা যায় না।

হফ্‌ম্যান বলেছেন ধর্মে উদাসীন হিটলারকে গেলীর স্মৃতি সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুলল। গেলীর কথা উঠলেই হিটলারের চোখ জলে ভরে যেতো। হিটলার তাঁর পরিচিত লোকজনকে অনেকবারই বলেছেন যে, "জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালবেসেছিলেন।" হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার পর থেকে তাঁর বাসভবনে সর্বত্রই বিরাজ করত গেলীর ছবি। গেলীর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উদ্‌যাপিত হতো রুচিসম্মত পরিবেশে। গেলীর মৃত্যুর পর হিটলার তাঁর ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং হুকুম দিলেন যে একমাত্র গৃহরক্ষিণী ফ্রাউ ভিন্‌টার ভিন্ন ওঘরে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই।

হফ্‌ম্যান আরও বলেছেন যে, গেলীর সঙ্গে হিটলার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে তাঁর (হিটলারের) জীবনের এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটত না। জার্মানীর বাইরে হিটলারের বিবেচনাহীন অভিযান, তাঁর বিশ্বজয়ের বিরাট এবং অবাস্তব পরিকল্পনা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না গেলী হয়ত সংযত করতে পারত—যেটা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ্যাডলফ হিটলারের মা ক্লারা পোজল (Klara Polzl) লোয়ার অষ্ট্রীয়ার স্পাইটল শহরের এক পর্ণকুটীরবাসীর কন্যা। হিটলারের পিতার সমগোত্রীয়া। এ্যাডলফের মায়ের অবিবাহিত অবস্থায় পদবী ছিল হিটলার। এটা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিয়ের পূর্বে তিনি তাঁর স্বামীর সমগোত্রীয়া ছিলেন।

হিটলারের মা ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠা রমণী। অতি অল্পবয়সে তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে ভিয়েনাতে চলে যান। কারো কারো মতে হিটলারের মা ছিলেন চেক্ সন্তান এবং জার্মান ভাষায় তিনি প্রার্থনা পর্যন্ত করতে জানতেন না। কিন্তু একথা সত্য নয়। তবে হিটলারের পিতার প্রথমা স্ত্রী যে চেক্ সন্তান ছিলেন এটা নিশ্চিত।

হিটলারের মা ক্লারা ছিলেন জার্মান মহিলা। রুডলফ ওল্ডেন (Rudolf Olden) তাঁর 'হিটলার দি পন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "But Klara his (Alois Hitler) third wife, was without any doubt German." কেউ কেউ মনে করেন হিটলারের বাবা ও মা একই জায়গায় কাজ করতেন এবং উভয়েই সেই সময়ে প্রেমে আবদ্ধ হন। কেননা হিটলারের বাবার দ্বিতীয়া স্ত্রী ১৮৮৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন মারা যান সে সময় হিটলারের সহোদর ভাই গুস্তাব মায়ের পেটে। অতএব এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, হিটলারের মায়ের সঙ্গে তাঁর বাবার বিয়ের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল।

হিটলারের পিতা এ্যালয়িস ৫৬ বছর বয়সে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন হিটলার ছ' বছরের বালকমাত্র। তিনি সে সময়ে লীঞ্জের অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ফিশ্চেলহাম (Fischlman) গ্রামে এক সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র। এটা ১৮৯৫ সালের কথা।

পরবর্তী ৫।৬ বছর ধরে হিটলারের পিতা এ্যালয়িস আজ এই গ্রাম, কাল সেই গ্রাম এভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। অস্থিরচিত্ত বৃদ্ধ পেন্সনভোগী এ্যালয়িস কোন এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি। কোন জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা তাঁর ধাঁচে সইত না। হিটলারকে তাই তাঁর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার সঙ্গে সাতবার জায়গা পালটাতে হয়। এবং ৫।৬টি বিদ্যালয়ের ভর্তি খাতায় তাঁর নামও ওঠে—কোনটিতে দু'বছর, কোনটিতে এক বছর এভাবে। ফলে হিটলারের বিদ্যালয় জীবন ছিল অনির্দিষ্ট ও অস্থির।

এর মধ্যে তিনি দু'বছর ল্যাম্বাকে 'বেনিডিকটাইন মঠে ধর্মযাজকের কাছে ধর্মশিক্ষা নিতে থাকেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন পর হিটলারের পিতা এ্যালয়িস লীঞ্জের দক্ষিণে লিওনডিং নামে এক গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ছোট্ট সংসার। ছোট্ট একটি বাড়ী এবং তদ্‌সংলগ্ন একটি বাগান। এই তাদের সম্বল।

এখানে এ্যাডলফকে এ্যালয়িস একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। প্রথম প্রথম পড়াশুনার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। হিটলার নিজেই স্বীকার করেছেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা প্রথমে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিদ্যালয়ের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাও জন্মেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি তাদের দলনেতা হয়ে ওঠেন। "I had become a ring leader"—Hitler.

রুডলফ ওল্ডেনের লেখা 'হিটলার দি পন' গ্রন্থে জানা যায় যে জর্জ ট্রাউলার নামে লিওনডিঙের (Leonding) এক স্থানীয় ছেলে হিটলারের সমবয়সী ছিল এবং একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো। হিটলার যে নিজেকে দলনেতা বলে জাহির করেছেন সে সেকথা অস্বীকার করেছে। ট্রাউলার বলেন যে হিটলারকে গ্রামের সকলে বিশেষত বিদ্যালয়ের বন্ধু-বান্ধবরা নির্বোধ বলে উপেক্ষা করত। হিটলার ছিলেন এক অদ্ভুত স্বভাবের বালক। সব সময় লোককে উপদেশ দিতে ব্যগ্র। লোকে তাঁর কথা শুনুক আর না শুনুক তাতে তাঁর কিছু এসে যেত না। তিনি অবলীলাক্রমে বকে যেতে পারতেন।

লিওনডিঙের কাছেই ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম। তারপাশেই 'দি ফিডল' নামে ছোট্ট একটি পাহাড়। হিটলার প্রায়ই সে পাহাড়ে চলে যেতেন। পাহাড়ের ওপর দু'টি গাছের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন। কেবলমাত্র দিনের বেলায় নয় পূর্ণিমা রাতেও তাঁকে এখানে এই অবস্থায় দেখা যেত। গ্রামের লোকেরা তাই ভাবত হিটলারকে ভূতে পেয়েছে।

তখন কে জানতো হিটলারের বক্তৃতাদানের এই চর্চা ভবিষ্যতে তাঁকে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে। তবে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যে সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রনেতা জন্মেছেন প্রত্যেকেই সুবক্তা ছিলেন। পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে এ রকম বড় বড় আন্দোলনের ইতিহাস আমরা জানি। এই সমস্ত আন্দোলনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নেতাদের ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা-

দানের ক্ষমতা। লেখার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনের ওপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করা যায় তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করা যায় বক্তাদের সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত বক্তৃতাদানের মাধ্যমে। হিটলার নিজে একজন সুবক্তা ছিলেন। এবং সাধারণ লোককে বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হিটলার নিজেই বলেছেন যে, "I know that fewer people are won over by the written word than by the spoken word and that every Great movement in this earth owes its growth to great speakers and not to great writers."

বিদ্যালয়ের পড়াশুনার প্রতি আস্তে আস্তে হিটলারের মনে বিরক্তির ভাব এসে গেল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনার প্রতি শৈশবে তাঁর যে আসক্তি ছিল তা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে তাঁর পড়াশুনার ওপর এরকম অনীহার ভাব দেখে তাঁর পিতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হিটলারের পিতার ইচ্ছা ছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে তাঁকে অষ্ট্রীয়ার একটি সরকারী আপিসে কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভিয়েনা জীবন ও বেভেরীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান

পিতার এ মনোভাব হিটলার কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। ফলে পিতা পুত্রের মধ্যে মানসিক সংঘাত উপস্থিত হয়। হিটলারের স্বপ্ন ছিল তিনি একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী হবেন। রুডলফ ওল্ডেন তাঁর 'হিটলার দি পন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে "He (Hitler's father) had demanded that Adolf should become a civil servant. Adolf however, was determined to become a painter."

হিটলারের পিতা কঠোর হস্তে পুত্রের এ মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত পিতার কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। হিটলার বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরলেন। লীঞ্জের উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল তাঁর খুব খারাপ হতো। বিশেষত জার্মান ও ফরাসী ভাষায় তিনি মোটেই ভাল ফল করতে পারতেন না। হিটলারের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে পড়াশুনার দিকে অমনোযোগী দেখলে বা পরীক্ষার ফল খারাপ হলে পিতা তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে যাবেন। অতএব তাঁর চিত্রশিল্পী হওয়ার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু এতে পিতার মত পরিবর্তন হয়নি। পিতা তাঁকে লীঞ্জের উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম কাটিয়ে 'ষ্টেইর' (Steyr)-এ এক সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য হিটলারের প্রবল আসক্তি ছিল সত্য কিন্তু ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহও কোন অংশে কম ছিল না। পরবর্তীকালে এই

ইতিহাসের শিক্ষাই তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। হিটলার নিজেই স্বীকার করেছেন "Best of all was my work in Geography, and still more in World History."

লীঞ্জের উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষক ডাঃ লিওপোল্ডের কাছে হিটলার যে কতখানি ঋণী ছিলেন তা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন। হিটলার Mein Campf-এ একমাত্র লিওপোল্ডকেই গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতি হিটলারের শ্রদ্ধার চেয়ে অশ্রদ্ধার ভাবই ছিল বেশী। হিটলার বলেছেন, "I have the most unpleasant recollections of the teachers who taught me. When I think of the men who were my teachers, I realize most of them were slightly mad." কিন্তু ডাঃ লিওপোল্ডকে হিটলার পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেছেন। এই ইতিহাসের শিক্ষকই জুগিয়েছেন বালক হিটলারের মনে জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রেরণা।

১৯৩৮ সালে তৃতীয় রাইখের চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হবার পর হিটলার এই শিক্ষকের সঙ্গে একবার দেখা করেন। তিনি তখন বৃদ্ধ কিন্তু ঝটিকা বাহিনীর একজন সক্রিয় কর্মী। হিটলার এটা জানতে পেরে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। নাৎসী দলের একজন সদস্যকে তিনি বলেছেন, "You can not imagine how much I owe to that old man."

হিটলারের পিতা ১৯০৩ সালে ৩রা জানুয়ারী ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হিটলার তখন ১৪ বছরের বালকমাত্র। পিতার মৃত্যুর পর হিটলার মায়ের সঙ্গে লীঞ্জের (Linz) একটি গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন। তাঁর মায়ের বয়স তখন ৪২। হিটলার ও তাঁর ছোট বোন পাওলাকে নিয়ে সংসার চালানো মায়ের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

হিটলারের মায়ের ইচ্ছে ছিল হিটলারকে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়ে অষ্ট্রীয়ার একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। হিটলারের পিতার এ ইচ্ছে তিনি সার্থক করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু হিটলারের মনোভাব ছিল অনমনীয়। মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও হিটলার মার এই মনোভাবকে সহ্য করতে পারতেন না। বরঞ্চ তিনি লেখাপড়ায় আরও অমনোযোগী হয়ে ওঠেন। ফলে মাতা পুত্রের মধ্যে একটি বিরক্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই সময়ে হিটলার হঠাৎ ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হন। হিটলার বলেছেন এই রোগ তাঁর জীবনে আশীর্বাদরূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের নির্দেশ ছিল হিটলার যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগে কোনো কাজে যোগ না দেন। ডাক্তারের এমন ধারণা জন্মেছিল যে, হিটলার হয়ত কোনদিনও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবেন না। অবশ্য ডাক্তারের এই ধারণা সত্য প্রতিপন্ন হয়নি। কেননা পরবর্তীকালে এই রকম কঠিন ব্যাধি তাঁর জীবনে আর দেখা দেয়নি।

অনেক লেখকের মতে বংশগত দিক থেকে হিটলারের একটু মাথা পাগলামির ধাঁচ ছিল। অবশ্য হিটলারের জীবনী লেখক কর্ণাড হিয়েডেন একথা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। হিয়েডেন বলেছেন যে, "But contrary to widespread assumption, there is no proof of hereditary mental weakness, though on his mother side, there were cases of eccentricity."

এক বছরের জন্য হিটলারের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁকে কিছুদিনের জন্য 'স্পাইটেলে' মাসীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে হিটলার পুনরায় 'ষ্টেইর' (Steyr)-এ সরকারি বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেন। অস্ট্রীয়া সরকারের অধীনে তাঁকে চাকরি দেওয়ার জন্য বাবা ও মার যে পরিকল্পনা ছিল তা আপাতত স্থগিত রইল।

ষ্টেইর-এর সরকারি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় হিটলার জার্মান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি প্রভৃতি সব বিষয়ে খারাপ করেছে। একমাত্র খালি হাতে চিত্রাঙ্কনে প্রচুর নম্বর পেয়েছে। ফলে তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়নি। উলিয়ম শাইবার উল্লেখ করেছেন যে, হিটলার এতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বিদ্যালয়ে যেতে হবে না এটাই তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দের ব্যাপার। বিদ্যালয় ছাড়তে পেরে আনন্দের উত্তেজনায় তিনি জীবনে প্রথম ও শেষবারের মত আকণ্ঠ মদ্য পান করেন। "He felt so excited at the prospect of leaving school for good that for the first and last time in his life he got drunk"—William L. Shirer.

এরপর ২।৩ বছর তাঁর জীবন সর্বাপেক্ষা আনন্দে কেটেছে। কাজ না করে এরকম ভবঘুরে জীবন-যাপনের যে কি আনন্দ তা হিটলার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ চ্যান্সেলর হওয়ার পর তাঁর ছোটবেলার বন্ধু অগাষ্ট কুবাইজাককে (August Kubaizek) ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৩ সালে এক চিঠিতে ব্যক্ত করেন। "These were the happiest days of my life and seems to me almost a dream"—Hitler.

এদিকে তাঁর কোন রোজগার ব্যতীত বিধবা মায়ের পক্ষে পিতার পেন্সনের টাকার ওপর নিভর করে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাঁর মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে অর্থোপার্জনের জন্য চেষ্টা করতে বললে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এমনকি নিজের একার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করতেন না। হিটলার তখন ভাবজগতে বিচরণ করছেন। তিনি একজন চিত্রশিল্পী হবেন। এদিকে বাড়িতে অর্থাভাবে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না।

তাঁর ছোটবেলার আর এক বন্ধুর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে পিতার মৃত্যুর পর হিটলার অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। ছোটবেলায় হিটলার ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। চুপচাপ থাকতে ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও বদরাগী। তাঁর কথার ওপর কেউ কথা বললে তিনি যেন ক্রোধে ফেটে পড়তেন।

এ সময়ে হিটলার ষ্টেফ্‌নি (Stefanie) নাম্নী এক রূপসী কুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হন। ষ্টেফ্‌নিকে পাবার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল! কিন্তু নিজে থেকে গিয়ে প্রেমিকাকে ধরা দিতে তিনি নারাজ। প্রেমের আগুন মানুষকে পলে পলে দহন করে অথচ আলো দেয় না। হিটলার এই মহিলাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে একটি কবিতা ছিল 'প্রেমিকা স্তোত্র' (Hymn to the Beloved). হিটলার বন্ধু কুবাইজাককে এ সমস্ত কবিতা পড়ে শুনাতেন।

চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য হিটলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বটে কিন্তু ১৬ বছর বয়স থেকেই রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধের কাহিনী হিটলারের কোমল মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বুয়োররা (ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক) এবং সেখানকার জুলুরা লড়ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। হিটলার যাত্রা-থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন। লীঞ্জের ওয়াগনার অপেরার যাত্রাপার্টি ছিল তাঁর অতীব প্রিয়। এই সমস্ত যাত্রাপার্টি তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে বুয়োর যুদ্ধের কাহিনী এবং বুয়োরদের স্বাধীনতার ভাবধারাগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতেন।

এই সব অভিনয় দেখে হিটলারের বালকমন হ্যাপস্‌বার্গের হাত থেকে অষ্ট্রিয়ার জার্মানদের মুক্ত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ত। ১৬ বছর বয়স থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাই শাইরার বলেছেন যে, "At sixteen he had become what he was to remain till his dying breath : a fanatical German-nationalist."

১৬ বছর বয়সকে হিটলারের জীবনের পরিবর্তনের সময় বলে ধরা যেতে পারে। হিটলারের বন্ধু কুবাইজাককে মন্তব্য করতে শুনি যে আলস্যে কিছুদিন অতিবাহিত করলেও এই সময় থেকেই হিটলারকে অত্যন্ত চিন্তাশীল যুবক বলে মনে হতো। তাঁর কথাবার্তা চালচলন যেন সবই পাল্‌টে গেছে। বিশ্বের বিচিত্র রাজনৈতিক ভাবধারা তাঁর অলস মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করে তুলতে লাগল। পৃথিবীর সর্বত্রই দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। তিনি যেন কোনো কিছুই হালকাভাবে নিতে পারতেন না। তাই তাঁর বন্ধু কুবাইজাককে বলতে শুনি, "He (Hitler) saw everything only obstacle and hostility……He was always up against something and at odds with the world. I never saw him take anything lightly."

এক সময়ে পড়াশুনার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হিটলার নানান ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে স্কুল যাওয়া বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ছোটবেলায় এই মনোভাবের জন্য বাবা ও মার সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড রকমের মানসিক সংঘাত ঘটেছে। আজ হিটলার পড়াশুনার জন্য পাগল।

বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনেক কিছু জানার বা শেখার জন্য তিনি ব্যাকুল। হিটলারের এই মানসিক পরিবর্তন সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছে। শাইরার প্রভৃতি

ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে এই সময় থেকে হিটলার দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। তিনি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ইহজগতে জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই। কর্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালে কালে অন্তরে লাভ করেন।

হিটলার যেন পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সবকিছু জানার জন্য জ্ঞানের আধার বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে মনঃসংযোগ করেছেন।

মানুষের চরম শক্তি নিহিত আছে তার মননশক্তিতে। এই মননশক্তির আধার হচ্ছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিধৃত মানব-মনের কল্পনা ও চিন্তার অমূল্য সম্পদরাজি সঞ্চিত আছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারে। তাই গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে মানুষের মননশক্তির আধার, উৎস, বিকিরণ-কেন্দ্র বলা চলে। এখন হিটলার স্বয়ং এই কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। জ্ঞান আহরণ করার জন্য তিনি লীগের বয়স্কদের জন্য স্থাপিত পাঠাগারে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। তিনি এখন এই পাঠাগারের একজন উৎসাহী সদস্য। বিভিন্ন প্রকার বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়াল। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল জার্মানীর ইতিহাস এবং জার্মান পৌরাণিক কাহিনীর ওপর লিখিত পুস্তকাদি।

. হিটলার যে কি অসাধারণ অধ্যাবসায়ের সাথে পড়াশুনা করেছিলেন এবং ভবিষ্যত জীবনে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন বিশেষত বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে সে বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর হিটলার সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'নাজিল সোসাইটির' (বার্লিনে অনুষ্ঠিত ' এক সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য হিটলার রিবেনট্রপের মাধ্যমে টয়েনবিকে আমন্ত্রণ জানান। হিটলার তখন সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিস্ট নায়ক হিসেবে সমধিক পরিচিত। টয়েনবি হিটলারের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে 'নাজিল সোসাইটির' সভায় উপস্থিত হবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন! টয়েনবির বন্ধু 'চার্লস ওয়েবষ্টার' কিন্তু টয়েনবিকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান। কেন না ওয়েবষ্টারের মতে গণতান্ত্রিক দেশের একজন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক হিটলারের ন্যায় এরকম একজন ফ্যাসিস্ট নায়কের নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারেন তা তাঁর জানা ছিল না। টয়েনবি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা তিনি জানতেন 'নাজি পার্টি' এবং তাঁর নেতা হিটলার সম্পর্কে লিখতে গেলে তাদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতির বিশেষ প্রয়োজন। এবং সুযোগ যখন এসেছে তখন তিনি সে সুযোগ হাতছাড়া করবেনই বা কেন?

টয়েনবি যথারীতি সভার এক সপ্তাহ আগে বার্লিনে এসে হাজির হন এবং এর মধ্যে তিনি জার্মানীর বেশকিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে আবার কারো কারো মতবাদ হচ্ছে ফ্যাসিস্টবিরোধী। বার্লিনের ক্যাথলিক বিশপও তাদের মধ্যে ছিলেন। রিবেনট্রপের সহকারী কর্মী ফ্রিজ বারবারের (Berber) সাথে টয়েনবি-

নির্দিষ্ট দিনে দেখা করেন। ফ্রিজ বারবারই হিটলারের নিমন্ত্রণ পত্রটি টয়েনবিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

টয়েনবি এবং ফ্রিজ বারবার যথাসময়ে সভাকক্ষে এসে উপস্থিত হন। রিবেনট্রপ, নিউরথ প্রভৃতি জার্মানীর প্রথম সারির নেতাগণ সেখানে অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই হিটলার সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং যথারীতি টয়েনবির সঙ্গে করমর্দন করেন। টয়েনবি প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং খানিকটা বিস্মিতও হন। হিটলারের কথার যোগ্য প্রত্যুত্তর কি হবে তা তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না! টয়েনবি বলেছেন যে হিটলার তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দু'দেশের দু'জন চিন্তানায়কের মিলন ঘটল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক হিটলার যেন খোলা মনে টয়েনবির সঙ্গে কথা বলতে পারছিলেন না। কোথাও যেন একটা সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল। কিন্তু কেন? এর উত্তর অবশ্য টয়েনবি নিজেও দিতে পারেননি। এর মধ্যে টয়েনবি কিছুটা জার্মান ভাষাও আয়ত্ত করেছেন। উদ্দেশ্য হিটলারের সঙ্গে সরাসরি বাক্যবিনিময় করার সুযোগ করে নেওয়া।

যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হল। হিটলার বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। টয়েনবি বলেছেন হিটলারের বক্তৃতা ছিল তীক্ষ্ণ ও বাকবহুল শব্দ দ্বারা পল্লবিত। হিটলার তাঁর বক্তৃতার মধ্যদিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বর্ণনা হিটলার তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন। টয়েনবি উল্লেখ করেছেন যে হিটলার প্রায় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বক্তৃতা করলেন। টয়েনবি মুগ্ধ, টয়েনবি বিস্মিত। তিনি বলেছেন কোন লোকের সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে না থাকলে এ রকম যুক্তিসম্মত বক্তৃতা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দৃশ্য ও অদৃশ্য কত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের রথ আপন গতিতে প্রবাহিত হয়! এই গতির উদ্দামতা কোন কোন সময় প্রবল আকার ধারণ করে আবার কোন কোন সময় হয়ে আসে স্তিমিত। এই উঠানামার মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা জার্মান জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিটলার সে সমস্ত দিকগুলো অতি সুন্দরভাবে বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন।

টয়েনবির নিজের ভাষাতে বলি. "Beginning in the Sixth Ceutuiy, Hitler's lecture rolled on till it arrived at the present day.........It lasted for two hours and a quarter, minus five minutes......For those two hours and a quarter Hitler developed his theme with masterly coherence and lucidity. I can not think of any academic lecturer to whom I have ever listened who could have spoken, so continuously for that length of time without ever loosing the thread of his argument."

লীঞ্জ ছিল অস্ট্রীয়ার একটি প্রদেশিক শহর। কাছে ছিল অস্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা। ভিয়েনা ছিল এক ঐশ্বর্যময়ী নগরী এবং বিভিন্নপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থল। উচ্চাভিলাষী হিটলারের বালক মনকে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভিয়েনা নগরী আকর্ষণ করল। ১৯০৬ সালে মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে হিটলার ভিয়েনাতে চলে যান। এখানে দু'মাস অতিবাহিত করার পর আবার লীঞ্জে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে মায়ের মৃত্যুর পর এই ভিয়েনাতেই কেটেছে তাঁর জীবনের সঙ্কটময় সময়। কিন্তু বর্তমানে এই দু'মাসের ভিয়েনা ভ্রমণ তাঁর যুবক মনকে যেন উত্তাল করে তুলেছে।

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে হিটলার আবার ভিয়েনায় আসেন। উদ্দেশ্য ভিয়েনা আকাদেমি অফ্ ফাইন আর্টসে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেওয়া। কিন্তু ভর্তির পরীক্ষায় তাঁর ফল আশাপ্রদ হল না। ফলে ভিয়েনা আকাদেমি অফ্ ফাইন আর্টসে ভর্তি হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

উচ্চাভিলাষী হিটলার পরের বছর আবার ভিয়েনা আকাদেমিতে ভর্তির জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এবার তিনি ভর্তির পরীক্ষায় বসার জন্য বিবেচিত হলেন না। কেন না এখানে ভর্তির পরীক্ষায় বসার যোগ্যতার জন্য তিনি যে নমুনা চিত্রটি পাঠিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত খারাপ। শাইরার উল্লেখ করেছেন যে, **'Hitler tried in the following year and this time his drawings were so poor that he was not admitted to the test."** হিটলার আশা করেছিলেন যে তিনি এবার ভিয়েনা আকাদেমিতে ভর্তি হবার সুযোগ পাবেন। এটা যেন তাঁর কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

মেইন ক্যাম্পে হিটলার লিখেছেন যে, তিনি এই ব্যাপারে তাঁর অসাফল্যের কারণ জানতে চেয়ে আকাদেমির ডাইরেক্টরের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। আকাদেমির ডাইরেক্টর তাঁকে উত্তরে জানিয়েছিলেন যে চিত্রশিল্পী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, বরঞ্চ স্থাপত্যবিদ্যা (আর্কিটেকচার) শেখার চেষ্টা করলে ভাল হতে পারে।

হিটলার 'আর্কিটেকচার'-এ ভর্তি হতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্কুল লার্নিং সার্টিফিকেট না থাকায় আর্কিটেকচারে ভর্তি হওয়ার ক্ষীণ আশাও তাঁর লুপ্ত হল।

এই সময়ে তাঁর মা ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন। হিটলারকে বাধ্য হয়ে আবার লীঞ্জে ফিরে আসতে হল। ১৯০৮ সালে ২১শে ডিসেম্বর তাঁর মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন হিটলার ১৯ বছরের যুবক। মায়ের মৃত্যুতে হিটলারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা স্থগিত রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা চরমে উঠল। দুবেলা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। লীঞ্জে আর থাকা সম্ভব নয় দেখে হিটলার ভিয়েনার পথে পা বাড়ালেন। হিটলার নিজেই বলেছেন, **"With a trunk of clothes and linen in my hand, and in my heart an**

unbreakable will—I travelled to Vienna.........I wanted to become somebody.*

সহায়সম্বলহীন অনাথ বালক হিটলার এই ঐশ্বর্যময়ী ভিয়েনা নগরীতে পাঁচটি বছর কাটিয়েছেন অসহনীয় দুঃখে। তাঁর সবচেয়ে সঙ্কটময় দিন গেছে এ সময়। তখন ১৯০৯ সাল।

এখানে অনেক সময় তাঁকে পার্কে রাত কাটাতে হয়েছে। পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন বহুবার। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে হিটলার ছিলেন একজন সমাজচ্যুত ব্যক্তি। যদিও বা খানিকটা নিজের দোষে, খানিকটা অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁকে এই জীবন যাপন করতে হয়েছে ভিয়েনাতে—কিন্তু এরকম সঙ্কটতম মুহূর্তেও তিনি কোনদিন অসামাজিক কাজে নিজেকে লিপ্ত করেননি।

কোন কোন সময় প্রলোভন তাঁর কাছে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যৌবনের উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা সমাজচ্যুত এবং রিক্ত হিটলারের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তাঁর উচ্চ মানসিকতা তাঁকে কোন সময়ে নৈতিক দিক থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অসামাজিক কাজকে তিনি তাঁর জীবনের পাথেয় করে নেননি।

ভিয়েনা নগরী ছিল মধ্য ইউরোপের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। তাই নিঃস্ব মানুষের পক্ষে ভিয়েনা নগরীতে বাস করা একটু অসুবিধাজনক ছিল। অবশ্য অন্যান্য সম্পদশালী নগরীর মত এখানেও প্রচুর দরিদ্রলোকের বাস ছিল। ছোট বড় সকলেই এখানকার ধনসম্পদের মোটামুটি সুযোগ নিতে আরম্ভ করেছে। নিম্ন-মধ্যবিত্তের একটি বিরাট অংশ এখানকার রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিল। এখানে শ্রমিকেরা যে কেবল তাদের শ্রমিক সংস্থা গড়ে তুলেছে তা নয়—তাদের একটা নিজস্ব রাজনৈতিক দলও গঠিত হয়েছে নাম 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'।

সমগ্র ভিয়েনার রাজনীতিতে জেগেছে উত্তেজনা। প্রায় দুই মিলিয়ন লোক নিয়ে এই ভিয়েনা নগরীতে গণতন্ত্র আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব খর্ব করে ভিয়েনাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তখন সবাই সোচ্চার।

নিঃস্ব হলেও হিটলারের মত একজন কর্মঠ যুবকের পক্ষে এখানে একটা স্থায়ী কাজ জুটিয়ে নেওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। লেখাপড়া শেখার সুযোগও ছিল। হিটলারের বন্ধু কুবাইজাকও অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। ভিয়েনা নগরী কুবাইজাককে দিয়েছে পথের সন্ধান। ভিয়েনা নগরীর 'আকাদেমি অব মিউজিকের' শিক্ষা তাঁকে দিয়েছে খ্যাতি।

হিটলারকে কি এক অদ্ভুত নেশায় মাতিয়ে রেখেছে তা বোঝা মুস্কিল; কেন না তিনি জীবিকার জন্য কোন কিছু শিক্ষা করা বা স্থায়ী চাকুরী গ্রহণ করা কোনটাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। বরঞ্চ এ সময় থেকে তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু অস্থায়ী কাজ বেছে নিলেন। তা থেকে যা আয় হত তা দিয়ে তাঁর একার ভরণপোষণ চলাও ছিল কষ্টসাধ্য।

ভিয়েনার রাস্তাতে বেলচা দিয়ে বরফ পরিষ্কার করে বা রেল ষ্টেশনের ধারে কার্পেট বিক্রী করে তিনি সময় সময় কিছু রোজগার করতেন। অনেক সময় রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগানদারের কাজ করেও তাঁকে জীবনধারণের অর্থ রোজগার করতে হতো। এভাবে এক বছর এক জায়গায় অতিবাহিত করার পরও তিনি স্থায়ী কিছু করতে পারলেন না।

অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনা করে হিটলার ভিয়েনার একটি জেলাতে চলে যান। এবং ৭, ম্যালডেমেন ষ্ট্রেসেতে এক হোটেলে এসে ওঠেন। এটা ভিয়েনার বিংশতিতম জেলার একটি ছোট্ট হোটেল। দানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু এখানে এসেও তিনি তাঁর ভাগ্যকে ফেরাতে পারলেন না। রোজগারের বিশেষ কিছু সুবিধেও করতে পারলেন না। তাই তাঁকে প্রায়ই অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাতে হতো। অনেক সময় দানছত্রে গিয়ে সাধুসন্ত ও ভিখারীদের সঙ্গেও তাঁকে অন্নগ্রহণ করতে হতো।

এই সময় হিটলারের সঙ্গে 'রেইনহোল্ড হ্যানিশ' নামের এক ব্যক্তির পরিচয় ঘটে। জার্মানীর বোহেমিয়ার অধিবাসী হ্যানিশ। ভবঘুরে লোক। রোজগারের তাগিদে ভিয়েনাতে এসেছে। ভিয়েনার 'মেইডলিং ষ্টেশনে' হিটলারের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ।

হ্যানিশ বলেছেন প্রথমদিন হিটলারকে দেখে তার মনে করুণার উদ্রেক হয়। পরণে ছেঁড়া পায়জামা, আধ পাগলের মত চেহারা, মাথা গুঁজবার মত কোন জায়গা নেই, কোন কোন দিন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে—হিটলারের এই ছন্নছাড়া জীবন হ্যানিশকে ব্যথিত করে তুলল। হ্যানিশের লেখা থেকে হিটলারের ভিয়েনা জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। তাই রুডলফ ওল্ডেন উল্লেখ করেছেন যে, **"This was the first genuine and authenticated ovservations about Hitler's life in Vienna that the world heard."**

হ্যানিশের মতে হিটলারের মানসিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। এত দুঃখ-দৈন্যের পীড়নেও তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরঞ্চ এই অবস্থা তাঁকে জুগিয়েছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও সম্ভ্রমবোধ। হ্যানিশ একবার হিটলারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি কি কাজ করেন। হিটলার উত্তরে নিজেকে চিত্রশিল্পী বলে জাহির করেন। হ্যানিশ হিটলারকে গৃহ-প্রসাধক (House Decorator) বলে উল্লেখ করাতে হিটলার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং উত্তরে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি গৃহ-প্রসাধক নন বরঞ্চ ভিয়েনার বিদ্বৎ সমাজের সভ্য এবং চিত্রশিল্পী। হ্যানিশের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, হিটলার এই সময় জার্মান ভাষা ভাল বলতে পারতেন না তথাপি তাঁর জার্মান-প্রীতি ছিল অপরিসীম।

হিটলার ও হ্যানিশ এখন একই ঘরের বাসিন্দা। দু'জনেরই বাস ২৭, ম্যালডেমেন ষ্ট্রেসের হোটেলে। অন্নসংস্থানের জন্য দু'জনেরই সমান চিন্তা। হিটলার হ্যানিশকে প্রস্তাব দিলেন যে তাঁরা অপরের ছবি জাল করে সেগুলি বিক্রী করে পয়সা রোজগার করবেন। এতে অনেক পয়সা আসবে! হিটলার বলেন যে

লীভে বাঁচার তাগিদে তাঁকে এভাবে অন্যের ছবি জাল করে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে।

হ্যানিশ্চ পুলিশের ভয়ে ভীত। এই সমস্ত কাজে তাঁর অনীহার কথা হিটলারকে জানালেন। হ্যানিশ্চ বললেন যে, বরঞ্চ পোষ্টকার্ডে চিত্রাঙ্কন করে সেগুলি বিক্রী করার ব্যবস্থা করবেন। তা থেকে যা রোজগার হবে তা তাঁরা দু'জনে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, হিটলার পোষ্টকার্ডে যা আঁকতেন সেগুলি তাঁর নিজস্ব আঁকা ছবি নয়। অন্যের আঁকা ছবি থেকে ট্রেইস করে নিয়ে সেগুলি রঙ করে দিতেন।

কিন্তু তাঁদের এমন কোনো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যাতে তাঁরা বেশ বড় রকমের একটা ব্যবসা চালাতে পারেন। হ্যানিশ্চের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, হিটলারের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিতার পেনসনের একটি অংশ তাঁর প্রাপ্য ছিল। হিটলার তাঁর সে অংশ বোনকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুঃসময়ে হিটলার বোনকে সে টাকা ফেরৎ দেবার জন্য চিঠি লেখেন। যথারীতি টাকাও পাওয়া গেল।

হিটলার রঙীন চিত্র আঁকতে আরম্ভ করলেন। হ্যানিশ্চ ছবি বিক্রীর জন্য ক্যান্‌ভাস করার দায়িত্ব নেন। প্রতিটি ছবির বিক্রীত অর্থ থেকে হ্যানিশ্চ প্রায় ৫।৬ ক্রাউন এমনকি ১০ ক্রাউন পর্যন্ত পেতেন। হিটলার যদি স্থিরভাবে এই ব্যবসা চালাতে পারতেন তাহলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন এবং তাঁদের ব্যবসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। কিন্তু হিটলার ছিলেন পিতার মত অস্থিরচিত্ত। তদুপরি তাঁর উগ্র মনোভাব তাঁকে এই কাজে বেশীদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। যদিও বা হ্যানিশ্চ তাঁকে সাহায্য করতে কোন সময়ে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

এমন সময় লীয়েডেনরথ (Leodenroth) নামক আর একজন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে হিটলার ও হ্যানিশ্চের বন্ধুত্ব ঘটে। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, এই সময় হ্যানিশ্চ হিটলারকে সর্বতোভাবে সাহায্য না করলে হিটলারকে অনাহারে দিন কাটাতে হতো এবং এই অবস্থায় কতদিন টিকে থাকতে পারতেন তা বলা মুস্কিল। লীয়েডনরথ বলেন যে, তখন ছবি আঁকার চেয়ে সেগুলো বাজারে বিক্রী করা ছিল কষ্টসাধ্য।

লীয়েডেনরথ হিটলারের শত্রু ছিলেন না। তাঁর কোনো রাজনৈতিক মতবাদও ছিল না। বরঞ্চ তিনি হিটলারকে রাজনীতিবিদ্‌ এবং সুবক্তা হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হিটলার সম্পর্কে লিয়েডেনরথের ব্যক্তিগত মন্তব্য সকলেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে ধরে নিতেন। তিনি বলেন হিটলার ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে কোন কথাবার্তা বা আলোচনা চলতে থাকলে তিনি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হয়ে যেতেন। লাজুক হিটলার যেন কঠোর হয়ে যেতেন। তাঁর মুখাবয়ব দেখে মনে হতো যেন তাঁর মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে।

কোন ব্যাপারে আলোচনা চলতে থাকলে হিটলার সেটাকে রাজনৈতিক মোড় দিতে চেষ্টা করতেন। এবং সেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন।

ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চিন্তাধারা হিটলারের জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো। কিভাবে তিনি জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন সে চিন্তায় তাঁর মন উত্তাল হয়ে উঠল। তাঁর জীবনী লেখক কণীড হিয়েডেন মন্তব্য করেছেন যে, "His feet were in the mud but he lived for the stars".

হিটলারের বাহ্যিক চালচলন ছিল এক অদ্ভুত রকমের। কারো কাছে পাওয়া একটি পোষাকী কোট ছিল তাঁর সম্বল। গালে ছিল লাল রঙের নরম লোম। তাঁর কোন বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। এমনকি এ সময়ে তাঁর কোন বান্ধবীও ছিল না। মদের নেশায় তাঁকে কোনদিন কেউ ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

এ সময়ে হিটলারের সঙ্গে হ্যানিশের মতবিরোধ ঘটে। হিটলার বলেছেন হ্যানিশ তাঁকে প্রতারণা করেছে। তাঁর আঁকা ছবি থেকে প্রাপ্ত অর্থ হ্যানিশ আত্মসাৎ করতো। এ ধারণা যেভাবে হোক হিটলারের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। বাধ্য হয়ে এ সময়ে হিটলারকে এক শ্রমিক সংস্থায় কাজ নিতে হয়।

দারিদ্র্য ও একাকীত্বের মধ্যে দিন কাটালেও ২৩ বছর বয়সের হিটলারের মনে ভিয়েনা নগরীই জুগিয়েছে তাঁর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ। ভিয়েনার যে পরিবেশে তিনি কাজ করতেন সেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন।

ভিয়েনাতে হিটলার কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু এখানে অষ্ট্রীয়ার তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতেন। এ সমস্ত দলের ভাবধারা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল হিটলার তাঁর 'মেইন ক্যাম্ফের' বিভিন্ন পাতায় তা স্বীকার করে গেছেন। এই তিনটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে (১) সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, (২) প্যান জার্মান ন্যাশানালিষ্ট পার্টি. (৩) খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্ট পার্টি।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রভাব তখন ভিয়েনাতে সর্বাপেক্ষা বেশী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিকদের চিন্তার জগতে তাদের স্থান ছিল অনেক উর্দ্ধে। হিটলার অবশ্য সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের কোনদিন ভাল চোখে দেখেননি। তাদের দ্বারা ভিয়েনা নগরীতে যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার কোনটাকেই হিটলার সুস্থমনে মেনে নিতে পারেননি। হিটলার অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাফল্যের পেছনে তিনটি কারণ বর্তমান ছিল। প্রথমত, কোন দেশে আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত করলে তাতে সাফল্য লাভ করা যায় তা তারা ভালভাবে জানত। দ্বিতীয়ত, সাধারণ লোকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে কিভাবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য চালাতে হয় তারও সম্যক জ্ঞান তাদের ছিল। তৃতীয়ত, জনসাধারণকে তাদের মতবাদের সমর্থনে আনতে গেলে যে ধরনের মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন তাদের ওপর প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে তাদের একটি সঠিক পদ্ধতি ছিল।

হিটলার উল্লেখ করেছেন যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতবাদগুলি এবং সেগুলো

কার্যকরী করার জন্য তাদের অবলম্বিত পদ্ধতি তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে হিটলার তাঁর নাৎসী দল গঠনের সময় এ-সমস্ত পদ্ধতি নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন।

হিটলার প্যান জার্মান ন্যাশানালিষ্ট পার্টিরও সমর্থক ছিলেন। এই পার্টির নেতা ছিলেন জর্জ রিটারভন্ শ্রোয়েনার। তিনি ছিলেন লোয়ার অষ্ট্রীয়ার স্পাইটল শহরের অধিবাসী। হিটলার শ্রোয়েনারকে অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে মনে করতেন। সমগ্র অষ্ট্রীয়াতে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তার করাই ছিল এ দলের একমাত্র উদ্দেশ্য—যাতে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের আধিপত্য খর্ব করে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে জার্মানীর সংযুক্তির পথ সুগম হয়। হিটলার 'মেইন ক্যাম্ফে' উল্লেখ করেছেন যে, এই দলের সঠিক কোন কর্মপন্থা ছিল না তাই তারা পদে পদে তাদের দলীয় নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

হিটলার যখন ভিয়েনাতে রাজনীতি সম্বন্ধে একটি সুসংবদ্ধ মতবাদ গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছেন সে সময় শ্রোয়েনারের খ্যাতি অস্তমিত। ১৯১০ সাল। তখন ভিয়েনায় কার্ল লুয়েগারের প্রতিপত্তি সর্বাধিক। অবশ্য শ্রোয়েনার ও কার্ল লুয়েগার দুজনই ছিলেন ইহুদী বিদ্বেষী। এবং সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে মুখ্য প্রচারক হিসেবে খ্যাত। তবে হিটলার শ্রোয়েনারকে **'better and thorough thinker in theoretical problems'** বলে মনে করলেও কার্ল লুয়েগারকে মনে করতেন, **'really great reformer and genius'**।

হিটলার মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে গোড়ার সমস্যা সমাধানে শ্রোয়েনারের চিন্তাধারা ছিল উঁচু ও বলিষ্ঠ। শ্রোয়েনারের চিন্তা ছিল জার্মানীর স্বার্থে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন। এবং হিটলার আরও মন্তব্য করেছেন যে, শ্রোয়েনারেব চিন্তানুযায়ী অষ্ট্রীয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য যদি জার্মানরা সচেষ্ট হতো তা হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়কে সম্ভবত এড়ানো যেত। শ্রোয়েনারের জার্মানীর সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তাধারার গভীরতা ছিল সত্য কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ছিল পয়গম্বরের মত কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

এদিক থেকে খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্টরা ছিল অনেক বাস্তববাদী। এ দলের লোকেরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে তাদের আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সাধারণ লোকের মন জয় করা একান্ত প্রয়োজন। তাই তারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট থাকতো। ক্যাথলিক ধর্মকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ফলে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এক বিরাট যুবগোষ্ঠীর সমর্থন তারা লাভ করেছিল। এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নতিকল্পে যা যা করা প্রয়োজন সেভাবে তারা এগোতে লাগলো। চালাতে লাগল প্রচার।

তারা অষ্ট্রীয়ার সামাজিক চরিত্রটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং বিপুল সংখ্যক অষ্ট্রীয়াবাসীর সমর্থনপুষ্ট ছিল। তবে তাদের ভুল ছিল তারা জাতীয়তাবাদী নীতিকে

তদানীন্তন অষ্ট্রীয়ার রাজনৈতিক শক্তির উৎস বলে মেনে নিতে পারেনি। তারা ভেবেছিল বিভিন্ন জাতীগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এই অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে তাদের ধ্যানধারণা জাতিগত হওয়া উচিত নয়। তাহলে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্টদের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি ছিল ধর্মীয় ভিত্তির ওপর, জাতি বিদ্বেষের আদর্শের ওপর নয়। হিটলার 'মেইন ক্যাম্ফে' উল্লেখ করেছেন যে, এই মারাত্মক ভুলের জন্যই খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্টরা অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।

হিটলার বার বার বলেছেন যে, প্যান জার্মান আন্দোলনের প্রতি তাঁর হৃদয়ের সংযোগ ছিল—কেন না তারাই একমাত্র চিন্তা করেছিল যে, অষ্ট্রীয়ায় জার্মান জাতির আধিপত্য বিস্তার করা একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু তারা অষ্ট্রীয়ার সামাজিক চরিত্রটি উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি, যার ফলে তাদের এই শোচনীয় পরিণতি। আর খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্ট নেতা কার্ল লুয়েগারের প্রতি হিটলারের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

হিটলার সংসদীয় গণতন্ত্রকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন দুর্বল ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তি দ্বারাই গঠিত হয় এই সংসদীয় গণতন্ত্র। এবং ইংলণ্ডই ছিল এই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে সমাজতন্ত্র নামক নতুন মতবাদ **"Democracy in the West is the forerunner of Marxism, which would be inconceivable without democracy."—Hitler**

হিটলার বলতেন, ইংলণ্ডই অষ্ট্রীয়াতে চালান করেছে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো। ভিয়েনায় অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্ট ভবনটি তৈরী করেছিলেন ওলন্দাজ স্থপতি বা স্থাপত্যবিদ হানসান। যা অষ্ট্রীয়ানদের কাছে ছিল মন্দিরের মত পবিত্র। কিন্তু পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ধাঁচে এই পার্লামেণ্ট ভবনটিকে সাজাতে হয়েছে গ্রীক মূর্তি—গ্রীক ও রোমান নেতা এবং দার্শনিকদের ছবি দিয়ে। হিটলার তাই অতি ক্রোধে ও দুঃখে বলেছেন যে, এই প্রাসাদটিকে অলংকরণের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে। হিটলার আরও বলেছেন যে, জার্মানীর 'রাইখষ্ট্যাগ' বা পার্লামেণ্ট ভবনটি একইভাবে 'Paul Wallat' অর্থাৎ 'পল ভালেট' কর্তৃক তৈরী করা হয়েছিল। হিটলারের কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ—যেখানে জার্মান জাতীয়তাবাদের কোন চিহ্নমাত্র নেই। এ থেকে বোঝা যায় হিটলার কতখানি জার্মান জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন।

হিটলার অবশ্য প্রথম প্রথম পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখেও দেখেছিলেন। এর পেছনে অবশ্য হিটলারের ওপর অষ্ট্রীয়ার সংবাদপত্রসমূহের এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল। অষ্ট্রীয়ার সংবাদপত্রসমূহ পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। অবশ্য আস্তে আস্তে হিটলারের ভুল ভাঙতে আরম্ভ করল। তিনি দেখতে পেলেন অষ্ট্রীয়াতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সার্বজনীন ভোটাধিকার যখন প্রচলিত হল তখন পার্লামেণ্টে ভোটের জোরে অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের প্রতিনিধিরা আসতে আরম্ভ করল। ফলে পার্লামেণ্ট ভবন দুর্বল ও

সংকীর্ণমনা লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হতে লাগল—আর চিন্তাশীল জার্মানরা ধীরে ধীরে সংসদ-সদস্যের পদ থেকে অপসারিত হতে লাগল। হিটলারের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে পার্লামেণ্ট সদস্যরা যতই নিকৃষ্ট স্তরের হোক না কেন টাকা দিয়ে তারা ভোট সংগ্রহ করতে পারে। যার ফলে অস্ট্রীয়ার পার্লামেণ্ট থেকে ক্রমে ক্রমে জার্মানরা সরে পড়তে আরম্ভ করল। এর পরিণতি হলো অস্ট্রীয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের ধ্বংস।

হিটলার বলেছেন যে, মাত্র ১৯।২০ বছর বয়সে তিনি অস্ট্রীয়ার ফ্রানজেন্ স্রঙের প্রাসাদে গিয়ে পার্লামেণ্ট সদস্যদের বক্তৃতা শুনতেন। প্রথম অভিজ্ঞতাতেই তিনি সংসদ সদস্যদের বক্তব্যকে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি এর পরেও আরও অনেকবার অস্ট্রীয়ার পার্লামেণ্ট ভবনে সদস্যদের বক্তব্য শোনার জন্য গিয়েছেন এবং দেখেছেন যে সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তার ছাপ নেই। তিনি দেখেছেন কিছু অভদ্র দাঙ্গাবাজ মানুষ (যারা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত) বিশ্রী আকার ইঙ্গিত করছে এবং পরস্পরের প্রতি কুৎসিৎ মন্তব্য করে সভায় হৈ চৈ করছে। আর একজন বৃদ্ধ স্পীকার তাদের সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন আর হাতুড়ী পিঠছেন। অবশ্য তাঁর সে আবেদনে কেউ কর্ণপাত করছে না।

আবার কোন কোন সময় দেখেছেন, সদস্যদের কেউ কেউ পার্লামেণ্ট ভবনে সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন, আবার কেউ কেউ চেয়ারে বসে হাই তুলছে। এই সমস্ত চিত্র হিটলারের মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল—যার জন্য তিনি বারংবার বলেছেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে মানবজাতির অবক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ। হিটলার বারবার তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, অস্ট্রীয়ার যা কিছু ভাল, যেমন সঙ্গীত, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব কিছুর মূলে রয়েছে প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রীয়ায় বসবাসকারী জার্মান মনীষীদের অবদান। অথচ জার্মানদের ধীরে ধীরে অস্ট্রীয়ার রাজনীতি থেকে বাধ্য হয়ে দূরে সরে যেতে হচ্ছে। তাঁর মতে অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন ছিল একজন শক্তিশালী প্রশাসকের। এবং একমাত্র দ্বিতীয় জোসেফ ভিন্ন আর কোন অস্ট্রীয়ান সম্রাটের সে ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় জোসেফ যদি আরও ৫০ বছর বেঁচে থাকতেন তাহলে অস্ট্রীয়ার শ্রীবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হত না। কিন্তু দ্বিতীয় জোসেফ রাজত্ব করেছিলেন মাত্র ১০ বছর। এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রীয়ার অবক্ষয়ের পথ ত্বরান্বিত হয়েছিল। হিটলার দ্বিতীয় জোসেফের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন।

হিটলার বলতেন—ত্রিশ বছরে পদার্পণ না করে কোন ব্যক্তির রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয় কেন না তাঁর ধারণা তার আগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক হয়ে ওঠে না। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বা লেখায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন যে, রাজনীতিতে আসার আগে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের মধ্যে একটি সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার (বিশেষত রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে) গড়ে তোলা উচিত। যাকে বলা যেতে পারে প্রত্যেক মানুষের জীবনদর্শন। এরূপ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাজনীতিতে না এলে সে লোকের পক্ষে রাজনৈতিক সাফল্যলাভ করা অসম্ভব।

তার সময়কার অষ্ট্রীয়ার রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি তাঁকে পদে পদে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি খুব সীমিত সংখ্যক লোকের কাছে ছাড়া বিশ্বের বা জার্মানীর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন না। তিনি খুব স্বল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং তাঁদের মতামতও তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতেন।

তিনি 'মেইন ক্যাম্ফে' উল্লেখ করেছেন যে, ভিয়েনাতে তিনি জার্মান জাতি ও জার্মানী সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন সে রকম সুযোগ আর কোথাও পাননি। হিটলার বার বার উল্লেখ করেছেন যে, অষ্ট্রীয়ার বা ভিয়েনার জার্মানরা মানসিক দিক থেকে ছিল অনেক উদার ও সমৃদ্ধ। এবং এখানকার বিজ্ঞান শিল্পকলা সবই ছিল তাদের হাতে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের সামরিক কর্মী থেকে উচ্চপদস্থ অফিসার প্রায় সকলেই ছিল জার্মান। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যও তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। অষ্ট্রীয়াতে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হবার পর থেকে জার্মানদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে।

এরপর থেকে জার্মান শিক্ষাদীক্ষা জার্মান রীতিনীতি, জার্মান ভাষা সব কিছুই এখানে ঘৃণিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। অষ্ট্রীয়া সরকারই ছিল এ সমস্ত জার্মান বিদ্বেষের মূলে। জার্মান সম্রাট কাইজারের প্রতি বিষোদ্গার, চিন্তানায়ক বিসমার্ককে হেয় করার চেষ্টা প্রভৃতি ছিল ভিয়েনার নিয়মিত কার্যকলাপ। হিটলার লক্ষ্য করলেন অষ্ট্রীয়ার শাসনকর্তা জার্মানীর চিরশত্রু ফরাসী জাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানের বিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বের ইতিহাস পড়ানো হয়—অথচ জার্মানীর ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের কোন বই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ার ব্যবস্থা নেই। জার্মানীকে বাদ দিয়ে অষ্ট্রীয়ার কোন ইতিহাস রচিত হতে পারে না। হিটলার সেটা ভালভাবে জানতেন। অথচ সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকলেও জার্মানীর ইতিহাস পড়ানো অষ্ট্রীয়াতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক দেশের একটি জাতীয় সঙ্গীত বর্তমান থাকে। বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইবার অধিকারী ছিল এবং অষ্ট্রীয়ার জয়গান করার রীতিই প্রচলিত ছিল কিন্তু জার্মান ছাত্রছাত্রীদের তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইবার কোন অধিকার ছিল না। হিটলার এ সমস্ত জিনিস অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন যে, তদানীন্তন হ্যাপসবার্গ বংশীয় সম্রাটই এ সমস্ত জার্মান বিদ্বেষের পৃষ্ঠপোষক।

অষ্ট্রীয়ার হ্যাপসবার্গ সম্রাটের ওপর তাই তাঁর ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। তিনি বুঝতে পারলেন অষ্ট্রীয়ার অধিবাসীদের সামাজিক জীবনটা ছিল অত্যন্ত কৃত্রিম। এবং অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য ক্রমশ 'হ্যাপসবার্গের জীবাণুভর্তি ইটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে'।

গণতন্ত্রকে হিটলার মার্ক্সীয় মতবাদের এক উর্বর ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। অষ্ট্রীয়ায় এই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখান থেকে জার্মানরা ক্রমশ বিতাড়িত হতে থাকে—যার ফলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যেরও আস্তে আস্তে পতন ঘটে।

হিটলার জোর দিয়ে বলেছেন যে সংখ্যাধিক্য ও একক প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ অনেক। 'সংখ্যাধিক্য শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ করে না, কাপুরুষও বটে। যেহেতু একশো বোকা একজন জ্ঞানীর সমতুল্য নয়, সেই রকম একজন কষ্টসহিষ্ণু ও নৈতিক চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে যা করা সম্ভব, একশটা কাপুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়'।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিটলারের জাতীয়তাবাদী মন ও চরিত্র অস্ট্রিয়ার এই সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিতে পারেনি। যেখানে জার্মানদের আধিপত্য ক্রমশ খর্ব হয়েছে। তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, 'সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন কেউ এ ধরনের হাঁসের ঝাঁকের ভিড়ে উচ্চ কণ্ঠস্বরে দিগদিগন্ত নিনাদিত করবে না। এবং অধিকাংশের সমর্থন পাওয়া মূর্খের দলে ভেড়ার মত কর্মকেও নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে মনে করবে না।' তাঁর মতে একমাত্র ইহুদীরা ছাড়া অন্য কোন জার্মান এ গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারে না। **"None but a Jew can value an institution which is as dirty and false as he is himself."—Hitler.**

হিটলার ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে কঠোর মন্তব্য করেছেন। যদিও বা সংবাদপত্রই হলো জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করার একটি প্রকৃষ্ট হাতিয়ার—কিন্তু ভিয়েনাতে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এখানকার সংবাদপত্রগুলি জার্মান জাতীয় জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে উপেক্ষা করে এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে তুলে ধরে। ফলে সাধারণ লোকের মনে জার্মানদের সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। জনগণ আসল জিনিসটা ভুলে গিয়ে জার্মানদের তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে বড় করে দেখে। এমনি করেই এখানকার সংবাদপত্রগুলি ইচ্ছে করে অনেক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণ লোকের কাছে বড় করে তুলে ধরে টাকার লোভে। ফলে অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তিনি বলেছেন এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কোনদিনও শুভ হতে পারে না বরঞ্চ দেশের অধঃপতন ঘটাতে সাহায্য করে।

হিটলার ভিয়েনাতে পোলিশ, জার্মান, হাঙ্গেরীয়ান, চেক্, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, চোর, বদ্‌মাস, ভিক্ষুক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আশ্রয়স্থল ছিল এই ভিয়েনা নগরী। হিটলার সব সময় মনে করতেন এদের মধ্যে জার্মানরাই ছিল সবচেয়ে উন্নত। তিনি মনে করতেন জার্মানদের সৃষ্টি পৃথিবীর অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির ওপর প্রভুত্ব করার জন্য। কেউ জার্মানদের ওপর প্রভুত্ব করুক এটা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না।

যৌবনের নানান অভিজ্ঞতা থেকে হিটলারের মনে এ ধারণা জন্মেছিল যে মানুষকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়। একটি উঁচু স্তর আর একটি নীচু। মানুষের মধ্যবিত্ত কোন স্তরকে তিনি মনে স্থান দেননি। হিটলার নিজেকে অনেক উঁচু স্তরের লোক

বলে মনে করতেন। এবং সুসভ্য জার্মান বলে নিজেকে জাহির করতেন। "From the experience of his youth both social and national, Hitler gained the conviction that men must be either higher or lower type and that he of course, belonged to the higher"—Kornard Heiden.

ভিয়েনা নগরীতে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে হিটলারের মনে এসব ধারণা বদ্ধমূল হয়। এখানে বাঁচার তাগিদে হিটলারকে শ্রমিকের পদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সিজার, আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের মানসিকতা নিয়ে যাঁর জন্ম তিনি কি এ সমস্ত কাজে নিজেকে বেশীদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারেন? হিটলার এখানে রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগানদারের কাজ করতেন। বাড়ী তৈরী করার সময় যে সমস্ত আবর্জনা জমত হিটলারকে সেগুলি গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র ফেলে দিয়ে আসতে হতো।

সকালে সূর্য ওঠার আগে তাঁকে ঘুম থেকে উঠতে হতো। কেন না তাঁর ওপর-ওয়ালা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক।

মধ্যাহ্নে যখন টিফিনের ঘণ্টা বাজতো হিটলার কাজ ছেড়ে টিফিনের সময় নিজের সামান্য খাদ্যটুকু গ্রহণ করতে করতে শ্রমিক-ভাইদের কথোপকথন একাগ্রমনে শুনতেন। আবর্জনার ওপর শুয়ে শুয়ে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য শ্রমিক-ভাইদের দুঃখদুর্দশার কথা ভাবতেন। এ সমস্ত কাহিনী হিটলারকে ব্যথিত করে তুলত। বেশীর ভাগ শ্রমিকই ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। এরা নিজেদের সোস্যালিষ্ট বলে মনে করত। এ সমস্ত শ্রমিক-ভাইরা ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করতো। তাদের মত ছিল উৎপাদনের যারা হাতিয়ার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে।

হিটলার ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন যে. শ্রমিক সংঘ বা শ্রমিকের দোহাই দিয়ে যারা এ সমস্ত আন্দোলন বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে তাকে সঠিক আন্দোলন না বলে অনেকাংশে গুণ্ডামি বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এতে শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হচ্ছে, শ্রমিকদের দুর্দশার শেষপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তাতে জাতীয়তাবোধ. দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেমের লেশমাত্র নেই। সুতরাং যা জাতীয়স্বার্থের পরিপন্থী সেরকম আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে হিটলার পুরোপুরি অনিচ্ছুক।

এই সমস্ত চিন্তাধারা হিটলারের কাছে নতুন। ল্যাম্বাকে বা লীঞ্জে থাকাকালীন হিটলার সোস্যালিজম সম্পর্কে একটি কথাও শুনেননি। সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায় তা তাঁর ধারণায় ছিল না। অনেক বিচার বিবেচনা করেও হিটলার তাঁর সহকর্মী শ্রমিক-ভাইদের এ সব মতবাদ স্থিরচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর অন্তঃকরণ যেন এ সমস্ত মতবাদে সায় দিতে নারাজ। এমিল লিজেল তাঁর হিটলার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "He might have liked these novel ideas if they have been expressed with less finality. The surer his fellow workers

were of their cause, the less inclined Hitler was to accept their words."

ভিয়েনাতে তাঁর এক সহকর্মী তাঁকে সোস্যালিষ্ট শ্রমিকসংস্থায় যোগদান করতে অনুরোধ করে। হিটলার কিন্তু অবিচল। দলের পুস্তকাদি ভালভাবে পড়াশুনা না করে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করতে নারাজ। তিনি প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী লেখকদের বই নিবিষ্টমনে পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সমাজতন্ত্র-বাদের স্বপক্ষের ও বিপক্ষের মতবাদগুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন। পরে সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার যুক্তিমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

নিঃস্ব অবস্থায় তাঁকে দিন কাটাতে হলেও তিনি শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি নিজেকে বিজয়ী সেনাদলের অধিনায়ক বলে মনে করতেন। এটা তাঁর দিবাস্বপ্ন হলেও তিনি নিজে এটাকে সঠিক বলে মনে করতেন। হিটলারের এই মনোভাবের জন্য তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই তাঁর ওপর রুষ্ট ছিল। এজন্য সহকর্মীদের কাছ থেকে তাঁকে কঠোর মন্তব্যও শুনতে হয়েছে অনেকবার। নির্যাতন ভোগও কম করতে হয়নি।

হিটলারের বিরুদ্ধ পক্ষের সদস্যরা বুঝতে পারল যে তারা হিটলারকে তাদের দলে টানতে পারবে না। তাই তারা হিটলারের ওপর দৈহিক বলপ্রয়োগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল। একদিন শ্রমিক সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য হিটলারকে স্পষ্টতই বলল যে হিটলার যদি শ্রমিক সঙ্ঘে যোগদান না করে তাহলে তাকে লাথি মেরে দোতলার কার্নিস থেকে ফেলে দেবে—এবং চিরতরে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাকে পরপারে চলে যেতে হবে।

হিটলার তখন নিরুপায়, একাকী। তিনি মৃত্যুভয়ে যে ভীত নন তাও নয়। তাঁর আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে কি রকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের ওপর জার্মান-অষ্ট্রীয়ার শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন নির্ভরশীল। এ সমস্ত ভেবে তাঁর হৃদকম্প উপস্থিত হলো। কিছুদিনের জন্য হিটলার কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু অন্য কোন কাজের সংস্থান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে পুনরায় তাঁকে আবার কাজে যোগদান করতে হলো। এবারও তিনি দেখতে পেলেন এক শ্রেণীর লোক কিভাবে শ্রমিক সঙ্ঘের নাম করে গুণ্ডামি চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের মতবাদে অবিশ্বাসী লোকদের ভীতি প্রদর্শন করে দাবিয়ে রাখছে।

হিটলার আবার প্রতিবাদ জানালেন। ফলে শ্রমিক সঙ্ঘের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিরতরে শ্রমিকের চাকরি ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

জীবনে ঘনিয়ে এল ঘোর সঙ্কট। অনাহারে অর্ধাহারে তাঁকে জীবন কাটাতে হচ্ছে। এক টুকরো রুটির জন্য রেল ষ্টেশনে কুলির কাজ করতে হচ্ছে। যেদিন কিছু জুটত না সেদিন কেবলমাত্র জল খেয়ে ভিখারীদের সঙ্গে রাত কাটাতেন। এত দুঃখের মধ্যেও তিনি আত্মবিশ্বাস হারাননি বা কোন কলঙ্কজনক পথ বেছে নেননি।

বরঞ্চ তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "I am grateful that I was thrown into a world of misery and poverty and thus came to know the people for whom I was afterwards to fight."—Mein Kampf.

হিটলার বুঝলেন যে সোস্যালিষ্টদের শ্রমিকদের উন্নতির জন্য এসব কর্মতৎপরতা দয়া বা অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি শ্রমিক সঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করে বলতেন যে তারা ধর্মঘট ডাকে, কল-কারখানা করে দেয়—ফলে শ্রমিকদের অর্থকষ্ট চরমে ওঠে। কিছুদিন এভাবে চলে, অনাহারে শ্রমিকদের দিন কাটে। নেতারা মহাজন বা ধনী মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে হয়তো একটা রফা করে। মালিকপক্ষ অনুকম্পা বা দয়া দেখিয়ে আবার শ্রমিকদের কাজে যোগ দেবার সুযোগ দেয়। তাদের দাবী দাওয়ার যে কোন সুরাহা হয় একথা বলা চলে না। হিটলারের মতে এগুলো কি সমাজসেবা বা শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতির পথ। তিনি স্পষ্টত বলতেন সমাজের বা শ্রমিকশ্রেণীর অবনতির কারণগুলোকে আগে চিনতে হবে—এবং মূল থেকে সেগুলিকে উৎপাটন করতে হবে। নচেৎ এ বাহ্যিক অনুকম্পা বা দয়া ভিক্ষে করে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। মালিকদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার এটা উপায় হতে পারে না। হিটলার তাই বলেছেন, "The aim of all social activity must never be merely charitable relief, which is rediculous and useless."—Mein Kampf. হিটলার মনে করতেন সব আন্দোলনই জাতীয়তার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমন্বিত ভিয়েনাতে এরূপ আন্দোলন কখনো সম্ভবপর নয়।

হিটলার তার শ্রমিকভাইদের এই ধরনের রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। কিন্তু নিরুপায়। তিনি মনে মনে ভাবতেন সময় এবং সুযোগ এলে তিনি শ্রমিকভাইদের তাঁর প্রতি এই রূঢ় ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবেনই। তিনি একথা ভালভাবে জানতেন যে, অন্যান্য শ্রমিকরা দলের শ্লোগান ভাল দিতে পারলেও তাঁর মত মানসিক দৃঢ়তা তাদের কারও নেই।

হিটলার আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, সোস্যালিষ্টদের বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে সম্যক বুঝতে হলে উচ্চধনতন্ত্রবাদের ওপর লেখা বই এবং পত্রিকাদি ভালভাবে পড়াশুনা করা একান্ত কর্তব্য। তাই তিনি "নিউ ফ্রি প্রেসে এবং দি উয়েনের ট্যাগব্লাট" (Neue Frie Presse and the Wiener Tagblatt) নামক ধনতন্ত্রবাদের ওপর লেখা পত্রিকাগুলি অতি যত্ন সহকারে পড়তে আরম্ভ করেন। এসব লেখা তাঁর মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও তিনি বলেছেন যে, এ লেখাগুলির যুক্তি ছিল অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর ও দুর্বল। জার্মানদের সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোই এই সমস্ত পত্রিকার আসল লক্ষ্য। "Its adverse criticism was reserved exclusively for the Germans."—Mein Kampf. তাই এ সকল পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় যেভাবে বিরুদ্ধ মতবাদকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তাতে হিটলার মোটেই সন্তুষ্ট নন। এমিল লেঙ্গীয়েল তাঁর হিটলার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে

'ফ্র্যাডারিক দি গ্রেট' হলে সোস্যালিষ্টদের এ সমস্ত মতবাদগুলিকে অন্যভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। "Frederik the Great would have disposed of socialist arguments in a different way." অবশ্য 'ফ্র্যাডারিক দি গ্রেটে'র মত বিবেচনাশক্তি এ সম্পাদকদ্বয়ের থাকবে এরূপ আশা করা বৃথা।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কার্ল লুয়েগার নামক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি তখন ভিয়েনার মেয়র ছিলেন। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরী কিন্তু তখনো গৌরবের সর্বোচ্চশিখরে। হিটলার বলেছেন এর জন্য সমস্ত কৃতিত্বের দাবী করতে পারে ভিয়েনার মেয়র কার্ল লুয়েগার। তাঁর সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তাঁর দক্ষ পরিচালনাগুণে সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সবদিক থেকেই অষ্ট্রীয়ার হৃদয় ভিয়েনা নব নব চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাই তদানীন্তনকালে ভিয়েনা বা অষ্ট্রীয়ার রাজনীতিবিদদের চেয়ে নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

কার্ল লুয়েগার ছিলেন খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্ট মতবাদের প্রধান প্রবক্তা এবং তাঁর মতবাদ খ্রীষ্টানদের আকৃষ্ট করেছিল। কার্ল লুয়েগারের একজন সমর্থক হিটলারকে বলেছিলেন যে, 'নিউ ফ্রি প্রেসে' এবং 'দি উয়েনের ট্যাগব্লাট' পত্রিকা দুটির সম্পাদক হচ্ছে দুজন ইহুদী। সোস্যালিষ্টদের নেতাও ছিলেন একজন ইহুদী এবং এঁদের লেখা যে জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে তাতে আশ্চর্য কি? হিটলার আরও জানতে পারলেন—ভিয়েনার বা অষ্ট্রীয়ার যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সবকিছুর কর্তৃত্বে আছে ইহুদীরা। এখানকার সব রকম পাপ ব্যবসার সঙ্গেও তারা জড়িত। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের শ্রমিক আন্দোলনের পেছনেও রয়েছে ইহুদী নেতারা।

ভিয়েনার প্রাদেশিক সরকার ছিল তখন ইহুদীদের বিদ্বেষী দলের সদস্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ। ভিয়েনার মেয়র কার্ল লুয়েগারও ছিলেন প্রচণ্ড ইহুদীবিদ্বেষী। ইহুদীরা ভিয়েনার সমস্ত কুকর্মের জন্য দায়ী এটা কার্ল লুয়েগারের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। কার্ল লুয়েগার তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ভিয়েনার জনমানসে ইহুদীদের বিপক্ষে তাঁর মতবাদকে অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। যুক্তিপূর্ণ লেখা মানবমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কার্ল লুয়েগার তাঁর কলমের আঁচড়ে ইহুদী ও সোস্যালিষ্টদের যে চিত্র জনসমাজে তুলে ধরেছেন তা যে-কোন লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ। একটি প্রবাদ আছে 'Pen is mightier than sword' অর্থাৎ কলমের শক্তি তরবারির শক্তির চেয়ে অধিক। আমরা তাই পরবর্তী সময়ে দেখতে পাই হেগেল, নীৎসে, স্প্যাঙ্গলার, কার্লস্কিমিট প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তাধারা হিটলারের মনের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভিয়েনা নগরীতে কার্ল লুয়েগারের ইহুদী এবং সোস্যালিষ্ট বিরোধী চিন্তাধারাও হিটলারের মনোরাজ্যে সৃষ্টি করেছিল আলোড়ন।

এটা স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর অমর দার্শনিক তত্ত্ব পৃথিবীতে জুগিয়েছে বিপ্লবের ইন্ধন, মানুষের চিন্তার রাজ্যে সৃষ্টি করেছে আলোড়ন। ভলতেয়ার, ডেভরেট ও রুশোর বাণী ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সকল দার্শনিকদের জোরালো যুক্তিবাদী তত্ত্ব তদানীন্তন ফরাসী জনগণকে উত্তাল করে তুলেছিল। তা

না হলে ফ্রান্সে এ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হতো কিনা কেউ সে কথা জোর করে বলতে পারে না। অবশ্য কোন একটা বিপ্লবের পেছনে অনেকগুলি কারণ বর্তমান থাকে— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। সঙ্গে ইন্ধন যোগায় দার্শনিক তত্ত্ব। তাই যুক্তিবাদী দার্শনিক তত্ত্বের শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

হিটলার কার্ল লুয়েগারের মতবাদকে যুক্তিপূর্ণ বলে মেনে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। কার্ল লুয়েগারের বক্তব্য ছিল ইহুদীরা 'সোস্যালিজম ও ক্যাপিটালিজম'— এই উভয় মতবাদের স্রষ্টিকর্তা। **"The Jews were the ringleaders of both Socialism and Capitalism."**

হিটলার তখন ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, নির্বোধ জার্মান শ্রমিকরা ইহুদী নেতাদের কু-পরামর্শে এবং ইহুদী সংবাদপত্রের বক্তব্যে প্ররোচিত হয়ে জার্মান শিল্প-সংস্থাগুলির শ্রীবৃদ্ধির মূলে আঘাত হানছে। হিটলার এতে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইহুদী চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী বাণী উচ্চারণ করে ইহুদী নেতারা কিভাবে জার্মান শ্রমিকদের স্বজাতীয় শিল্পসংস্থাগুলিকে ধ্বংস করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। তাই ইহুদীদের ওপর হিটলারের বিদ্বেষ ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল।

এ সমস্ত পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি পড়ে হিটলার আরও বুঝতে পারলেন যে, ইহুদীরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য খ্রীষ্টান জগতের ধ্বংসসাধন করতে চাইছে। সোস্যালিষ্ট ও ইহুদীরা একযোগে খ্রীষ্টধর্মকে উৎখাত করতে সচেষ্ট। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো যে হিটলার কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না। না ক্যাথলিক না প্রোটেষ্টাণ্ট।

হিটলার মনে করতেন ইউরোপে নর্ডিক জাতিই খাঁটি আর্য জাতির বংশধর। হিটলার নিজেকে নর্ডিক জাতির ভগবান বলে মনে করতেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ দুটি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে জ্বলতে থাকতো। ইহুদী এবং সোস্যালিষ্টদের ওপর প্রতিশোধ নেবার হিংস্র প্রবৃত্তি যেন তাঁর কঠোর মনকে কঠোরতর করে তুলত। তিনি ভুলে যেতেন যে, তখনও তিনি একজন সাধারণ লোক যার নিজের একবেলার অন্নসংস্থান করতেও প্রাণান্ত হচ্ছে। **"He felt himself a pure Nordic, unlike the others, who were tainted with Jewish Socialism."**

হিটলার ল্যাম্বাকে কোন ইহুদী দেখতে পাননি। লীঞ্জে যে সমস্ত ইহুদীর বাস ছিল তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের কোন প্রভেদ আছে এটা বোঝা যেত না। কিন্তু ভিয়েনায় ইহুদীরা ছিল পোল্যাণ্ড থেকে আগত এবং তাদের বেশভূষা বা চালচলনও ছিল ভিন্ন ধরনের। বেশীর ভাগই ছিল পোষাক-পরিচ্ছদে নোংরা। তদুপরি এসব ইহুদীরা ছিল ঘোরতর জার্মান ও অষ্ট্রীয়া বিদ্বেষী।

ভিয়েনাতে এসে হিটলার অনুভব করলেন যে এখানে তিনি তাঁর প্রকৃত শত্রুকে চেনার সুযোগ পেয়েছেন। পার্কে বসে তিনি প্রায়ই ইহুদীদের কথাবার্তা শুনতেন। ইহুদীদের ভাষা না বুঝলেও হিটলার এটুকু বুঝতে পারতেন যে ইহুদীরা জার্মান জাতির

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হিটলার ভিয়েনাতে ইহুদীদের ভালভাবেই চিনতে পেরে-ছিলেন। এরজন্য অবশ্য তাঁকে ইহুদীদের সঙ্গে মিশতে হয়নি। বরঞ্চ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তাতেই তিনি ভালভাবে অনুভব করতে পারতেন যে ইহুদী এবং সোসালিস্টরাই তাঁর প্রধান শত্রু। হিটলার মনে করতেন ইহুদীরা হচ্ছে এক বিশেষ জাতি এবং পৃথিবীর যে-কোন জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পক্ষে এ জাতটা মারাত্মকও বটে।

হিটলার পরবর্তী জীবনে ইহুদীদের ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন। নানান কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইহুদীরা জার্মান বিদ্বেষী এবং জার্মানদের ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে হিটলার সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতি যে নৃশংস ব্যবহার করেছেন বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। এমন কি বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকেও জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল হিটলারের ভয়ে। আশ্রয় নিয়েছিলেন আমেরিকায়। তবে ইহুদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য তার জন্য সমগ্র ইহুদী জাতিকে দায়ী করাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

হিটলার স্বীকার করেছেন যে, ভিয়েনার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে দিয়েছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। তাঁর নিজের উক্তি থেকেই এ কথার সমর্থন মেলে। **"I had gone to Vienna and I began to study the social and racial problems and Marxian movement. I left Vienna a convinced anti-semite, a moral enemy of the Marxian Wetar. sehaung and a pan German.—Emil Lengil.**

তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদীজাতি এবং মার্ক্সীয় মতবাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে হিটলার পরবর্তীকালে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তার মানসিক প্রস্তুতি ঘটেছিল এই ভিয়েনা নগরীতে। যাই হোক এই রকম মানসিক অবস্থা নিয়ে হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দু'বছর পূর্বে (অর্থাৎ তিনি যখন ২৪ বৎসরে পদার্পণ করে-ছিলেন) ১৯১৩ সালে ভিয়েনা নগরী ত্যাগ করে জার্মানীর মিউনিক শহরে চলে যান। মিউনিক বেভেরিয়ার রাজধানী।

সব দিক বিবেচনা করে এই মিউনিক শহরকে জার্মানীর অন্যতম সুন্দর শহর হিসেবে পরিগণিত করা হতো। হিটলার যে কেন তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করে জার্মানীতে চলে যান সে সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা শক্ত। তবে হিটলার নিজে বলেছেন যে প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই তিনি অষ্ট্রীয়া ছেড়েছিলেন। হ্যাপসবার্গ সম্রাটদের জার্মানদের প্রতি বিদ্বেষভাব হিটলার মেনে নিতে পারেননি।

হিটলারের বন্ধুরা মনে করেন যে যেহেতু তখন অষ্ট্রীয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেজন্য হিটলার ভিয়েনা পরিত্যাগ করে মিউনিক শহরে চলে যান। বিশেষত শ্লাভ, ম্যাগিয়ার এবং ইটালীয়ানদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। হিটলার মেইন ক্যাম্ফে

বলেছেন, "জার্মান অধ্যুষিত অস্ট্রীয়াকে আবার জার্মানীর অধীন হইতে হইবে। ......অন্যান্য দেশবাসী জার্মানদের শিরায় শিরায় কি আমাদের মতই জার্মান রক্ত প্রবাহিত হয় না?" ......ছেলেবেলা থেকেই এসব চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে তোলপাড় করত। এমনকি তিনি বিসমার্কের শাসনাধীন জার্মান সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করতে পারেননি বলে মনে মনে রাগ করতেন।

মিউনিকে এসেও হিটলার নিজের অদৃষ্টকে ফেরাতে পারলেন না। বিধির বিধান খণ্ডন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রবাদ বাক্যটি ছোটবেলা থেকেই মা-ঠাকুরমার কাছ থেকে প্রায় সকলেই শুনেছেন। হিটলার অবশ্য নিয়তির ওপর বিশ্বাস করে থাকার পাত্র ছিলেন না।

যাই হোক, ক্ষণিকের জন্য হলেও হিটলার আশা-ভরসাহীন জীবনে চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিউনিকে এসে হিটলার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। প্রথমে তিনি ছোটোখাটো একটি ফটোর দোকান করলেন। ছবি এঁকে কিছু কিছু উপার্জনও করতে লাগলেন। তাতে অবশ্য তাঁর একার মত ব্যয় নির্বাহ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। সপ্তাহে ঘর ভাড়া দিতেও ২ টাকা থেকে ২৲ টাকা চলে যেত। অবশ্য একজন তরুণ ইন্‌জিনিয়ারও তাঁর সঙ্গে জুটে গেল। তাতে তাঁদের কয়েকদিন চলল।

হিটলারের মিউনিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কর্ণাড হিয়েডেন মন্তব্য করেছেন যে, "**Life lay before him penurious, grey and hopeless.**" হিটলারের নিজের উক্তি থেকে জানতে পারা যায় যে তাঁর পিতা এ ধারণা নিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন যে. তাঁর ছেলে হিটলারের পক্ষে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব।

মিউনিকে এসে হিটলার প্রথমে ছবি আঁকার কাজ নেন এবং পরে সূত্রধরের (Carpenter) কাজ নিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলেছে। শৈশবে লেখাপড়ায় অবহেলা করার ফল তাঁকে এখন পদে পদে ভোগ করতে হচ্ছে। এই নিঃসঙ্গ সহায় সম্বলহীন অবস্থা থেকে বাঁচার তাগিদে তিনি রাজনীতিকে তাঁর জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। **"Politics became for him the means of escape from hopeless existence"—Kornard Heiden.**

এখানেও তাঁর কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না। ছিল না তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনই তিনি অতিবাহিত করতেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি অতীব বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথা উঠলে তিনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে যেতেন। এত অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি এখানে অত্যধিক মনোযোগের সাথে বিভিন্ন পুস্তক-পত্র-পত্রিকাদি পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন। বিসমার্ককে হিটলার দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। জার্মানীর জন্য বিসমার্কের অনবদ্য অবদানের কথা তিনি কোনদিনও বিস্মৃত হন নি।

বিসমার্কের লেখা পুস্তকাদি তিনি নিবিষ্টমনে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বিসমার্কের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত রীতিনীতি, তাঁর শাসনপ্রণালী তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য যদি কোনদিন তিনি জার্মানীর কর্তৃত্ব হাতে পান তবেই তিনি এ সমস্ত নিয়ম কাজে লাগাতে পারবেন। হিটলারের স্বল্প-সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব—তাঁর এ সমস্ত চিন্তাধারাকে উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিতেন এবং ভাবতেন যে, যে লোকের কোন পরিচিতি নেই, যে নিজের অন্নসংস্থানের জন্য দিনরাত হিমসিম খাচ্ছে, তাঁর মত লোকের পক্ষে এ সমস্ত চিন্তা করাটাই নেহাত পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এ সময়ে তিনি মার্ক্সীয় মতবাদ ও ইহুদী ধর্মমত সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে পড়াশুনা করেন। এবং এই দুই মতবাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি সে সম্বন্ধেও একটি দৃঢ় ধারণা করে নেন। এরপর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সময় ও সুযোগ এলে জার্মানদের স্বার্থে তিনি জার্মানী থেকে মার্ক্সীয় মতবাদ ও ইহুদীদের চিরতরে মুছে দেবেন। ১৯১৩-১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর এই চিন্তাধারা বিভিন্ন মহলে প্রচার করে বেড়িয়েছেন।

হিটলার ১৯১৩ সালে অস্ট্রীয়ার সৈন্যবিভাগে ভর্তি হতে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ডাক্তারের অভিমত তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং শারীরিক দিক থেকে সৈন্যবিভাগের কাজের অযোগ্য। হিটলারের মত লোকের পক্ষে এটা অত্যন্ত অপমানজনকও বটে। কেউ কেউ মনে করেন সম্ভবত এই কারণেই হিটলার অস্ট্রীয়া ছেড়ে চলে যান এবং জার্মান সৈন্যবিভাগে যোগ দেন।

এটা সত্য যে হিটলার নিজেকে জার্মান বলে জাহির করতেন—কিন্তু জার্মানী ও তাঁর মধ্যে তখনো পর্যন্ত কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছিল।

১৯১৪ সাল। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। অস্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড আততায়ীর বোমার আঘাতে নিহত হলেন। ফার্ডিনাণ্ড অস্ট্রীয়ার অন্তর্গত বসনিয়ার রাজধানী সিরাজেভোতে গিয়েছিলেন। এক বিপ্লবী যুবক (বলকান রাজ্যের অধিবাসী) বোমার আঘাতে যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ডকে হত্যা করল। অস্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাট এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সার্বিয়াকে ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়ে চরম পত্র দিলেন।

হিটলার তখন মিউনিকে অবস্থান করছেন। এ সংবাদে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন হয়ত কোন বিদ্রোহী জার্মান যুবক দ্বারা ফার্ডিনাণ্ডের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং এর পরিণতি কি হতে পারে তাও তিনি ভেবে নিলেন। কিন্তু একটু পরেই জানতে পারলেন যে একজন বিপ্লবী ক্ষুদ্র বলকান রাজ্যের অধিবাসী সার্বিয়ান যুবক দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তিনি বললেন, "**When immediatelly afterwards I heard the names of the alleged criminals and they were known to be serbs, I began to feel a**

slight horror at the vengeance of inscrutable destiny."—Mein Kampf.

এ যুদ্ধের আসল কারণ হলো দুই শিবিরের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একদিকে জার্মানী ও অষ্ট্রীয়া। অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। জার্মানী তার নৌ-বাহিনী গঠন করার যে নীতি নিয়েছিল—ব্রিটেন তাতে অসন্তুষ্ট ছিল। বলকান অঞ্চলে জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ার প্রভাব বৃদ্ধিকেও রাশিয়া ভাল চোখে দেখেনি। জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ার প্রভাবকে বলকান অঞ্চলে খর্ব করার জন্য রাশিয়া বহুদিন ধরে সচেষ্ট ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাতে মদত দিচ্ছিল। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দেখতে দেখতে রাশিয়া যোগ দিল বলকান রাষ্ট্র সার্বিয়ার পক্ষে আর জার্মানী যোগ দিল অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর দিকে। পরে ব্রিটেন. ফ্রান্স ও ইটালী রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল। আর তুর্কী যোগ দিল জার্মানীর পক্ষে।

১৯১৮ সাল পর্যন্ত সর্বনাশা যুদ্ধের কবলে পড়ে হাজার হাজার লোক নিহত হল। জার্মানী-অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল। রাশিয়ায় শুরু হল বিপ্লব। ইটালী বিধ্বস্ত হল গৃহযুদ্ধে। আর ব্রিটেন ও ফ্রান্স শ্রান্ত-ক্লান্ত। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। সমগ্র ইউরোপে দেখা দিল ধ্বংসের এক বীভৎস মূর্তি। কিন্তু এ যুদ্ধ হিটলারকে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ করে দিল।

হিটলার ১৯১৪ সালের ৩রা আগষ্ট বেভেরিয়ার সম্রাট তৃতীয় লাউডউগের কাছে বেভেরিয়ান সেনাদলে যোগদান করার জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। পরের দিনই তিনি উত্তর পেলেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এই দিনটি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্মরণীয়। লাউডউগের চিঠি পড়ে হিটলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। এতদিন পর তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হল। জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ পেলেন। তাঁর নিজের কথায় বলি, **"I opened the document with trembling hands; and no words of mine could now described my satisfaction is felt on reading…" (Mein Kanpf. P. 100)**

বেভেরিয়ান রেজিমেণ্টে সেইদিনই তিনি যোগদান করলেন। অন্যান্য সৈন্যদলের সঙ্গে মিউনিক ছেড়ে রণক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় এবং স্বদেশের গৌরববোধে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

মেইন ক্যাম্ফে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, **"At long last the day came when we left Munich on war service......As the first rays of the morning sun broke through the light mist. I then felt as if my heart could not contain its spirit."**

হিটলার জার্মান সেনাবিভাগের সাধারণ একজন সৈনিক হিসেবে কাজ গ্রহণ করেন। সেনাবিভাগের প্রধানদের মধ্যে চিঠিপত্র বিলি করা ও অন্যান্য খবরাখবর পরিবেশন করা তাঁর একমাত্র কাজ হল। বলা যায় তিনি জার্মানীর হয়ে গুপ্তচরের

কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সময়েই জার্মান সেনাবিভাগের বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানদের বিজয়বার্তা চারদিকে ঘোষিত হতে লাগল। জার্মানদের জয়যাত্রা প্রথমদিকে অপ্রতিহত গতিতে চলল। হিটলারের মন আনন্দ ও আশার আলোতে উদ্ভাসিত হল। নব নব স্বপ্নে তাঁর মন বিভোর হয়ে উঠল। কিন্তু হিটলার দেখতে পেলেন—জার্মান সংবাদপত্রসমূহে এসব বিজয়বার্তার কাহিনী বিকৃতরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। জার্মান জনমতকে অবদমিত করার প্রচেষ্টা সংবাদপত্র-সমূহে স্পষ্টরূপে চলতে থাকে। হিটলার জার্মান সংবাদপত্রসমূহের এই অপপ্রচারকে সহ্য করতে পারলেন না। সংবাদপত্রের এ রকম সংবাদ পরিবেশনে হিটলার মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

তিনি ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এ সমস্ত সংবাদপত্রের পরিচালক কে বা কারা? হিটলার অচিরেই আবিষ্কার করলেন যে এ সব সংবাদপত্রের পরিচালক ইহুদীরা। ইহুদীরা ছিল অর্থলোভী, নিজের স্বার্থে তারা স্বদেশের স্বার্থ বলি দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। তারা জার্মানীর বুকের ওপর বসে জার্মানদের রক্ত শোষণ করছে। হিটলারের মনোভাব ইহুদীদের ওপর কঠোরতর হয়ে উঠতে লাগল।

১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে হিটলার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গোলার আঘাতে আহত হলেন। হিটলারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্বদেশে (জার্মানীতে) পাঠিয়ে দেওয়া হল। দু বছর পর স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন। হিটলারের চোখের সামনে যেন স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলে গেল। জার্মান শস্যক্ষেত্রের সবুজের সমারোহে হিটলারের মন সতেজতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। হিটলারকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল।

হিটলার সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বার্লিনে এসে হিটলার দেখলেন সমগ্র দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে। শত শত নরনারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিনযাপন করছে। রাস্তা-ঘাটে, হোটেলে, রেস্তোঁরায়, বাড়িতে যেন সর্বত্রই হতাশার ভাব। যুদ্ধে আহত বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈনিকরা যেন সকলের করুণার পাত্র। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে পারলেই যেন বাহাদুরি।

সৈনিক হিটলার ও জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘে যোগদান

যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে কোন বীরত্ব আছে বলে কেউ মনে করে না। হিটলার এ সমস্ত জিনিস অবলোকন করে স্তম্ভিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

হিটলার বার্লিন থেকে এলেন মিউনিকে। মিউনিকের অবস্থা আরও খারাপ। হিটলার তখন ছিলেন মিউনিকের সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক।

মিউনিকের জনগণ সৈন্যদের অপরাধী হিসাবে দেখতে লাগল। সকলের কাছেই সৈন্যরা যেন অবহেলার পাত্র। তারা মনে করতে লাগল সৈন্যরা যেন দেশের সর্বনাশ সাধনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। সকলের ক্রোধ সৈন্যদের ওপর। হিটলার বুঝতে পারলেন জার্মানীর আবহাওয়া কে বা কারা বিষাক্ত করে তুলেছে। সে বিশ্বাসঘাতকদের হিটলার চিনে নেবার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

হিটলার লক্ষ্য করলেন সরকারী সমস্ত আপিস, সৈন্যবিভাগ, নৌবাহিনী প্রভৃতির এবং যুদ্ধের প্রায় সমস্ত দপ্তরখানায় উচ্চপদস্থ অফিসারগণ হচ্ছে ইহুদী। অর্থাৎ জার্মানীর প্রায় সর্বত্রই ইহুদীদের আধিপত্য। ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইহুদীরা ছিল অপরিহার্য। বড় বড় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিতেও রয়েছে তাদের আধিপত্য। দেশের প্রায় সমগ্র উৎপাদন সামগ্রীর কলকারখানা ইহুদীদের পরিচালনাধীন। কিন্তু দেশের প্রতি কতব্যবোধ তাদের বিন্দুমাত্রও ছিল না। তারা মনে করতো, **"devotion to duty as a mark of weakness and narrow mindedness...In the business world it was still worse. Here the Jewish nation had become actually "indispensable"—Mein Kampf.**

বেভেরিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কিন্তু কে বা কারা ষড়যন্ত্র করে বেভেরিয়া এবং অন্যান্য জার্মানদের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় রত, হিটলার বুঝতে পারলেন এর মূলে রয়েছে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র অথচ তদানীন্তন জার্মান সম্রাটগণ এটা কেন উপলব্ধি করতে পারছেন না তা ভেবে হিটলার বিস্মিত ও চিন্তিত হলেন। বেভেরিয়া যদি এ সময়ে ধ্বংসের কবলে পড়ে তাহলে জার্মানীর অস্তিত্বও যে বিপন্ন হবে। কেন না একটির সঙ্গে অন্যটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

হিটলার এসব ভেবে চিন্তিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর পক্ষে এ সমস্ত ব্যাপারে কিছু করার ছিল না। কেন না তখনো তিনি একজন সাধারণ সৈনিক। তাঁর কথায় কে কর্ণপাত করবে? উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর জার্মান সম্পর্কিত এ সমস্ত চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে নারাজ। হিটলার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি আবার রণক্ষেত্রে যাত্রা করলেন।

এ সময়ে রাশিয়ায় দেখা দিল বিপ্লব। রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালো। ফলে জার্মানীকে আর পূর্ব সীমান্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো না। হিটলার ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ভাগ্যদেবী হয়ত এবার জার্মানীর ওপর সুপ্রসন্ন হয়েছেন।

ব্রিটেন, ফ্রান্স দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। হিটলার আশা করতে লাগলেন জার্মানী এবার প্রচণ্ডবেগে ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

১৯১৮ সাল। রণক্ষেত্র থেকে রাশিয়ার বিদায় জার্মানীর সামনে যুদ্ধজয়ের অপূর্ব সুযোগ এনে দিল।

রণক্ষেত্রে সর্বত্রই জার্মানীর জয়ের আশা। এ সময় হঠাৎ জার্মানীর রণসম্ভার সরবরাহকারী কারখানাগুলিতে দেখা দিল ধর্মঘট। ফলে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হল। জার্মান সৈন্যরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সেনাপতিরা বিষণ্ণ। মিত্রশক্তিকে চরম আঘাত

করার জন্য যখন জার্মানী প্রস্তুত, ঠিক সেই সময় অস্ত্রকারখানায় এ ধর্মঘট। জার্মান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য এই বিশ্বাসঘাতকতায় হিটলার ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

হিটলার সমস্ত দিক বিবেচনা করে বুঝতে পারলেন যে এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে ইহুদীরা। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির মুখপত্র ভরওয়ার্টস (Vorwarts) আশা করেছিল যে কোন প্রকারে জার্মানীকে এ যুদ্ধের বিজয় গৌরব হতে বঞ্চিত করতে হবে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতারা প্রায় সকলেই ছিল ইহুদী। এ ধর্মঘট অবশ্য বেশীদিন চলেনি।

ইহুদীরা আশা করেছিল যে এ ধর্মঘট সফল হলে জার্মানীর আর্থিক দুরবস্থা চূড়ান্তরূপ ধারণ করবে। ইহুদীরা জার্মানীর কর্তৃত্বপদ হাতে নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং সেই সুযোগে তারা নির্বিবাদে জার্মানীর ওপর শোষণ চালাতে পারবে।

এ ধর্মঘট অবশ্য অল্পদিন স্থায়ী হল। জার্মান সৈন্যরা কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না। কিন্তু এতে জার্মান জাতির মেরুদণ্ড যে ভেঙ্গে পড়ল সেটা অস্বীকার করার উপায় রইল না।

এ ধর্মঘটের ফলে জার্মানদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন প্রবলভাবে দেখা দিল। দেশের জনসাধারণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে সৈন্যরা দেশের স্বার্থে রণাঙ্গনে আত্মাহুতি দেবে কেন? স্বদেশে যদি বিশ্বাসঘাতক লোকেরা অস্ত্রকারখানায় ধর্মঘট ঘটিয়ে জার্মানদের জয়লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে সৈন্যরা কিসের স্বার্থে যুদ্ধ করবে?

এ ধর্মঘটের ফল হল সুদূর প্রসারী। রাশিয়া ও ইটালী যখন রণাঙ্গণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে নিজেদের গৃহবিবাদের ফলে. এবং যে সময় যুদ্ধজয় জার্মানদের হাতের মুঠোয় ঠিক সে অবস্থায় এ ধর্মঘট যে জার্মানদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সেটা অস্বীকার করার উপায় রইল না। তাই পরবর্তী সময়ে হিটলার যে প্রচণ্ড ক্রোধে ইহুদী নিধনে মেতে উঠেছিলেন তার পিছনে যে ইহুদীদের এ সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপ অনেকাংশে দায়ী তা অস্বীকার করা যায় কিভাবে?

অক্টোবর ১৯১৮ সাল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়। হিটলার ঈপ্রেসের রণাঙ্গনে ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন রণক্ষেত্রে ইংরেজদের গ্যাস বোমার আঘাতে হিটলার আহত হলেন। তাঁকে যেতে হল হাসপাতালে। চোখ দুটি নষ্ট হবার উপক্রম হল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁর চোখ দুটি রক্ষা পেল। নিজেও প্রাণে বেঁচে গেলেন।

অসুস্থ হিটলার হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন জার্মানরা এখন কেউ যুদ্ধ চায় না। এ যুদ্ধের সমস্ত দোষ চাপান হল কাইজার উইলিয়ম (জার্মান-সম্রাট) ও কয়েকজন যুদ্ধ বিশারদ সেনানায়কের ওপর। হিটলার বিস্ময়ে হতবাক। এত রক্তপাত, এত জীবনহানী এত দুঃখ কষ্ট সবই কি বৃথা যাবে? ভাবতে লাগলেন কাইজার যা করেছেন সবই তো দেশের স্বার্থেই করেছেন। অতএব তার দোষটা কোথায়?

নভেম্বর মাসের খবর আরও ভয়ানক। হাসপাতালে বসে হিটলার চোখের সামনে দেখতে পেলেন মোটর গাড়ি, লরী প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে জার্মান নাবিকের দল ছুটে চলেছে। বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠল জার্মানীতে। কয়েকজন ইহুদী নেতা হলেন এই বিদ্রোহের মূলে। তারাই যোগাচ্ছে এই বিদ্রোহের ইন্ধন। যারা কোন সময়ে যুদ্ধে যায়নি তারাই জার্মানদের মনে বিষ ছড়াচ্ছে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। জার্মানদের অন্তর্বিদ্রোহের আগুনে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে এগিয়ে এসেছে—নোংরা ইহুদী যুবকরা।

হিটলার প্রথম প্রথম ভাবলেন সামান্য কিছু ইহুদী যুবকের উস্কানিতে জার্মানদের এ অন্তর্বিদ্রোহ বেশীদিন স্থায়ী হবে না। কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন রণাঙ্গনে সেনাপতি ও সৈন্যরা আত্মসমর্পণের জন্য উদ্‌গ্রীব। হিটলারের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। তিনি বুঝতে পারলেন এতদিন তিনি যা স্থানীয় ঘটনা বলে মনে করেছেন এটা তা নয়। এটা ইহুদীদের পরিচালনায় একটি সর্বাত্মক বিপ্লব। জার্মানীকে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্যই ইহুদীদের এই নোংরা কীর্তিকলাপ। **"What I had imagined to be local affair was apparently general revolution"—Mein Kampf.**

ইহুদী সাংবাদিকদের ষড়যন্ত্র, ইহুদী ধনীমালিকদের জার্মানীর ওপর কর্তৃত্ব করার সর্বৈব প্রচেষ্টা, তাদের জার্মান বিদ্বেষ, জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে মিত্র-শক্তির জোরালো প্রচারকার্য—জার্মানদের নিজের দেশেই পঙ্গু করে রেখে তাদের ওপর শোষণ চালাবার জন্য ইহুদী ও মিত্রশক্তির প্রচেষ্টা এতদিনে সার্থকরূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। ক্রোধে ও ঘৃণায় হিটলার অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হল।

১০ই নভেম্বর। হাসপাতালে উপস্থিত হলেন এক বৃদ্ধ ধর্মযাজক। বৃদ্ধ ধর্মযাজক কম্পিত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ একটি ভাষণ দিলেন। হিটলার বৃদ্ধের কথা নিবিষ্ট-মনে শ্রবণ করলেন। বৃদ্ধ যাজক জানালেন জার্মানী সমূহ বিপদের সম্মুখীন। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত। জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ম দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিদ্রোহের দাবানলে জার্মানরা ক্ষতবিক্ষত। রাজতন্ত্রের ঘটেছে উচ্ছেদ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জার্মান ভূমিতে সাধারণতন্ত্র।

বৃদ্ধ ধর্মযাজক বলে চলেছেন জার্মান সম্রাট এখন মিত্রশক্তির করুণার পাত্র। মিত্রশক্তি জার্মানদের ওপর যে সমস্ত সর্ত যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে আরোপ করবে তাকে সে সব মেনে নিতে হবে। স্বদেশের অপমানে, স্বদেশের পরাজয়ে বৃদ্ধ অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। অসহায় বালকের ন্যায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

হিটলার বৃদ্ধধর্মজাযকের চোখের জল দেখে নিজেও স্থির থাকতে পারলেন না। জীবনের কত শোচনীয় অবস্থায় হিটলার ছিলেন স্থির, অবিচল। একমাত্র মায়ের মৃত্যুতে তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল। এবার স্বদেশের অপমানে হিটলার অনাথ শিশুর মত কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিটলার কিন্তু তখনো জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করেন নি। ১৯৩০ সালে

হিটলার জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিটলার ক্রোধে মন্তব্য করলেন জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়মের অবিবেচনা প্রসূত কার্যাবলী আজ জার্মানীর এ দুর্দশার মূলে রয়েছে।

কাইজার উইলিয়মই বিশ্বাসঘাতক ইহুদী মার্ক্সীয় নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য তাঁর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। অথচ এসব কপট ছলনাকারীরা আজ জার্মানীর এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। এসব মার্ক্সীয় ইহুদী নেতারা যে বিশ্বাসঘাতক এবং অত্যন্ত ঘৃণ্যজীব একথা কাইজারের জার্মান হিসেবে বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর বিবেচনা শক্তির অভাবে আজ সমস্ত জার্মানীকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হিটলার ভাবতে লাগলেন রণক্ষেত্রে কত জার্মান মায়ের সন্তান আত্মত্যাগ করেছে স্বদেশের জন্য, তাদের তাজা রক্তে রণক্ষেত্র লাল হয়ে উঠেছে, কত আশায় সতের আঠার বছরের তরুণ জার্মান বীরগণ ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে তাদের বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, জার্মান মায়েরা কি এ জঘণ্যতম পরিণতির জন্য তাঁদের বীর সন্তানদের উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিলেন? ভাবতে ভাবতে হিটলার অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে, মানসিক যন্ত্রণায় হিটলার বলে উঠলেন—এ জঘণ্য ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী জাতটা আজ জার্মানীর কর্তৃত্বভার হাতে নেবার জন্য এ সমস্ত ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে আর নির্বোধ জার্মান সম্রাট কাইজার মার্ক্সের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এ সমস্ত সর্বনাশা ইহুদীদের চিনতে পারেননি। হিটলার দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন কাইজারের প্রশ্রয়েই ইহুদী জাতটা জার্মানীর মাটিতে এ সমস্ত নোংরা রাজনীতির আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

হিটলার তখন অতীব সাধারণ লোক। জার্মান সৈন্যবাহিনীর সাধারণ একজন সৈনিক মাত্র। তবুও তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'ইহুদীদের সঙ্গে কোন বিচার বিতর্ক চলতে পারে না।' তাদের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্ক হয় এসপার না হয় ওস্পার। **"With Jews there is no bargaining—there is merely the hard or fast 'Either-or' I resolved to become a politician"** হিটলার জার্মান রাজনীতিতে প্রবেশ করার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে হিটলার মিউনিকে ফিরে এলেন। যোগ দিলেন মিউনিকের সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীতে। এ বাহিনীর পরিচালনার ভার তখন সৈনিক সমিতির হাতে। সেখানে হিটলারের পক্ষে কোন মতামত প্রকাশ করা শক্ত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ সমিতির কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সৈনিক সমিতি থেকে চলে এলেন তাঁরই যুদ্ধবিধ্বস্ত সঙ্গী আরনেষ্ট শ্মিডের সঙ্গে এবং সেখানে ট্রাউনষ্টাইন নামক জায়গায় এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হিটলার আবার ফিরে এলেন মিউনিকে।

সে সময় মিউনিকের অবস্থাও সঙ্কটজনক। এখানকার কর্তৃত্বে রয়েছে ইহুদীরা। এখানেও আবার একটা বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা চালাচ্ছে ইহুদীরা হিটলারের মাথার

মধ্যে তখন নানান্ চিন্তাভাবনা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। অবশ্য তাঁর কোন চিন্তাভাবনা কার্যকরী করা সে সময় অসম্ভব ছিল। আসল কথা হল হিটলার তখনো জার্মান জনজীবনে একজন অপরিচিত সাধারণ লোক। তিনি তখনো কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য হননি।

এমন সময় তাঁর কাছে এক বিরাট সুযোগ উপস্থিত হল। রুশ বিপ্লবের হাওয়া তখন মিউনিকের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। হিটলার সে সুযোগে মিউনিকের কেন্দ্রীয় সমিতির (যেটা ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত) যে সমস্ত কার্য-কলাপ জার্মানদের পক্ষে ক্ষতিকারক সেগুলিকে জার্মান জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে একদিন সকাল বেলায় হিটলারকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাইখষ্ট্যাগের তিনজন যুবকর্মীকে পাঠানো হল। আসল উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে গ্রেপ্তার করা। হিটলার একাই তিনজনকে পর্যুদস্ত করলেন। তারা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই মিউনিক মুক্ত হল। মিউনিকের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হল। মিউনিকের দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠিত হল। হিটলারকে উক্ত কমিশনের সামনে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার জন্য নির্দেশ দিলেন মিউনিকের তৎকালীন শাসকবর্গ। হিটলারের রাজনীতিতে প্রবেশ করার এক বিরাট সুযোগ উপস্থিত হল। বলা যায় জার্মানীর শত্রুদের আক্রমণ করার এবং তাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করার এক বিরাট সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে হিটলারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। হিটলার বলেছেন, **"That was my first incursion into more or less pure politics।"**

হিটলার ওজস্বিনী ভাষায় কমিশনের কাছে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। কমিশনের সদস্যমণ্ডলী-হিটলারের বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করলেন এবং তাঁর বক্তব্যকে যথাযথ বলে মেনে নিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করলেন না।

এর মাত্র সপ্তাহ খানেক পরেই প্রতিরক্ষাবাহিনীর আর একটি সভায় হিটলারকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানান হল। সৈন্যদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই তৎকালীন জার্মান শাসকবর্গ হিটলারকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে বক্তৃতা দেবার এই সুযোগ দিলেন। হিটলারের বক্তৃতা দানের অসামান্য ক্ষমতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই সকলেই সম্যক অবহিত হয়েছেন।

জার্মান সৈন্যবাহিনীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার এক অপূর্ব সুযোগ হিটলার পেয়ে গেলেন। যেটা তিনি এতদিন ধরে কামনা করে এসেছেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবাধভাবে তিনি তিনি মনের ভাবপ্রকাশ করলেন। স্বদেশের স্বার্থে জার্মান মাতৃভূমি থেকে নভেম্বর বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও কেন্দ্রীয় সমিতির (যাদের নায়ক হচ্ছে ইহুদীরা) কর্মকর্তাদের উৎখাতের জন্য হিটলার তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। এমন সব অকাট্য যুক্তি তিনি খাঁড়া করলেন যেগুলিকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারো ছিল না বললেই চলে।

নভেম্বর বিদ্রোহে ইহুদীরাই যে জার্মানদের যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন সে কথাও হিটলার সৈন্যদের সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। যেটা জার্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। সামান্য কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই অনুধাবন করলেন যে জার্মানীর স্বার্থে একটি নতুন দল গঠন করা একান্তভাবেই দরকার। গঠন করা হল একটি নতুন দল। পরে এটি জার্মান লেবার পার্টি নামে পরিচিত হয়েছিল।

হিটলার স্পষ্টভাষায় বলে দিলেন যে, জার্মানীর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁদের আদর্শ প্রচার করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে দেশের স্বার্থেই তাঁরা এই দল গঠন করেছেন। প্রথমে এই দলের নাম দেওয়া হল 'সোস্যাল রিভিল্যুশনারী পার্টি'। কেন না এ দলের সামাজিক চিন্তাধারা বাস্তবিক পক্ষেই বৈপ্লবিক ছিল।

এই পার্টি গঠনের পেছনে আবার আর একটি কারণও বর্তমান ছিল। সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। হিটলারের বুঝতে ভুল হল না যে, তিনি ছোটবেলায় যে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় দিন কাটিয়েছেন তার মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসাম্য। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে তাঁর ধারণা আরও দৃঢ় হয়। তিনি বুঝতে পারলেন পুঁজি হলো শ্রমিকদের শ্রমের ফসল। স্বদেশের উন্নতি বিধানে পুঁজির ভূমিকা অপরিসীম।

হিটলার নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে এ সমাজ সৃষ্টির মূলে যে শ্রমিকদের অবদান রয়েছে সেটা তিনি এতদিন অনুভব করতে পারেননি। এই সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর মনের ওপর একটি সঠিক ধারণা সৃষ্টি করে 'গডফ্রেড ফেডার' নামক এক জার্মান মনীষীর বক্তব্য। গডফ্রেড ফেডারের 'সুদ ও দাসত্বের' অবলুপ্তি সম্পর্কিত বক্তব্য হিটলারকে মুগ্ধ করেছিল। ফেডারের বক্তৃতার মধ্যে হিটলার জার্মানীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামের একটি সুস্পষ্ট পথের সন্ধান পেলেন।

হিটলার নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদবৃদ্ধির জন্য প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। ফেডারের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে হিটলার স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক ধনভাণ্ডার থেকে ঋণ করার নীতি পরিত্যাগ করতে শাসকবর্গকে অনুরোধ জানালেন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হতে তিনি তাঁদের কাছে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। এর ফলে বিদেশের ঋণভার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে স্বদেশের সম্পদের সার্বিক উন্নতিসাধনের পথ প্রশস্ত হবে—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য।

হিটলার তাঁর মেইন ক্যাম্ফে উল্লেখ করেছেন যে **"Feder's lecture gave me a splendid warcry for the coming struggle."**

হিটলার আরও বললেন তাঁর এবং জার্মানীর সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের একমাত্র মতবাদ হওয়া উচিত **'Nation and Fatherland.'** যার জন্য দরকার জার্মানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং জার্মানদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও জার্মান-

জাতিকে অবিমিশ্র রাখা, **"Blood mixture, and lowering of racial level which accompanies it, are the one and only cause why old civilization disappears."**

জার্মনদের মধ্যে ভিনদেশীয় বিভিন্ন লোকের রক্তের সংমিশ্রণই যে জার্মানীর পুরাতন ঐতিহ্যের ধ্বংসের মূল কারণ এই কথা হিটলার ভালভাবে অনুধাবন করলেন।

গডফ্রেড ফেডারের বক্তৃতা শোনার পর থেকে অর্থনীতির ওপর লিখিত তিনি বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতে লাগলেন। এরপর থেকে তিনি কার্ল মার্কসের জীবনী এবং তাঁর রচিত Capital' গ্রন্থখানি আরও নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সঙ্গে পড়লেন। হিটলায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করলেন যে তিনি স্পষ্টত বুঝতে পেরেছেন যে জার্মানীর জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের আসল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্পদ ও স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পদের নেতৃত্ব গ্রহণ করা। এতে যে জার্মানীর জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে তা তারা বুঝেও বুঝলেন না। **"By means of Trade Union which might have been the savnig of the nation, the Jews actually destroy the bases of the Nations economy."—Mein Kampf.**

এর কিছুদিন পর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মিউনিকের একটি সংগঠন এক বিরাট বিতর্ক সভার আয়োজন করল। হিটলার বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিজের নাম লেখালেন। সকলেই ভাবল হিটলার এ বিতর্ক সভায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে যাবেন। কিন্তু ফল হল উল্টো। উপস্থিত সুধীবৃন্দ হিটলারের বক্তব্যে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই হিটলারকে সমর্থন জানালেন। এর পর হিটলারকে মিউনিকে অবস্থিত জার্মান সৈন্য-বাহিনীর ইন্সট্রাকটারের পদে নিযুক্ত করা হল। **"The result was, however, that a few days later-, I was ordered to join a Munich Regiment, nominally as instructor."—Mein Kampf.**

তখন জার্মান সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ছিল না বললেই চলে। তার একমাত্র কারণ অবশ্য জার্মান সৈন্যদের ওপর ইহুদী পরিচালিত সৈনিক সমিতির বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রভাব। অতীব সতর্কতার সঙ্গে হিটলার সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে এনে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের উদগ্র বাসনা জাগ্রত করতে সমর্থ হলেন। হৃদয়ের অপার প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে হিটলার তাদের মন জয় করলেন। সৈন্যদের বেশীরভাগই হিটলারের মতবাদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল এবং তারাই হিটলারের পরবর্তীকালের নতুন আন্দোলনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রভূত সহায়তা করেছিল। এক কথায় বলা যায় হিটলার মিউনিকের সৈন্যবাহিনীকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উজ্জীবিত করেছিলেন।

একদিন হিটলার তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি জরুরী নির্দেশ পেলেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে লিখেছেন কয়েকদিনের মধ্যেই মিউনিকে একটি

রাজনৈতিক দলের জরুরী অধিবেশন হবে। হিটলার যেন উক্ত অধিবেশনে যোগদান করে তার একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। এই রাজনৈতিক দলের একটি ছোটখাট নামও দেওয়া হয়েছে। 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ'। সেখানে গডফ্রেড ফেডারও বক্তব্য রাখবেন।

এর আগে হিটলার ফেডারের বক্তব্য শুনেছেন এবং তাঁর বক্তব্যে তিনি আকৃষ্টও হয়েছেন। হিটলারের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ওপর ফেডারের বিরাট প্রভাব পড়েছিল তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। নভেম্বর বিপ্লব জার্মান সৈন্যদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার একটি সহজ সুযোগ করে দিয়েছিল।

হিটলার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত উক্ত সভায় উপস্থিত হলেন। এই সভা বা এই রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। হিটলার ফেডারের বক্তব্য শুনলেন অতীব নিবিষ্ট মনে। তারপর তিনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় এক অধ্যাপক উঠলেন তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য। অধ্যাপকের বক্তব্য শেষ হলে হিটলার নিজেই একটি ছোটো অথচ খুব সুচিন্তিত বক্তব্য রাখলেন। এ পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। মাত্র ছয়জন। উপস্থিত সকলেই হিটলারের বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

হিটলার সেখানে আর বেশি সময় অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন এ পার্টির সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট তৈরী করবেন। তবে এ পার্টির সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। নানান চিন্তা ভাবনা করতে করতে হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এক সপ্তাহ পরে হিটলার হঠাৎ একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে হিটলারকে জানানো হল যে তাঁকে জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। হিটলার এতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ধারণা করতে পারেননি যে এরূপ একটি তৈরী পার্টির তিনি সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। বরঞ্চ তিনি চিন্তা করেছিলেন নিজেই একটি আলাদা পার্টি তৈরী করবেন।

'জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ' হিটলারকে আরও জানাল যে তিনি যেন এদলের সামনের বুধবারের সভায় যোগদান করেন। হিটলার এদলের সদস্যপদ নেবেন না ভেবেই একটি উত্তর লিখে ফেলেন। অবশ্য তিনি এ চিঠি আর শ্রমিক সঙ্ঘের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠাননি।

বুধবার, হিটলার যথারীতি শ্রমিক সঙ্ঘের মিটিং-এ উপস্থিত হলেন।

মিউনিকের এক অন্ধকার গলিতে অবস্থিত একটি শুঁড়িখানায় মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। মিটমিটে গ্যাসের আলো জ্বলছে ঘরে। হিটলার এসে শুঁড়িখানায় উপস্থিত হলেন। পাশের একটি ঘরে সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুঁড়িখানায় অবশ্য তখন কোন খদ্দের ছিল না। হিটলার ঘরে ঢুকে দেখলেন মাত্র চারজন সদস্য নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছেন। তখনো সভাপতি এসে পৌঁছাননি। এ পার্টির প্রেসিডেণ্ট হলেন হের হেরার। আর এর মিউনিক শাখার প্রেসিডেণ্ট হলেন অ্যানটন ডেক্সলার।

সভায় মোটামুটিভাবে সকলেই বক্তব্য রাখলেন। এর মধ্যেই এ পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচার কার্য-চালানো হয়েছে। জার্মানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পার্টির কাছে তাদের মতামত জানিয়ে বহু চিঠি ইতিমধ্যে এসে গেছে। সে সমস্ত চিঠিগুলি সভায় পাঠ করা হল। উপস্থিত পার্টি সদস্যরা সকলেই সন্তুষ্ট। যেহেতু তাঁরা বুঝতে পারছেন জার্মানীর বিভিন্ন জায়গার অধিবাসীবৃন্দ তাঁদের সংস্থাকে সুস্থমনে মেনে নিতে চাইছে।

কোষাধ্যক্ষ তাঁর রিপোর্ট পড়লেন। তহবিলে টাকা তিরিশের বেশি ছিল না। তখনো পর্যন্ত সংস্থার না আছে আর্থিক সম্বল না আছে লোকবল। তবে সংস্থার মুষ্টিমেয় সদস্যদের আছে অসাধারণ মনোবল! কিভাবে জার্মানীকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং অতীতে স্বার্থান্বেষী জার্মান নাগরিকের কার্যকলাপ কিভাবে স্বদেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সাধনে ব্রতী হয়েছিল তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হল।

হিটলার একটি কথা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন যে, তাঁদের সংস্থার সদস্যদের স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সদ্ইচ্ছে, অনুভূতি ইত্যাদি যথেষ্ট আছে তবে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে জার্মানীকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা এ সংস্থার নেই। হিটলার এ সংস্থার কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করলেন। হিটলার ভেবে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না, যে তিনি এ সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করবেন কি না?

হিটলারের চিন্তাশক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি কোন বড় রাজনৈতিক দলের সভ্য হতে চাননি। কেন না তিনি জানতেন যে কোন বড় রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে সেখানে তাঁর পক্ষে তাঁর মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে না। বিশেষত জার্মানীর মত শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত দেশে তাঁর মত একজন সাধারণ লোকের পক্ষে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠালাভ করা যে কিরকম কষ্টসাধ্য ব্যাপার সেটা তিনি ভালভাবেই অনুধাবন করলেন।

তাই চিন্তা-ভাবনা করে এ ছোট সংস্থার সদস্যপদ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। এ সংস্থার তিনি হলেন সাত নম্বর সদস্য। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে এ সংস্থার সদস্যসংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র সাতজন। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন শুরু করার পথ প্রশস্ত হল।

ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে তিনি দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। দলের সংকীর্ণমনা ও সন্দিগ্ধচিত্ত লোকদের তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে তাঁদের দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য সকল সদস্যের সমবেতভাবে প্রচারকার্য চালানো উচিত। হিটলার তাঁদের দলের কর্মপন্থা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করে গণ্যমান্য লোকের কাছে পাঠাতে লাগলেন। তাঁদের দলের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। দলের সভা অনুষ্ঠানের জন্য বড় হলঘরের ব্যবস্থা করলেন।

দলের সভাপতি হের হেরার হিটলারের এ সমস্ত কার্যাবলী পছন্দ করতে পারলেন না। দুজনের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হল। হেরার কিভাবে হিটলারকে দমিয়ে রাখবেন তার জন্য চেষ্টার কসুর করলেন না। কিন্তু হিটলার দমে থাকার পাত্র নন। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে দলের অন্যান্য সদস্যদের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন। হেরার মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং দল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

অক্টোবর মাসে দলের একটি বিশেষ সভা ডাকা হল। এ সভায় প্রায় ১১১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হিটলার উপস্থিত সুধীবৃন্দের কাছে তাদের দলের কর্মপন্থা সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করলেন। 'ভার্সাই সন্ধি' ও ব্রেষ্ট লেটভেস্কের সন্ধিতে জার্মানদের ওপর যে সমস্ত সত্ত আরোপ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে হিটলার বিস্তারিত-ভাবে তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

১৯২০ সালের প্রথম দিকে হিটলার তাঁর দলের প্রচার বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তাঁরই উদ্যোগে দলের একটি বিরাট জনসভার ব্যবস্থা করা হল। এ জনসভায় প্রায় দু'হাজারের ওপর লোকসমাগম হয়েছিল। এ সভার প্রধান বক্তা ডঃ ডিঙ্গফিল্ডার (**Dr. Dingfielder**)। হিটলারই কিন্তু সভাকে সুচারুরূপে পরিচালনা করলেন। হিটলারের অপূর্ব বক্তৃতা, তাঁর দেশাত্মবোধ, বক্তব্যের মধ্যে তাঁর জোরালো যুক্তি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী কিরূপ হীন অবস্থায় পতিত হয়েছে, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর ওপর কিরূপ অবিচার হয়েছে, কিভাবে এসমস্ত অবিচারের প্রতিকার করা যায় তার ওপর তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হিটলারের বক্তব্য শুনলেন। হিটলারের বক্তৃতা শেষ হলে সকলে হিটলারের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। উপস্থিত জনগণ সঙ্গে সঙ্গে ৩৫০ মার্ক চাঁদা দিলেন পার্টি তহবিলে।

হিটলার এ সভায় ঘোষণা করলেন তাদের দলের নতুন নাম হল 'ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট জার্মান ওয়ার্কারস পার্টি'। পরে ইহা নাৎসী দল বা নাজি পার্টি নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সভায় হিটলার তাঁর পঁচিশ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করলেন।

তন্মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখিত হল :—

১। বিভিন্ন দেশের সব জার্মানদের এক বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২। জার্মানীর পক্ষে গ্লানিকর ভার্সাই চুক্তি বাতিল করতে হবে।

৩। জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৪। যাদের দেহে জার্মান রক্ত নেই, তাদের জার্মানী থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ইহুদীরা কোন সময় জার্মান জাতিভুক্ত হতে পারে না।

৫। যারা জার্মান জাতিভুক্ত নয় তারা শুধু বিদেশীদের মত জার্মানীতে থাকতে

পারবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে এবং তাদের ভোট দেবার অধিকার থাকবে না।

৬। জার্মান রাইখকে (গভর্ণমেণ্ট) প্রথমত জার্মান শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে জার্মানীর শত্রুতা সাধনে যারা ব্রতী হয়েছে তাদের জোরপূর্বক জার্মানী থেকে বের করে দিতে হবে।

৭। বসবাসের জন্য বিদেশীদের জার্মানীতে আসা বন্ধ করতে হবে।

৮। জার্মান জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল জার্মানদের কর্তব্য ও অধিকার একই নীতিতে পরিচালিত হতে হবে।

৯। প্রত্যেক জার্মানকে স্বদেশের স্বার্থে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাজি দলের আদর্শের মধ্যে জার্মানীর মুক্তির বীজ নিহিত আছে বুঝতে পেরে জার্মানরা দলে দলে নাজি দলের সদস্যভূক্তির জন্য এগিয়ে এল। হিটলার যেভাবে এ সভা পরিচালনা করলেন এবং নিজের সপক্ষে জনগণের মতামত গঠন করলেন তাতে দলের প্রেসিডেণ্ট হেরার মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি দল থেকে পদত্যাগ করলেন।

১লা এপ্রিল। ১৯২০ সাল। হিটলার তাঁর সৈনিকের পদে ইস্তফা দিলেন। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তাঁর দলের কাজে নিয়োজিত করলেন। ধীরে ধীরে পার্টির সমস্ত প্ল্যান, প্রোগাম নিজের হাতেই নিয়ে নিলেন। বলতে গেলে এখন থেকে তিনিই হলেন পার্টির সর্বময় কর্তা।

মিউনিকে হিটলার ও ডেক্সলার পরিচালিত ন্যাশানালিষ্ট সোসালিষ্ট পার্টি ছাড়াও বেভেরিয়া, নুরেনবার্গ, আগসবার্গ প্রভৃতি জায়গায় ষ্ট্রেচার, ডঃ অটো ডিকেল, আলফ্রেডব্রুনার প্রভৃতি চিন্তানায়কদের পরিচালনায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে উঠল।

মিউনিকের অনুকরণে অস্ট্রীয়া ও সুদেতানল্যাণ্ডে জার্মান সোস্যাল ওয়ার্কারস পার্টিকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হল। এ সময়ে একজন অস্ট্রীয়ান আইনজীবী ওয়াল্টার রেইল (Walther Reil) পার্টিকে নতুনভাবে সংগঠিত করলেন। একজন চিন্তাশীল রেলকর্মী রুডল্ফ জাংগ (Rudolf Jung)-ও এ সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘের কাজ কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। এ সমস্ত দলের প্রোগ্রাম স্থির হয়েছিল অস্ট্রীয়ার মোরাভিয়ান শহরে বসে। এ সমস্ত দলের নীতিও ছিল সম্পূর্ণ ইহুদী বিদ্বেষী।

১৯১৮ সালের মে মাসে এ পার্টিরও নামকরণ করা হয় **'The German Nationalist Socialists Workers, Party'** এবং তারা তাদের দলের চিহ্ন হিসেবে স্বস্তিকা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অস্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর তার অংশ নিয়ে যখন চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হয় সে সময় এ পার্টি জার্মানীর সুদেতানল্যাণ্ডে এবং ভিয়েনায় তাদের ব্রাঞ্চ অপিস খোলে এবং রেইল (Reil) হন এ পার্টির চেয়ারম্যান।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে এ দলের একটি বিরাট সভা হয়। উক্ত সভায় মিউনিক, বেভেরিয়ার **National Socialist German Worker's Party**-র সদস্যরাও যোগ দেন। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জার্মানীর সালজ্‌বার্গ নামক জায়গায়।

হিটলার কারো কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারতেন না। তাই জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত এ সমস্ত সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন কর্তাদের তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে জার্মানীর বিভিন্ন জায়গায় পার্টি সদস্যদের নিয়ে সালজ্‌বার্গ নামক স্থানে হিটলার এক সভার ব্যবস্থা করেন। এ সভায় হিটলার রেইলকে (**Reil**) পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন।

এ সময়ে হিটলার রোয়েমের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। রোয়েম (**Rohm**) ছিলেন মিউনিকে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। তাঁর সংগঠন প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি হিটলারের আগেই জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন। হিটলারের ন্যায় রোয়েমও বিশ্বাস করতেন জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার করতে হলে দরকার সাধারণ লোকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, জার্মান সৈন্যবাহিনীর আস্থাভাজন হওয়া এবং জার্মান শ্রমিকদের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা।

এ ব্যাপারে রোয়েম কম্যুনিষ্টদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কম্যুনিষ্টরা ভালই হোক বা খারাপই হোক কাজের সফলতার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে তারা কোনদিনও পিছপা হন না, **"He (Rohm) admired the spirit and toughness of the communists, who were prepared to fight what they believed in."**

হিটলার যখন জার্মান ওয়ার্কাস পার্টিকে সবদিক থেকে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন সে সময় রোয়েমই জার্মানীর সমর্থ অথচ অবসরপ্রাপ্ত গণ্যমান্য এমনকি সাধারণ মানুষকেও উক্ত পার্টির সদস্যভুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং রোয়েমের প্রচেষ্টায় এদের দিয়েই জার্মানীর প্রথম ঝটিকা বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে রোয়েমই মেজর জেনারেল রিটার ভন অ্যাপকে (**Ritter Von Epp**) ৬০ হাজার মার্ক চাঁদা পার্টির জন্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। এ টাকাটার প্রয়োজন ছিল পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য। এর অর্ধেকটা অবশ্য ভন অ্যাপ সংগ্রহ করেছিলেন আর বাকী অর্ধেকটা এসেছিল সৈন্যবাহিনীর গোপন তহবিল থেকে।

রোয়েমের ঐকান্তিক সহযোগিতায় হিটলার বেভেরিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং বেভেরিয়ার সরকারের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন। জার্মান ও বেভেরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যাতিরেকে হিটলারের পক্ষে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়া কোনমতেই সম্ভব হতো না। **Alan Bullock** অবশ্য তাঁর

'Hitler—A Study in tyranny' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "Yet however important this help from outside the foundation of Hitler's success was his own energy and ability as a political leader |"

অবশ্য অ্যালান বুলক যথার্থই বলেছেন যে, "হিটলার বাইরের যত সাহায্য লাভ করুক না কেন হিটলারের সফলতার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর নিজস্ব কর্মকুশলতা ও উদ্যোগ।"

হিটলার সব সময় মনে রাখতেন জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিতে হলে জার্মান জনগণের সাহায্য অপরিহার্য্য। হিটলার তাই বলতেন, "To be a leader means to be able to move masses."—Alan Bullock.

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে অষ্ট্রীয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাট এবং কার্ল-লুয়েগারের খ্রীষ্টান সোস্যালিষ্টদের কাছ থেকে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন মিউনিকে এসে তিনি তাঁর সে শিক্ষাকে কাজে লাগালেন।

১৯২৩ সাল পর্যন্ত হিটলার ছিলেন একজন প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ। তখন পর্যন্ত তিনি জাতীয় স্তরের নেতা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেননি।

হিটলার বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে, নানান ধরনের পোষ্টার বা দেওয়াল লিখনে, বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে তিনি তাঁর ও তাঁদের দলের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করে সকলের মন জয় করলেন। তাঁর নাৎসী দলের সদস্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রোয়েম গড়ে তুললেন দলের বিরাট 'ঝটিকা বাহিনী'। এই 'ঝটিকা বাহিনী' যাকে ইংরাজীতে হিটলারের 'Storm Troopers' বলা হত প্রয়োজনের সময় সর্বশক্তি দিয়ে স্বীয়দলের হয়ে কাজ করে গেছে।

তখন জার্মানীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দল ছিল কম্যুনিষ্টদের। জার্মানীতে হিটলার কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করলেন, যাতে তাঁর দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়—সেটাই হল হিটলারের ধ্যান জ্ঞান।

হিটলার বলতেন. "Vehemence Passion, Fanaticism, these are the great magnitude forces which alone attract the great masses"...... The doom of a nation can be averted only by a storm of glowing passion." হিটলার এটাকে মনে প্রাণে মেনে নিলেও এ ধৈর্য্যের প্রভাব তাঁর জীবনের শেষদিকে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এ ধৈর্য্যের অভাব তাঁর জীবনের অধঃ-পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে।

নাৎসী দলের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টিও সমভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাই যেখানে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সভা হওয়ার কথা থাকত সেখানে আগে থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা উপস্থিত থেকে উক্ত সভাকে পণ্ড করার জন্য সচেষ্ট হতো। ফলে নাৎসী ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হত। নাৎসীদলের প্রভাব বৃদ্ধি হলে কম্যুনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব জার্মানীতে বিপন্ন হবে এটা বুঝতে পেরে নাৎসীদলের যে কোন সভাতে কম্যুনিস্ট সদস্যগণ হৈ চৈ চিৎকার

চেঁচামেচি করে শ্রোতাদের তাদের বক্তব্য শুনতে বাধা দিত। ফলে নাৎসী দলের প্রচারকার্যে অসুবিধে হতে লাগল।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে রোয়েমের নেতৃত্বে নাৎসীদলের বিরাট ঝটিকাবাহিনী গঠিত হয়েছিল। এখন থেকে ঝটিকাবাহিনীর ওপর নির্দেশ দেওয়া হল কম্যুনিস্টরা নাৎসীদলের সভা পণ্ড করতে চেষ্টা করলে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

হিটলার ঘোষণা করলেন পশুশক্তিকে দমন করতে হলে পশুশক্তির দ্বারাই তা করতে হবে। হিটলার জানতেন ভয়কে জয় করতে হলে শত্রুপক্ষের মনেও ভয়ের সৃষ্টি করতে হবে। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই হিটলার শত্রুপক্ষের ওপর বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করলেন। তিনি মেইন ক্যাম্ফে উল্লেখ করেছেন, **"Terror cannot be overcome by the weapons of mind but only by counter terror."** তিনি আরও বললেন, **"We shall meet violence with violence in our own defence."**

নাৎসীবাহিনী ও কম্যুনিস্টদের এ সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি ও শান্তি-প্রিয় শ্রেণীর লোকেরা মেনে নিতে পারল না। নাৎসীদলের কোন সভা-সমিতির কথা শুনলে তারা ভয়ে আঁতকে উঠতো। আবার হয়তো দু'দলের সংঘাত লাগবে। শান্তি-শৃঙ্খলা হবে বিঘ্নিত। যার ফল ভোগ করতে হবে তাদের।

নাৎসীদলের ঝটিকাবাহিনীর এরকম আক্রমণের ফলে কম্যুনিস্টরা কাবু হয়ে পড়ল। এরপর থেকে কম্যুনিস্টরা নাৎসীদলের কোন সভা পণ্ড করতে সাহস পেত না। ঝড়ের মত এ বাহিনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঝটিকাবাহিনী'। এ বাহিনীর সকলেই যে সেনাবাহিনীর লোক ছিল তা নয়, এর মধ্যে সাধারণ জার্মানরাও ছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল জার্মানীর যুব সম্প্রদায়।

পরে এ 'ঝটিকাবাহিনী' যাকে ইংরাজীতে **'Storm Detachment'**ও বলা হত তা নাৎসীদলের এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়। 'হিটলার, নাৎসীদল ও ঝটিকা-বাহিনী' ছিল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিটলার 'মেইন ক্যাম্ফে উল্লেখ করেছেন যে, **"The storm Detachment may be neither a military organisation nor a secret-society…Its training must be carried out not on military principles but from the point of what is best for the party."** জার্মানীর একশ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী অবশ্য এ ঝটিকাবাহিনীকে সহ্য করতে পারত না। তাঁরা এ বাহিনীকে গুণ্ডাবাহিনী বলে আখ্যা দিয়ে দিল। গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে হিটলারকে সভা সমিতি করতে হচ্ছে বলে তাঁরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। হিটলার এ সমস্ত লেখকগোষ্ঠীর বক্তব্য শুনলেন এবং তিনি তাঁদের অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়লেন না।

হিটলার উল্লেখ করলেন যে, কম্যুনিস্টদের মত দল ইচ্ছে করলে ভিমিস্থিনিসের মত বক্তাকেও স্তব্ধ করে দিতে পারে। অথচ কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে এ সমস্ত লেখকগোষ্ঠী

সমালোচনা করে একটি লাইনও তাঁদের কলমের আঁচড়ে তুলে ধরলেন না। এঁরা হচ্ছে কাপুরুষ, নীরব কর্মী ও ভয়ে সন্ত্রস্ত। কম্যুনিস্টদের পদলেহনে এঁদের আপত্তি নেই।

হিটলার তাঁর মেইন ক্যাম্ফে প্রত্যেক জার্মানবাসীকে শান্তির মুখোস পরিহিত এ সমস্ত লেখকগোষ্ঠীকে চিনে রাখতে আবেদন জানান। তিনি আরও বলেছেন এঁরা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাই বেশী করে চেনেন। হিটলার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ সমস্ত লেখকগোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, শক্তির সঙ্গে লড়তে হলে শক্তির সাহায্যেই লড়তে হবে। কাপুরুষতা বা ভীরুতার স্থান এখানে নেই।

হিটলারের এ সমস্ত বক্তব্য হয়ত সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ নাও করতে পারেন তবে তিনি তাঁর মনের কথা এতটুকুও গোপন করেননি। কিভাবে তাঁর দলের শক্তি স্বদেশের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে তিনি তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন এবং তিনি যে অপূর্ব উক্তি দেখিয়ে তাঁর ঝটিকাবাহিনী তৈরী করেছেন, সে বাহিনী যে বিশ্বে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তখন আর কারও সন্দেহ রইল না। **"Hitler is quite open in explaining how this is to be achieved"—Alan Bullock.**

হিটলারের ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট পার্টির বেশিরভাগ সদস্যই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব সম্প্রদায়, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশিরভাগই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল। আর যারা যুদ্ধে যায়নি তারা এ সময়ে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত কোন না কোন কাজে যুক্ত থেকে নিজেদের রোজগারের পথ করে নিয়েছিল। তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল এক অদ্ভুত রকমের। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন তারা আর্থিক দিক থেকে কোন অসুবিধের সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ শেষে এদের অবস্থা হয়ে উঠল অতীব শোচনীয়। এরা এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হল যে দিনান্তে তাদের একবেলা আহারের সংস্থান করাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী জার্মানীকে তাদের বহু অংশ ইংরেজ ফরাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হল। জার্মান সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হল। জার্মানীর সৈন্যসামন্ত রাখার ব্যাপারে তাদের ওপর বহু সর্ত আরোপ করা হল। জার্মান রণতরীর সংখ্যা সীমিত করা হল। রাইন অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক বিরাট অঙ্কের টাকা জার্মানদের ওপর ধার্য্য করা হল। এককথায় বলতে গেলে মিত্র-শক্তি জার্মানীকে সব দিক থেকে পিষে মারার চেষ্টা করতে লাগল। যাতে জার্মানী ভবিষ্যতে আর মাথা তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকা করার জন্যই তোড়জোড় আরম্ভ করল মিত্রশক্তিবর্গ।

যে সমস্ত জার্মান সৈন্য ও অফিসার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। প্রায় ১০০০০০। তার মধ্যে প্রায় ৪০০০ অফিসার। তাদের সকলেই যে উচ্চবংশোদ্ভূত তা নয়, অনেকেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় প্রত্যেকে উপযুক্ত। তারা নিজেদের জার্মানীর স্তম্ভ বলে

মনে করত। তাদের ধারণা ছিল তারা স্বদেশবাসীকে যথার্থভাবে পরিচালিত করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। এ সমস্ত লোকেরাই ছিল হিটলারের অনুগামী। "The active section of the German Fascist revolution was the intellectuals the possessors of that decisive superiority complex."

ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট দলের নাম করা কয়েকজন নেতা সম্পর্কে এখানে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না। গোয়েরিঙ ছিলেন হিটলারের ফিল্ড মার্শাল। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন খ্যাতনামা পাইলট ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে তাঁকে জার্মানীতে বেকার অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। সে সময় তিনি অত্যন্ত বিষাদময় জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন সুইডেনের বিমানবাহিনীর কর্মাসিয়াল পাইলট হিসেবে কাজ করেন। পরে আবার জার্মানীতে ফিরে আসেন এবং রাইখষ্ট্যাগে একটি সম্মানজনক চাকরি নেন। এক সময়ে তিনি প্রবল নেশাভাঙ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক আবার ভোগসুখের প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল প্রবল। নিষ্ঠুরতা ছিল তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক। তবুও তিনি জার্মানীর একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি জার্মানীতে হিটলারের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। "……for a time he was actually more popular than Hitler"—Joaeiam C Fest.

নুরেনবার্গ বিচারের সময় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, জার্মানীতে হিটলারের পরেই ছিল তাঁর স্থান। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর হিটলারের কোন আস্থা ছিল না এবং তাঁর ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করতে হিটলার ভয় করতেন। জোয়াসিম সি ফ্যাষ্ট তাঁকে রোমের সম্রাট নীরোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রোম যখন চারদিক থেকে আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে নীরো তখন তাঁর বেহালা বাদনে ব্যস্ত ছিলেন। গোয়েরিঙকে ফ্যাষ্ট অনেকটা এরকম চরিত্রের লোক বলে বর্ণনা করেছেন।

হিটলারের পুলিশবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্বে ছিলেন হিমলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন জার্মান পদাতিক সৈনিক। অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর যুদ্ধের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি পড়াশুনা করার জন্য জার্মানীতে চলে আসেন। তিন বছর পড়াশুনা করে আবার তিনি মুরগীপালন ব্যবসায় নামেন। পরে জার্মান রাইখের অধীনে চাকরি নেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিনি হিটলারের আস্থাভাজন হন এবং পুলিশের সর্বময় কর্তৃত্বপদ লাভ করেন। হিমলারের হৃদয়হীনতা সর্বজনবিদিত। ইহুদী নিধনে তাঁর যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তা হয়ত এখনো অনেকের স্মরণে আছে। হিমলার স্পষ্টত বলে বেড়াতেন যে স্বদেশের স্বার্থে কাকেও খুন করলে তাতে দোষের কিছু নেই।

হিমলার হিটলারের গোপন পুলিশবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন, একথা তিনি নিজেও কোনদিন ভাবতে পারেননি। ভাগ্যই তাঁকে উক্তপদে বহাল করতে সহায়তা করেছিল। প্রথম জীবনে তিনি চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ

করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চাষ-বাস করতে গেলে যে সুস্থ, সবল দেহের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেটা তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছিলেন একজন কৃষক এবং তাঁর ধমনীতে কৃষকের রক্তই প্রবাহিত। তাঁর চরিত্রে কৃষকের স্বভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ করে দিল।

১৯২৩ সালে হিটলার বিদ্রোহ ঘোষণা করে যখন বেভেরিয়া সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করেন সে সময় তিনি ও রোয়েম হিটলারকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর বিশেষ কোন মতবাদ ছিল না। জার্মানীতে অত্যন্ত সাধারণ লোক হিসেবেই তিনি প্রতিভাত হতেন। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন বলেই তাঁর এ শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছিল। ১৯২৬ সালে পশ্চিম প্রাশিয়ার এক জমিদার কন্যা মার্গারেট বোডেনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। মার্গারেট বোডেন হিমলারের চেয়ে বয়সে দুই বছরের বড় ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি মিলিটারী হাসপাতালে নার্সের কাজ করতেন। যুদ্ধশেষে তিনি পিতার টাকাতে একটি নার্সিং হোম স্থাপন করেন। হিমলার পত্নীর অর্থদ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছিলেন।

হিমলারের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে কোন ঘৃণ্য মিথ্যাচারণে প্রবৃত্ত হতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে হিটলারের যুদ্ধমন্ত্রী ব্লোম্বার্গ (Blomberg) এক জার্মান মহিলার পাণি-গ্রহণ করেন। হিটলার স্বয়ং গোয়েরিঙসহ এ বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু এ বিয়ের কিছুদিন পরেই জার্মানীর গোপন পুলিশের সর্বময় কর্তা হিসেবে হিমলার নানান নথি-পত্র পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ব্লোম্বার্গের পত্নী পূর্বে বেশ্যাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হিমলারের কথায় হিটলার বিস্মিত হন। ব্লোম্বার্গের বিয়ের সাক্ষী হিসাবে ছিলেন বলে তিনি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করতে লাগলেন।

হিটলার ব্লোম্বার্গকে যুদ্ধমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাঁর জায়গায় সৈন্যবাহিনীর প্রধান ফ্রিককে বসাবার কথা চিন্তা করে রাখলেন। কিন্তু ফ্রিক নিজেও ছিলেন নাৎসী বিরোধী। তাই হিমলার ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ফ্রিকের বিরুদ্ধে হোমোসেক্সচুয়ালিটির প্রমাণপত্র পেশ করেন এবং তাঁকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেবার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেন। হিটলারের বিরোধিতা করতে পারে এরকম লোকদের হিমলার ধীরে ধীরে নানান কূট কৌশলের মাধ্যমে সরিয়ে দেন।

ব্লোম্বার্গকে অপসারিত করে হিটলার নিজেই যুদ্ধমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। এভাবে হিমলারের ছলচাতুরীতে হিটলার আস্থাভাজন হয়ে নিউরথের মত প্রথম সারির নেতাকেও বিতাড়িত করেন। তাঁর জায়গায় বসান রিবেনট্রপকে। রিবেনট্রপ ছিলেন হিটলারের বৈদেশিক মন্ত্রী।

অবশ্য হিমলারের মৃত্যু বড়ই করুণ। ১৯৪৫ সালে ২৩শে মে, ব্রিটিশদের হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ব্রিটিশ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা

করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় তিনি সাইয়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপ ছিলেন হিটলারের অত্যন্ত আস্থাভাজন বিদেশমন্ত্রী। তিনি ছিলেন জার্মানীর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ পরিবারের সন্তান। তিনি ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে নন-অ্যাগ্রেশন প্যাক্টে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৯ সালে রিবেনট্রপই জার্মানীর হয়ে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মস্কো প্যাক্টে সই করেছিলেন। হিটলার রিবেনট্রপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, **"Ribbontrop is a genius."**

রিবেনট্রপকে বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে হিটলার নাৎসী দলের এবং হিটলারের অনুগত আলফ্রেড রোজেনবার্গের ওপর যে অবিচার করেছিলেন তা সত্যি খুবই দুঃখজনক। রোজেনবার্গ কিন্তু তাঁর মতবাদে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি রিবেনট্রপ ও গোয়েবলস-এর মত হিটলারের চাটুকারিতা করা পছন্দ করতেন না। মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের স্বাধীনচেতা পুরুষ। অনেক অপমান সহ্য করেও কিন্তু তিনি নাৎসীদল ত্যাগ করেননি। অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ ছিলেন হিটলারের আদিগুরু। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীবিহীন একটি বিশাল নর্ডিক রাজ্য স্থাপন করা। এ জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রিবেনট্রপ ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মস্কো প্যাক্টে সই করার পর তিনি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে এটা নাৎসীদের পক্ষে ভবিষ্যতে মঙ্গলদায়ক হবে না।

এ সমস্ত ব্যাপারে রোজেনবার্গ হিটলারকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি হিটলারের আদিগুরু হলে কি হবে হিটলার তাঁর কথায় এ সময়ে বিশেষ কর্ণপাত করতেন না। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু দলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে তিনি হিটলারকে নাৎসী দলের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কতকগুলি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলেন। হিটলার অবশ্য রোজেনবার্গের মানসিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরে নাৎসী দলের আদর্শ সুষ্ঠুভাবে প্রচার করার জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রোজেনবার্গকে নিযুক্ত করেন।

রোজেনবার্গ এ সময়ে ভিডকুইন কুইসলিঙের সঙ্গে জার্মান সরকারের একটি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কুইসলিঙ ছিলেন নরওয়ের অধিবাসী এবং নরওয়ে নাৎসী দলের সদস্য। এতে তিনি সফলতাও অর্জন করেছিলেন। কুইজলিঙের বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন চক্রান্তের ফলে হিটলার অত সহজে নরওয়েকে নিজের কুক্ষিগত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রোজেনবার্গের পর অ্যাডমিরাল রেডার কুইসলিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাডমিরাল রেডার হিটলারকে জানিয়ে দিলেন যে কুইসলিঙের সহযোগিতায় নরওয়ের পতন ঘটান সম্ভব। বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কোন লোকের সম্পর্কে কথা উঠলেই আমরা কুইসলিঙের কথাই মনে করি।

নরওয়ের অধিবাসী হয়েও প্রথমে তিনি রাশিয়ার অনুরক্ত ছিলেন আবার অন্যদিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারেরও সমর্থক ছিলেন। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন রাশিয়াতে। রুশ বিপ্লবের পর তিনি ফিরে এলেন নরওয়েতে। নরওয়েতে 'রেডগার্ড' বাহিনী গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালান। কিন্তু নরওয়ের কম্যুনিস্ট দল তাঁকে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক। এরপর কুইস্‌লিঙ জার্মানীতে চলে গিয়ে নাৎসীদলে যোগ দেন।

নুরেনবার্গ বিচারে রিবেনট্রপ, রোজেনবার্গ, কাইটেল, ফ্রিক, জডল ও আরও কয়েকজন নাৎসী নেতার ফাঁসি হয়েছিল। গোয়েরিঙ ও হিমলার ধরা পড়ার পর সাইয়ানাইড ক্যাপস্থল খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রুডলফ হেস, অ্যাডমিরাল রেডর এবং ফ্রাঙ্ককে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর স্পীয়ারকে দেওয়া হয়েছিল ২০ বছরের কারাদণ্ড। নাৎসী নেতাদের মধ্যে এখন সম্ভবত রুডলফ হেসই বেঁচে আছেন।* কারাগারে বন্দী। বর্তমানে তিনি চোখে ভাল দেখতে পান না। চলনশক্তিও প্রায় রহিত। তবুও তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে রাশিয়া নারাজ।

তাহলে কি আমাদের বুঝতে হবে হিটলারের ভৌতিক দেহাবশেষ রাশিয়া আমেরিকাকে এখনো ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। তাই জার্মানী এখনো রাশিয়া আমেরিকার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাচ্ছে না।

রুডলফ হেস হিটলারের ডেপুটি হিসেবে কাজ করতেন। হিটলারের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনিও ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সুদক্ষ পাইলট। অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী। সামাজিক জীবনে খাপ খাইয়ে চলা তাঁর ধাতে সইত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর তিনি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। তাঁর স্ত্রী এখনো জীবিতা।

স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি নাতনীরা তাঁকে প্রায়ই কারাগারে দেখতে যেতেন।

জার্মানীর 'স্পানডাউর'এর (SPANDAUR) কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকলেও তাঁর জন্য ইস্ট জার্মান সরকারকে এক বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এটি জার্মানীর সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত কারাগার। বেশ কয়েক বছর আগে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এ সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল। চল্লিশ বছর তিনি জেলেই কাটিয়েছেন।

নাৎসীদলের প্রচারমন্ত্রী ছিলেন গোয়েবলস। ১৮৯৭ সালে তাঁর জন্ম। ১৯২১ সালে জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করেন। তারপর তিনি সাংবাদিকতাকে নিজের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই হিটলারের প্রভাবে জার্মান নাৎসীদলে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে জার্মান রাইখষ্ট্যাগের সদস্য হন। ১৯৩৩ সালে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং রেডিও, থিয়েটার, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি জার্মানীর সবরকম গণমাধ্যমের ওপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল।

---

* বইটি রচনাকালে হেস জীবিত ছিলেন এবং স্পানডাউর-এর কারাগারে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। হেস বর্তমানে ইহলোকে নেই।

মানুষের মনস্তত্ব বোঝার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি সুবক্তা হিসেবে জার্মানীতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন কোন মিথ্যাকে বারবার প্রচারের মাধ্যমে তা সত্য বলে প্রতীয়মান করা যায়। রাইখষ্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর মিথ্যা প্রচারকার্য হিটলারকে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করতে প্রভূত সহায়তা করেছিল।

তিনি ছিলেন খোঁড়া। পঙ্গু পা নিয়ে তাঁর পক্ষে যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র তিনিই শেষ পর্যন্ত হিটলারের অনুগামী ছিলেন। হিটলারের আত্মহত্যার কয়েকদিনের মধ্যেই তিমি সপরিবারে মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে নিজের পুত্রদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন, পরে সপরিবারে আত্মহত্যা করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

জোয়াসিম সি. ফ্যাষ্ট গোয়েবলস সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, **"Joseph Goebbles was the brain behind this manipulation of minds···He actually turned the initially irresolute Adolf Hitler into der Fubrer and set him on the pillar of religious Veneration."** সত্যি বলতে কি গোয়েলসের উপস্থিত বুদ্ধি ও নাৎসী দলের হয়ে তাঁর প্রচার জার্মানবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনিই তাঁর প্রচারের মাধ্যমে হিটলারকে জার্মানীর অবিসংবাদিত নেতারূপে নির্বাচিত করতে জার্মানবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নাৎসীদলের অন্যান্য নায়কদের বর্ণনা লেখার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হবে, তবে জার্মানীর কর্ণধার ফুয়েরার সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে হিটলার কোন বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। চিত্রশিল্পী হিসেবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। জীবনটা সেভাবেই আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন। জার্মানীর নাগরিকত্বও তাঁর ছিল না। ভাগ্যক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর হয়ে সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সেখান থেকে নিজের বুদ্ধি কৌশলে, নিজের প্রতিভাবলে তিনি জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হলেন। হয়ে গেলেন নিজের দলের অবিসংবাদিত নেতা।

নাৎসীদলের প্রত্যেকেই ছিলেন কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভাবান এবং নিজস্ব চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ। ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষয়িষ্ণু জার্মান সমাজ জীবনে তাঁরা তাঁদের স্থান করে নিয়েছিলেন-স্বদেশকে এবং স্বদেশবাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে। তাঁরা গড়ে তুললেন তাঁদের নাৎসীদল।

হিণ্ডেনবার্গ থেকে হিটলারের ক্ষমতা দখল

এটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ন্যাশানেল সোস্যালিষ্টদের কোন অফিসারই কর্ণেল বা জেনারেল ছিলেন না একমাত্র লুডেনড্রপ ছাড়া।

লুডেনড্রপ ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর খ্যাতনামা সেনাপতি। প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়মের অন্যতম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। হিটলারের অফিসাররা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লেফটেনেণ্ট বা ক্যাপটেইন। হিটলার নিজেই বললেন, **"From the majors downwords they are all mine."** ন্যাশানেল সোস্যালিষ্টদের শৈশব অবস্থার ইতিহাস হচ্ছে নিচের তলার অফিসারদের সঙ্গে তাদের জেনারেলদের ঝগড়া বিবাদের ইতিহাস।

নাৎসীদলের আদর্শের মধ্যে জার্মানীর মুক্তির পথ নিহিত আছে মনে করে জার্মান জনগণ দলে দলে এই দলের সদস্যভুক্ত হতে লাগল। দেখতে দেখতে জার্মানীর বিভিন্ন জায়গায় এই দলের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯২৩ সাল। ফ্রান্স জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। এটাই জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। এর আগে জার্মানীর 'সার' ভেলিও তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাভাবে জার্মান জনগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে জার্মানী দেউলিয়া হয়ে পড়ল। লোকের মনে দারুণ হতাশা, অথচ ইহুদীরা এই সুযোগে নিজেদের অর্থোপার্জনের চেষ্টায় মেতে উঠল। ভাইমার রিপাব্লিক এই চরম অর্থসঙ্কট থেকে জার্মানবাসীকে মুক্ত করার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

হিটলার বুঝতে পারলেন এটাই তাঁর পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে বেভেরিয়ার সরকার দখল করে নিতে পারলে সেখান থেকেই তিনি জার্মান রাইখ দখলের চেষ্টা চালাতে পারবেন। বেভেরিয়ার মেয়র 'কার' হিটলারকে ভেতরে ভেতরে তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা জানালেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহান সেনানায়ক লুডেনড্রপও জানালেন তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন। লুডেনড্রপ ও অন্যান্য জেনারেল, মন্ত্রী ও বেভেরিয়ার সম্ভ্রান্ত জনগণকে হিটলারের এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

হিটলার নিজেই বেভেরিয়ার বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত জনগণ, জেনারেলদের কাছে যেতে লাগলেন। তাঁর মনের কথা গোপন না রেখে পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের কাছে হিটলার তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন এবং তাঁকে এই বিদ্রোহে সমর্থন জানাতে অনুরোধ করলেন। হিটলার জার্মান জেনারেলের একজনের কাছে তাঁকে এই বিদ্রোহে সমর্থন করার জন্য বলতে গিয়ে বলেই ফেললেন তাঁরা যদি তাঁকে এই বিদ্রোহে সমর্থন জানান তাহলে তিনি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। **Kornard Heiden** বলেছেন—হিটলার একজন জেনারেলকে বললেন, **"Excellency, I will stand behind you as faithfully as dog."**

মন্ত্রী, জেনারেল বা বেভেরিয়ার সম্ভ্রান্ত জনগণ এই মুহূর্তে এই বিদ্রোহ চাননি। ৮ই নভেম্বর, ১৯২৩ সাল, হিটলার সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। লুডেনড্রপ, গোয়েরিঙ, ষ্ট্রেচার নামক একজন স্কুলশিক্ষকসহ দলনেতা হিটলার প্রথমে গুলি

চালাতে চাননি। চেয়েছিলেন ভয় দেখিয়ে বেভেরিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করে নিতে। হিটলার আশা করেছিলেল তাঁকে ও লুডেনড্রপকে দেখে মিউনিকের পুলিশ-বাহিনী তাদের অস্ত্র নামিয়ে নেবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। তারা ২।৩ মিনিট ক্রমাগত গুলি চালাল। লুডেনড্রপ তার মধ্য দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন। গোয়েরিঙ কিছুটা আহত হলেন এবং সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। লুডেনড্রপ ঘটনাস্থলেই বন্দী হলেন।

হিটলারকে ডঃ শুলজ (Doctor Schultz) তাঁর গাড়ি করে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলেন। অবশ্য হিটলার শীঘ্রই ধৃত ও বন্দী হলেন এবং তাঁকে বেশ কয়েক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। বেভেরিয়ার বিচারমন্ত্রী গুরটনার (Gurtner) হিটলারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। গুরটনারের প্রচেষ্টায় মাত্র এক বছর কারাবাসের পর ছাড়া পেলেন।

এই এক বছর কারাবাসে থেকে হিটলার নিজের আত্মজীবনী 'Mein Kampf' বা 'My Struggle' বইখানা লেখেন। এটাকে নাৎসীদের জীবনবেদ বলে মনে করা হয়। জার্মানীতে একদিনেই এই বইয়ের প্রায় চল্লিশ হাজার কপি বিক্রী হয়। এ পুস্তক ক্রয় ও পাঠ জার্মানদের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ পুস্তকে হিটলারের দেশাত্মবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। এ পুস্তক পাঠে জার্মানরা স্বদেশের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। হিটলার সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও তাঁর সম্পর্কে প্রচারের ব্যাপারে এই পুস্তকের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

হিটলারের ১৯২৩ সালের এই বিদ্রোহের বিফলতার মূলে রয়েছে নীচের অফিসার ও জেনারেলদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ। মেজর থেকে আরম্ভ করে সব অফিসাররাই হিটলারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু লুডেনড্রপ ব্যতীত কোন উপরের অফিসারই এ বিদ্রোহে হিটলারকে সমর্থন জানান নি।

তবে বলতে গেলে মিউনিক কেন সমগ্র জার্মানীর পুলিশ-বাহিনীর অধিকাংশই ন্যাশানেল সোস্যালিষ্টদের সমর্থক ছিলেন। মিউনিকের পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ডঃ ফ্রিক ছিলেন হিটলারের অনুরাগী। যাঁকে হিটলার ১৯৩৩ সালে রাইখের মন্ত্রীত্বপদে নিয়োগ করেছিলেন।

জার্মানীর শাসক সম্প্রদায়ের এ সমস্ত লোকের মাধ্যমে হিটলার তাঁর প্রয়োজনীয় সব খবরাখবর পেতেন। ফলে তাঁর বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে আগেভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠত। হিটলারের সফলতার পেছনে তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্য, বিচক্ষণতা ও তাঁর জেদ বিশেষভাবে কাজ করেছে। হিটলারের বিরোধী-পক্ষও অকপটে স্বীকার করেছে যে রাজনৈতিক চাতুর্যে হিটলার ছিলেন অদ্বিতীয়।

হিটলার কারান্তরালের বাইরে এসে দেখতে পেলেন নাৎসী দল নিষিদ্ধ হয়েছে। তাঁর অনেক সহচর পলাতক। প্রকাশ্যে তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হল না। তাঁকে অষ্ট্রীয়ায় চলে যেতে বাধ্য করা হল।

হিটলার ছিলেন প্রচণ্ড দৃঢ়চেতা। সহজেই ভেঙ্গে পড়ার মানুষ তিনি নন। তিনি ধৈর্য্য ধরে সুযোগের সন্ধানে রইলেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তাঁর অত্যন্ত দুঃসময় চলল। ১৯২৯ সালে ঝটিকাবাহিনীর কার্যকলাপের জন্য হিটলারকে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করা হল। হিটলারকে সাইলিসিয়ার আদালতে এই মর্মে অঙ্গীকার করতে হল যে ঝটিকাবাহিনী তাঁর দলে রক্ষী বাহিনীর কাজ করে। এর পেছনে আর কোন মতলব আছে বলে হিটলার স্বীকার করেননি। তিনি ভেতরে ভেতরে জার্মানীর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

১৯২৩ সালের পর থেকে হিটলার আর কোনদিন সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন নি। জার্মান রাইখের অধিকাংশ সদস্য হিটলারকে এই বিদ্রোহে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল হল বিপরীত। ১৯২৩ সালের বিদ্রোহের সময় রাইখ সদস্যদের বিশেষ কোন সাহায্য তিনি পাননি।

১৯২৯ সালে সারা দুনিয়ায় দেখা দিল অর্থ নৈতিক সঙ্কট। ইয়ং প্ল্যান ও দাওজ প্ল্যান অনুযায়ী আমেরিকার কাছ থেকে জার্মানী যে অর্থ নৈতিক সাহায্য পাচ্ছিল তাও গেল বন্ধ হয়ে। আমেরিকার এই অর্থ সাহায্য থেকে জার্মানী ভার্সাই সন্ধিতে তার ওপর যে ঋণের বোঝা চাপিয়েছিল তা শোধ করতে আরম্ভ করেছিল। আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য বন্ধ হওয়াতে জার্মান অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে জার্মানীতে প্রচুর কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ল। জার্মানীর চারদিকে শুধু হতাশা। যুব সম্প্রদায়ের মনে প্রচণ্ড রকমের বিক্ষোভ দানা বাধতে লাগল। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। দেশের সাধারণ লোক ভাইমার সাধারণতন্ত্রের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়ল।

হিটলার এ রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিভাবে এসব সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হয় হিটলার তা ভালভাবে জানতেন। সামরিক বাহিনীর লোকেদের মধ্যেও হিটলারের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। হিণ্ডেনবার্গের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্রোনার প্রমাদ গুণলেন। তিনি ধীরে ধীরে নাৎসী দলের লোককে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা বন্ধ করতে লাগলেন।

ফলে সৈন্যবাহিনীতে প্রচণ্ড রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তারা প্রকাশ্যে নাৎসী দলকে সমর্থন জানাতে লাগল। ১৯৩০ সালে গ্রোনার নাৎসী দলের তিন সেনানায়ক লুডিন, শিরিংয়ার আর ওয়েণ্ডকে গ্রেপ্তার করলেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হল সামরিক আদালতে।

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে হিটলার রাইখের চ্যান্সেলার পদ লাভ করার জন্য চেষ্টা চালান। সে সময় রাইখের বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গই হিটলারকে প্রবলভাবে বাধা দেন। চ্যান্সেলার পদে যাতে হিটলার অধিষ্ঠিত হতে না পারেন তার জন্য হিণ্ডেনবার্গ চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি করলেন না। হিণ্ডেনবার্গ ছিলেন প্রচণ্ড নাৎসী

বিরোধী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্রোনারের কূট পরামর্শে নাৎসী দলকে হিণ্ডেনবার্গ নিষিদ্ধ করলেন।

হিটলারের ঝটিকাবাহিনী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জার্মানীর প্রবল জনসমর্থন রয়েছে নাৎসীদলের প্রতি। তাই জার্মান জনগণের প্রবল চাপে হিণ্ডেনবার্গকে নাৎসী দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হলো। গ্রোনারকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হল।

গোয়েবলস্ ছিলেন ছোটোখাটো চেহারার মানুষ। হিটলারকে অবিকল নকল করতে তাঁর মত সমকক্ষ ব্যক্তি তৎকালীন জার্মানীতে খুব কমই ছিল। গোয়েবলস্ বলতেন কোন মিথ্যাকেও বার বার প্রচারের মাধ্যমে সত্য বলে লোকের মনে ধারণার সৃষ্টি করা যায়। হিটলার সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করে যেতেন যে ফ্যুরার যা করেন বা বলেন তা সর্বতোভাবে সত্য। একথা জার্মান জনগণের মধ্যে বার বার প্রচারের মাধ্যমে তিনি হিটলার সম্পর্কে তাদের মনে একটি সুস্পষ্ট ও সুন্দর ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। হিটলারের ন্যায় গোয়েবলসেরও কোন নেশা ছিল না। না করতেন মদ্যপান, না খেতেন বিড়ি কিম্বা সিগারেট বা অন্য কিছু। হিটলারের ছোটবেলাকার ধৈর্য্য, প্রচারক্ষমতা, উদ্ভাবনীশক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি—এ সব গোয়েবলস বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলতেন, **"Propaganda should not be decent, it should be effective."** এটাই ছিল ন্যাশানেল সোস্যালিষ্টদের মূলমন্ত্র ও সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৯৩০ সালের পর থেকে হারম্যান গোয়েরিঙ হিটলারের অন্যান্য অনুগামীদের চেয়ে পার্টির কাজে অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন। গোয়েরিঙ জার্মানীর অর্থনীতি, সেনাবাহিনীর এমন কি তৎকালীন জার্মানীর শিল্প সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। বৈদেশিক ব্যাপারেও তাঁর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। গোয়েরিঙ ছিলেন হেসের (Hesse) গ্র্যাণ্ড ডিউকের পুত্র প্রিন্স ফিলিপের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবার প্রিন্স ফিলিপ ছিলেন ইতালীর রাজার শ্যালক। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গোয়েরিঙ-এর একটি বিশেষ প্রভাব ছিল। গোয়েরিঙ জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের পুত্রেরও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই গোয়েরিঙ ছিলেন তৎকালীন জার্মান ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট দলের একজন অপরিহার্য কর্মকর্তা।

তবে সেই সময় হিটলার যাঁর কাছে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন রোয়েম। এক সময়ে হিটলারের অনেক ওপরতলার অফিসার ছিলেন। রোয়েম ছিলেন হিটলারের বস। ১৯২৩ সালে হিটলারের সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় রোয়েম রাইখ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯২৫ সালে তিনি হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। এর পরিণতি অবশ্য রোয়েমের পক্ষে খুবই খারাপ হল। কেননা এই সময়ে হিটলারের সমর্থক জার্মানদের সংখ্যা প্রচুর। এককথায় বলতে গেলে তখন হিটলার জার্মানীর অবিসংবাদিত নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছেন। ফলে রোয়েম একঘরে হয়ে পড়লেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা চরমে উঠলো। রোয়েম নিজের ভুল

বুঝতে পেরে আবার হিটলারের সঙ্গে একটি মিটমাট করে নিলেন এবং হিটলারকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হলেন। বলা চলে পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনে হিটলার ও রোয়েম পুনরায় নিজেরা পূর্বের সুন্দর সম্পর্ক আবার গড়ে তুললেন।

রোয়েমের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি ছিলেন অতীব কামাসক্ত। বিশেষভাবে তিনি ছিলেন সমকামী (**Homosexual**)। সেজন্য জার্মানীর বেশির ভাগ লোক রোয়েমের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু হিটলারের ভয়ে তারা মুখ খুলতে পারত না। ভন হিণ্ডেনবার্গও রোয়েমকে মোটেই পছন্দ করতেন না। অবশ্য তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ওপর রোয়েমের কিছু আসত-যেত না।

রোয়েম ছিলেন অসাধারণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁরই প্রচেষ্টায় হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা মাত্র এক হাজার থেকে তিন লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। ঝটিকা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হিটলারের জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নেবার সুযোগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করে দিচ্ছিল।

রোয়েমের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের পুত্র কর্ণেল ওস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ওস্কারের মাধ্যমে রোয়েম হিণ্ডেনবার্গের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়ে রাইখের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ছিলেন গ্রোনার। জেনারেল ভন্ শ্লীসার ছিলেন একজন সুচতুর রাজনীতিবিদ্। সুকৌশলে তিনি গ্রোনারের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করে ভেতরে ভেতরে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ভন্ শ্লীসারের সঙ্গে রোয়েমেরও বন্ধুত্ব ছিল। তাই রোয়েম শ্লীসারের এ সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হতে পারতেন। রোয়েম শ্লীসারের এ রকম চিন্তাধারা হিটলারের গোচরে আনলেন। এভাবে রোয়েম সব সময় হিটলারকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তাঁর ভবিষ্যতে রাইখ চ্যান্সেলারের পদে উপবিষ্ট হবার পথ প্রশস্ত করে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। আসল কথা হল রোয়েম যে-কোন কারণেই হোক না কেন হিটলারের মধ্যে এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তখন জার্মানীকে দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র হিটলার। যদিও বা হিটলার ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁরই অধীনস্থ একজন সাধারণ সৈনিক।

রাইখ প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল। ১৯২৫ সালে তিনি যখন জার্মান রাইখের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন তখন তাঁর বয়স ৮০। বৃদ্ধবয়সে হিণ্ডেনবার্গকে রাইখ প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত করতে অনেক চিন্তাশীল জার্মানবাসীর আপত্তি ছিল এবং তাঁরা অনেকেই হিণ্ডেনবার্গকে ভোট দেননি। তথাপি হিণ্ডেনবার্গ প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ জার্মান ভোটদাতাদের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া। হিণ্ডেনবার্গ অল্পসংখ্যক ভোট পেয়েও রাইখের প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করেন।

হিণ্ডেনবার্গের পক্ষে এই বৃদ্ধবয়সে জার্মানীর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা

কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে জার্মানীর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করতে হতো। হিণ্ডেনবার্গ তাঁর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এর ফলে রাইখষ্ট্যাগের শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে হিণ্ডেনবার্গের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন জেনারেল ভন্ শ্লীসার। জেনারেল ভন্ শ্লীসার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং হিণ্ডেনবার্গের মুখ্য উপদেষ্টারূপে কাজ চালাতে থাকেন। রোয়েম কিন্তু ভেতরে ভেতরে শ্লীসারকে সম্পূর্ণরূপে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন।

হিণ্ডেনবার্গ তা অনুধাবন করতে পেরে শ্লীসারকে চ্যান্সেলার পদ থেকে অপসারিত করেন। ভন্ প্যাপেনও হিণ্ডেনবার্গের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। হিটলার ও রোয়েম সুকৌশলে শ্লীসার ও ভন্ প্যাপেনকে কব্জা করে ফেলেন। শ্লীসারের পর হিণ্ডেনবার্গ ব্রুয়েনিংকে চ্যান্সেলার পদে নিয়োগ করলেন। শ্লীসার, ভন্ প্যাপেন, ব্রুয়েনিং এঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান রাইখের এরূপ শোচনীয় অবস্থা চলতে থাকল। তখন জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষের ওপর। তদুপরি যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে জার্মানী মিত্রশক্তিকে বৎসরে ২০০০ মিলিয়ন মার্ক ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। দেশের এই চরম দুর্দিনে ব্রুয়েনিং সরকারের পক্ষে অবস্থা সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ব্রুয়েনিং সরকার জার্মানীর সাধারণ লোকের ওপর অত্যধিক কর বসিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ কর্মচারীর বেতন কমিয়ে দেওয়া হল। বেকারদের সুযোগ সুবিধেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। শিক্ষিত বেকার যুবকের দল এই রকম অবস্থায় ক্ষেপা কুকুরের মত হয়ে উঠল। তারা সন্ধান করতে লাগল একটি নতুন দল ও নতুন নেতার, যাঁকে অবলম্বন করে তারা বর্তমান জার্মান সরকারকে উৎখাত করে নতুনভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধিমানসে অন্য কাউকে বসিয়ে দেশের সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে।

হিটলারকে তারা তাদের দলের নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে মনে মনে প্রস্তুত হলেন।

জার্মানীর বৈদেশিক মন্ত্রী ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে 'অষ্ট্রো-জার্মান কাষ্টমস ইউনিয়ন' গড়ে তুলে জার্মানীর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সচেষ্ট হন। কিন্তু ফ্রান্স সেখানে বাদ সাধল। চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইতালীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অষ্ট্রিয়াকে এই ইউনিয়নে যোগ দিতে দিল না। ফ্রান্স স্পষ্টত জানিয়ে দিল যে এই ইউনিয়ন ভার্সাই সন্ধির বিরোধী। জার্মানীর সাধারণ লোক ব্রুয়েনিং সরকারকে ভুল বুঝল। তারা মনে করল দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার মূলে রয়েছে ব্রুয়েনিং সরকারের অপদার্থতা।

নাৎসী দল এ সুযোগে তাদের প্রতিপত্তি প্রবল বিক্রমে বাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট

হল। সুযোগ বুঝে হিটলার তদানীন্তন জার্মান সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বার্লিনে বন্‌ধ পালন করলেন। **"By November, 1932, things had gone so far that National Socialists were acting together with Communists made a strike in Berlin, which dislocated the transport services."**

শ্লীসার স্পষ্টতই উল্লেখ করলেন যে এভাবে চলতে থাকলে জার্মান সরকার দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে বাধ্য হবে। হিটলার ঠিক করলেন জার্মান রাইখ দখল করতে হলে বিপ্লব বা বিদ্রোহের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। ১৯২৩-এর বিদ্রোহের পর হিটলার আর কোন সময়ে জার্মানীতে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন নি।

হিটলার ঠিক করলেন জার্মান রাইখ দখল করতে হলে সেখানে প্রচুর পরিমাণে নাৎসী দলের সদস্য পাঠাতে হবে। ১৯৩০ সালে রাইখের নির্বাচনে নাৎসী পার্টি অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নির্বাচনে নাৎসী দল অংশগ্রহণ করল। ক্রুয়েনিং ও হিণ্ডেনবার্গ দেশের স্বার্থে নাৎসী ও কম্যুনিস্ট দলকে একত্র করে একটা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। অবশ্য এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না।

এই নির্বাচনে জার্মানীর দুই উগ্রপন্থী দল নাৎসী ও কম্যুনিস্টরা আলাদা আলাদা ভাবে অংশগ্রহণ করল। ৩২ কোটি ভোটের মধ্যে নাৎসীরা প্রায় ৬৭ লক্ষ ভোট পেল। কম্যুনিস্টরাও অনেক ভোট সংগ্রহ করল। ক্রুয়েনিং সরকারের সদস্যসংখ্যা কমে গেল। ফলে হিণ্ডেনবার্গ ও ক্রুয়েনিংকে তাঁদের হাত শক্ত করার জন্য সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হল। জার্মান আইনের ৪৮ ধারা অনুযায়ী ইচ্ছে করলে হিণ্ডেনবার্গ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নাৎসী ও কম্যুনিস্ট দুটি দলের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে পারতেন।

কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে হিটলারের অনুরক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল প্রচুর। যার জন্য হিণ্ডেনবার্গ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নাৎসীদলের কার্যকলাপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। তদুপরি তিনি বার্দ্ধক্যের ভারে জর্জরিত। আগেই উল্লেখিত হয়েছে জার্মান রাইখের সেনাবাহিনীর ওপর মেজর জেনারেল শ্লীসারের একটি বিরাট প্রভাব ছিল। শ্লীসারের সঙ্গে রোয়েমের অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। আবার রোয়েমের সঙ্গে হিণ্ডেনবার্গের ছেলে ওস্কারেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রোয়েমের প্রভাবে শ্লীসার ও ওস্কার হিণ্ডেনবার্গকে নাৎসী দল ও হিটলারের ওপর কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে দিলেন না।

১৯৩০-এর নির্বাচনে হিটলার কিন্তু নিজে রাইখের সদস্যপদের জন্য দাঁড়াতে পারেন নি। কেন না তখনো তিনি জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করেন নি। **"Hitler himself had to step into the breach. He was still not of German notionality"—Rodolfolden's 'Hitler'—Page 284.** আইনের দিক থেকে হিটলার তখনো বিদেশী। অবশ্য এর পরবর্তী নির্বাচনে ১৯৩২ সালের মধ্যেই তিনি

জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করলেন এবং ১৯৩২ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তাঁর পার্টিসহ তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জার্মান রাইখের সদস্যপদ লাভ করলেন।

কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হলে দু'রকম পথ অবলম্বন করতে হয়—(১) বিপ্লবের মাধ্যমে ও (২) ভোটের মাধ্যমে। হিটলার কিন্তু জোর করে বা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেননি। ১৯২৩ সালের সশস্ত্র বিপ্লবের পর হিটলার আর সে পথে যেতে রাজী হননি। তিনি চেয়েছিলেন জনগণের সহযোগিতা ও ভোটের মাধ্যমে রাইখের ক্ষমতা দখল করতে এবং দেখা গেল ১৯৩২ সালের জুলাই-এর নির্বাচনে তাঁর দল ৬০৮টি সিটের মধ্যে ২৮৮টি স্থান দখল করেছেন। তখনো নাৎসীরা মেজরিটি দল হিসেবে রাইখে স্থান পায়নি।

সুচতুর হিটলার জার্মান ন্যাশানাল পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার্মান রাইখের ক্ষমতা দখলের জন্য এগিয়ে এলেন। শ্লীসার, কর্ণেল ওস্কার, রোয়েম ও অন্যান্য নাৎসী নেতাদের সহযোগিতাও তিনি লাভ করলেন।

ক্রয়েনিং ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। জার্মানীতে নাৎসীদলের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। এদিকে জার্মান জাতীয় দলের নেতা ডঃ হুগেনবার্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিটলার রাইখ দখলের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ক্রয়েনিং-এর পক্ষে এ অবস্থার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্রয়েনিং বাধ্য হয়ে হিণ্ডেন-বার্গের কাছে চ্যান্সেলার পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি পাঠালেন। হিণ্ডেনবার্গ আশা করেছিলেন ক্রয়েনিংকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন। ক্রয়েনিং-এর পদত্যাগের পর হিণ্ডেনবার্গ শ্লীসারকে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত করার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু শ্লীসারের পক্ষে রাইখের পূর্ণ সমর্থন লাভ করা সম্ভব হল না। হিণ্ডেনবার্গের তখন একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন তাঁর ছেলে কর্ণেল ওস্কার। রাইখের সদস্যদের ষড়যন্ত্রের ফলে ভন্ প্যাপেনকেও সরে যেতে হল। এদিকে ভন্ প্যাপেনও শ্লীসারের সঙ্গে হিটলার ও রোয়েমের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

হিণ্ডেনবার্গ তখন বুঝতে পারলেন তিনি যতই নাৎসীবিরোধী হউন না কেন হিটলার ভিন্ন তিনি আর এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না যাঁর হাতে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিতে পারেন। "There was no one left but Hitler, the leader of the greatest single party of the state."

হিণ্ডেনবার্গ প্রথম থেকেই হিটলারের ওপর মনক্ষুন্ন ছিলেন। হিটলারকে রাইখের চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করতে গিয়ে তিনি প্রতিপদে চিন্তা করেছেন। তাঁর ছেলের অনুরোধ সত্ত্বেও হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে নিয়োগ করতে গিয়ে নানান-ভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করেন। হিটলারের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর পিতার নাম, তাঁর স্ত্রী আছেন কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জেরা করেন।

হিটলার হিণ্ডেনবার্গকে তাঁর বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ করে ফেলেন। হিণ্ডেনবার্গ

হিটলারকে অবশ্য রাইখের চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত করলেও প্রথমে কিন্তু তিনি হিটলারের হাতে বৈদেশিক নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি ইত্যাদি দেননি। তবে রাইখের আভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালনার ভার বিশেষভাবে ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট-দের হাতে ছিল। জার্মান রাইখের ওপর তখন বিরাট প্রভাব ছিল প্রাশিয়ার। প্রাশিয়ার ক্ষমতা বাস্তবিক পক্ষে তখন প্রাশিয়ার মন্ত্রী ফ্রিক এবং গোয়েরিঙ-এর ওপরেই ন্যস্ত ছিল। ফ্রিক ও গোয়েরিং-এর প্রভাবও হিণ্ডেনবার্গকে হিটলারকে জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করতে অনেকাংশে বাধ্য করেছে। রোয়েমের কৃতিত্ব এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী যিনি হিটলারকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তাঁকে জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছেন। অবশ্য এই রোয়েমকেই হিটলার নিজের ক্ষমতা একচ্ছত্র করার বাসনায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন। তবে হিটলার কেন, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারাও বিংশ-শতাব্দীতেই এরকম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে এতটুকু পিছপা হননি। অতএব নিজের স্বার্থে এরকম হত্যাকাণ্ডের জন্য কেবলমাত্র একা হিটলারই যে দায়ী একথা বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

হিণ্ডেনবার্গ হিটলারের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে তাঁকে কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে গেলেন। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। হিটলারকে হিণ্ডেনবার্গ নির্দেশ দিলেন যে তিনি কেবল তাঁর নাৎসী দলের সদস্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবেন না। তাঁকে জার্মানীর দক্ষিণপন্থীদেরও তাঁর মন্ত্রীসভায় নিতে হবে। জার্মান সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। হিটলার হিণ্ডেনবার্গের কথায় স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, তিনি হিণ্ডেনবার্গকে আরও বললেন অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার নতুনভাবে রাইখের নির্বাচন করবেন। হিণ্ডেনবার্গ হিটলারের কথায় আশ্বস্ত হলেন। তাঁর মনে আনন্দের সঞ্চার হল। হিটলারের ওপর তাঁর যে অবিশ্বাস ছিল তাও অনেকটা তিরোহিত হল। হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে 'রাইখ' ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে নির্বাচনের জন্য আদেশ দিলেন। হিটলার এই সুযোগের সন্ধানই করছিলেন। তাঁর দল জোর প্রচারকার্য চালাতে লাগল। জার্মানদের মনের ওপর তাদের প্রচারকার্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হল।

হিটলার চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হয়ে ভেতরে ভেতরে বিরুদ্ধ পার্টিগুলিকে ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। গোয়েবলস, গোয়েরিঙ, রিবেনট্রপ, ভন্ প্যাপেন প্রভৃতি নাৎসী নায়কগণ হিটলারের পার্শ্বচররূপে কাজ করতে লাগলেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে প্রায় ১৯৬ জন লোক রাজনৈতিক কারণে নিহত হল। অনেকের ধারণা এর পেছনে নাৎসী দলের গোপন চক্রান্তই বিশেষভাবে কাজ করেছে। অবশ্য গোয়েবলস প্রচার করে যেতে লাগলেন এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে ইহুদীরা।

হিটলার এবার উপলব্ধি করতে পারলেন জার্মানীতে তাঁর প্রতিপক্ষ শক্তিশালী

দল একমাত্র কম্যুনিস্ট দল। এই কম্যুনিস্টদের জার্মানী থেকে উৎখাত করতে তিনি এখন মরিয়া হয়ে উঠলেন। রাইখের নির্বাচনের মাত্র সাতদিন আগে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সালে জার্মান পার্লামেণ্টে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দিল।

জার্মান পার্লামেণ্ট ভবন যাকে 'রাইখষ্ট্যাগ' নামে অভিহিত করা হয় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। মেরিনাস ভেনভার লুবে নামক একজন ডাচ ঘটনাস্থলে ধরা পড়ল। সে এক সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল। সেদিন রাত্রিতেই হিটলার ঘোষণা করলেন রাইখষ্ট্যাগে আগুন লাগিয়েছে কম্যুনিস্টরা। গোয়েরিঙ এবং গোয়েবলসও প্রচার করতে লাগলেন আগুন লাগিয়েছে কম্যুনিস্টরা। তার প্রচুর প্রমাণ আছে এবং শীঘ্রই সেগুলি কাগজে ফলাও করে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু এসব জিনিস আর কোনদিন কাগজে ছাপা হয়নি বা আদালতেও এসব ব্যাপারে কোন কাগজপত্র প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা হয়নি। ভ্যানভার লুবে ও তিনজন বুলগেরিয়ান কম্যুনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হল। প্রচারের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক জার্মান জনগণের মনে কম্যুনিস্টদের দেশদ্রোহী বলে প্রতিপন্ন করলেন নাৎসী নায়ক গোয়েবলস। নাৎসীদল তখন জার্মানীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল।

নাৎসী বিরোধীদের হত্যা করার জন্য ঢালাও হুকুমনামা জারি করলেন হিটলার। বৃদ্ধ হিণ্ডেনবার্গের কোন প্রতিবাদ করার ক্ষমতাই ছিল না।

হিটলার এইবার তাঁর দলের যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে চান বা তার সমালোচনা করতে চান, তাঁদের উৎখাত করার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। শুধু কি তাই? তাঁর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যাঁকে কেন্দ্র করে তিনি আজ এই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন সেই রোয়েমকে তিনি এখন আর সহ্য করতে পারছেন না। তার একমাত্র কারণ রোয়েম ঝটিকা বাহিনীর ওপর বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ঝটিকা বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যই রোয়েমের পরম ভক্ত। এতে হিটলারের ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এই মনে করে রোয়েমকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন হিটলার।

তবে এ সংবাদ ঘুণাক্ষরে রোয়েম জানতে পারলেন না। এর মধ্যে হিটলার হিণ্ডেনবার্গের কথামত ১৯৩৩ সালের ৫ই মার্চ রাইখষ্ট্যাগের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। এই নির্বাচনে নাৎসীরা ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ভোট পেল। চারিদিকে নাৎসীদের জয়-জয়কার। হিটলার বিজয়গৌরবে জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথের সন্ধান পেলেন। Rudolf Olden তাই বলেছেন, "Hitler prepared for the day that was to place him in power legally and constitutionally." জার্মান জেনারেল বেক বলেন, "This man (Hitler) has no country, and one could add no class, no past, no family."

হিটলারের ছিল না কোন দেশের নাগরিকত্ব, তাঁর ছিল না কোন ভূত বা ভবিষ্যৎ। তথাপি তাঁর অদম্য কর্মক্ষমতা, বুদ্ধিকৌশলে এবং প্রতিভাবলে ভিনদেশী এই হিটলারই জার্মানীর মত একটি সুশিক্ষিত, এবং সর্ববিষয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশের

নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হলেন। বিপ্লবের মাধ্যমে নয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ভোটের মাধ্যমে।

হিণ্ডেনবার্গ শারীরিক দিক থেকে একেবারেই পঙ্গু হয়ে গেছেন। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। হিটলার এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ক্ষমতা দখল করলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন এরকম কোন নাৎসী নেতাকে তিনি ইহজগতে জায়গা দিতে রাজি নন!

রোয়েমের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে হিটলার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রোয়েমকে করলেন নাৎসী দল থেকে বিতাড়িত। দল থেকে বিতাড়িত করে হিটলার ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনাও তিনি স্থির করে ফেললেন। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন. হিটলারের রক্তস্নানের দিন সমাগত। হিটলার 'ঝটিকা বাহিনীর' এক সভায় যাবার জন্য স্থির করলেন। সভার স্থান উইসি নামক বেভেরিয়ার একটি গ্রাম।

হিটলার তাঁর দলের প্রধানদের সকাল দশটায় উক্ত গ্রামে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডঃ গোয়েবলস। হিটলার, গোয়েবলস ও তাঁর অনুরক্ত আরও কয়েকজন নাৎসী নেতাসহ সকাল ৬টায় বেভেরিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। বেভেরিয়াতেই রোয়েমের আবাসস্থল ছিল।

হিটলার রোয়েমের ঘরে গিয়ে নিজেই তাঁর দরজায় করাঘাত করলেন। রোয়েমের তখনো চোখে ঘুম। রোয়েম ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন কে দরজায় করাঘাত করছে? হিটলার গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন স্বয়ং হিটলারই দরজায় করাঘাত করছেন। রোয়েমের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তিনি নিজেই এসেছেন। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ১৯২৩ সালের পর হিটলারের সঙ্গে কতকগুলি ব্যাপারে রোয়েমের মনোমালিন্য হয়। যার ফলে রোয়েম কিছুদিন পার্টি থেকে সরে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আবার তাঁদের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যায়। যাহা হউক, রোয়েম জানতেন হিটলারের আসার সময় দুপুরে। তিনি হঠাৎ এত সকালে তাঁর গৃহে আগমন করলেন কেন? রোয়েম এই জন্য একটু চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। নানান ভাবনা চিন্তা করে রোয়েম তাঁর ঘরের দরজা খুলে দিলেন। হিটলার তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রোয়েমের সঙ্গে 'ঝটিকা বাহিনীর' আরও কয়েকজন সদস্যও ঘরে ছিল।

হিটলারের নির্দেশে রোয়েমসহ এদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হল। হিটলার ঘরে ঢুকেই রোয়েমকে নানান কটূ মন্তব্য করলেন। আগেই বলা হয়েছে রোয়েম ছিলেন 'সমকামিতা দোষে দুষ্ট'। রোয়েমের অন্যান্য সঙ্গীদের বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল Stadelheim-এর কারাগারে। মেজর বুকের নির্দেশে সকলকেই গুলি করে হত্যা করা হল।

রোয়েমকে একটি ঘরে আটকে রাখা হল। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল একটি রিভলবার এবং হিটলারের নির্দেশ ছিল রোয়েম যেন রিভলবারের গুলিতে নিজেই আত্মহত্যা করেন। কিন্তু রোয়েম তাতে রাজি হলেন না। রোয়েম নিজে আত্মহত্যা

করে হিটলারকে তাঁর আত্মহত্যার খবর জার্মানবাসীদের মধ্যে প্রচার করার সুযোগ দিতে নারাজ। ফলে হিটলারের নির্দেশেই তাঁর সামনে ঝটিকা-বাহিনীর এক নেতার গুলিতে রোয়েমকে সে কক্ষেই মৃত্যুবরণ করতে হল। জেনারেল শ্লীসার ও তাঁর স্ত্রীকে একইভাবে হিটলারের নির্দেশে হত্যা করা হল। হত্যা করা হল হিটলারের পরমবন্ধু গ্রেগর ষ্ট্রেসারকে (Gregor Strassor)।

হিটলার তাঁর বন্ধু রুডলফ হ্যাস ও তাঁর অন্যান্য জেনারেলরা জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে লাগলেন যে রোয়েম, শ্লীসার ও গ্রেগর ষ্ট্রেসার এঁরা সকলেই হিটলারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, যাতে হিটলারকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে পারেন। হিটলার তাঁর অপূর্ব বাগ্মীতাবলে জার্মানবাসীদের মনের ওপর তাঁর বিরুদ্ধে রোয়েম, শ্লীসার ও গ্রেগরের ষড়যন্ত্রের বিষয় সত্য বলেই প্রতীয়মান করলেন। তিনি জার্মানবাসীদের আরও বুঝালেন যে, রোয়েম জার্মান ঝটিকা বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে 'হোমোসেক্সচুয়াল'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। অতএব স্বদেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে হিটলার রোয়েম, শ্লীসার ও গ্রেগরের ওপর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন।

Kornand Heiden তাঁর One Man Against Europe গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "Later on, in Reichstag (13th July, 1934) Hitler mentioned that Roehm had conspired with Schleicher and Strassor to start an armed rebellion and that Hitler himself was to have been murdered." তবে এর মধ্যে সত্যতা কতটুকু ছিল তা বলা মুস্কিল। কেন না হিটলারের বিরুদ্ধে এঁদের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিটলার নিজেও দিতে পারেন নি। শুধু সন্দেহের বশে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন এই আশঙ্কায় হিটলার ১৯৩৪ সালের ২৯শে ও ৩০শে জুনের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক জার্মানীর ক্ষমতাবান লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন।

টয়েনবি একদিকে যেমন হিটলারের সাংগঠনিক প্রতিভার, তাঁর পাণ্ডিত্যের ও অপূর্ব বক্তৃতা দানের ক্ষমতার কথা সবিস্তারে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে হিটলারের এ রকম নিষ্ঠুর আচরণকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তাই ১৯৩৪ সালের জুন মাসে হিটলারের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা তিনি তাঁর এক পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই লেখার কিছু অংশ সুইস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, "The shockingness of these events of 29th June—30th June, in West European eyes was indeed manifold. It was indeed shocking to see the head of a state—even when he was the leader of a recently victorious revolutionary movement—shooting down his own former henchman in the style of a American Gangster."

সত্যি কথা বলতে কি রোয়েম, শ্লীসার ও গ্রেগরের হত্যাকাণ্ড হিটলারের জীবনে

দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে। যাঁদের হাত ধরে তিনি জার্মানীর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদেরই তিনি একে একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন।

হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অষ্ট্রীয়াতেও ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট পার্টির আধিপত্য দেখা দিয়েছিল। অষ্ট্রীয়ার পার্লামেন্টের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য হিটলার সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার ডলফাসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করলেন। কেন না তিনি তাঁর সমকক্ষ ক্ষমতাবান কাকেও অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার পদে রাখতে রাজি নন। অথচ এই ডলফাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে হিটলার অষ্ট্রীয়ায় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের ক্ষমতা খর্ব করে সেখানে নাৎসী দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৪ সাল হিটলারের ষড়যন্ত্রের ফলে অষ্ট্রীয়ান চ্যান্সেলার ডলফাস নিহত হন। তারপর অষ্ট্রীয়াকে জার্মানীর অধীনে আনা হল। হিটলারের এতদিনের স্বপ্ন সফল হল।

হিটলার তাঁর নিজের পথের কাঁটা তুলতে গিয়ে যেসব হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিলেন তাতে জার্মানীর সুধীসমাজও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হিটলার মনে মনে স্থির করে রাখলেন হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর তিনি জার্মান রাইখের প্রেসিডেন্টের নির্বাচন পদ্ধতিও পরিবর্তন করবেন। কেন না হিটলার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে তাঁর পক্ষে রাইখের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব।

জার্মান যুবসম্প্রদায় এইজন্য হিটলারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। হিটলারই একমাত্র নেতা যিনি জার্মানীর ঘোর অর্থনৈতিক দুরবস্থার হাত থেকে জার্মানবাসীকে মুক্ত করার জন্য সুচিন্তিত পথের সন্ধান দিতে লাগলেন। জার্মানীতে সূত্রপাত হল নবজাগরণের। যা প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ ও ভাইয়েমার সাধারণতন্ত্রের কর্মকর্তারা এতদিন ধরে শত চেষ্টাতেও করতে পারেন নি। বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকেই হিটলার দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে দেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তাঁদের দলের কাগজে ভাইমার সাধারণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে ধরতে লাগলেন। জার্মানীর যুবসম্প্রদায় এমনকি জার্মানীর বিদ্বৎজনও হিটলারকে তাঁদের সমর্থন জানালেন।

হিণ্ডেনবার্গ তখন পঙ্গু অবস্থায় রোগশয্যায় মৃত্যুর দিন গুণছেন। নানান রকম ভেবেচিন্তে হিণ্ডেনবার্গের শরীরের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ ১লা আগষ্ট হিটলার মন্ত্রীসভার একটি জরুরী অধিবেশন ডাকলেন এবং উক্ত অধিবেশনে জার্মান রাইখের মন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের দিয়ে একটি বিল পাশ করিয়ে নিলেন। শীঘ্রই উক্ত বিল আইনে পরিণত করা হল। স্থির হল হিটলার নিজেই রাইখের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং তার জন্য কোন নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না।

হিটলার সুকৌশলে সাধারণ নির্বাচনের সব বিধিনিষেধ ধূলিসাৎ করে দিলেন। হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার একাধারে জার্মানীর চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হলেন। পরে নাম গ্রহণ করলেন ফ্যুরার বা লীডার। জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। বিশ্ববাসী বিষণ্ণদৃষ্টিতে জার্মানীর দিকে দৃষ্টি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বের সেরা ডিক্টেটর। হিটলার ঘোষণা করলেন—'One Nation, One Reich, One Fuhrer ?"—এক জাতি, এক রাইখ, এক নেতা। হিটলার জার্মানবাসীদের কাছে ভগবানের প্রতিভূ বলে প্রতীয়মান হতে লাগলেন। হিটলার জার্মানীর পঙ্গু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। জার্মানী যেন নবজীবন লাভ করল। 'Hitler in the eyes of his admirers was a prophet, exalted as 'the chosen of God' 'One no longer sees Hitler, but those sixtyfive millions whose minds he has stirred to the joy of renaissance.'

জার্মানীর ৬৫ লক্ষ লোক নবজাগরণের আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। হিটলার এবার আরও জোরালো যুক্তিতে ইহুদীদের কুকর্মগুলিকে বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জার্মানবাসীদের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। ভাইমার রিপাব্লিকের দোষ-ক্রটির কথা উল্লেখ করে বিখ্যাত লেখক টমাসম্যান তাঁর পুত্রকন্যার কাছে যে চিঠি দেন তাতে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন যে ভাইমার রিপাব্লিকের পতনের মূলে জার্মান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দায়িত্বও রয়েছে। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিটলারকে জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

লোকার্ণো চুক্তিতে ১৯২৫ সালে জার্মানীকে লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল সত্য কিন্তু হিটলারের বুঝতে এতটুকু ভুল হয়নি যে লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ লাভ করে জার্মানী বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির অঙ্গুলী হেলনেই লীগের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। অতএব সেখানে জার্মানীর সদস্য হিসেবে থাকা না থাকা সমান।

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর ওপর যে সমস্ত সর্ত আরোপ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল জার্মানী এক লক্ষের বেশী সৈন্য রাখতে পারবে না, তদুপরি জার্মানীর রণতরীর সংখ্যাও সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল। হিটলার লীগ অব নেশনসের এই সমস্ত নীতির কঠোর সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। হিটলার দাবী করলেন অন্যান্য জাতির মত তাদেরও রণসম্ভার বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দিতে হবে। লীগ অব নেশনস্ এতে সম্মতি দিল না। হিটলার লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। ১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করলেন, জার্মানীও ইউরোপের অন্যান্য জাতির ন্যায় রণসম্ভার বাড়িয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে তিনি অন্য কারও কথাই কর্ণপাত করতে নারাজ।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষার আয়োজন করলেন। জার্মানী যাতে নব নব অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে তার ব্যবস্থা

করলেন। ১৮।১৯ বছরের জার্মান ছেলেদের নিয়ে তিনি এক বিরাট যুব-সংগঠন গড়ে তুললেন। দেখতে দেখতে জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। রণতরী, অস্ত্রশস্ত্র, বিমানবহর—সবদিক থেকে জার্মানীর অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হল। জার্মানীর বিমানবহর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমানবহরে পরিণত হল। জার্মানীর রণসম্ভার বৃদ্ধিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

যুদ্ধঋণ হিসেবে ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর ওপর যে বিরাট টাকার বোঝা চাপিয়ে ছিল হিটলার সে ঋণ দিতে অস্বীকার করলেন। ভার্সাই সন্ধির সর্ত একের পর এক তিনি অমান্য করতে লাগলেন। রাইন অঞ্চলে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করলেন। সার ভ্যালি গণভোটের মাধ্যমে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। এইভাবে তিনি ইউরোপের অন্যান্য শক্তিকে উপেক্ষা করে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে চললেন। জার্মানীর অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হল। কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা, শিল্প সবকিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর জাতীয় জীবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হল রাষ্ট্র। 'In fact, National Socialism has created war economy, subjecting the entire social and economic fabric to Govt. regulations."—I knew Hitler– by G. W. Ludeke (P-692)

ফলে শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হতে লাগল। অবশ্য তারা যাতে নাৎসী দলের সমর্থক হিসেবে কাজ করে তার জন্য জোর প্রচারকায চালানো হতে লাগল। ভাইমার রিপাব্লিক জার্মানির শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল সত্যি কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পথ নির্ধারণ করার কোন প্রচেষ্টা তারা প্রথম থেকেই চালাতে পারেনি। ১৯২৫ সালে হিণ্ডেনবার্গ এসেও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন করতে পারলেন না। জার্মানীর শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকের জন্য সামাজিক বীমা চালু করা হল। অল্প টাকায় তাদের সরকার থেকে বাড়িঘর দেবার ব্যবস্থা করা হল। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য দেবার ব্যবস্থাও তাদের জন্য করা হল সরকার থেকে। শ্রমজীবীদের জন্য মাহিনাসহ ছুটির ব্যবস্থা করা হল। প্রয়োজনবোধে নাৎসী সংগঠন থেকেও তাদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হতে লাগল। তাদের জন্য অল্প খরচে জার্মানীর বাইরে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হল। গঠন করা হল নাৎসী পরিচালিত সেবার ফ্রন্ট—'the largest labour organisation of the world.' 'National Socialism is as genuine Socialism as it is genuine Nationalism.'

জার্মান ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক লাভ করে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে না পারে হিটলার সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিলেন। ইহুদি পরিচালিত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা স্থাপন করা হল। প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল এইসব কলকারখানায়। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ফলে কি কৃষি, কি কলকারখানায় উৎপাদন

বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। লোকে কথায় বলে, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'। হিটলারের অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও পরিচালনা গুণে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জার্মানীর অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠল। জার্মানীতে তৈরী হতে লাগল প্রচুর সমরোপকরণ।

'In fact, the world has never seen two supposed hostile economic and social systems more alike in essentials, both of practice and ideology, than National Socialism and Communism.'—I knew Hitler —by G W Ludeke.

হিটলারের আগ্রাসী নীতি

হিটলার এবার জোর দিলেন জার্মান অধ্যুষিত এলাকাগুলি দখল করার দিকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুলাই হিটলারের গোপন নির্দেশে অস্ট্রীয়ার চ্যান্সেলর ডলফাসকে প্রায় ২৫০ জন এস. এস. বাহিনীর লোক অস্ট্রীয় সৈনিকের ছদ্মবেশে হত্যা করেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে হিটলার অস্ট্রীয়াকে জার্মানীর অধিকারভুক্ত করতে পারেন নি।

ডঃ সুশিনগের নেতৃত্বে অস্ট্রীয় সৈন্যরা এক নূতন সরকার গঠন করল। গ্রেপ্তার করা হল এস. এস. বাহিনীর অনেক লোককে, যারা ডলফাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। ডলফাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মূলে যে হিটলার একথা চারিদিকে প্রচারিত করার সঙ্গে সঙ্গে হিটলার একটু থমকে দাঁড়ালেন। ডলফাসের মৃত্যুর জন্য মায়াকান্না কাঁদলেন। ইতালীর ফ্যাসিস্ত নায়ক মুসোলিনীও এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলেন।

হিটলার একটু ভীত হলেন। তিনি ভাবলেন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে। তাঁর মনে উদিত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 'সিরাজিভোর' ঘটনা। ডলফাসের মৃত্যুকে 'সিরাজিভোর' সঙ্গে তুলনা করলেন। তবে তিনি ক্ষণিকের জন্য থমকে গেলেও ভেতরে ভেতরে অস্ট্রীয়া দখলের পরিকল্পনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী, সমরাস্ত্র ইত্যাদি বহুগুণ বাড়িয়ে নিলেন।

হিটলার হঠাৎ ঘোষণা করলেন জার্মানীর মোট সৈন্যসংখ্যা হবে পাঁচলক্ষ। সমস্ত ইউরোপ হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে উঠল। লীগ অব নেশনস্ তার সদস্যদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য হিটলারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারল না। হিটলার ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন যে তাঁকে দমন করার মত ক্ষমতা লীগ অব নেশনসের নেই।

তবে চতুর হিটলার চারদিকে প্রচার করতে লাগলেন যে তিনি শান্তিপ্রয়াসী। কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। জার্মানীর শান্তির প্রয়োজন। তাই শান্তি বজায় রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। হিটলারের এরকম ফাঁকা বুলিতে ব্রিটেন বিশ্বাস স্থাপন করল।

১৯৩৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার হিটলার একটি ইংরেজ দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন যে ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তি যে সব দেশ জার্মানীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেগুলো জার্মানীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পোল্যাণ্ডের ডানসিস ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর অংশ। ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তি এই অঞ্চল জোরপূর্বক কেড়ে নিয়েছিল। তৈরী করা হল পোলিশ করিডর। হিটলার বললেন, "This corridor was a disgraceful injustice. and must be restored to Germany."

হিটলারের মত এরকম স্বরে কেউ ইতিপূর্বে জার্মানীর হয়ে কথা বলেননি। কেউ জার্মানীর স্বার্থের জন্য এরকম আন্তরিকতার সঙ্গে চিন্তা করেননি। ফলে হিটলারের ওপর জার্মানবাসীর বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের বিদেশ-মন্ত্রী সদম্ভে ঘোষণা করলেন "Frontiers are not changed by words." পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। জার্মানীর প্রতিরক্ষা ব্যাপারে পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করা একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। হিটলার তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি।

যখন জার্মানীতে প্রজাতন্ত্রী সরকার অর্থাৎ ভাইমার রিপাব্লিক গঠিত হয়েছিল তখন এই রিপাব্লিকের কর্ণধার ছিলেন এবার্ট। তিনি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে হিটলার এই সন্ধির সূত্র ধরে এটাকে আরও দশ বৎসরের জন্য বাড়িয়ে নিলেন। এই সন্ধিতে স্থির হয়েছিল যে জার্মানী বা পোল্যাণ্ড কেউ কারও বিরুদ্ধে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না। দুদেশের মধ্যে কোন বিরোধের কারণ ঘটলে তা তারা নিজেরাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে নেবে। উভয় রাষ্ট্রই এই সন্ধিতে নিজ নিজ স্বার্থে বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করার সংকল্প গ্রহণ করল।

অবশ্য হিটলার ভেতরে ভেতরে অন্যরকম মতলব আঁটতে লাগলেন। তা কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না। "Of the small states he (Hitler only says derisively that Germany would not be their Policeman. Czechoslovakia and 'inferior' Poland, he looks on as in themselves not capable of an alliance."—Rudolf Olden. হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি লীগ অব নেশনস্ বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ফ্রান্সই একমাত্র রাষ্ট্র যে বারবার হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে সন্দেহের চোখে দেখতো। লীগ অব নেশনস্‌কে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু লীগের অন্যতম সদস্য আমেরিকা ও ইংলণ্ড কেউ হিটলারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক ছিল না।

আমেরিকা 'মনরো ডকট্রিন' অনুযায়ী আমেরিকার বাইরে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন 'লীগ অব নেশনস্' স্থাপনের মূল প্রবক্তা হয়েও আমেরিকার সিনেটের নির্দেশে তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে নাক গলাতে পারলেন না। লীগ অব নেশনস থেকে আমেরিকা সরে এলো।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ১৯২৫ সালে লোকার্ণো চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীকে লীগ অব নেশনস্-এর সদস্যভুক্ত করা হল। জার্মানী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেরও অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হল। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের এক ভাষণে হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে, অন্যান্য দেশ যখন অস্ত্রসম্বরণ করছে না তখন শুধু জার্মানীর ক্ষেত্রেই বা কেন এ নীতি প্রয়োগ করা হবে। ইংলণ্ড নিজের স্বার্থেই জার্মানীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করেছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইংলণ্ড 'বণিকের' জাত। ব্যবসায়ী চিন্তাধারা নিয়ে সে চলে। অতএব ইংলণ্ড বুঝতে পারল জার্মানীর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হলে ইংলণ্ড তার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ফ্রান্স ইংলণ্ডকে প্রস্তাব দিল হিটলার যাতে জার্মানীতে আর অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সঙ্গে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইল। কেননা হিটলার যে কোন সময় ফ্রান্সের বিপদের কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সাহায্য ফ্রান্সের বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন হবে। তাই ফ্রান্স নিজের বিপদের সময় ইংলণ্ডের সাহায্যপ্রার্থী।

ইংলণ্ড ফ্রান্সের এই প্রস্তাবে সায় দিতে রাজী হল না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরকে (Daladier) স্পষ্টভাষায় বলে দিলেন, "If Hitler made an agree-ment, he might even feel inclined to honour it ... His signature like no other Germans in all her past"—A. J. P. Taylor.

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। কেননা ফ্রান্স বুঝতে পারল ইংলণ্ড জার্মানী অর্থাৎ হিটলারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নারাজ। ইংলণ্ড তার দেশের জনগণের দোহাই দিয়ে ফ্রান্সকে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গেলে ইংলণ্ডের সাধারণ লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

এরপর ইতালীর প্রস্তাব অনুযায়ী জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী—এই চারটি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। "To set themselves up as an European Directory."

কিন্তু এই চুক্তি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডকে পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে চিন্তিত করে তুলল। ১৯২২ সালের সন্ধি (Treaty of Rapallow) অনুযায়ী জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সে চুক্তি তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল, তবুও রাশিয়া এই চার রাষ্ট্রের চুক্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

সুচতুর হিটলার ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর মনে এ ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি কেবল নিজের দেশ জার্মানী থেকে কম্যুনিজমকে উৎখাত করতে সচেষ্ট নন, তিনি রাশিয়া থেকেও কম্যুনিজমকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। হিটলারের রাশিয়ার ইউক্রেনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। হিটলারের এই চিন্তাধারাতে ইতালী ইংলণ্ড এমনকি ক্ষণিকের জন্য হলেও ফ্রান্সের মনে একটা আশার সঞ্চার হলো। হিটলারকে সমরাস্ত্র বাড়াতে দেখেও তারা চুপচাপ রইল। Rudolf Olden তাঁর 'Hitler' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "Since in Hitler's opinion, 'the international Jew is today the sole ruler of Russia, it is doomed to collapse."

ইতালীর সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারে হিটলারকে প্রথমে বেশ একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। হিটলার জার্মানীর স্বার্থে অস্ট্রীয়ার অবলুপ্তি ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইতালী এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কেননা অস্ট্রীয়া ছিল ইতালীর 'বাফার এষ্টেট'। সুতরাং অস্ট্রীয় চ্যান্সেলার ডলফাসের আততায়ীর হাতে মৃত্যু ইতালীকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তাই হিটলার যখন অস্ট্রীয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া জোরপূর্বক জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তখন মুসোলিনী অস্ট্রীয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভেতরে ভেতরে সাহায্য করেছিলেন। "Mussolini encouraged the Czechs to become communists in the autumn of 1939 in order to make things difficult between Moscow and Berlin"

১৯৩৫ সালে ইতালী আবিসেনিয়া আক্রমণ করে। লীগ অব নেশনসের সদস্যরা এ আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু :মূলত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য ইতালীর বিরুদ্ধে লীগ কোন ব্যবস্থা নিতে পারল না।

১৯৩৫ সালের ১লা মে, আবিসেনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি স্বীয়রাজ্য থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এক সপ্তাহের মধ্যেই মুসোলিনী নতুন রোম সাম্রাজ্যের সীমানা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন। হিটলাব ইতালীব আবিসেনিয়া দখলের ঘটনা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর এখন আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে লীগ অব নেশেনস্ হচ্ছে একটি 'কাগুজে বাঘ'। জোরপূর্বক কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্র দখল করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা লীগের নেই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor যথার্থই বলেছেন, The real death of League was in December, 1935, not in 1939 or 1945.

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে দেখা দেয় একটি অনিশ্চয়তার ভাব। Collective Security বা সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা ফাঁকা আওয়াজ বলে প্রতীয়মান হতে থাকে চেম্বারলেন এবং চার্চিলের Collective Security সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা বস্তুতপক্ষে বিলফতায় পর্যবসিত হতে লাগল।

হিটলার ইতালীর আবিসেনিয়া দখলের জন্য মনে মনে পুলকিত। লীগের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে তিনিও স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে মিত্রশক্তি জার্মানীর যেসব জায়গা ভার্সাই সন্ধির সর্তানুযায়ী জোরপূর্বক দখল করেছে সেগুলো এক এক করে উদ্ধার করে নেবেন। যদিও বা এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে আপাতত কিছু তিনি বলতে চাইলেন না।

হিটলার এর মধ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে Anglo-German Naval Treaty স্থাপন করে জার্মানীর নৌবাহিনীকে সজ্জিত করার কাজে লেগে গেছেন। Conscription চালু করে দেশের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। সবদিক থেকে জার্মানীকে হিটলার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন। জার্মানী তার প্রায় ১৬·৮% টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিল সমরাস্ত্র তৈরি ও জার্মানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাস। হিটলার ফ্রান্সের হাত থেকে রাইন অঞ্চল মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সে সময় ফ্রান্সে ভোটের ব্যাপারে সব রাজনীতিবিগদ্ণ ব্যস্ত। হিটলার ভালোভাবে সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অগ্রসর হলেন। এটা তিনি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারলেন যে ফ্রান্সের পক্ষে সে সময়কার পরিস্থিতিতে হিটলারকে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না।

হিটলারের ছিল অপরিসীম মনোবল আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কেননা তখনো পর্যন্ত জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা বা সমরাস্ত্র এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি যার ওপর ভিত্তি করে তারা এত তাড়াতাড়ি জার্মান অধ্যুষিত জায়গাগুলি মিত্রশক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

হিটলালের প্রচারের জোরে মিত্রশক্তি অনুভব করতে লাগল যে সত্যি সত্যি হিটলার জার্মানীকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলেছেন। তিনি বাহুবলে জার্মান অধ্যুষিত জায়গাগুলি মিত্রশক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন। এখানেই রয়েছে হিটলারের বৈদেশিক নীতির সফলতা। সময় ও সুযোগের সৎব্যবহার করা প্রকৃত রাজনীতিবিদের পরিকল্পনা সাফল্যের চাবিকাঠি। যা হিটলারকে জার্মানীতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। A. J. P. Taylor হিটলার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, "It was never Hitler's method to take the initiative He liked others to do his work for him and he waited for the inner weakening for European system, just as he had waited for the peace settlement to crumble of itself."

ফ্রান্সের সে সময়কার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং রাইন অঞ্চলে বসবাসকারী জার্মান অধিবাসীদের ওপর গোপনে এবং কূটকৌশলে প্রভাব বিস্তার করে হিটলার রাইন অঞ্চল ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্ত করে নিলেন।

জার্মানীর রাইন অঞ্চল পুনর্দখল বাস্তবিকপক্ষে মিত্রশক্তির সমষ্টিগত নিরাপত্তার (Collective Security) মূলে কুঠারাঘাত করল। এর মধ্যে ইউরোপের রাজনীতির

গতি আবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ১৯৩৬ সালে ১৬ই জুলাই, স্পেনে আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধের নেতা ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। ইনি হিটলারের গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হলো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শাসন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স কিম্বা রাশিয়া স্পেনের ব্যাপারে নাক গলাতে এল না।

ইতালীর শাসনকর্তা মুসোলিনী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ইউরোপে ইতালী বন্ধুহীন হয়ে পড়ল। স্পেনে ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তিত হল। উপায়ান্তর না দেখে মুসোলিনী হিটলারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হলেন, নিজের দেশের নিরাপত্তার তাগিদে। হিটলারের কাছে মুসোলিনী তাঁর জামাই কাউন্ট গ্যালেজা সিয়ানা এবং ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠালেন। হিটলারও মুসোলিনীর সঙ্গে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিত্রতা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন।

মুসোলিনীর জামাতা ও ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিটলারের সঙ্গে তাঁর ব্রেখটস-গ্যাডেনের বাড়িতে দেখা করলেন। হিটলার তাঁদের অতি সমাদরে গ্রহণ করলেন। মুসোলিনীকে হিটলার ইতালীর শ্রেষ্ঠসন্তান বলে উল্লেখ করলেন। মুসোলিনীর বিবিধ গুণাবলীর প্রশংসা করলেন। হিটলার উল্লেখ করলেন যে ইতালী ও জার্মানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা কেবল সোভিয়েত শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হবে না, তাঁরা পশ্চিম ইউরোপেও তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। হিটলার তাঁদের বললেন জার্মানীর সমরাস্ত্র তৈরির ও সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধির কাজ তিন বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। ইতালীও যেন সেইভাবে প্রস্তুতি নেয়—এই কথা হিটলার সিয়ানাকে বলে দিলেন।

মুসোলিনী অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন। এর সঙ্গে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে ইতালীয় আধিপত্য বিস্তার করতে ফ্রান্সের কাঁধে বন্দুক রেখে আর হিটলার ইতালীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার্মানীকে ইউরোপে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন।

'Hitler intended to make Germany the leading power in Europe, with Italy as, at best, a Junior partner." যদিও বা তখনো পর্যন্ত দুজন দুজনকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারতেন না তবুও উভয়ের স্বার্থেই তাঁরা তখনকার মত একটা রফায় এসেছিলেন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে স্থাপিত হল 'রোম-বার্লিন' চুক্তি। এরপর থেকে ইউরোপের রাজনীতির গতি একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হতে থাকল। কোন সময় কার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জার্মানীর স্বার্থে এগিয়ে যেতে হবে সে ব্যাপারে হিটলারের বিরাট দূরদৃষ্টি ছিল।

একই নীতিতে হিটলার জাপানের সঙ্গেও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। যদিও বা বাস্তব দিক থেকে হিটলার জাপানের চীন আক্রমণকে সমর্থন জানাতে পারেননি। অবশ্য প্রকাশ্যে হিটলার এই ব্যাপারে কোন উক্তি করেননি। হিটলার ছিলেন অসামান্য কূটকৌশলী, যেটা প্রকৃত রাজনীতিবিদের থাকা একান্ত কর্তব্য।

হিটলার জাপানকে রাশিয়া ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

জাপান জার্মানীকে সুদূর প্রাচ্যের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে দিতে নারাজ। এশিয়া-খণ্ডে ক্ষুদ্র জাপানই ছিল একমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র। বুদ্ধি, বিবেচনা এবং রণনৈপুণ্যে জাপান ছিল সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয়।

নানা চিন্তা ভাবনা করে হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন যে জাপানের সঙ্গে এমন একটি সর্তে চুক্তি করতে হবে যেটা 'জাপান ও জার্মানী' উভয় রাষ্ট্রকেই সমভাবে সন্তুষ্ট রাখতে পারে।

হিটলার তার প্রধান উপদেষ্টা রিবেনট্রপের পরিকল্পনামত জাপানের সঙ্গে স্থাপন করলেন Anti-Comminterin Pact এই চুক্তিতে স্থির হল যে জার্মানী ও জাপান বিশ্বের কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করা যাবে। এই চুক্তি কেবলমাত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে করা হয়নি, করা হয়েছিল বিশ্বের সমস্ত কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে। তাই এটাকে Anti Russian Pact বলা চলে না।

পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে রাশিয়া আক্রমণ করেছিল জার্মানী একা। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল এই চুক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধেই করা হয়েছিল। এই চুক্তি রাশিয়াকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলল। কেননা এই চুক্তির ফলে যে কোন সময় জার্মানী একা কিংবা জাপান ও জার্মানী সমবেতভাবে রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে। যার পরিণতি রাশিয়ার পক্ষে মারাত্মক হতে বাধ্য।

জাপান ও জার্মানীর মধ্যে এই চুক্তি কেবলমাত্র রাশিয়াকে ভাবিয়ে তুলল না, ভাবিয়ে তুলল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সকেও। ফ্রান্স অনেক ভাবনা চিন্তা করে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। রাশিয়াকে লীগ অব নেশনসের সদস্যভুক্ত করা হল। "France made the Franco-Soviet Pact, the Western Power accepted Soviet Russia, somewhat grudgingly as loyal member of the League of Nations"

রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করে নিলে কি হবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুজনেই ভেতরে ভেতরে রাশিয়ার ভয়ে ভীত। পাছে তাদের রাজ্যে কম্যুনিজম বিস্তার লাভ করে। তাই উভয় রাষ্ট্রই রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোপনে চক্রান্ত করতে লেগে গেল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্থির করল কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে হিটলার-মুসোলিনী চুক্তিকে উভয় রাষ্ট্রই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবে। কিংবা তারা ফ্যাসিস্টদের সমর্থন করবে। কেননা তারা হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতিতে যত না ভীত তার চেয়ে তাদের বেশি ভয় রাশিয়াকে। ইংলণ্ডের জনগণের ধারণা ফ্যাসিস্টরা ইউরোপের সভ্যতাকে কম্যুনিস্টদের দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল ঘোষণা করল যে, "Better Hitler than Stalin."

১৯৩৬ সালের মে মাসের নির্বাচনে ফরাসী দেশে প্রতিষ্ঠিত হল বামপন্থী সরকার। রেডিক্যাল সোসালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অধিকসংখ্যক আসন পেল। ফ্রান্সের রক্ষণশীল দল এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করল "Not merely better Hitler than Stalin,

but better Hitler than Leon Blum." Leon Blum ছিলেন তখন ফ্রান্সের বামপন্থী নেতা। তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী।

রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির এরূপ মনোভাবের এটাই একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে অন্য কারণও বর্তমান ছিল। ১৯৩৬ সালে স্ট্যালিনের শাসনকালে রাশিয়ায় আরম্ভ হল শোধন বা বিরোচনের নামে পুরানো বলশেভিক নেতাদের ওপর অত্যাচার।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor বলেছেন, "1936 Saw the beginning of the great purge in Russia : practically every old Bolshevik leader was executed or imprisoned, thousands—perhaps millions of lesser Russians sent off to Siberia in the following year the purge extended to the armed forces."

স্ট্যালিনের শাসনকালে অনেক বলশেভিক নেতাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোককে যেতে হয়েছে সাইবেরিয়ার Concentration Camp-এ। এর পর সেনাবাহিনীতে শোধনের নাম করে সামরিক বাহিনীর অনেক মার্শাল ও বড় বড় অফিসারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

স্ট্যালিন কি তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করেই এরূপ নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড চালালেন? কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন স্ট্যালিন হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে ভেতরে ভেতরে সেনাবাহিনীর কেউ কেউ এবং পুরাতন বলশেভিক নেতাগণ স্ট্যালিনের শাসনের বিরুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কর্ণাড হিয়েডেন তাঁর 'One Man Against Europe' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "In the so-called sabotage trials in Russia from 1936 to 1938 the highest Soviet officials confessed that they had been in the service of foreign espionage." অবশ্য তিনি এরপরই আবার বলেছেন, "We cannot yet decide what is literally true in these confession but it is most probable that subterranean National Socialist propaganda has penetrated deep into the vital centres of the Soviet Union."

ঐতিহাসিকদের এই সমস্ত মতামত থেকে একটি কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্ট্যালিন রাশিয়ার স্বার্থের কথা চিন্তা করেই রাশিয়ার এরূপ অনেককেই তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। বিনা কারণে তিনি এরকম নিষ্ঠুরতার পথ গ্রহণ করেননি। রাশিয়াকে গভীর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি এই পথ গ্রহণ করেছিলেন।

এর পর থেকে কিন্তু সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা আর কেউ রাশিয়াকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে নারাজ। "Nearly every western observer was convinced that Soviet Russia was useless as an ally—"A. J. P. Taylor.

পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি বিশেষত ইংলণ্ডকে হিটলার তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে প্রকৃত সাহায্য করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হিটলার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন জার্মানী ও অস্ট্রীয়া এক এবং অভিন্ন। হিটলারের জন্মভূমি ছিল অস্ট্রীয়া। হিটলার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রীয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা চিন্তা করেও ইতালীর বিরাগভাজন হতে হবে এই ভয়ে তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করেন। এখন ইতালীর মুসোলিনী হিটলারের হাতের মুঠোয়। অতএব নিশ্চিন্তমনে হিটলার অস্ট্রীয়ার ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে গেলেন।

অস্ট্রীয়ার তদানীন্তন সামরিক শাসনকর্তা ডঃ সুশিনগকে হিটলার ডেকে পাঠালেন। এর মধ্যে হিটলারের প্ররোচনায় অস্ট্রীয়ার নাৎসীদল হিটলারের স্বপক্ষে অস্ট্রীয়াতে এক বিপুল আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তারা চায় অস্ট্রীয়া যেন অবিলম্বে জার্মানীর সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সাল, সুশিনগ তাঁর পারিষদবর্গসহ হিটলারের তলব পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তাঁর ব্রেখটসগ্যাডেনের বাড়িতে। সুশিনগ প্রথমে ভেবেছিলেন যে হিটলার হয়ত একটি শান্তিপুর্ণ আলোচনার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হিটলার সুশিনগকে অস্ট্রীয়ার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব সবিস্তারে বললেন। সুশিনগ হিটলারের কথা শুনলেন ঠিকই কিন্তু তিনি জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রীয়ার সংযুক্তির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট মতামত দিতে পারলেন না। হিটলার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সুশিনগকে বিশ্বাসঘাতক বলতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করলেন না। সুশিনগ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

সুশিনগকে হিটলার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুসোলিনী এখন তাঁর আজ্ঞাবহ। আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অস্ট্রীয়াকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। এই অবস্থায় সুশিনগ কি করবেন? হিটলার সুশিনগকে বলেছিলেন যে তিনি সেইদিনই তাঁর সঠিক উত্তর পেতে চান। সুশিনগ সম্মতি না দিলেও হিটলার যে অনতিবিলম্বে অস্ট্রীয়া দখল করে নেবেন তাও বলে দিলেন।

১০ই মার্চ, সুশিনগকে অস্ট্রীয়ার পুলিশবাহিনীর প্রধান খবর দিলেন অস্ট্রীয় সীমান্তে জার্মান সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রিবেনট্রপের মাধ্যমে হিটলার সুশিনগকে চ্যান্সেলার পদ ছেড়ে দিতে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। এই পত্রে হিটলার আরও উল্লেখ করেছেন যে অস্ট্রীয়ার চ্যান্সেলারের দায়িত্ব যেন ভিয়েনার হিটলারের গুণমুগ্ধ ও সমর্থক রাজনীতিবিদ সেইশ-ইনকার্টের হাতে তুলে দেন। সময় দিচ্ছেন মাত্র দুঘণ্টা।

অস্ট্রীয়ার নাজি সমর্থকরা ভিয়েনার রাস্তায় নেমে পড়েছে। হিটলারের নামে জয়ধ্বনিতে রাস্তাঘাট মুখরিত করে তুলেছে। সুশিনগকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্য স্লোগান দিতে দিতে তারা ভিয়েনার রাস্তা পরিক্রমা শুরু করল। এসব সত্ত্বেও সুশিনগ অস্ট্রীয়ার প্রেসিডেন্ট 'মিক্লাসের' দৃঢ়তার জন্য পদত্যাগ করলেন না।

ছুলি-

মিকলাস ঘোষণা করলেন, প্রাণ থাকতে তিনি অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর হাতে তুলে দেবেন না। 'রেইশ-ইনকার্টকে' তিনি কুইজলিং বলে সম্বোধন করলেন। ক্রোধে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু মিকলাসের সীমিত শক্তিতে হিটলারকে বাধা দেওয়া যে অসম্ভব—তা তাঁর বুঝতে বেশি সময় লাগল না।

১৩ই মার্চ, রাত ৮-৪৫ মিঃ। হিটলারের নির্দেশে জার্মান বাহিনী ভিয়েনায় ঢুকে পড়ল। বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়া জার্মানীর অধিকারভুক্ত হল। ইতালীর মহা-নায়ক মুসোলিনী তাঁর বিশেষ দূত মারফৎ অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে হিটলারের মনোভাবের সমর্থন করে হিটলারকে একটি বার্তা পাঠালেন।

হিটলারের মন আনন্দে ভরে গেল। হিটলারের কূটনীতির সফলতা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। হিটলার এরপর তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে।

হিটলার একটা জিনিস বুঝতে পারলেন যে তিনি যা করছেন তাতে বাধা দেবার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা রাশিয়া এমনকি আমেরিকাও আসবে না। আর ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চেম্বারলেনও ইউরোপে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এই ভয়ে হিটলারকে তোষণ করেই চলেছেন। চেম্বারলেনের এই মানসিকতার প্রতিবাদে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন পদত্যাগ করলেন। তার জায়গায় এলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স।

A. J. P. Taylor তাঁর Origin of Second World গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, "Post war ended when Germany re-occupied Rhineland on 7 March, 1936. Pre-war began when she annexed Austria on 13 March, 1938."

সামরিক দিক থেকে জার্মানীর পক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়ার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হচ্ছে চেকোশ্লোভাকিয়া। ইউরোপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত সুদেতন পর্বতের পাদদেশে সুদেতন অঞ্চলে বাস করতো প্রায় ৩২ লক্ষ জার্মান। যাদের বলা হতো সুদেতন জার্মান।

হিটলারের পঁচিশদফা কর্মসূচীর অন্যতম ছিল ইউরোপের সমস্ত জার্মানভাষী লোকদের এক রাষ্ট্রের অধীনে আনা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে তাদের নিয়ে এক বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা। ক্রমবর্ধমান জার্মানভাষীর জন্য ইউরোপ থেকে অতিরিক্ত স্থান জার্মানীর অধিকারে আনা ইত্যাদি। তদুপরি চেকোশ্লোভাকিয়াকে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে জার্মানীর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। "He (Hitler) was also concerned in more practical terms, to remove well-armed Czechoslovakia, allied to France and Soviet Russia, raised against German Hegemony"—A. J. P Taylor.

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮ হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্য সেনানায়কদের ডেকে পাঠালেন। ডেকে পাঠালেন সেনাধ্যক্ষ কাইটেলকে। সেনানায়কেরা একবাক্যে বললেন যে জোরপূর্বক চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার

চেষ্টা করলে সমস্ত ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। জার্মানীর হবে সমূহ বিপদ।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে কূটনীতিবিদ হিটলার সেনানায়ককে জানিয়ে দিলেন তিনি জোরপূর্বক এই রাজ্য দখল করতে চান না। তবে তিনি সুদেতেন জার্মানদের জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তা তিনি করতে চান শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে। হিটলার বাইরে কাউকেও কিছু বুঝতে দিলেন না কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। হিটলার সুকৌশলে সুদেতেন জার্মানদের মনে জার্মান জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হলেন। হিটলার ভালোভাবেই জানতেন যে মানুষের মনে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগিয়ে দিতে পারলে সে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ যে কোন উপায়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এগিয়ে যাবেই। তার গতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। "Men are not wise when they hear the call of nationalism."

হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের চিন্তাকে তাঁর সেনাপতিরা মেনে নিতে পারলেন না। এ ব্যাপারে প্রথমে হিটলারের বিরোধিতা করলেন জেনারেল লাড-উইক বেক। সৈন্যবাহিনীকে হিটলারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তিনি গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সঙ্গে পেয়ে গেলেন আর একজন সেনানায়ক। নাম ব্রাউচিৎস। হিটলার বেক এবং ব্রাউচিৎস-এর মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। বেককে হিটলার জেনারেলের পদ থেকে অপসারিত করলেন। তাঁর জায়গায় নিয়ে এলেন জেনারেল হালডারকে।

হালডারও কিন্তু মনে মনে হিটলারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন হিটলারকে গদিচ্যুত করতে। তিনি গোপনে হিটলারের প্রাণ সংহার করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করলেন। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের হিটলার-প্রীতি তাঁদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল।

গ্রীষ্মের শেষদিকে জার্মানীতে সমরসজ্জা পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে তিনি ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শক্তিকে যে কোন মুহূর্তে খর্ব করতে সমর্থ। ব্রিটেনের কাছে হিটলার জানতে চাইলেন যে তারা কি সুদেতেন জার্মানদের জার্মানীর অন্তর্ভুক্তিতে সম্মত আছে? তা যদি না থাকে তাহলে হিটলার যে কোন উপায়ে সুদেতেন জার্মানদের জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করবেন। হালডার ভাবলেন হিটলার যদি চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের হুকুম জারি করেন তাহলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তিনি হিটলারের জীবনের অবসান ঘটাবেন। তার আগে হালডার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব জানতে চেষ্টা করলেন।

হালডার বুঝতে পারলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কোনমতেই হিটলারের সঙ্গে সংঘর্ষে যাবেন না। চেম্বারলেন হিটলারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি জার্মানীকে সুদেতেন অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে সম্মত আছেন। তবে মন্ত্রিসভার সম্মতি ব্যতিরেকে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না।

চেম্বারলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সম্মতি নিলেন। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সম্মতি নিয়ে তাঁর মতামতও জানিয়ে দিলেন। স্থদেতন অঞ্চল জার্মানীকে ফিরিয়ে দেবার জন্ম চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের চেক সরকারকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চেক সরকার তাঁদের এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন না। ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারের ভয়ে ভীত হয়ে সরে দাঁড়ালো।

চেকোশ্লোভাকিয়া এখন সমগ্র বিশ্বে একা। অন্য কোন উপায় না দেখে চেক সরকার রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করল। রাশিয়াও করল তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তারা চেক সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ফ্রান্স চেক সরকারের সাহায্যের জন্য এগিয়ে না এলে তারাও চেক সরকারের সাহায্যে আসতে পারবে না। কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটেন আগেই সরে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে চেক প্রধান-মন্ত্রী বেনেস (Benes) অসহায়বোধ করতে লাগলেন। তিনি পদত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি বলে গেলেন চেকরা বরাবরই এভাবে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে।

অন্যদিকে হিটলার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানতে চেয়ে আবার একটি জরুরী তারবার্তা পাঠালেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করলেন ২২শে সেপ্টেম্বর এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য চেম্বারলেন যেন 'গোডেসবার্গে' হিটলারের বাসভবনে উপস্থিত থাকেন।

চেম্বারলেন হিটলারকে উত্তরে তাঁর সম্মতি জানালেন। ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর গোডেসবার্গে হিটলারের বাসবভনে চেম্বারলেন ফ্রান্স-এর প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল হিটলারের। হিটলার এদিকে চেক সীমান্তে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করে রেখেছেন। "He meant to succeed by intrigue and the threat of violence and not by violence itself."

ইতালীর কর্ণধার মুসোলিনী হিটলারের মনোভাব সমর্থন করে তাঁকে চিঠি পাঠালেন। তিনি হিটলারকে অনুরোধ করলেন হিটলার যেন চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তার শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আর কিছুদিন অন্তত অপেক্ষা করেন। হিটলার তাতে সম্মত হলেন।

এরপর হিটলার আবার চেম্বারলেনকে চরমপত্র দিলেন। তিনি চেম্বারলেনকে জানালেন ১লা অক্টোবরের মধ্যে স্থদেতান অঞ্চল তার চাই। তা না হলে তিনি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এবার চেম্বারলেন একটু কড়াস্বরে হিটলারকে জবাব পাঠালেন যে, হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে তার সাহায্যার্থে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে এগিয়ে আসবে। এদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও হিটলারকে সতর্ক করে তারবার্তা পাঠালেন।

হিটলার এবার একটু বিপাকে পড়লেন। কিন্তু কিভাবে এই সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় হিটলার ভালই জানেন। হিটলার তখন নরম সুরে চেম্বারলেনকে একটি চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠিতে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে

জানালেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্য অংশ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাবেন না যদি সুদেতান অঞ্চল অচিরেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্তিতে চেক সরকার সম্মত হয়। এই ব্যাপারে আর এক দফা আলোচনার জন্য হিটলার মিউনিকে তাঁর বাসভবনে চেম্বারলেনকে আমন্ত্রণ জানালেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর হিটলারের চিঠি নিয়ে এক বিশেষ দূত চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন।

এদিকে সমগ্র বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। এই বুঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহুদীরা দলে দলে চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে চলে যেতে আরম্ভ করেছে।

হিটলারের জেনারেল হালডার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হিটলার চেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে হিটলারকে করবে গদিচ্যুত। তাঁর ঘটবে মৃত্যু। হালডার যখন এরকম চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় চেম্বারলেন হঠাৎ হিটলারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে তিনি মিউনিকে হিটলারের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দালাদিয়ের। হিটলার এই সাক্ষাতকারের সময় ইতালীর কর্ণধার মুসোলিনীকেও থাকতে অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছেন।

চেম্বারলেনের মিউনিকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্তে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে গেল। হিটলারকে গদিচ্যুত করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। হালডার ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন যে এই পরিস্থিতিতে জার্মান সৈন্যরা কিছুতেই হিটলারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করবে না। বলতে গেলে এই যাত্রায় চেম্বারলেনই হিটলারকে বাঁচিয়ে দিলেন। "The effect on our plans, Says Kordt 'was bound to be disasterous. It would have been absurd to stage a putch to overthrow Hitler at a moment when the British Prime Minister was coming to Germany to discuss with Hitler about the peace of the World."—William Shirer—Rise and Fall of Third Reich, p —497.

২৯শে সেপ্টেম্বর, বেলা ১২-৪৫ মিঃ। মিউনিকে হিটলারের কনিগসপ্লাজের বাসভবনে চতুঃরাষ্ট্রশক্তির শান্তি আলোচনা আরম্ভ হল। এই সম্মেলনে চেক সরকারের কোন প্রতিনিধিকে হিটলার থাকতে দিতে সম্মত হলেন না। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের ব্যক্তিত্বের কাছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এই যেন ভার্সাই সন্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর ওপর যে প্রতিহিংসা নিয়েছিলেন তারই প্রতিশোধ। অবশ্য চেম্বারলেনের অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর চেক প্রতিনিধি মাসতনি ও ডঃ মাসবিককে পাশের ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল মাত্র।

রাত ১০ টা। চেম্বারলেনের পরামর্শদাতা এইচ উইলসন চেক প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিলেন যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেক সরকারকে অবিলম্বে সুদেতান অঞ্চল জার্মানীর হাতে তুলে দিতে হবে। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হল যে ১লা

অক্টোবর ১৯৩৮, জার্মান সৈন্যরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে সুদেতান অঞ্চল দখল করে নেবে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারী করা হল। হিটলারের কাছে চেম্বারলেনের নতিস্বীকারকে ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডাফকুপার মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর, জার্মানীর রাষ্ট্রদূত চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন জার্মানীর দাবী সনদ।

এরপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার ১১০০০ বর্গমাইল জায়গা জার্মানীর দখলে নিয়ে এলেন। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল ছিল সুদেতান পাহাড়ের নিচে অবস্থিত। এখানে ছিল ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুর্ভেদ্য সমর ব্যবস্থা, যা একমাত্র ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের সঙ্গে তুলনীয়। এই ম্যাজিনো লাইন বিস্তৃত ছিল সুইজারল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়াম পর্যন্ত। ফ্রান্সের পূর্বসীমান্তে অবস্থিত এই লাইন ফ্রান্সের প্রহরীর ন্যায় কাজ করত। এখানেই গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সের বিপুল সমর সম্ভার।

এই চুক্তির ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীকে ছেড়ে দিল সুদেতান অঞ্চল। শুধু কি তাই, এই চুক্তির ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠল। জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার ৬৮% কয়লা, ৭৫%—৮০% লিগনাইট, ৮০% রাসায়নিক বস্তু, ৭০% বিদ্যুৎ শক্তি, ৪০% বনজ সম্পদ ও আরও অনেক কিছু অধিকারে আনল।

সুদেতান অঞ্চল জার্মানীর করায়ত্ত হওয়ায় সীমান্ত অঞ্চলে জার্মানীর প্রভূত সুবিধে হল। নিঃস্ব দেউলিয়া জার্মানীকে হিটলারের এক একটি সার্থক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে জার্মানীর সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হল। হিটলার সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করলেন।

"Chamberlains stubborn, fanatical insistence on giving Hitler what he wanted, his trip to Brechtesgaden and Godesberg and finally the fateful journey to Munich resumed Hitler from his limb and strengthened his position in Europe, in Germany, in the Army, beyond anything that could not have been imagined a few weeks before."—William Shirer.

একমাত্র উইষ্টন চার্চিল সমগ্র বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন বৃটেন ও ফ্রান্সের হিটলার তোষণ নীতির ফলে মধ্য ইউরোপের এবং দানিয়ুব অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে হিটলারকে অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হতে হবে। এই সবে সূচনাপর্ব। চার্চিলের এই সাবধানবাণী তখন কেউ গ্রাহ্য করেনি।

হিটলার সুদেতান অঞ্চল লাভ করে ক্ষান্ত রইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি জেনারেল কাইটেলের কাছে গোপনে জানতে চাইলেন সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে হলে জার্মানীর কিরূপ সমরসজ্জার প্রয়োজন?

এমন সময় হিটলার খবর পেলেন প্যারিসে জার্মান রাইখের থার্ড সেক্রেটারী আর্ণষ্ট ভন র‍্যাথ এক জার্মান ইহুদী যুবক দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। জার্মান ইহুদী যুবকের নাম হার্সেল গ্রীনস্ পান। হিটলারের নির্দেশে জার্মানীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০,০০০ ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হল। হিটলার ইহুদী নিধনে মেতে উঠলেন। সমগ্র বিশ্বে কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

এরপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন স্বাধীন শ্লোভাক অঞ্চল সৃষ্টি করার জন্য। হিটলারের কূটকৌশলে ১৪ই মার্চ ১৯৩৯ সালে সৃষ্টি হল চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ নিয়ে স্বাধীন শ্লোভাক অঞ্চল। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শ্লোভাকরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই বাস করত। শ্লোভাকরা তাই তাদের স্বায়ত্ত শাসনের জন্য বিগত ২০ বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল। মিউনিক চুক্তির পর হিটলারই তাদের সুযোগ করে দিল। শ্লোভাকিয়া ছিল মূলত হাঙ্গেরীর অংশ। তারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য বহুদিন ধরে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। A. J. P. Taylor যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, "The movement was not created by him (Hitler), he merely took advantage of it, as he had done of German Austrians and Sudetan Germans. He would have been satisfied with Slovak autonomy within a subservient Czechoslovak state."

এবার হিটলার চেক প্রেসিডেন্ট ডঃ এমিল হাচাকে রিবেনট্রপের মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন। ডঃ এমিল হাচা ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। বয়স ছিল ৬৬। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। হিটলারের নির্দেশে ডঃ হাচা ও তাঁর কন্যা এবং চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী চকোভস্কি ১৪ই মার্চ বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন। হিটলার সাদরে তাঁদের বরণ করে নিলেন।

কিন্তু সেইদিনই বেলা ১টায় হিটলার ডঃ হাচাকে রিবেনট্রপের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে জার্মানীর স্বার্থে চেকোশ্লোভাকিয়াকে অবিলম্বে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হাচার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। হিটলার দু'ঘণ্টার মধ্যে তার জবাব চান। নচেৎ তিনি কালবিলম্ব না করে চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে জার্মান সৈন্য প্রবেশ করিয়ে দেবেন। হাচা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। ডঃ মোড়েল (হিটলারেরই ডাক্তার) ঔষধপত্র দিয়ে ডঃ হাচাকে সুস্থ করে তুললেন।

হাচাকে টেলিফোনে প্রাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করা হল। হাচা নিরুপায়। বাধ্য হয়ে হাচা প্রাগকে চেকোশ্লোভাকিয়ার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দিলেন।

১৫ই মার্চ, সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ। জার্মান সৈন্য বিনা বাধায় ঢুকে পড়ল চেক রাজ্যে। হিটলার সন্ধ্যার পর প্রাগে এসে উপস্থিত হলেন। নাৎসীবাহিনী বিনা বাধায় প্রাগের রাস্তায় মিছিল করে এগিয়ে গেল। প্রথমে হিটলার কেড়ে নিয়েছিল

সুদেতান অঞ্চল। শ্লোভাকরা তারপর গঠন করল নিজেদের স্বাধীন রাজ্য। এবার চেক রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, প্রাগ ইত্যাদি হিটলার সুকৌশলে হস্তগত করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার আলাদা অস্তিত্ব ইউরোপের ম্যাপ থেকে অন্তত কিছুকালের জন্য মুছে গেল।

বৃটেন, ফ্রান্স এমনকি রাশিয়া, আমেরিকাও হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল হিটলার এবার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে।

বৃটেন ও ফ্রান্স আর চুপচাপ থাকলো না। তারা ঘোষণা করল হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে তারা যে কোন উপায়ে তা প্রতিহত করবেই। চেম্বারলেন হাউস অব কমন্সে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

হিটলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। হিটলার তাঁর অফিসে এসে যেসব পুরুষ ও মেয়ে কর্মচারী পেলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে আলিঙ্গন করলেন। তিনি তাদের বলে উঠলেন, "Children! This is the greatest day of my life. I shall go down in history as the greatest German."

কিন্তু হিটলার বুঝতে পারেননি চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনে জার্মানীর ধ্বংসের দিন সমাগত। তাই William Shirer বলেছেন, "It did not occur to him, how could it?—That the end of Czechoslovakia might be beginning of the end of Germany."

রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারের চুক্তি

চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারের করতলগত। এইবার চেম্বারলেনের টনক নড়ল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ক্রোধে ফেটে পড়ল। তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে এইবার হিটলার নিশ্চিত পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন। চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন যে পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স একযোগে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৮ সাল। মিউনিক চুক্তির একমাস পরের ঘটনা। হিটলার জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনটপ মারফৎ পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত যোশেফ লিপস্কিকে ডেকে পাঠালেন। লিপস্কির মন খুশিতে ভরে গেল। তিনি মনে করলেন হিটলার নিশ্চয় তাঁকে কোন সৎ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। ব্রেখটস-গ্যাডেনের 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে' রিবেনট্রপ ও লিপস্কি গল্পগুজবের মধ্যে দুপুরের ভোজন সমাধা করলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁরা একসঙ্গে কাটালেন। লিপস্কি রিবেনট্রপের এইরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ।

খানা-পিনা সমাপ্ত। এইবার রিবেনট্রপ লিপস্কিকে তাঁর আসল মনোভাব ব্যক্ত

করলেন। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কট্টর নাৎসী রিবেনট্রপ পরিষ্কার লিপস্‌কিকে জানিয়ে দিলেন যে, "ডানজিগ জার্মানীরই অংশ", এটা জার্মানীকে ফিরে পেতেই হবে। জার্মান সরকার "ডানজিগ এবং পূর্ব প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পোলিশ করিডরের মধ্যে দিয়ে মোটর চলাচলের উপযোগী একটি প্রশস্ত সড়ক ও রেলপথ তৈরী করতে বদ্ধপরিকর।

লিপস্‌কি পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ বেককে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। জানতে চাইলেন পোলিশ সরকারের মতামত। ৩১শে অক্টোবর বেক লিপস্‌কিকে চিঠি পাঠালেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন ডানজিগ কিছুতেই জার্মানীর হাতে তুলে দেবেন না পোলিশ সরকার। দ্বিতীয়ত পোলিশ করিডরের কোন হেরফের হবে না।

হিটলার এতে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। হিটলার নিজেই পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেককে ডেকে পাঠালেন ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে। হিটলার বেককে অভ্যর্থনার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু তিনি বেককে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ডানজিগ জার্মানীর এবং ইহা অচিরেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই ব্যাপারে কারো বাধাই হিটলার মানবেন না।

"Danzig is German" the Fuehrer reminded his guest, "will always remain German, and will sooner or later become part of Germany." He could give the assurance however that no fait accompli would be engineered in Danzig."

২৩শে মার্চ, ১৯৩৯। জার্মানীর স্বার্থে হিটলার লিথুনিয়া কেড়ে নেবেন স্থির করে ফেলেছেন। রিবেনট্রপ হিটলারের নির্দেশে লিথুনিয়াকে চরমপত্র দিলেন। মেমেল হিটলারের চাই-ই। লিথুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি মেমেল অঞ্চলের স্বত্ব জার্মানীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। জার্মানী মেমেল অধিকার করার ফলে পোল্যাণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

২৬শে মার্চ, হিটলার আবার পোলিশ রাষ্ট্রদূত বেককে বার্লিনে ডেকে পাঠালেন। ডানজিগ এবং পোলিশ করিডরের ব্যাপারে হিটলারের সঙ্গে আলাপ হল বেক-এর। বেক স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, পোল্যাণ্ড কিছুতেই ডানজিগ হিটলারের হাতে তুলে দেবে না। পোলিশ করিডরের মধ্যে দিয়ে হিটলার ইচ্ছা করলে সড়ক বা রেলপথ তৈরী করতে পারেন। বেক হিটলারকে এও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া বা অস্ট্রীয়া নয় যে এত সহজেই কারো কাছে মাথা নত করবে।

৩১শে মার্চ, চেম্বারলেন পরিস্থিতি বিবেচনা করে হিটলারকে সতর্ক করে দিলেন যে হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হিটলার এতে কিন্তু বেশ ভীত হয়ে পড়লেন। পোল্যাণ্ড আক্রমণের চিন্তা তিনি কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখলেন। প্রকাশ্যে এই ব্যাপারে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করলেন না।

তবে তিনি গোপনে নাৎসী সেনানায়কদের সঙ্গে সব কিছু স্থির করে ফেললেন। পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিন স্থির হল ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

সমগ্র ইউরোপে চলছে চাপা উত্তেজনা। পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেক অবস্থা পর্যালোচনা করে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ৬ই এপ্রিল ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হল এক চুক্তি। ইংল্যাণ্ড প্রতিশ্রুতি দিল পোল্যাণ্ড হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডকে সবরকম সাহায্যই দেবে।

৭ই এপ্রিল, অর্থাৎ বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের চুক্তির পরের দিন। বেনিতো মুসোলিনী আক্রমণ করলেন আলবেনিয়া। হিটলারের জ্ঞাতসারেই ঘটনাটা ঘটলো। অবশ্য হিটলার না জানার ভান করলেন। আলবেনিয়া ইতালির করতলগত হল। এতে গ্রীস ও যুগোশ্লোভাকিয়া ভীত হয়ে পড়ল। তারা এখন যে কোন মুহূর্তে ইতালির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। বৃটেন গ্রীস ও যুগোশ্লোভাকিয়াকে বিপদের সময় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। ফলে গড়ে উঠল দুটি সমান্তরাল শক্তি। একদিকে ফ্রান্স ও বৃটেন। অন্যদিকে জার্মানী ও ইতালি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সমস্ত ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলেছেন। রুজভেল্ট ১৫ই এপ্রিল হিটলারকে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে হিটলারকে লিখলেন হিটলার যেন সব কিছু শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে এরকম কোন অবস্থার যেন সৃষ্টি না হয়, সেই ব্যাপারে হিটলারকে অনুরোধ জানালেন। রুজভেল্ট চিঠিতে আরও উল্লেখ করলেন যে তিনি অবহিত হয়েছেন যে হিটলার বাল্টিক রাষ্ট্র পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ও বৃটেন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে কৃতসংকল্প। যদিওবা হিটলার প্রবোধবাক্য উচ্চারণ করে যাচ্ছেন যে, অন্য কোন রাষ্ট্র আক্রমণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই।

রুজভেল্টের এই চিঠি হিটলারকে প্রচণ্ড রকমের আঘাত দিল। হিটলার সোজা-সুজি রুজভেল্টের চিঠির জবাব দিলেন না। ২৮শে এপ্রিল রাইখষ্ট্যাগের বিরাট জনসভায় তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন।

এই বক্তৃতা বেতারের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হল। হিটলার বক্তৃতা দিলেন প্রায় আড়াই ঘণ্টা। বাক্‌চাতুর্যে হিটলার ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি প্রথমেই বৃটেনকে আক্রমণের সুরে বললেন যে, বৃটেন জার্মানীর ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তাই তিনি বৃটেনের সঙ্গে ১৯৩৫ সালে সংঘটিত ইংল্যাণ্ড-জার্মান নৌচুক্তি বাতিল করে দিচ্ছেন।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করবে এটা সর্বৈব মিথ্যা প্রচার মাত্র। তা হিটলার সকলকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন পোল্যাণ্ডই জার্মান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে জার্মানীর ওপর আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে। জার্মানীর ন্যায্য দাবী ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। পোল্যাণ্ড যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এটা হিটলার সুকৌশলে প্রচার করলেন। অথচ হিটলার নিজের দেশের

স্বার্থেই 'ডানজিগে' অধিকার কায়েম করার জন্য পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিনক্ষণ স্থির করে রেখেছেন।

এইবার তিনি আমেরিকার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। রুজভেল্টের পত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, রুজভেল্ট বলেছেন সমস্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। তা যদি সত্যি হতো তা'হলে হিটলারই সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। হিটলার দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে লীগ অব নেশনস্ হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মেটাবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছিলেন লীগ অব নেশনস্-এর অন্যতম প্রবক্তা, অথচ লীগ অব নেশনস্ থেকে আমেরিকা বেরিয়ে যায় নিজেরই দেশের স্বার্থে। সেই সময়কার দুর্যোগপূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতিতে (সেনেটের চাপে) আমেরিকা মাথা গলাবার প্রয়োজনবোধ করেনি। অথচ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য আমেরিকার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

তিনি আরও বলে গেলেন, লীগ অব নেশনস্-এ আলোচনার মাধ্যমেই জার্মানী চেয়েছিল এক সম্মানজনক শর্তে জার্মান সমস্যা মীমাংসা করে নিতে। কিন্তু ভার্সাই চুক্তি জার্মানীর ওপর প্রচুর অসম্মানজনক শর্ত আরোপ করেছিল এবং তা জার্মানীকে মেনে নিতে হয়েছিল। জার্মানীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময় রুজভেল্ট কোথায় ছিলেন? দ্বিতীয়ত রুজভেল্ট বলেছেন হিটলারের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে ৩১টি দেশের ওপর। এই ব্যাপারে হিটলার রুজভেল্টকে জিজ্ঞাসা করতে চান যে তিনি কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সিদ্ধপুরুষ? হিটলারের এই সমস্ত মনোভাব কিভাবে রুজভেল্ট জানলেন? তারপর আবার রুজভেল্ট হিটলারের কাছে প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন, জার্মানী যেন তার আগ্রাসী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

হিটলার রুজভেল্টের এই সমস্ত কথার উত্তরে জানাতে চান যে, তিনি রুজভেল্টের চিঠি পাবার পর সমস্ত দেশের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে জানতে পেরেছেন যে তারা রুজভেল্টকে তাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার জন্য কোন দায়িত্ব দেননি। অতএব এই ব্যাপারে রুজভেল্ট চুপচাপ থাকলেই ভাল করতেন। তিনি রুজভেল্টের কাছ থেকে আরও জানতে চান যে বৃটেন আয়ারল্যাণ্ডের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে সেই ব্যাপারে তাঁর কি কোন বক্তব্য নেই? বৃটেনের এইরকম জঘন্য কার্যকলাপে যখন আমেরিকার কোন মাথাব্যাথা নেই তখন জার্মানীর ব্যাপারে তিনি নাক গলাতে এসেছেন কেন? হিটলার রুজভেল্টকে প্রশ্নের স্বরে জিজ্ঞেস করতে চান যে উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতা কি আলোচনার মাধ্যমে এসেছে? না বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং বিধ্বংসী সংঘর্ষের মাধ্যমে। হিটলারের ভাষায় বলা যায়—

"The freedom of North America was not achieved at the conference table any more than the conflict between the North and the South was decided there. I will say nothing to the innumerable struggle which finally led to the subjugation of the north

American continent as a whole. I mention all this only in order to show that your view, Mr. Roosevelt although, undoubtedly deserving of all honour finds no confirmation in the history of your country or of the rest of the world."

তিনি রুজভেল্টকে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে আরও জানিয়ে দিলেন যে তিনি জার্মানীর সাত লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিচ্ছিন্ন জার্মানীকে কেবল রাজনৈতিক দিক থেকে একত্র করে ক্ষান্ত হননি, তিনি জার্মানীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছেন এবং তিনি জার্মানীর ওপর মিত্রশক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ভার্সাই চুক্তির জঘন্যতম শর্তগুলি এক এক করে ছিন্ন করেছেন। হিটলারের ভাষায় বলা যায়—

"I have succeeded in finding useful work once more for the whole of seven million unemployed. Not only have I united the German people politically but I have also endeavoured to destroy sheet by sheet that treaty which in its four hundred and forty eight articles contain the vilest oppression which peoples and human beings have ever been expected to put up with"

হিটলারের অকাট্য যুক্তিপূর্ণ এই বক্তব্য সকল জার্মানবাসীকে মুগ্ধ করে দিল, বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে দিল এবং বিশ্ববাসীকে করল চিন্তাক্লিষ্ট। ২৮শে এপ্রিলের এই বক্তৃতায় হিটলার কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

হিটলার নিজের স্বার্থেই এখন রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে মনস্থির করে ফেলেছেন। রাশিয়ারও প্রয়োজন ছিল হিটলারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। অতএব দুজনেই পরস্পরের স্বার্থে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

হিটলারের যেমন লোলুপ দৃষ্টি পোল্যাণ্ডের ওপর, রাশিয়ারও তাই। উভয়েরই দেশের স্বার্থে এই চিন্তা। এর আগে হিটলারই চেয়েছিলেন পোল্যাণ্ডকে রুশবিরোধী Anti-comminterm pact-এ সই করাতে। কিন্তু তাতে সে সম্মত হয়নি। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এক ইহুদী। নাম লিটভিনফ। চেয়েছিলেন রাশিয়া যেন বৃটেনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। স্ট্যালিনের অনুমতি নিয়ে লিটভিনফ রাশিয়ার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি দেননি।

চার্চিল পার্লামেণ্টে বার বার বলতে লাগলেন যে নাৎসী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইংল্যাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন। চার্চিলের এই কথায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্ণপাত করেননি। ফলে এই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল ইংল্যাণ্ডকে। চার্চিলের এই কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন গ্রহণ করলে বিশ্ব রাজনীতির গতিবিধি নিশ্চিত অন্যধারায় প্রবাহিত হত।

১৭ই এপ্রিল। স্ট্যালিনের নির্দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মিলিত হলেন জার্মান

উচ্চপদস্থ এক অফিসারের সঙ্গে। জার্মানীর পক্ষে রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনে স্ট্যালিনের আগ্রহের কথা জ্ঞাপন করলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত।

এর মধ্যে ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তন হল। ইহুদী লিটভিনফ সোভিয়েত পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হলেন। সম্ভবত জার্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে লিটভিনফ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে সেই চিন্তা করেই তাঁকে অপসারিত করলেন স্ট্যালিন।

চেম্বারলেনের মত স্ট্যালিনও জার্মান তোষণ নীতি গ্রহণ করলেন। তবে এইটা খুব সঠিকভাবে বলা যাবে না ঠিক কোন্ সময়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে হিটলারের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরের কথাবার্তার সূত্রপাত হয়।

মলোটভ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯৩৯ সালের ২০শে মে জার্মান রাষ্ট্রদূত স্থলেনবার্গ দেখা করলেন মলোটভের সঙ্গে। স্থলেনবার্গ মলোটভকে জানালেন উভয়দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের জন্য জার্মানী ও মস্কোর মধ্যে একটি সমঝোতা প্রয়োজন। এইদিকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড পরিষ্কার অনুভব করতে পারল যে বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে এই চুক্তি তাঁদের এক বিরাট বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে চলেছে।

হিটলার এরপর ইতালির সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন। হিটলার বেনিতো মুসোলিনীকে লিখে পাঠালেন যে জার্মানী ইতালির সঙ্গে এক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়। দুই দেশের স্বার্থেই এই চুক্তির প্রয়োজন। মুসোলিনী ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট সিয়ানোকে বার্লিনে পাঠালেন। ২২শে মে, ১৯৩৯। যাকে বলা হয় 'ইস্পাতের চুক্তি'।

২৩শে মে, হিটলার তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলেন। সেনানায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরাল রেডার, জেনারেল ফন ব্রাউচিৎস, জেনারেল হালডার ও জেনারেল কাইটেল। আর উপস্থিত ছিলেন হিটলারের ব্যক্তিগত সচিব কর্ণেল রুডলফ স্মাণ্ড।

হিটলার সেনানায়কদের সম্মুখে সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য, পোল্যাণ্ডকেও জয় করতেই হবে! প্রয়োজন হলে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকেও। যদিওবা হিটলার ভেতরে ভেতরে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। হিটলার একটা কথা বারবার বলে চলেছেন যে এই যুদ্ধ হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ। ব্রিটিশ নৌশক্তি যে অপরাজেয় এই কথা হিটলার ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি বললেন জার্মান বিমানবাহিনীই এই যুদ্ধে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ব্রিটিশ জলপথ অবরোধ করবে জার্মান সাবমেরিন।

১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বর জার্মানীর সমরায়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বেশ কিছু সেনানায়ক কিন্তু এখন তাঁরা কেউ হিটলারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না।

১৯৩৯ সালের মে মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হল জার্মানীর সমরায়োজন। কারখানায় তৈরি হতে লাগল প্রচুর সমরাস্ত্র। তৈরি হল ১৭টি ডুবোজাহাজ। জার্মানীর

সৈন্যবাহিনী ৭ ডিভিশন থেকে ৫১ ডিভিশনে দাঁড়ালো। বিমান বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ২½ লক্ষ। জার্মানীর সমরসজ্জার ক্রমাগত বেড়েই চললো।

এইদিকে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ চেম্বারলেনের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিস্থাপনের জন্য। বাধ্য হয়ে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সারির এক নেতাকে স্ট্যালিনের কাছে পাঠালেন চেম্বারলেন। স্ট্যালিন চেম্বারলেনের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তাই চেম্বারলেনের প্রেরিত দূত উইলিয়াম স্ট্রাংকে স্ট্যালিন তাঁর অসম্মতির কথা জানিয়ে দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন।

১৫ই জুন জেনারেল বন ব্রাউচিৎসের কাছ থেকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের 'ব্লু প্রিন্ট' পেলেন হিটলার। পোল্যাণ্ড গোপনে সব খবরাখবর সংগ্রহ করত। পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেক হিটলারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, হিটলারের ডানজিগ দখলের যে কোন প্রচেষ্টাকে পোল্যাণ্ড প্রতিহত করবে।

হিটলার পোলিশ সরকারের এইরকম ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস। সমগ্র ইউরোপ অগ্নিগর্ভ। চারদিকে যুদ্ধের কালোছায়া। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে।

হাঙ্গেরী ও ইতালি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ভীত। মুসোলিনী হিটলারকে অনুরোধ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়ানোর মারফৎ একটি চিঠি পাঠালেন। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে। হিটলার সিয়ানোকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না। হিটলার সেই সময় স্ট্যালিনের কাছ থেকে পেলেন একটি টেলিগ্রাম। সিয়ানো ছিলেন তখন হিটলারের সামনে। টেলিগ্রামের বক্তব্য হিটলার সিয়ানোকে জানালেন। টেলিগ্রামে স্ট্যালিন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর মধ্যে মস্কোর সঙ্গে বার্লিনের একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্থাপিত হয়েছে।

স্ট্যালিনের টেলিগ্রামের উত্তরে রিবেনট্রপ হিটলারের নির্দেশে মস্কোকে জানিয়ে দিলেন যে, "German-Russian relations, had come to a historic turning point......there exists no real conflicts of interest between Germany and Russia......It has gone well with both countries previously when they were enemies. Germany was ready to divide up eastern Europe, including Poland, with the Soviet Union.' "The great drama" Hitler said to his select listeners "is now approaching its climax."

এরপর হিটলার ওবের সালজবুর্গে ডাকলেন একটি সামরিক সম্মেলন। হিটলার তাঁর সেনানায়কদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটেন বা ফ্রান্স কেউ পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। কেননা তাদের সেইরকম কোন সামরিক শক্তি নেই। হিটলার বলে চললেন যে, "Our opponents are poor creatures (poor worms) I saw them at Munich." হিটলার তার

সেনানায়কদের আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য হিটলার এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তার অন্যতম কারণ জার্মানীর পক্ষে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। তাতে জার্মানীর পরাজয় অবধারিত। তাই জার্মানীর সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী হলেও নিজের দেশের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন। জার্মানীর দুই ফ্রন্টে শত্রু থাকুক তা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেনই। মজুত রাখলেন প্রায় পাঁচলাখ জার্মান সৈন্য।

হিটলার জানতেন পোল্যাণ্ড কিছুতেই জার্মানী আক্রমণ করবে না। যুদ্ধের যত প্ররোচনাই সৃষ্টি করা হোক না কেন। তাই হিটলার সুকৌশলে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের মত একটি পরিকল্পনা করে ফেললেন। স্থির করলেন কিছু জার্মান সৈন্য পোলিশ সেনাবাহিনীর ছদ্মবেশে নিজের দেশের সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালাবে। সেই অজুহাতে পোল্যাণ্ডকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এটাকে নাম দেওয়া হল 'অপারেশন হিমলার'।

২২শে আগষ্ট, রিবেনট্রপ খুশিমনে হিটলারের লিখিত নির্দেশসহ রাশিয়া রওনা হয়ে গেলেন। উপস্থিত হলেন ক্রেমলিনে। নানান আলোচনার পর রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৩শে আগষ্ট। স্ট্যালিনের প্রশ্নের জবাবে রিবেনট্রপ জানালেন ইতালি ও জাপান উভয়েই জার্মানীর পাশে আছে। উপযুক্ত মুহূর্তে তারা জার্মানীকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। রিবেনট্রপ স্ট্যালিনকে এও জানিয়ে দিলেন যে সমগ্র জার্মানবাসী রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর মধুর সম্পর্কের জন্য আগ্রহী।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই সংবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। ২৪শে আগষ্ট পার্লামেন্টের এক জরুরী অধিবেশন ডাকা হল। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে অলোচিত হল। চেম্বারলেন এরপরও হিটলারের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি হিটলারকে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে অনুরোধ জানান।

চেম্বারলেনের এই চিঠিতে হিটলার অতীব ক্ষুব্ধ হলেন। চেম্বারলেন চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন জার্মানীর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যাণ্ডারসন মারফৎ। হিটলার হ্যাণ্ডারসনকে তাঁর মনোভাব বুঝতে দিলেন না। হিটলার চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একটি কূটনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। যাতে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে। সেই উদ্দেশ্যেই হিটলার এটা চেয়েছিলেন। কিন্তু হিটলারের সেই আশা বিফলতায় পর্যবসিত হল।

এর মধ্যে হিটলার মুসোলিনীর কাছ থেকে আবার এক বার্তা পেলেন। তাতে লেখা ছিল হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ যদি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় তাহলে ইতালির

এমন কোন সামর্থ নেই, যা দিয়ে তারা জার্মানীকে সাহায্য করতে পারে। মুসোলিনীর এই চিঠি হিটলারকে বিব্রত যে করেনি তা নয়, তবে হিটলারের পক্ষে এতখানি এগিয়ে হঠাৎ আবার পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়।

হিটলার ভালোভাবেই জানতেন ভবিষ্যতে রাশিয়ার সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তবুও কিছু সময়ের জন্য হলেও তিনি রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলেন। রাশিয়ারও নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কিছু সময় জার্মানীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনও ছিল। "The published treaty carried an undertaking that neither power would attack the other. Should one of them become, 'the object of belligerent action by a third power, the other party would in no manner lend its support to his 'Third power' etc. Two years later, when German troops were pouring into Russia in violation of the pact, Stalin would still justify his odious deal with 'Hitler secured peace for our country for one and a half years'......as well as an opportunity of preparing our forces for defence if fascist Germany risk attacking our country in defence of the pact. This was a definite gain for our country and a loss for fascist Germany." রাশিয়া ও জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি এবং উভয়ের স্বার্থেই পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা মুসোলিনীকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলেছে ভীষণভাবে। মুসোলিনী এর আগে হিটলারকে বহুবার চিঠি দিয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। এইবার শেষ চেষ্টা হিসাবে মুসোলিনী আবার ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যাটোলিকাকে হিটলারের কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য পোল্যাণ্ড আক্রমণের চিন্তা থেকে হিটলারকে নিবৃত্ত করা। হিটলার আপাতত পোল্যাণ্ড আক্রমণের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তাঁর বিরোধীপক্ষ তা জানতে পারল।

এই সংবাদে অবগত হয়ে হিটলারের শত্রুদের মন খুশিতে ভরে গেল। অ্যাডমিরাল ক্যানারিস তো বলেই ফেললেন যে হিটলার আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। তিনি অন্তত সামনের কুড়ি বছরের মধ্যে আর পোল্যাণ্ড আক্রমণের চিন্তা করবেন না। জিসেভিয়াস (Gesevius) ঘোষণা করলেন, হিটলার শেষ হয়ে গেছেন। অতএব হিটলারকে গদিচ্যুত করার তাঁদের যে পরিকল্পনা আছে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। "Both men thought there was no further need of bothering to overthrow the Nazi dictator, he was finished."

হিটলার এরমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি মুসোলিনীকে চিঠি পাঠালেন ইউরোপখণ্ডে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠলে তাঁর কিরকম সমরসম্ভার প্রয়োজন তা জানতে চাইলেন। উত্তরে মুসোলিনী হিটলারকে সাহায্যের জন্য এক

বিরাট বিবৃতি পাঠালেন। হিটলার মুসোলিনীকে উত্তরে জানিয়ে দিলেন ইস্পাত ও কয়লা ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ দিয়ে তিনি ইতালিকে সাহায্য করতে পারেন। হিটলার মুসোলিনীকে আরও জানিয়ে দিলেন তিনি শক্তি দিয়েই পোল্যাণ্ড সমস্যার সমাধান করবেন। তাতে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি থাকলেও তা তিনি বন্ধ করবেন না।

হিটলারের বিরোধী পক্ষ যেমন গোয়েরডলার (Goerdler), অ্যাডলফ ভনট্রোথ, হেলমুথ ভন মলটকে, ফেবিয়ান ভন স্কালব্রেনডর্ফ (Fabian Von Schlabrendorf) এবং পেপেন সকলে গোপনে লণ্ডনে গিয়ে ইংরাজ সরকারের কাছে হিটলারের সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। তাঁরা হিটলারের জীবন নাশের জন্তও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, জার্মান সৈন্তবাহিনী, পুলিশ এবং জার্মানীর বিপুল সংখ্যক মানুষ হিটলারের ওপর গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশীল। হিটলারের নেতৃত্বে তাদের রয়েছে প্রগাঢ় আস্থা। হিটলার ২৫শে আগষ্ট পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখার কারণ জানিয়ে গোয়েরিংকে বলেছিলেন যে, তিনি আর একবার চেষ্টা করে দেখলেন ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা করা যায় কিনা?

হিটলার এইবার আর একটি কূটনৈতিক চাল চাললেন। হিটলার গোয়েরিং-এর সুইডিস বন্ধু বার্জার ডাহলেরাসের (Dahlerus) মাধ্যমে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেম্বারলেনের কাছে জানালেন যে তিনি পোল্যাণ্ড সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে রাজি আছেন। তবে ডানজিগ জার্মানীর চাই-ই ও পোলিশ করিডরের মধ্যে তিনি রাস্তাও তৈরি করবেন। আর চাই পোল্যাণ্ডে জার্মান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা। হিটলার জানতেন তাঁর এই প্রস্তাব পোল্যাণ্ড কিছুতেই মানবে না।

ফলে পোল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হবে। সেই ফাঁকে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রামণের একটি অজুহাত দেখাতে পারবেন। তাই হিটলার সৈন্তবাহিনীকে প্রস্তুত করে রাখলেন।

চেম্বারলেন হিটলারের চিঠির উত্তরসহ হেণ্ডারসনকে হিটলারের কাছে পাঠালেন ২৯শে আগষ্ট। হিটলার হেণ্ডারসনকে জানিয়ে দিলেন যে এখন আর তাঁর পক্ষে অপেক্ষা করার মত সময় নেই। তিনি পোল্যাণ্ডের সুস্পষ্ট মতামত জানতে চান ডানজিগের ব্যাপারে. তার জন্য তিনি ৪/৫ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে রাজি নন। হেণ্ডারসনকে হিটলার আরও জানিয়ে দিলেন যে পোল্যাণ্ডের নতুন সীমানা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। হেণ্ডারসনের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

পোল্যাণ্ড আক্রমণের সব ব্যবস্থা পাকা। ৩১শে আগষ্ট সকাল ৯টায় ফুয়েরারের কণ্ঠস্বর জার্মান বেতারে শোনা গেল। জার্মানীর সমর দপ্তরে চলেছে প্রচণ্ড রকমের ব্যস্ততা। হিটলার জার্মানদের জানালেন যে পোলিশ সৈন্য জার্মান সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছে। গিউৎসের রেডিও ষ্টেশনে পোলিশ সৈন্তদের ছদ্মবেশে কিছু জার্মান সৈন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিটলার তাই দেশবাসীকে জানালেন যে স্বদেশের স্বার্থে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে বাধ্য

হলেন। তিনি আরও জানালেন যে, তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধান কিন্তু বাস্তবে ঘটল অন্য জিনিস। হিটলার তাই বাধ্য হয়ে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সকাল ৪-৪৫ মিঃ পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন।

জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের খবর বায়ুবেগে সর্বত্র প্রচারিত হল। জার্মানীর ফরাসী ও ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে রিবেনট্রপকে স্পষ্ট জানানো হল যে জার্মানী পোল্যাণ্ডের ওপর আক্রমণ বন্ধ না করলে বাধ্য হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

৩রা সেপ্টেম্বর। সমস্ত লণ্ডন শহর উত্তপ্ত। কমন্স সভায় চেম্বারলেন জানাতে বাধ্য হলেন ব্রিটেন হিটলারকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তবে চেম্বারলেন হিটলারের ধ্বংস দেখে যেতে পারেননি। ভগ্ন হৃদয়ে ১৯৪০ সালের ৯ই নভেম্বর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯৩৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। এক সপ্তাহের মধ্যেই পোল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হল। এই সময়ে লুটের মাল ভাগ-বাটোয়ারার জন্য এগিয়ে এল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী। হিটলার যুদ্ধ করলেন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। স্ট্যালিন হিটলারের কাছ থেকে একের পর এক দাবী আদায় করতে লাগলেন। পোল্যাণ্ডের অর্ধাংশ ও বাল্টিক রাজ্য দখল করলেন স্ট্যালিন। তাঁকে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। শুধু যুদ্ধের মহড়া দিয়ে আর হিটলারকে যুদ্ধে মদত যুগিয়েই তিনি তাঁর কাজ হাসিল করলেন। হিটলারের কাছ থেকে স্ট্যালিন পেয়ে গেলেন পোল্যাণ্ডের তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চল বরিস্লাভ। ইউক্রেনীয় গম আর রুমানিয়ার তেল সংগ্রহ করার চিন্তা হিটলারকে বন্ধ রাখতে হল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে এই দুটি জিনিস হিটলারের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

২৮শে সেপ্টেম্বর মলোটভ ও রিবেনট্রপ সীমান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এখন পোল্যাণ্ডের অর্ধাংশ ও লিথুনিয়া, লেটিভিয়া এবং এস্থোনিয়া স্ট্যালিনের করতলগত হল।

হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের এই চুক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে স্ট্যালিন চরিত্রের অত্যন্ত ঘৃণ্য দিক বলে মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা মানবতাবাদের পূজারী স্ট্যালিন পোল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, লেটিভিয়া, এস্থোনিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে ফ্যাসিস্ট একনায়কের আক্রমণের হাত থেকে ত রক্ষা করলেনই না, উল্টে তিনি এই সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর নিষ্ঠুরের মত নিজের আধিপত্য কায়েম করলেন। আর পরোক্ষভাবে হিটলারকে মদত যুগিয়ে গেলেন। যা আমাদের কাছে অত্যন্ত অশোভন বলে মনে হয়।

কিন্তু রাশিয়ার স্বার্থের কথা চিন্তা করলে স্ট্যালিনের এই চুক্তিকে আমরা অমানবিক মনে করতে পারি না। স্ট্যালিন ছিলেন অত্যন্ত উচুস্তরের রাজনীতিবিদ এবং রণকৌশলে অদ্বিতীয়। তিনি ভালভাবেই জানতেন হিটলার মুখে যাই বলুন না কেন অচিরে তিনি রাশিয়া আক্রমণ করবেনই। সেই সময় রাশিয়া সামরিক দিক থেকে খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। রাশিয়াকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তাঁর কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। তদুপরি হিটলার যখন তাঁর

সঙ্গে এই রকম অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাইছেন তখন রাশিয়ার স্বার্থের কথা চিন্তা করে স্ট্যালিনের এতে সম্মতি দেওয়া খুবই সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত অধিকৃত এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার সীমান্তবর্তী সীমারেখা বিস্তৃত করল। ফলে জার্মানীর তরফ থেকে রাশিয়া আক্রান্ত হলে তা মোকাবিলা করার পক্ষে রাশিয়ার খুবই সুবিধে হবে। উইলিয়ম শাইরারার যথার্থই বলেছেন, "Within a short time it also gave the Soviet Union an advanced defensive position against Germany beyond the existing Russian frontiers, including bases in the Baltic States and Finland—at the expense of the Poles, Latvians, Estonians and Finns."—p-656

স্ট্যালিন নিজেই স্বীকার করেছেন এই চুক্তির ফলে তিনি দেশের জন্য দেড় বছরের শান্তি ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, যেটা রাশিয়ার পক্ষে হয়েছিল এক বিরাট লাভ এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানীর পক্ষে বিরাট ক্ষতি।

স্ট্যালিনের এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল উইনষ্টন চার্চিল। চার্চিল বলেছিলেন, স্ট্যালিনের সম্পাদিত এই চুক্তি নিতান্ত বাস্তবসম্মত। কারণ দেশের কর্ণধার হিসেবে নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নই ছিল প্রথম বিবেচ্য। "No statesman, not even dictators, can foretell the course of events over the long run. It is arguable, as Churchill has argued, Hitler, it was also at the moment realistic in a high degree. Stalin's first and primary consideration, as was that of any other head of Government, was his nation's security."—William L. Shirer-P. 657.

পোল্যাণ্ডের এই রকম দুঃসময়ে ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। এই সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে হিটলারের পক্ষে পোল্যাণ্ড দখল করা সম্ভব হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের ব্যাপার। জার্মান জেনারেল কাইটেলও অবাক হলেন। তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করলেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাঁদের বিরুদ্ধে এই সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলে কি ফল দাঁড়াতো বলা শক্ত। যাই হোক পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো।

২৬শে সেপ্টেম্বর। হিটলার আবার শান্তির বাণী প্রচার করলেন। বেতারে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সঙ্গে স্ট্যালিনও গলা মেলালেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর রুশ-জার্মান যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হল। তাঁরা ঘোষণা করলেন পোল্যাণ্ড পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্বে ইউরোপে এক শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধের সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়েছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে হিটলার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পোল্যাণ্ডের কথা বাদ দিয়ে,

তাদের সঙ্গে যে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাজী আছেন। হিটলার ভেবে-ছিলেন চেম্বারলেন হয়ত তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

১২ই অক্টোবর চেম্বারলেন হিটলারকে জানিয়ে দিলেন, বৃটেন তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে নারাজ। হিটলার বুঝতে পারলেন চেম্বারলেনকে এখন আর বোকা বানানো সম্ভব নয়। পরের দিনই হিটলার এক সরকারি ইস্তাহার জারি করলেন। তিনি তাতে উল্লেখ করলেন যে ইংল্যাণ্ড হিটলারের শান্তি প্রস্তাব ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছে। হিটলার জেনারেলদের সামনে তেজস্বি ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। জেনারেলদের নির্দেশ দিলেন পশ্চিমে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে।

জেনারেলরা অনেকেই হিটলারের এই প্রস্তাবে সায় দিতে সম্মত হলেন না। হালডার ও ব্রাউচিৎস হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পশ্চিমে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানোর মত ক্ষমতা জার্মানীর নেই। কিন্তু হিটলারের মনোভাব অনমনীয়। তিনি রইলেন তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

হালডার ও ব্রাউচিৎস হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করলেন। ৮ই নভেম্বর হিটলারকে বোমার আঘাতে ধরাশায়ী করার চেষ্টা চালানো হল। হিটলার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন।

নাৎসী প্রচার দপ্তর বোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনাকে কাজে লাগালো। সমস্ত দোষটা বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ওপর আরোপ করা হল। জার্মানীতে বৃটিশ বিরোধিতা তুঙ্গে উঠলো। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী জেনারেলরা চুপ হয়ে গেলেন। জার্মানবাসীদের কাছে হিটলারের বিরুদ্ধে হালডার ও ব্রাউচিৎস-এর চক্রান্ত ব্যর্থ হল। তবে কে বা কারা হিটলারের বিরুদ্ধে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো তার হদিস কিন্তু পাওয়া গেল না।

এরপর পোল্যাণ্ডের ইহুদীদের ওপর চললো নাৎসী-বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার। কেউ এগিয়ে এলো না এই ব্যাপারে হিটলারকে বাধা দিতে। না ব্রিটেন, না ফ্রান্স বা রাশিয়া। পোল্যাণ্ডের লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে মৃত্যুবরণ করতে হল নির্মমভাবে। 'Hitler and Stalin agreed to institute in Poland a regime of terror designed to brutally suppress police freedom, culture and national life.'

ডিসেম্বর মাস, ১৯৩৯ সাল। মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে চলতে লাগলো এক ঠাণ্ডা লড়াই। মুসোলিনী হিটলারের রুশপ্রীতিকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। ৩০শে নভেম্বর সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ করল ফিনল্যাণ্ড। হিটলার সব নীরবে মেনে নিলেন।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে মুসোলিনী হিটলারকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু হিটলারের করার কিছুই ছিল না। স্ট্যালিনের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটাতে গিয়ে হিটলার বেসামাল হয়ে পড়লেন। তবুও উপায় নেই। রাশিয়া থেকে তেল গমের বদলে হিটলারকে দিতে হচ্ছে প্রচুর

সমরাস্ত্র। হিটলারের রাশিয়া তোষণ নীতির মূল কারণ ছিল, একটি ফ্রন্টেই সংগ্রাম চালানো। তবে হিটলার ও স্ট্যালিন উভয়েই জানতেন তাঁদের এই মিত্রতা সাময়িক। হিটলার ঘোষণা করলেন তিনি পশ্চিমে আক্রমণ শুরু করবেন ১লা জানুয়ারী, ১৯৪০।

বিশেষ কিছু কারণে সাময়িকভাবে হিটলার পশ্চিমে আক্রমণ চালাবার সংকল্প স্থগিত রাখলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে আনলেন উত্তরে। জার্মানীর দরকার প্রচুর আকরিক লোহা. যা বিপুল পরিমাণে রয়েছে সুইডেনে। গ্রীষ্মকালে এখান থেকে জার্মানীতে আকরিক লোহা যেত জলপথে। কিন্তু শীতকালে জলপথ বরফে জমে গেলে এই লোহা ট্রেনপথে নরওয়ের নরভিক বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো। সেখান থেকে জাহাজে পৌছাত জার্মানীতে।

বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীতে সুইডেন থেকে লোহা আমদানির পথ বন্ধ করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে লাগল। হিটলার তা বুঝতে পারলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করার এক সুযোগ তাঁর হাতে এসে গেল। পেয়ে গেলেন নরওয়ের এক মেজরকে। মীরজাফরের মত তাঁকেও নরওয়ে দখলের ষড়যন্ত্রে হিটলার কাজে লাগালেন। নরওয়ের এই বিশ্বাসঘাতক মেজরের পুরোনাম মেজর ভিডকুন আব্রাহাম লরিৎস কুইসলিঙ।

জার্মান অ্যাডমিরাল রেডর ১৪ই ডিসেম্বর স্বয়ং কুইসলিঙকে সঙ্গে নিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। হিটলার কুইসলিঙ-এর কাছ থেকে নরওয়ের গোপন খবর সংগ্রহ করলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে নরওয়ের নরভিক বন্দরে সৈন্য অবতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাও কুইসলিঙের কাছ থেকে হিটলার জানলেন।

তাই হিটলার সিদ্ধান্ত নিলেন অতর্কিত আক্রমণে তিনি ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে নেবেন। এই সময় হিটলার খবর পেলেন ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এর মধ্যে হিটলার নতুন দুটি সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। (১) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আণ্ডার সেক্রেটারী সামনার ওয়েলস হিটলারের সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে ১লা মার্চ বার্লিনে এসে পৌছেছেন। পশ্চিমে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ করার উপায় নির্ধারণ মানসে তাঁর এই আগমন। (২) মুসোলিনীকে কিভাবে তিনি পুরোপুরি তাঁর কব্জায় নিয়ে আসবেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দূতকে হিটলার বলে দিলেন যে জার্মানী চিরদিনই শান্তি-প্রয়াসী। কিন্তু ব্রিটেন তাঁর সমস্ত শান্তি প্রস্তাব নাকচ করে দিচ্ছে। তাই হিটলার ওয়েলসকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর সঙ্গে পশ্চিমের লড়াই অনিবার্য এবং এই লড়াই শেষ পর্যায়ে পৌছবে।

ওয়েলস বাধ্য হয়ে জানিয়ে দিলেন এই যুদ্ধে আমেরিকাও নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না।

সামনার ওয়েলস চলে যাবার পর হিটলার মুসোলিনীকে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ চিঠি পাঠালেন। অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হিটলার বুঝতে

পেরেছিলেন যে মুসোলিনীকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের দলে টানার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করে ফেলেছে। মুসোলিনীও তাদের প্রস্তাবে যে মৌন সম্মতি দিয়েছেন তা হিটলার জানতো। তাই হিটলার সংশয়ের মধ্যে ছিলেন।

যাই হোক, হিটলারের হৃদ্যতাপূর্ণ চিঠি মুসোলিনীকে অভিভূত করে ফেলল। ১৮ই মার্চ, ১৯৪০ সালে আল্পস পর্বতের কাছে ব্রেনার পাশ সীমান্ত ষ্টেশনে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে নিভৃতে আলোচনা আরম্ভ হল।

হিটলার মুসোলিনীকে তাঁর অকাট্য যুক্তি দিয়ে আকৃষ্ট করে ফেললেন। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসোলিনী হিটলারকে সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন। মুসোলিনী হিটলারকে জানিয়ে দিলেন জার্মানীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইতালি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত।

হিটলার মুসোলিনীর ওপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। মুসোলিনী ও হিটলার যেন একই মুদ্রার দুটি দিক।

হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর জেনারেলদের চক্রান্ত ব্যর্থ হল। হিটলারের অসামান্য মনোবল ও কিছুটা ভাগ্য হিটলারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তার সঙ্গে ছিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে এগিয়ে যাওয়ার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস, ডেনমার্ক ও নরওয়ের কর্তৃপক্ষকে হিটলার উক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারফৎ জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের জানানো হোল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দুটি দেশের জনসাধারণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই জার্মান রাইখ এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। এর সঙ্গে জার্মানী এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে দুই দেশের সীমান্ত অক্ষুন্ন থাকবে। অক্ষম ডেনমার্ক জার্মানীর এই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হল কিন্তু নরওয়ে জার্মানীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ফলে নরওয়ের সঙ্গে জার্মানীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। অচিরে জার্মান সৈন্যের আক্রমণে নরওয়ে পর্যুদস্ত হল। নরভিক বন্দরসহ সম্পূর্ণ নরওয়ে জার্মানীর হস্তগত হল। নরওয়ের রাজা পালিয়ে গেলেন। বিশ্বাসঘাতক কুইসলিঙের উপর নরওয়ের শাসনভার অর্পণ করা হল।

ডেনমার্ক ও নরওয়ে জার্মানীর অধিকারভূক্ত হল। হিটলার আনন্দে জেনারেলদের জানালেন, থার্ড রাইখের বিজয়াভিযান বন্ধ করার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রেরই নেই। এবার জার্মানীকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে পশ্চিমে।

১৯৪০ সালের ১০ই মে। সময় সকাল ৮টা। রিবেনট্রপ নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়কে ডেকে পাঠালেন। জানানো হোল যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অবিলম্বে তাঁদের দেশ আক্রমণ করবে। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জার্মানী কয়েক ডিভিশন সৈন্য এই দুই দেশে প্রেরণ করছে। রিবেনট্রপ এই দুই দেশের প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জার্মান সৈন্যদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা হলে তা নির্মমভাবে দমন করা হবে।

যে কথা সেই কাজ। বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের আকাশে জার্মান বিমানের

গর্জন শোনা গেল। হিটলার বেলজিয়ামের প্রতি প্রদত্ত নিরপেক্ষতার নীতি ছিন্ন করলেন।

নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণের গোপন নাৎসী চক্রান্ত বার্লিনে নেদারল্যাণ্ডের সামরিক অ্যাটাশে কর্ণেল জি. জে. স্যাস অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন। জি. জে স্যাসের সঙ্গে নাৎসী জেনারেল অস্টারের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। স্যাস তাঁর মাধ্যমে গোপনে এই সব খবর পেয়ে তা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের কাছে জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপনসূত্রে এই সংবাদ অবগত হয়েও তা বিশ্বাস করেননি।

অবশ্য এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে চলছিল চরম ক্যাবিনেট সংকট। এই সংকটের সমাপ্তি ঘটল ১০ই মে সন্ধ্যায়। চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হলেন। উইনষ্টন চার্চিল এলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১০ই মে, ১৯৪০। চার্চিল মন্ত্রিত্ব-পদ গ্রহণ করলেন ইংল্যাণ্ডের ঘোর সংকটকালে। বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের ওপর জার্মান আক্রমণের সংবাদে চার্চিল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। দুইদিনের মধ্যেই বিশাল ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী চার্চিলের নির্দেশে বেলজিয়াম সীমান্তে এসে উপস্থিত হল। জার্মান হাইকম্যাণ্ড ঠিক এইটাই চাইছিলেন। বিশাল মিত্রবাহিনী ঠিক এইভাবেই নাৎসী ফাঁদে পা দিল। "As it happened, this was just what the German High Command wanted. This Allied wheeling movement played directly into its hand." Though they did not know it the Anglo-French armies sped directly into a trap that, when sprung, would soon prove to be utterly disasterous."

হিটলার ছিলেন রাজনীতিতে সুচতুর। কৌশলের আশ্রয় তিনি চিরকালই গ্রহণ করেছেন। বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড আক্রমণের ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি গ্রহণ করেছেন।

নেদারল্যাণ্ড জার্মান সৈন্যকে প্রতিরোধ করল। হিটলার উঠলেন ক্ষিপ্ত হয়ে। গোয়েরিঙ বিমান বহরকে নির্দেশ দিলেন বোমার আঘাতে সমস্ত ডাচ শহর ধ্বংস করে দিতে। ১৪ই মে জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ডাচ সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। রাণী উইল হেলমিনা পালালেন লণ্ডনে। গৃহহারা হোল ৭৮,০০০ মানুষ। ডাচ সরকারের পতন ঘটল। নেদারল্যাণ্ডে নাৎসী পতাকা উড়ল হল।

এরপর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হল বেলজিয়ামের। বেলজিয়ামে ইতিমধ্যে ইঙ্গ-ফরাসীর এক বিশাল বাহিনী ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বেলজিয়াম এবং ইঙ্গ-ফরাসীর সম্মিলিত বাহিনীর ওপর হঠাৎ জার্মান বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছিন্নভিন্ন করে দিল মিত্রবাহিনীকে। জার্মানীর তরুণ জেনারেল এরভউন রোমেল ট্যাঙ্ক যুদ্ধে দারুণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলল নাৎসী বাহিনী। নাৎসী বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে মিত্রশক্তির বহুসংখ্যক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হল।

পর্যুদস্ত হল বিশাল মিত্রবাহিনী। সেডানের কাছে জার্মান জেনারেল

গুডেরিয়ানের পঞ্চদশ বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিল ব্রিটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ামের সম্মিলিত বাহিনীকে। চার্চিলের বাকশক্তি রহিত হল। স্বচক্ষে মিত্রশক্তির এই ধ্বংস দেখার জন্য তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত হলেন ১৬ই মে।

২০শে গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্কবাহিনী অ্যারেভিলে প্রবেশ করল। এই সময় থেকেই চার্চিল চ্যানেল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ বাহিনীকে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। ২৪শে মে'র মধ্যে জার্মানবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে দখল করে নিল এ্যারোভিল ও বুলোন। অবরুদ্ধ করল ক্যালে বন্দর। সেখান থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে ডানকার্ক।

জার্মানবাহিনীর এই গতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না মিত্রশক্তির। কিন্তু এই বিজয়াভিযানের মুখে রাণ্ডস্টেট ও গোয়েরিঙ-এর পরামর্শে হিটলার ২৪শে মে একটি মারাত্মক নির্দেশ পাঠালেন, 'নাৎসী বাহিনীকে গতিরুদ্ধ করতে হবে চ্যানেল বরাবর।' হালডার ও ব্রাউচিৎস এই নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। এর ফলে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ামের বিমান ও নৌবাহিনীর এক বিশাল অংশ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। যুদ্ধের গতি বদলে গেল।

হিটলার তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আগের আদেশ বাতিল করে আবার আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ব্রিটিশ নৌবহর এর মধ্যে ডানকার্কে শুরু করেছে অপসারণের কাজ। যাকে বলা হয় 'অপারেশন ডায়নামো।' ৪ঠা জুনের মধ্যে নাৎসী বাহিনীর হাতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেল প্রায় ৩,৩৯০০০ ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য। হিটলারের একটা ভুল নির্দেশে জার্মানীর যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন রুদ্ধ হল। তাই যথার্থই বলা যায় ডানকার্কই ব্রিটেনকে দিল মুক্তির স্বাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে ডানকার্কই সব চেয়ে অলৌকিক ঘটনা বলে চিহ্নিত হল। যুদ্ধের গতি বদলে গেল। ফ্যাসিস্ট নায়ক হিটলারের পতনের হল সূত্রপাত। ৩,৩৯,০০০ ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অপসারণ করতে না পারলে চার্চিল সরকারের পক্ষে প্রচণ্ড জার্মান আক্রমণের মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব হতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহের ব্যাপার। নিয়তির হাতে হিটলার প্রচণ্ড মার খেলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রিটেন চরম সঙ্কটের মুখে পড়ল। ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেল। বিমানবহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ভরসা এখন একমাত্র নৌবাহিনী। কিন্তু চার্চিলের মনোবল ছিল অক্ষুণ্ণ। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্পে তিনি রইলেন

হিটলার অবশ্য চার্চিলের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্পের কথা জানতেন। তিনি এতে আদৌ ভীত হননি। এর মধ্যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য নিরাপদে ডানকার্ক বন্দর থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। ডানকার্ক হিটলার দখল করলেন। ডানকার্কের ভেতর দিয়ে প্রবলগতিতে এগিয়ে গেল নাৎসীবাহিনী। বিধ্বস্ত হলো ফ্রান্স। বিখ্যাত প্যারী নগরীর দখল নিল নাৎসীবাহিনী। ১৬ই জুন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রেনো পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন পেঁতা। পেঁতা নাৎসী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালেন।

ধূর্ত মুসোলিনী সুযোগ বুঝে হিটলারকে চিঠি দিলেন যে তিনি যুদ্ধে যোগদান করতে চান। কিন্তু আপাতত মুসোলিনীর সাহায্য হিটলারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। ১৭ই জুন মুসোলিনী ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ট্রেনযোগে রওনা হলেন। এসেই হিটলারকে প্রস্তাব দিলেন 'ফ্রান্স ইতালী ও জার্মানীর কাছে যুক্তভাবেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করুক।' হিটলার দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মুসোলিনী হতাশ হয়ে রোমে ফিরে গেলেন। তবে হিটলার বললেন ফ্রান্স যেন আলাদাভাবে মুসোলিনীর সঙ্গে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়রীতে লিখলেন, 'এত বড় বিজয়ের পরও হিটলার ছিলেন ধীর, শান্ত···আজ বাধ্য হয়ে তাঁর প্রশংসা করছি; সত্যি তিনি তুলনাবিহীন।' **"Today he speaks with a reserve and perspicuity which after such a victory, are really astonishing. I can not be accused of excessive tenderness toward him, but today I truly admire him."**

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর। জার্মানীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীকে ফ্রান্সের কমপেইনের অরণ্যের মধ্যে এক রেলের কামরাতে সই করতে হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর অপমানজনক চুক্তিতে। ভার্সাই সন্ধি গ্রাস করল জার্মানদের যথাসর্বস্ব। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হিটলার আজ বদ্ধপরিকর। তাই পরাজিত ফ্রান্সকে হিটলার আদেশ দিলেন, সযত্নে রক্ষিত সেই রেলের কামরাতেই ফ্রান্সকে সই করতে হবে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে। উইলিয়ম শাইরারের ভাষায় বলা যায়, **"It was to be on the same spot where the German Empire had capitulated to France and her allies on November, 1918; in the little clearing in the woods at Compiegne. There the Nazi warlord would get his revenge, and the place itself would add to the sweetness of it for him."—p-889.**

২২শে জুন, ১৯৪০। কমপেইনের অরণ্যে সযত্নে রক্ষিত রেলের কামরাতে ২২ বছর পর হিটলার এসে একটি নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রাউচিৎস, কাইটেল, রেডর, রিবেনট্রপ আর রুডলফ হেস।

ফ্রান্সের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য ছিলেন জেনারেল হাণ্টজাইগার। ২২শে জুন হাণ্টজাইগার আর জার্মানীর কাইটেল চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। হাণ্টজাইগার চুক্তিতে স্বাক্ষরের আগে ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ভাগ্যবিড়ম্বিত ফ্রান্সকে আজ এক ভয়ঙ্কর অপমানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হচ্ছে। তবুও তিনি আশা করেন জার্মানী এক উদার নীতির মাধ্যমে তাঁর দেশকে শান্তিতে কাজ করার সুযোগ দেবে।

ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চার বছর ছিল অপরাজিত। সেই ফ্রান্স মাত্র ছ সপ্তাহের

যুদ্ধে হিটলারের কাছে বিধ্বস্ত হল। ইংল্যাণ্ডকে আজ একাই মোকাবিলা করতে হবে নাৎসী নায়ক হিটলারের সঙ্গে।

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ

এরপর হিটলার দৃষ্টি ফেরালেন ব্রিটেনের দিকে। হিটলার ব্রিটেন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাণ্ডাষ্টেডের কাছে ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার অভিপ্রায় তাঁর নেই। তবে ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ চাই জার্মানীর। হিটলারের বিশ্বাস ব্রিটেন তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন।

সুইডেনের রাজার মাধ্যমে এই প্রস্তাব চার্চিলের কাছে পাঠানো হল। চার্চিল হিটলারের প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি হিটলারের এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন। হিটলার ব্রিটেন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আক্রমণের সাংকেতিক নাম দেওয়া হল 'সী লায়ান'। ১৯শে জুলাই হিটলার জ্বালাময়ী ভাষায় দেশবাসীর উদ্দেশ্তে বেতারে ভাষণ দিলেন। ব্রিটেন জয়ের সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন।

এই আক্রমণের ব্লুপ্রিণ্ট তৈরি করলেন জেনারেল কাইটেল। হিটলার ভালো-ভাবেই জানতেন যে জার্মান নৌবাহিনী ব্রিটেনের তুলনায় অনেক হীনবল। তাই ব্রিটেনকে সমুচিত শিক্ষা দিতে গেলে বিমান আক্রমণের মাধ্যমেই তা করতে হবে। ৭ই সেপ্টেম্বর জার্মান বিমানবহর প্রচণ্ড বিক্রমে লণ্ডন শহরের ওপর বোমাবর্ষণ করল। লণ্ডনবাসী আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগলো। তারা বুঝতে পারলো শীঘ্রই হিটলার ফ্রান্সের মত ব্রিটেনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবেন।

কিন্তু ফল হলো বিপরীত। চার্চিল ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন জলপথে ও বিমানপথে আক্রমণ চালাতে। হিটলার ভেবেছিলেন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে ফ্রান্সের মত ব্রিটেনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবেন। ব্রিটিশ নৌবহর ও বিমান বহরের পাল্টা আক্রমণে হিটলার দিশাহারা হয়ে উঠলেন।

ইংলিশ চ্যানেলের প্রধান বন্দর ক্যালে, বুলোন, অষ্টেণ্ড ও শেরবুর্গে অতর্কিত আক্রমণ করে জার্মানীর ৮০টি জাহাজ ডুবিয়ে দিল ব্রিটিশ বিমানবহর। ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ বিমান বহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে ডানকার্কে ৮৪টি জার্মান জলযানের সলিল সমাধি হল। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে জার্মান অস্ত্রাগার প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হল। হিটলার এই প্রথম জোর ধাক্কা খেলেন। তাঁকে ইংল্যাণ্ড জয়ের সংকল্প ত্যাগ করতে হল। আবার নরওয়ের যুদ্ধেও জার্মান নৌবহর প্রচণ্ড আঘাত পেল। ফলে এই নৌবহরের পক্ষে আর ব্রিটেন আক্রমণ করা সম্ভব হল না।

হিটলার 'অপারেশন সী লায়ান' প্রত্যাহার করে নিলেন। চার্চিল ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বৈমানিকদের জানালেন তাঁর অন্তরের গভীর ভালবাসা।

হিটলার এইবার নজর দিলেন পূর্বদিকে। ইংল্যাণ্ড জয়ে হিটলার ব্যর্থ হলেন। বিশ্বের ইতিহাসে ব্রিটিশ সৈন্যদের এরকম বীরত্বের কাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চার্চিলের কূটকৌশলে এবং গোয়েরিঙ-এর ভুল নির্দেশের ফলেই জার্মানীকে বাধ্য হয়ে ব্রিটেনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কথা ত্যাগ করতে হল। "Britain was saved. For merely a thousand years it had successfully defended itself by sea-power."

১৯৪০ সালে হিটলার ব্যস্ত ছিলেন পশ্চিমে। স্ট্যালিন সেই সুযোগে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলেন। দখল করলেন বাল্টিক রাজ্যগুলি। পৌঁছে গেছেন বল্কান অঞ্চলে। স্ট্যালিনের নির্দেশে ইতিমধ্যে ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া ও এস্থোনিয়া দখল করে নিল লালফৌজ। স্ট্যালিন এরপর রুমানিয়াকে দিলেন চরম-পত্র। বেসারভিয়া আর বুকোভিনা সমস্যার সমাধান চায়। হিটলার স্ট্যালিনের মনোভাব বুঝতে পেরে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

পররাজ্য গ্রাস করে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে স্ট্যালিন হিটলারের মতই মতপোষণ করতেন। শাইয়ারার বলেছেন, "Stalin could be as crude and as ruthless in these matters as Hitler and even more cynical."

স্ট্যালিনের পক্ষে অবশ্য এছাড়া উপায়ও ছিল না। তাঁর কাছে দেশের নিরাপত্তাই ছিল প্রথম ও প্রধান। এই সময় চার্চিল স্ট্যালিনকে হিটলারের সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। স্ট্যালিনকে অনুরোধ করেন হিটলারকে বিশ্বাস না করতে।

স্ট্যালিন কিন্তু চার্চিলকে ভুল বুঝলেন। চার্চিলকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বিশ্বাস জার্মানী ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য চেষ্টা করবে না। রুশ-জার্মান বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হবে বলে তিনি মনে করেন না। স্ট্যালিন তখনো বুঝতে পারেননি যে হিটলার মনে মনে স্থির করে রেখেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন এবং রাশিয়াকে কোন সুযোগ না দিয়েই অতর্কিতে আক্রমণ করবেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন রুশশক্তিকে। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে তিনি রাশিয়া আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর।

হিটলার এইবার সেনাধ্যক্ষদের সামনে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। ব্রিটেনের একমাত্র আশা ভরসার স্থল আমেরিকা ও রাশিয়া। রাশিয়াকে শেষ করে দিতে পারলে জাপানের শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হবে দূরপ্রাচ্যে। এর ফলে ব্রিটেনকে সামান্যতম সাহায্য করাও সম্ভব হবে না। ব্রিটেনের শেষ আশাও চূর্ণ হবে। তাই হিটলার ১৯৪১ সালের বসন্তকালের মধ্যে রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণের জন্য ১৩০ ডিভিসন নাৎসী সৈন্য ঠিক করে

রাখলেন। সেই অনুযায়ী তিনি দক্ষিণ পোল্যাণ্ড বরাবর সৈন্য মোতায়েন করতে শুরু করে দিলেন। সুচতুর হিটলার রাশিয়াকে তাঁর মতলব বুঝতে দিলেন না।

১২ই নভেম্বর, ১৯৪০ সাল। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ এলেন বার্লিনে। উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা। স্ট্যালিন এখন হিটলারকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

রুশ-জার্মান সম্পর্কে ধীরে ধীরে চিড় ধরতে আরম্ভ করল। এতদিন স্ট্যালিন ও হিটলার নিজেদের স্বার্থে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে আত্মসাৎ করছিলেন। এইবার আরম্ভ হল দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত। রাশিয়া চলেছে রুমানিয়াকে নিজেদের দখলে আনতে। হিটলার প্রমাদ গুণলেন। হিটলার তাঁর জেনারেলদের নির্দেশ দিলেন যেভাবেই হোক ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে রুমানিয়ার তৈলখনি অঞ্চল জার্মানীর দখলে আনতেই হবে।

স্ট্যালিন পরিস্থিতি বিবেচনা করেই মলোটভকে জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেন। মলোটভ রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে জানালেন যে তিনি অনেক জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এসেছেন। রিবেনট্রপকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, জার্মানীর রুমানিয়া দখলের চেষ্টা রুশ-জার্মান চুক্তির পরিপন্থী। এ ছাড়া জার্মানী ফিনল্যাণ্ড-এ সৈন্য সমাবেশ করতে চলেছে।

জার্মানীতে মলোটভের অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না। বুদ্ধিতে মলোটভ রিবেনট্রপের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। রিবেনট্রপ মলোটভকে জানালেন ব্রিটেন পরাজিত। কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ব্রিটেন কয়েকদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। ব্রিটেনের আত্মসমর্পণের পর জার্মানী, ইতালি, রাশিয়া ও জাপান পরস্পর বন্ধু হিসেবে বাস করবে। অবশ্য মলোটভ রিবেনট্রপের কথাতে ভুলবেন একথা চিন্তা করা বৃথা।

এরপর মলোটভ মিলিত হলেন স্বয়ং হিটলারের সঙ্গে। মলোটভ সরাসরি হিটলারকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি জার্মান সৈন্যবাহিনীকে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের নির্দেশ দিলেন কেন? হিটলার এতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন বটে কিন্তু বুঝতে পারলেন হয়ত ফিনল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। হিটলার ঠিক এই সময়ে তা চান না। তবে হিটলার একটা কথা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন রুশ-জার্মান সংঘর্ষ অনিবার্য। কেননা স্ট্যালিন বা মলোটভকে তিনি আর ভুলিয়ে রাখতে পারবেন না। মলোটভ হিটলারের মনের কথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন। হিটলার যে অবিলম্বে রাশিয়া আক্রমণ করবেন এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন।

মলোটভ দেশে ফিরে গেলেন। হিটলার তাঁর জেনারেলদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। হিটলার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হবার পর ঝটিকা আক্রমণে সোভিয়েত রাশিয়াকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হবে।

কিন্তু ব্রিটেনে ব্যর্থ হিটলার। ভূমধ্যসাগর থেকেও তাঁকে পিছু হটতে হলো।

হিটলার এই সময় সাহায্য চাইলেন স্পেনের ফ্যাসিস্ত নায়ক ফ্রাঙ্কো আর ইতালির মুসোলিনীর কাছে। জিব্রালটার দখলের জন্য হিটলার স্পেনের সাহায্য চেয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কো হিটলারকে নিরাশ করলেন। হিটলার ক্রোধে রিবেনট্রপকে বললেন, 'অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ' জার্মানীর চাটুকার ফ্রাঙ্কো আজ সব ভুলে গেছে। গৃহযুদ্ধের সময় জার্মানী ফ্রাঙ্কোকে উদারভাবে সাহায্য না করলে তাঁর আজ কি পরিণতি হতো? আজ সেই ফ্রাঙ্কোই হিটলারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। হিটলার এইবার ইতালির সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেতে চাইলেন। জানুয়ারী ১৯, ১৯৪১ সালে মুসোলিনী হিটলারের আমন্ত্রণে বার্গফে এলেন।

মুসোলিনী মর্মাহত। মিশরে ও গ্রীসে তিনি সগুপরাজিত। হিটলার অবশ্য আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। হিটলার মুসোলিনীর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় জানালেন যে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি জার্মানীর কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছেন না। রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ১৫৫ ডিভিসন। জার্মানীরও প্রায় তাই। জার্মানীর রাশিয়া জয় সম্পর্কে হিটলার নিশ্চিত ছিলেন।

তাই বসন্তকালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণের জন্য তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সাজিয়ে নিলেন। হিটলার তার আগে বল্কান অঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৪১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি বুলগেরিয়া দখল করলেন।

যুগোশ্লাভাকিয়া দখল করতে গিয়ে হিটলারকে প্রচণ্ড রকমের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জার্মানী যুগোশ্লাভাকিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে এবং সেই দেশের ভেতর দিয়ে জার্মান সৈন্য চলাচল করবে না বলে হিটলারকে কথা দিতে হলো।

এরপরই হিটলার করলেন এক মারাত্মক ভুল। বল্কানের একটি ছোট রাষ্ট্রের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য হিটলার রাশিয়া আক্রমণের সময় পাল্টে দিলেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চার সপ্তাহ পরে হিটলার রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। জেনারেল ব্রাউচিৎস ও জেনারেল হালডার হিটলারকে এই ব্যাপারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিটলার বুঝলেন না। রুশ আক্রমণের সময় চার সপ্তাহ পিছিয়ে দেবার ফলে জার্মানবাহিনীকে রাশিয়ায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে লড়াই করতে হয়েছিল। সেইটাই হল জার্মান সৈন্যদের মৃত্যুবান। উইলিয়ম শাইয়ারার বলেছেন, **"The postponment of the attack on Russia upto four weeks was probably the most catastrophic single decision in Hitler's career."**

যুগোশ্লাভাকিয়াকে শিক্ষা দেবার জন্য এবং বেশ কিছুটা মুসোলিনীর স্বার্থেই হিটলারকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। হিটলার ১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিল যুগোশ্লাভাকিয়া আক্রমণ করেন। যুগোশ্লাভাকিয়াতে তিনদিনে ১৭,০০০ নরনারী নিহত হল। বেলগ্রেড আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

বেলগ্রেডের পতন হিটলারকে রুশ আক্রমণে উৎসাহিত করল। ৩০শে এপ্রিল হিটলার স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন ২২শে জুন ১৯৪১-এ তিনি রাশিয়া আক্রমণ করবেন।

রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর এই যুদ্ধ আদর্শের ও জাতিগত যুদ্ধ। হিটলার ঘোষণা

করলেন রুশনীতি ন্যাশানাল সোশ্যালিজম এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব রাশিয়ার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটাতে হিটলার বদ্ধপরিকর। হিটলার বলতেন, "As Russia's crime was its existence so its judgement was extermination. The war in the West was a traditional war, a war of diplomatic aims... the war in the East was a crusade, a war of ideologies in which all conventions were ignored," হিটলার বুঝতে পারলেন না যে রাশিয়ার মত এইরকম একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

রুশ আক্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা করলেন নাৎসী চিন্তাবিদ্ আলফ্রেড রোজেনবার্গ। ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। রাশিয়ার সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলকে জার্মানীর জন্য খাদ্য যোগাতে হবে। রাশিয়ার লোকের জন্য খাদ্য থাকুক বা না থাকুক তাতে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। জার্মানদের প্রয়োজনে চাই সমস্ত খাদ্য। রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করতে হবে। রুশ শ্রমিকদের পাঠাতে হবে সাইবেরিয়ায়।

রাশিয়া আক্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা করেও নির্দেশ দিয়ে হিটলার চলে এলেন বার্গফে। এইখানে এসে তিনি খবর পেলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রুডলফ হেস ১০ই মে, ১৯৪১ তারিখে এরোপ্লেনে করে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছেন। হিটলার উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করতে লাগলেন। ঘরময় করলেন পায়চারি। হেসকে পাগল বলে প্রচার করলেন। হেস গোয়েরিঙ, গোয়েবলস ও রিবেনট্রপ—এঁদের ঈর্ষার চোখে দেখতেন এবং হিটলারের প্রিয়পাত্র হবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে যান ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য, যাতে ব্রিটেন ও জার্মানী একযোগে রাশিয়া আক্রমণ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। তাঁর এই দৌত্যকার্য সফল হল না। এদিকে হিটলার আদেশ জারি করলেন যে হেস জার্মানীতে এলেই যেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। হেসের আসনে হিটলার নিয়োগ করলেন বোরম্যানকে।

বিচিত্র ইতিহাসের কাহিনী। হিটলারের বিশাল বাহিনী পোল্যাণ্ডে উপস্থিত। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী দখল করল নাৎসী বাহিনী। এতেও স্ট্যালিনের টনক নড়ল না। স্ট্যালিন মলোটভকে রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী করলেন। "Stalin was displeased with the deterioration of German-Soviet relations and blamed Molotov's clumsy diplomacy for much of it."
—William Shirer.

স্ট্যালিন মলোটভকে সরিয়ে দিয়ে পিপলস্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদটি নিজেই গ্রহণ করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও স্ট্যালিনকে জার্মানী সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন কিন্তু তাঁদের কারও কোন কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

২১শে জুন, ১৯৪১। রিবেনট্রপ রাষ্ট্রদূত শুলেনবার্গের কাছে এক গোপন বার্তা পাঠালেন যে, জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করছে ২২শে জুন। শুলেনবার্গ হতবাক্। খবর পাঠালেন মলোটভকে। মলোটভ দিশাহারা হয়ে পড়লেন এই খবর শুনে।

হিটলার মুসোলিনীর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠালেন। মুসোলিনী চিঠি পেয়ে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি শুধু সিয়ানোকে গোপনে জানালেন যে এই যুদ্ধে জার্মানী যেন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে। ২২শে জুন, রবিবার, ১৯১২ সালে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন। এত দীর্ঘদিন পর জার্মানীও একই দিনে রাশিয়া আক্রমণ করল।

হিটলারের বিশাল নাৎসীবাহিনী তীব্রবেগে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। রাশিয়ার লালফৌজের বাধা দেবার ক্ষমতা কোথায়? রুশ বিমানবহর বিমান ক্ষেত্রেই ধ্বংস হল। নাৎসীবাহিনী দখল করল বিস্তীর্ণ রুশ অঞ্চল। ধাবিত হল ইউক্রেনের দিকে। ইউক্রেনকে রাশিয়ার গ্রেনারী বা শস্যভাণ্ডার বলা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বিশাল রুশ সৈন্য বিধ্বস্ত হলো। ইউক্রেন এলো নাৎসীবাহিনীর দখলে। হাজার হাজার রুশসৈন্য বন্দী হলো। বিশাল রুশবাহিনী জার্মান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হলো। জেনারেল হালডার তাঁর ডায়রীতে লিখলেন মাত্র ১৪ দিনের যুদ্ধে রাশিয়া বিধ্বস্ত হলো।

হিটলার ভাবলেন রাশিয়া শেষ হয়ে গেছে। অতএব তিনি নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। ৮ই অক্টোবর হিটলার তাঁর অধিকর্তা অটো ডিয়েট্রিচকে বার্লিনে পাঠালেন। হিটলার ডিয়েট্রিচকে জানিয়ে দেন যে তিনি যেন সকলকে জানিয়ে দেন মস্কো রক্ষাকারী টিমোশোর শেষ রুশবাহিনী ধ্বংসপ্রায়। মার্শাল বুঁদেনীর বাহিনী নিশ্চিহ্ন। আর লেনিনগ্রাদে ভরোশিলভের প্রায় সত্তর ডিভিসন সৈন্য জার্মান সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত। হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করলেন রাশিয়ার অস্তিমলগ্ন সমুপস্থিত।

এইখানেই হিটলার প্রচণ্ড রকমের ভুল করলেন। হিটলার রাশিয়ার শক্তিকে ছোট করে দেখেছিলেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে জার্মান জেনারেলরা রাশিয়া আক্রমণে হিটলারের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়নি। তারা বুঝতে পেরেছিল যে হিটলারের এই আগ্রাসী নীতি জার্মানীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তারা চাইল হিটলারকে খতম করে দিতে। ১৯২৪ সালে হিটলার যখন জেলে বসে 'মেইন ক্যাম্ফ' লেখেন তখন তিনি সেনাপতিদের ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন এবং তাদের দিয়ে তিনি জার্মানীকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

হিটলারের সেই আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। ট্রেবর রোপার বলেছেন, "The General staff was not content to be a mighty instrument of his policy it had a policy of its own." হিটলার কূটকৌশলে জেনারেলদের কিছুটা অবদমিত করেছিলেন সত্যি কিন্তু তাদের জয় করতে পারেননি।

১৯৩৮ সালে Munich crisis-এর সময় চেকোস্লোভাকিয়ার অধিকার নিয়ে যে অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় জেনারেল হালডারের নেতৃত্বে বেশ কিছু জেনারেল হিটলারের মৃত্যু ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তারপর থেকে সেনাপতিরা বেশ কয়েক বছর হিটলারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। হিটলারের

হুকুমেই তাদের চলতে হয়েছে। রাশিয়া আক্রমণের পূর্বে জেনারেলরা আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। অবশ্য তিনি একে একে জার্মান সেনাপতিদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠলেন। তিনি জেনারেলদের বোঝালেন যে, "That Russia could resist the German armies seemed to him ridiculous belief." "You have only kicked the front door, he declared and the whole house will tremble down."

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? হিটলারের এই দম্ভ অনেকটাই ছিল মিথ্যা আস্ফালন মাত্র। ইতিহাস তার সাক্ষী। কেন না দরজায় পদাঘাত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। জুলাই-এর মাঝামাঝি। হিটলার সেনাপতিদের লেলিনগ্রাদ আক্রমণের হুকুম-জারি করলেন। এটাও হিটলারের এক বিরাট কৌশলগত ভুল। তাঁর সেনাপতিরা চেয়েছিলেন মস্কো আক্রমণ করতে। তার জন্য তাঁরা ব্লুপ্রিণ্টও তৈরি করে রেখে-ছিলেন। হিটলারকে ব্রাউচিৎস ও হালভার তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানালেন কিন্তু তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতে নারাজ। সেনাপতিদের প্রতি করলেন বিষোদ্গার। ব্রাউচিৎস চাইলেন পদত্যাগ করতে। হালভারের অনুরোধে তিনি তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। এবার জেনারেল গুডেরিয়ান হিটলারকে বুঝাতে চাইলেন। শীতে মস্কো অভিযানের পরামর্শ দিলেন। হিটলার অনড়। তিনি আগে লেলিনগ্রাদ দখল করতে বদ্ধপরিকর। বাধ্য হয়ে জেনারেলরা হিটলারের আদেশ মেনে নিলেন। বিজয় গৌরবে জার্মান সৈন্য কিয়েভ অধিকার করল। লেনিনগ্রাদ শহরকে অবরোধ করে রাখল। নাৎসী বাহিনীর হাতে ২,৬৫,০০০ হাজার রুশসৈন্য বন্দী হল। এই জয় সত্ত্বেও স্মোলেনস্কের কিছু দূরে জার্মান বাহিনী থমকে দাঁড়ালো। নেমে এলো শরতের বৃষ্টিধারা।

এইবার হিটলার বুঝতে পারলেন তিনি কি মারাত্মক ভুল করেছেন। হালভার, ব্রাউচিৎস আর বেকের চাপে তিনি মস্কো অভিযান শুরু করার আদেশ দিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর হিটলার হুকুমজারি করলেন ৮।১০ দিনের মধ্যেই মস্কো অভিযান শেষ করতে হবে। এটা যে অসম্ভব ব্যাপার তা হিটলার বুঝলেন না।

নাৎসীবাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে মস্কো অভিমুখে ধাবিত হলো। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সাড়ে ছয় লক্ষ রুশসৈন্যকে বন্দী করা হল। নাৎসীবাহিনী দখল করল প্রচুর ট্যাঙ্ক, কামান ও গোলাবারুদ। নাৎসী বাহিনীকে হঠাৎ স্তব্ধ করে দিল রুশসৈন্য নয়, প্রকৃতি। ভগবানের অমোঘ বিধান নাৎসী বাহিনীর ওপর নেমে এল। শরতের শেষ। আরম্ভ হয়েছে বৃষ্টি ও তুষারপাত। নাৎসী বাহিনীকে যেন কোন এক জাদুকর মন্ত্রবলে স্তব্ধ করে দিল। হিটলারের সেনাপতিরা নেপোলিয়ানের কথাই স্মরণ করতে লাগলেন। প্রকৃতির বিরূপতার জন্য নেপোলিয়ানকে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জয়ের আশা ত্যাগ করতে হয়েছিল। হিটলারের এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি ছিল। নেপোলিয়ানের পরাজয়ের কথা চিন্তা করে হিটলার যে মাসেই রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁকে এই আক্রমণের সময় এক

মাসের ওপর পিছিয়ে দিতে হয়। তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হল। যার ফলে হিটলারের রুশ অভিযান বিফল হয়ে পড়ল। হিটলার চেয়েছিলেন শীতের আগেই রুশ অভিযান শেষ করতে। কিন্তু তা হল না।

বৃষ্টি ও তুষারঝড়ে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে কামান নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নাৎসী বাহিনীর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হল না। প্রথমে শীতের আগে যে বিক্রমে তারা এগোচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবী ভেবেছিল রাশিয়ার পতন অবধারিত। রুশ জেনারেল জুকভ রুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় নাৎসীবাহিনীকে আঘাত করার জন্য তৈরী হয়ে রইলেন। নভেম্বর মাস। বৃষ্টি, তুষার ঝড়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সব কিছুকে উপেক্ষা করে নাৎসীবাহিনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। হিটলারের হুকুম ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১-এর মধ্যে অভিযান শেষ করতে হবে। এর মধ্যেই রাশিয়ার প্রায় এক তৃতীয়াংশ জার্মানীর দখলে এসে গেল। ইউক্রেন তো বহুদিন জার্মানদের দখলেই ছিল। ইউক্রেনে জার্মান শাসন ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর। জেনারেল গুডেরিয়ান মস্কোর দক্ষিণ দিক থেকে জানালেন তাপমাত্রা শূন্যের ২১ ডিগ্রী নীচে, পরদিন আরো কমে গেল। নাৎসীবাহিনী তখন মস্কোর ৩০ মাইলের মধ্যেই। হিটলার তখন পূর্ব রাশিয়ায় নিজের আস্তানায়। ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছেন আর ভাবছেন কয়েকদিনের মধ্যেই মস্কোর পতন অবধারিত।

৫ই ডিসেম্বর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নাৎসীবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল। সেনাধ্যক্ষ টিমোসেঙ্কোর জায়গায় এলেন জেনারেল জর্জি জুকভ। জুকভ তখনো পর্যন্ত তেমন কোন খ্যাতি অর্জন করেননি। সুযোগ বুঝে জুকভ ১০০ ডিভিশন রুশসৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নাৎসীবাহিনীর উপর। বিধ্বস্ত হলো নাৎসীবাহিনী। যেমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ানের অজেয় ফরাসী সেনা ১৮১২ সালে এই রাশিয়াতে। মস্কোর দ্বারপ্রান্ত থেকে জার্মান বাহিনীকে হটতে হলো। হিটলারের দর্প হল চূর্ণ।

একদিকে প্রচণ্ড শীত অন্যদিকে বীর রুশ সেনাবাহিনীর পরাক্রম ও রুশবাসীদের দেশপ্রেম হিটলারের মুখে চুনকালি লেপে দিল। মস্কো অভিযান ব্যর্থ হলো। এই আক্রমণ যে কেবল ব্যর্থ হলো তাই নয়, এই পরাজয়ের ফলে জার্মানীকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। সমস্ত নাৎসীবাহিনীর শতকরা ৩২ ভাগ ধ্বংস হলো। অঙ্কের সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নিহত হল, ১০,১০,৩৯৬ জন সৈনিক। কেবলমাত্র 'ফ্রস্ট বাইটে' অর্থাৎ প্রচণ্ড তুষারপাতে মারা গেল ১,১২,৬২৭ জন জার্মান সৈন্য।

শীতের শেষে এলো বসন্ত। হিটলার চাইলেন নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করতে। জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন রাশিয়া জয়ের যে জুয়া-খেলায় তিনি মেতেছেন তাতে তিনি সফল হবেন না।

হিটলার চেয়েছিলেন জাপানকে রাশিয়া আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে। জার্মানপ্রেমিক জাপানী রাষ্ট্রদূত ইয়োসুক মাৎসুওকাকে হিটলার অনুরোধ করলেন

তিনি যেন জাপানকে রাশিয়া আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জঙ্গী জাপান সরকার এতে আমল দিল না। মাৎসুওকার উল্টে পতন ঘটল।

হিটলার যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে চাইতেন এবং তিনি জানতেন একমাত্র জাপানই এই কাজটি করতে পারে। ১৩ই এপ্রিল ১৯৪১ স্ট্যালিনের সঙ্গে রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হিটলার এই চুক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। শত চেষ্টা করেও হিটলার জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারলেন না। জাপান আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপ-মার্কিন স্বার্থে চুক্তি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এর মধ্যে ১৬ই অক্টোবর কনোয়ে সরকারের পতন ঘটল। ক্ষমতায় এলেন কট্টর আমেরিকা বিরোধী হিদেকি তোজো। হিটলারের মন আনন্দে নেচে উঠল। তবে তিনি চেয়েছিলেন বৃটেন ও রাশিয়াকে পরাজিত করে জাপানের সহযোগিতায় আমেরিকা আক্রমণ কবতে। তাঁর সেই আশা অবশ্য ব্যর্থ হলো। তোজো আমেরিকা আক্রমণের দিন ক্ষণ স্থির করে রেখেছেন। অথচ হিটলার শত চেষ্টা করেও জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামাতে পারলেন না।

তোজোর নির্দেশে ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ রবিবার সকাল সাড়ে সাতটায় জাপান বিদ্যুৎগতিতে পার্ল হারবার আক্রমণ করল, যা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেবিকার বিশাল ও অন্যতম শক্তিশালী নৌঘাঁটি।

হিটলার ক্ষুব্ধ হলেন। তবে তিনি তা বাইরে প্রকাশ করলেন না। বরঞ্চ জাপানের রাষ্ট্রদূত ওসিমাকে ডেকে জানালেন যে জাপান যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ কবে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। রাইখষ্ট্যাগের সামনে বিশাল জনসমাবেশে হিটলার ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। ঐদিনই জার্মানী, জাপান আর ইতালির মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। জার্মানী, ইতালি আর জাপান শপথ নিলো যে বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্তি না ঘটলে কেউ অস্ত্রসম্বরণ করবে না। অ্যাডমিরাল রেডার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে স্বাগত জানালেন।

জেনারেল হালডার কিন্তু এর মধ্যে জার্মানীর ধ্বংসের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। তিনি বলে উঠলেন, ঘনিয়ে এল জার্মানীর আরও একটি অন্ধকারময় দিন।

শীতে নাৎসী সৈন্যরা প্রচণ্ড বাধা পেল রুশ সৈন্যদেব কাছে। হিটলারের বিপুল-সংখ্যক নাৎসীবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আহত হল ততোধিক। হিটলার ও তাঁর কট্টর অনুচর গোয়েরিঙ হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও ইতালির কাছে সৈন্য পাঠাবার জন্য আবেদন জানালেন। জানুয়ারীর শেষে গোয়েরিঙ রোমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসোলিনীকে সবকিছু খুলে বললেন। ১৯৪২-এর ২১শে ও ৩০শে এপ্রিল মুসোলিনী হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন সালজবুর্গে। রুশ অভিযানে হিটলারকে দুই ডিভিসন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। হিটলার অবশ্য প্রথমে সম্মতি দিলেন না। তিনি ভাবলেন তাহলে মুসোলিনী তাঁর দুর্বলতার কথা জানতে পারবেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর সম্মতি দিলেন।

হিটলার তাঁর প্রিয় জেনারেল রোমেলকে আফ্রিকায় ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন। দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করার মত সৈন্যসংখ্যা বা ক্ষমতা হিটলারের ছিল না। তবুও হিটলার তার সংকল্পে অটল। রাশিয়া ও ব্রিটেন দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রকেই তিনি একই সঙ্গে ধরাশায়ী করবেন। হিটলারের মাথায় যেন ভূত চাপলো।

রোমেলকে বলা হত মরুশৃগাল। সত্যিই তিনি তাই ছিলেন। রোমেলের নেতৃত্বে নাৎসীবাহিনীর প্রবল আক্রমণে আফ্রিকার বুকে ব্রিটিশ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ১৯৪২-এর ২১শে জুন, রোমেল দখল করলেন তব্রুক। দুদিন পরেই প্রবেশ করলেন মিশরে। প্রচণ্ড গতিতে রোমেল তাঁর 'আফ্রিকান কোর' নিয়ে চললেন ককেসাসের দিকে। রোমেলের দরকার ছিল আরও কয়েক ডিভিসন সৈন্য। তিনি তা হিটলারকে জানালেন।

আফ্রিকা বিজয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভূমধ্যসাগরের বুকে সিসিলি আর লিবিয়ার মাঝখানে মাল্টা দ্বীপ। ১৯৪১ সালের শেষে রোমেলের সরবরাহের প্রায় ৬৩ ভাগ ধ্বংস হয়ে গেল শত্রু আক্রমণে। মাল্টার গুরুত্ব হিটলার বুঝতে পারলেন না। অ্যাডমিরাল রেডার সেই মুহূর্তেই মাল্টা দ্বীপে প্যারাসুট বাহিনীকে নামিয়ে দিয়ে মাল্টা দখল করে নিতে অনুরোধ জানালেন। ১৯৪২-এর ১৫ই জুন, হিটলার কোন এক অজ্ঞাত কারণে মাল্টা আক্রমণ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। ১৬ই জুন ব্রিটিশ নৌবহর মার্কিণ বিমান বহরের সহায়তায় মাল্টা দ্বীপে অবতরণ করল। ৩রা জুলাই রোমেল চরম হতাশায় বললেন, 'আমাদের শক্তি নিঃশেষ।'

এরপরও হিটলার আর একটি মস্ত ভুল করলেন। ২৩শে জুলাই স্ট্যালিনগ্রাদে প্রচণ্ড নাৎসী আক্রমণে রুশবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হিটলার স্থির করতে পারলেন না তিনি কি কেবল স্ট্যালিনগ্রাদ দখলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন না ককেসাসের তৈলখনি অঞ্চলে ও স্ট্যালিনগ্রাদে একই সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে দুটো জায়গাই দখল করবেন! তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন না দুইদিকে যুদ্ধ চালাবার মত ক্ষমতা তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেই। হিটলার একটু চিন্তাভাবনা করে দুইদিকে সৈন্য পরিচালনা করার নির্দেশ দিলেন। এর ফল হলো মারাত্মক। জেনারেল হালডার ১৬ই জুলাই ভিনিৎসায় হিটলারের সদর দপ্তরে পৌঁছলেন। হালডার পরিস্থিতি বিবেচনা করে হিটলারকে কেবলমাত্র স্ট্যালিনগ্রাদ আক্রমণের আদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। হালডার ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন নাৎসীবাহিনীর পক্ষে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এতে নাৎসীবাহিনীর পরাজয় অনিবার্য। হালডারের কথাতে হিটলার কর্ণপাত করলেন না। হালডারকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হল।

স্ট্যালিনগ্রাদ দখলের জন্য নাৎসী বাহিনীকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হল। সারা অক্টোবর মাস স্ট্যালিনগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় চলল হাতাহাতি যুদ্ধ। হিটলার স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন।' ককেসাস ও স্ট্যালিনগ্রাদ দুটো স্থান একসঙ্গে দখল করতে গিয়ে হিটলার নিজের ফাঁদে পা দিলেন। রাশিয়া-জয়ের ক্ষীণ আশাও নির্মূল হল কেবলমাত্র হিটলারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। Antonny Brett

James বলেছেন, "The German High Command should have chosen one or the other—the Caucasus or Stalingrad. Instead, they resolved to tackle both simultaneously, and is so doing they eventually stretched their resources to the limit and beyond."

৩১শে আগষ্ট রোমেল প্রচণ্ড বিক্রমে ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালেন। ব্রিটিশ বাহিনী বিপর্যস্ত হলো। কিন্তু মার্কিন ট্যাঙ্কের সহায়তায় ব্রিটিশ-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ হানল। রোমেল পিছু হটতে বাধ্য হলেন। রোমেল ফুয়েরার কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন। জানিয়ে দিলেন পিছুহটা ছাড়া কোন উপায় নেই। হিটলার প্রত্যুত্তরে জানালেন রোমেলকে সৈন্যবাহিনীসহ এগিয়ে যেতে, থমকে দাঁড়ানো চলবে না। হয় মৃত্যু, না হয় জয়। রোমেল কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না! শেষে উপায়ন্তর না থেকে হিটলারের নির্দেশকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের পিছু হটতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর অধীনে বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রাণে বাঁচলো।

রোমেলের পরাজয়ের সংবাদে হিটলার চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার চেয়েও অধিক চিন্তায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, যখন খবর পেলেন আমেরিকা ও ব্রিটেনের সম্মিলিত বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করতে আরম্ভ করেছে। এইবার হিটলার বুঝতে পারলেন তাঁর সামনে ভীষণ বিপদ। ১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী দুপুরে মরক্কো ও আলজিরিয়ার সমুদ্রকূলে অবতরণ করতে আরম্ভ করল। হিটলার আদেশজারি করলেন সমগ্র ফ্রান্স দখল করে নিতে হবে জার্মানবাহিনীর। অবতরণ করতে হবে কর্সিকা ও তিউনিসিয়ায়।

আইসেনহাওয়ারের আগে তিউনিসিয়া দখল করে নিল হিটলার। কিন্তু বৃথা এই জয়। কয়েকমাস আগে রোমেলের সাহায্যার্থে কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাঠালে হিটলারকে আজ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

হিটলারের একের পর এক মারাত্মক ভুল নির্দেশের পরিণতি তাঁর হাজার বছরের স্বপ্নের রাইখের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। হিটলার তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ জেনারেলসহ আলপাইনের সুন্দর পরিবেশে তাঁরই বাসভবন বেরস্টেগাডনে কিছুদিন অতিবাহিত করার কথা চিন্তা করছিলেন। হায় বিধাতা! মানুষ ভাবে এক হয়ে যায় আর এক। ১৯শে নভেম্বর, প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে রুশসৈন্য মরিয়া হয়ে নাৎসীবাহিনীকে স্ট্যালিনগ্রাদে আক্রমণ করল। একদিকে তুষার বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীত। অন্যদিকে রুশ সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাত। নাৎসীবাহিনীর নাভিশ্বাস আরম্ভ হল। জেনারেল জিৎসালার হিটলারকে অনুরোধ করে বললেন স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানীর জয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই হিটলার যেন ষষ্ঠ বাহিনীকে পিছু হটার জন্য নির্দেশ দেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাজার হাজার সৈন্য মৃতপ্রায়। "বিশাল নাৎসী সেনাবাহিনীকে অহেতুক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে দিন, দেশের স্বার্থে"। হিটলার কিন্তু অনমনীয়। তাঁর নির্দেশ

পশ্চাদপসারণ কিছুতেই নয়। অথচ স্ট্যালিনগ্রাদে নাৎসীবাহিনী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ।

১৯৪৩ সাল, ৮ই জানুয়ারী। রুশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রাকোসভস্কি নাৎসী জেনারেল পলাশকে জানিয়ে দিলেন জার্মান সৈন্যবাহিনী অবরুদ্ধ। তাদের জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। অবিলম্বে পলাশ যেন আত্মসমর্পণ করেন। তাহলে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। পলাশ নিরুপায়। ফুয়েরার পলাশের কোন কথাই কর্ণপাত করলেন না। ফলে রুশসৈন্য প্রচণ্ডবেগে নাৎসীবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু।

জার্মান ষষ্ঠবাহিনী নিশ্চিহ্ন হলো। ৩রা ফেব্রুয়ারী নাৎসীবাহিনী পলাশের নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। বার্লিন বেতারে ঘোষণা করা হল স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতি জার্মানদের ঠেলে নিয়ে গেল মৃত্যুর দিকে।

একদিকে মরুশৃগাল রোমেলের আফ্রিকায় পরাজয় আর একদিকে পলাশের স্ট্যালিনগ্রাদে। এই দুই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে হিটলার তাঁর তৃতীয় রাইখের মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। হিটলার দিশাহারা হয়ে পড়লেন। নতুনভাবে তিনি জার্মানীর অধীনে বিভিন্ন যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতে লাগলেন। হিটলার যেন পাগল হয়ে গেলেন। লক্ষ লক্ষ ইহুদী ও রুশবন্দীদের বিভিন্ন বন্দী-শিবিরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশের নাম দেওয়া হল 'New Order' বা নববিধান।

রাশিয়াতে যখন জার্মান সৈন্য একের পর এক জায়গা অধিকার করে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় অনেক জায়গায় রুশ অধিবাসীরা হিটলারকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল। রাশিয়ার অনেক বুদ্ধিজীবীও হিটলারকে স্বাগত জানিয়েছিল। স্ট্যালিনের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হয়ত বেশ কিছু লোক হিটলারকে রুশ আক্রমণে সহায়তা করেছেন নিজেদেরই স্বার্থে। কেননা সদ্য-প্রাপ্ত রুশ স্বাধীনতাকে নষ্ট করার জন্য তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ওৎ পেতে ছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য স্ট্যালিনকে নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ স্বার্থান্বেষী লোককে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে, বহুসংখ্যককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে স্ট্যালিন দেশকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

উইলিয়ম শাইরারার বলেছেন, 'When the German troops first entered in Russia they were in many places hailed as liberators by a population long ground down and terrorized by Stalin's tyranny' —P.-1118

হিটলার কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি রাশিয়ার মুক্তিদাতা হিসাবে উপস্থিত হননি। অবতীর্ণ হয়েছিলেন এক নিষ্ঠুর খুনীর ভূমিকায়। হিটলার চেয়েছিলেন, সমস্ত ইউরোপের প্রভু হতে। ইহুদী ও স্লাভদের চেয়েছিলেন নিশ্চিহ্ন

করতে। শুধু কি তাই? পূর্বদিকের শ্রেষ্ঠ শহর মস্কো, লেনিনগ্রাদ আর ওয়ারশ প্রভৃতিকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। রুশদের চেয়েছিলেন জার্মানীর দাস-এ পরিণত করতে। এখানেই হিটলারের সঙ্গে নেপোলিয়ানের তফাৎ।

নেপোলিয়ানকে গ্রীস, জার্মানী, ইতালী ও তুরস্কের নিষ্পেষিত লোকেরা তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর হিটলারকে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সর্বস্তরের লোক প্রথমে যেভাবেই দেখুক না কেন, পরে তারা তাকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তাই শাইয়ারার বলেছেন, 'But the savagery of the Nazi occupation and the obvious aims of the German conquerers, often publicly proclaimed to plunder the Russian lands, enslave their peoples and colonize the East with Germans soon destroyed any possibility of such a development'.—P-1119.

বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে প্রথম তিন বৎসর হিটলারের নাৎসীবাহিনী ইউরোপে প্রচণ্ড ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। মনে হচ্ছিল হিটলার হয়ত সমস্ত বিশ্ব জয় করে নেবেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। মে মাসে তিউনিসিয়ার অক্ষশক্তি প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। আইসেনহাওয়ার যে এইবার ইতালির দিকে মুখ ফেরাবেন তাতে আর কারও সন্দেহ রইল না। নাৎসী-বাহিনী রাশিয়ায় জোর ধাক্কা খেল।

এইদিকে ইতালির জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী পরাজয়ের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। ইতালিবাসী ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। চাইল ফ্যাসিস্ট সরকারের ধ্বংস।

ভীতসন্ত্রস্ত মুসোলিনী হিটলারকে চাপ দিতে লাগলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে। হিটলার মুসোলিনীর ভাবগতি বুঝতে পেরে তাঁকে অভয় দিয়ে যেতে লাগলেন। বাস্তবে মুসোলিনীর অবস্থা গুরুতর। সিসিলিতে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীর সম্মিলিত শক্তির কাছে প্রচণ্ড মার খেল ইতালির সেনাবাহিনী। বিদ্রোহী ফ্যাসিস্ত নেতা জিউসেপ বোত্তাই, কিনো গ্র্যাণ্ডি ও সিয়ানো অবিলম্বেই ফ্যাসিস্ত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল ভেঙ্গে দেবার দাবি জানালেন।

মুসোলিনীকে পদচ্যুত করা হল। গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল জেলে। পতন ঘটল ইতালির আধুনিক সীজারের। ইতালির একটি লোকও মুসোলিনীর এই পরিণতিতে ব্যথিত হলো না। ফ্যাসিস্ত দলকে নিষিদ্ধ করা হলো। মার্শাল বাদোগলিও ক্ষমতা দখল করে গঠন করলেন নির্দল মন্ত্রীসভা।

মুসোলিনীর পতনের খবর হিটলারের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এসে উপস্থিত হল। ইতালির দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নাৎসীকবলিত। বাদোগলিও আশ্রয় নিলেন দক্ষিণ ইতালিতে। তিনি মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মুসোলিনীকে বন্দী করে রাখা হল অ্যাপেনাইন পর্বত শিখরের এক হোটেলে।

হিটলার মুসোলিনীকে উদ্ধার করার জন্য হিমলারকে নির্দেশ দিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর এস. এস. বাহিনীর এক দুঃসাহসী পাইলট করজেনীকে হিটলার নির্দেশ দিলেন মুসোলিনীকে যে কোন উপায়ে উদ্ধার করে আনতে হবে। হিটলার পরিকল্পনা করে নকশা তৈরী করে দিলেন। সেইভাবে কাজও হল। বিনা রক্তপাতে মুসোলিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে এল করজেনী। এটা কি রকম দুঃসাহসিক কাজ তা ভাবতেও অবাক লাগে। মুসোলিনীকে পর্বতঘেরা পাহারারত জায়গা থেকে উদ্ধার করার জন্য করজেনী পুরস্কৃত হলেন। অবশ্য নিঃসন্দেহে তিনি পুরস্কার পাবার যোগ্যও বটে। এ যেন 'আর্থার কোনান ডয়েল'-এর কাহিনীকে [illegible] ছুরিয়ে দেয়।

হিটলার চেয়েছিলেন মুসোলিনিকে নিয়ে [illegible] আবার ফ্যাসিস্ত দলকে উজ্জীবিত করে তুলতে। কিন্তু মুসোলিনীর আর পূর্বের ক্ষমতা নেই। তিনি এখন রুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। হিটলার বুঝতে পারলেন তাঁকে দিয়ে আর কোন সুবিধে হবে না। মুসোলিনীকে তিনি খরচের খাতায় লিখে রাখলেন। অথচ এই মুসোলিনীর জন্য হিটলারকে রাশিয়া আক্রমণের দিন পিছাতে হয়েছিল, যার ফলে নাৎসী সৈন্যদলকে রাশিয়ার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, শিকার হতে হয়েছিল বিরূপ প্রকৃতির। যা নিয়ে এল নাৎসী বাহিনীর অনিবার্য পরাজয়।

পরে অবশ্য হিটলার মুসোলিনীকে দিয়েই ইতালিতে ফ্যাসিস্ত পার্টি গঠন করলেন। এর মধ্যে হিটলার ও গোয়েবলস্-এর নির্দেশে মুসোলিনী তাঁর জামাতা সিয়ানো ও কন্যা এডার সাথে একটা মিটমাট করে ফেললেন। বাবার কথার উপর ভরসা করে এডা সিয়ানোকে নিয়ে মিউনেকে এসেছিলেন। সিয়ানো ছিলেন ইতালির বিদেশমন্ত্রী। মুসোলিনীকে গদিচ্যুত করার পিছনে সিয়ানোর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মিউনিকে আসার পর সিয়ানো তাঁর শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে আপোষ করে নিলেন। ভেবেছিলেন শ্বশুর তাঁকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু হিটলার মুসোলিনীকে সিয়ানোর মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করলেন।

সিয়ানোকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। হিটলারের পরিকল্পনা মতো জার্মান অধিকৃত ইতালিতে 'ফ্যাসিস্ত রিপাব্লিক পার্টি' গঠন করা হলো এবং মুসোলিনীকে সে রিপাব্লিকের নেতা নির্বাচিত করা হলো। 'For Hitler had insisted that the Duce would immediately create such a party and in September 15, at the Fuehrer's prodding, Mussolini proclaimed the new Italian Social Republic.'

মুসোলিনী এখন হিটলারের হাতের পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নয়। নতুন ইতালির ফ্যাসিস্ত পার্টি গঠন করা হলো সত্যি কিন্তু মুসোলিনী রোমে যেতে পারলেন না। আর ইতালির লোকও তাঁকে চাইছে এমন কথা বলা যাবে না। নাৎসী বাহিনীর সহায়তায় এবং এই বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ইতালির উত্তর সীমান্তেই গার্ডা হ্রদের 'রোকাজেলে ক্যাবিনেট' নামক একটি ক্ষুদ্র জায়গাতেই মুসোলিনী তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন

করলেন। "He, Mussolini never returned to Rome. He set himself up at an isolated spot in the extreme north—at Roccadelle Caminate, on the shores of Lake Garda, where he was closely guarded by a special detachmant of the S. S."—William Shirer

পদচ্যুত প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ হালডার লিখলেন সামরিক দিক থেকে যুদ্ধ জার্মানীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। রাশিয়া ও মিত্রশক্তির সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা হিটলার হারিয়ে ফেলেছেন। এই প্রথম গোয়েবলস্ হিটলারকে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। জার্মানীতেও হিটলারের বিরোধী শক্তি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। জার্মানীর ছাত্রসমাজ যারা হিটলারকে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেছিল তারা এখন হিটলারকে গদিচ্যুত করার জন্য জোর আন্দোলন শুরু করল। জার্মানীর রাস্তায় রাস্তায় হিটলার বিরোধী পোস্টার পড়তে আরম্ভ করল। "But ten years of Hitler's rule had brought disillusionment, and this was sharpened by the failure of Germany to win the war and particularly, as 1943 came by the disaster of Stalingrad. The University of Munich, the city that have given birth to Nazism, became the hotbed of student revolt."—William Shirer.

১৯৪৪ সালের শুরুতে রুশবাহিনী প্রায় রাশিয়ার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল। সুযোগ বুঝে হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল বেশ কিছু জার্মান। ১৯৪৩ সালের মধ্যে হিটলারকে মারার জন্য অন্তত ছয়বার চেষ্টা চালানো হয়। বিমানে টাইম বোমা রেখেও তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। তা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা প্রথমে জেনারেল পলাশকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। পলাশ ফুয়েরার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে জড়িত হতে চাননি। তিনি চক্রান্তকারীদের সাবধান করে দিলেন। এমন সময় হিটলারের বিরোধীপক্ষ সন্ধান পেলেন হিটলার বিদ্বেষী এক যুবকের। তাঁর নাম স্ট্যাউফেনবার্গ। হিটলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা অনেক দিন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। সুযোগের অভাবে তা তিনি এতদিন কার্যে পরিণত করতে পারেননি। হিটলারকে স্বহস্তে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন তিনি। হিটলার ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে তাঁকে মারার ষড়যন্ত্র করছে কয়েকজন জেনারেল।

ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝেছিলেন যে হিটলারকে হত্যা করতে হলে তা করতে হবে তাঁরই নিজ কক্ষে। কেন না সেখানে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেন। জেনারেল অলব্রিখট, জেনারেল স্টীফ আর জেনারেল ফেলজিবেলের সঙ্গে স্টাউফেনবার্গ দেখা করলেন। তাঁরাও হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন কিংবদন্তী মরুশৃগাল রোমেলের এখন আর হিটলারের ওপর কোন আস্থা নেই। তিনি মনেপ্রাণে চান জার্মানীকে হিটলারের হাত থেকে মুক্ত করতে। ষড়যন্ত্রকারীরা রোমেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী

মাসের শেষ দিকে উলম-এর সন্নিকটে রোমেলের হারলিনজেনের বাড়িতে জেনারেল স্পাইডেল দেখা করেন। প্রথমে রোমেল এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চাননি। পরিস্থিতির চাপে পড়ে রোমেল মত দিলেন। জেনারেল স্পাইডেল, নিউরথ ও স্ট্যালিন রোমেলকে হিটলারের মৃত্যুর পর জার্মান আর্মির কমাণ্ডার ইন চীফ হিসেবে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন।

নাৎসীবাহিনী সমগ্র ইউরোপে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। রুশ আর মিত্রবাহিনীর অনবরত বোমাবর্ষণে জার্মানীর জনজীবন তখন বিপর্যস্ত। জার্মানীর সাধারণ লোকও হিটলারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে মিত্রবাহিনী প্রচুর সৈন্যসমাবেশ করে ফেলেছে। এই শত্রু-সৈন্যদের মোকাবিলা করার জন্য হিটলার সপ্তমবাহিনী ও ১২তম প্যাঞ্জার বাহিনীর ওপর দায়িত্ব দিলেন। ফিল্ডমার্শাল রোমেলের ওপরই নাৎসীবাহিনীকে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল। রোমেল বুঝতে পারলেন নাৎসীবাহিনীর পক্ষে রুশ ও মিত্রবাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। রোমেল হিটলারকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং নাৎসীবাহিনীকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দেবার জন্য রোমেলকে ক্ষমতা দেন। হিটলার রোমেলের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। রোমেলকে রুশ এবং মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে নির্দেশ দিলেন। রোমেল এইবার স্পাইডেলকে গোপনে জানিয়ে দিলেন যে হিটলারকে অবিলম্বে হত্যা করতে না পারলে জার্মানীর ধ্বংস অনিবার্য।

এর দুদিন পর, ১৭ই জুলাই, নর্ম্যাণ্ডির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের মুখে মিত্র-শক্তির প্লেন আক্রমণে রোমেল গুরুতররূপে আহত হলেন। ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের মন ভেঙ্গে গেল।

জুন মাসের শেষে হিটলার স্টাউফেনবার্গকে নিযুক্ত করলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ ফ্রমে'র চীফ অব ষ্টাফ। স্টাউফেনবার্গ এইবার হিটলারের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেলেন। চক্রান্তকারীরা হিটলারের সঙ্গে গোয়েরিঙ, গোয়েবলস্ ও হিমলারকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করল।

২০শে জুলাই, সকাল ৫-৩০ মি। স্টাউফেনবার্গ তাঁর সহকারী লেফ্‌ট্যানেন্ট ওয়ারনার ফন হেফটনের সঙ্গে রাস্টেনবুর্গে রওনা হলেন ফুয়েরারের দপ্তরে। বেলা সাড়ে বারটায় মিলিত হলেন জেনারেল কাইটেলের সঙ্গে। স্টাউফেনবার্গ সঙ্গে নিলেন তাঁর হাতব্যাগে হিটলারের মরণাস্ত্র 'টাইম বোমা'। বেলা একটায় রাস্টেনবুর্গে ফুয়েরার এর দপ্তরে জরুরী সভার আয়োজন করা হয়েছে। গোয়েরিঙ, গোয়েবলস্ ও কাইটেল সকলেই সভাকক্ষে জল্পনাকল্পনায় ব্যস্ত। সেইখানে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষও। হিটলার ঝুঁকে পড়ে একটা ম্যাপ দেখছেন। এই সময় স্টাউফেনবার্গ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর হাত-ব্যাগটি।

ঘরের মাঝখানে ১৮ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া একটি টেবিলের মাঝবরাবর একটি দরজার দিকে হিটলার বসেছিলেন। তাঁর একদিকে বসেছিল কাইটেল আর অন্যদিকে

জডল। ঘরে উপস্থিত ছিলেন আরও ১৮ জন অফিসার। আর ছিল কয়েকজন এস. এস. কর্মী। স্টাউফেনবার্গ তাঁর হাত-ব্যাগটি রাখলেন হিটলারের বসার জায়গা থেকে মাত্র ২ মিটার দূরে। টাইম বোমাটি বিস্ফোরণের সময় ছিল ১২টা ৩৭ মিনিটে। স্টাউফেনবার্গ কাজের অজুহাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কর্নেল ব্রাণ্ড ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন। তবে ব্যাগের মধ্যে কি আছে তা তিনি বুঝতে পারলেন না, ব্রাণ্ডের পায়ে ব্যাগটি লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেইটা তিনি টেবিলের ওপরে তুলে রাখলেন। সামান্য এই ঘটনার জন্য হিটলার প্রাণে বাঁচলেন।

১২-৪২ মিঃ-এ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল টাইম বোমটির। স্টাউফেনবার্গ দূরে থেকে ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন। প্রচণ্ড শব্দে বোমাটির যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন স্টাউফেনবার্গ দ্রুত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, হিটলার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোসহ এতক্ষণে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। কিছু সময়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন বার্লিনে। স্টাউফেনবার্গ চারদিকে প্রচার করে দিলেন হিটলার তাঁর ১৮ জন সঙ্গীসহ আততায়ীর বোমার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। বার্লিনে বসে হিটলারের অবর্তমানে কে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তাও স্থির হয়ে গেল। চারদিকে থমথমে ভাব।

হিটলার কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। হাতে সামান্য একটু আঘাত পেলেন। প্রাণে বেঁচে গেলেন কাইটেল ও জডল। হিটলার কিছুক্ষণ ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে রইলেন। সকলের ধারণা হলো মিত্রবাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে। সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের সর্বত্র বোমার টুকরোতে ভরে গেল। কর্ণেল ব্রাণ্ড নিহত হলেন। হিটলার কোনরকমে কাইটেলের কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে এলেন। বর্লিনের সব প্রবেশপথে সতর্ক প্রহরা বসানো হলো।

ছুটে এলেন অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস, রাইখমার্শাল গোয়েরিঙ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ। এরা প্রত্যেকে পরস্পরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করতে লাগলেন। হিটলার ক্রুরদৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর ডাক্তার মোরেলের দিকে। মোরেলকে বললেন শয়তানদের সকলকে পাঠাতে হবে কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে।

স্টাউফেনবার্গ অলব্রিট্রেক্ট আর বেক একত্রে কথা বলতে লাগলেন। তাঁদের মনে একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হয়ত হিটলার মরেননি। স্টাউফেনবার্গ এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল ফ্রম'-এর কাছে। ফ্রম ইতিমধ্যে কাইটেলের কাছে সব কিছু শুনেছেন। শুনেছেন হিটলার সামান্য একটু আঘাত পেয়েছেন মাত্র। স্টাউফেনবার্গ দীপ্তব্যঞ্জক কণ্ঠে ফ্রমকে বললেন হিটলারের সভাকক্ষে বোমাটি উনিই রেখেছিলেন। হিটলারের মাত্র দুই মিটার দূরে সুতরাং হিটলার বাঁচতে পারেন না। ফ্রম রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন হিটলার মরেননি। এখন মরতে হবে ষড়যন্ত্রকারীদের। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অলব্রিট্রেক্ট, বেক, হেপনার, মার্জ প্রভৃতি জেনারেলরা আর রয়েছেন স্বয়ং

স্টাউফেনবার্গ। ঐদিন রাত ১টায় হিটলার জার্মানবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিলেন। বেতারে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—

My German Comrades !

If I speak to you today it is my first order that you should have my voice and should know that I am unhurt and well, and secondly that you should know of a crime unparalleled in German History... This time we shall settle accounts with them in the manner to which we National Socialists are accustomed...

হিটলারের যে কথা সেই কাজ। প্রথমে অবশ্য রোমেলকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যদিও বা রোমেলও ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম। হিটলারের নির্দেশে গেস্টাপো বাহিনীর হাতে একে একে প্রাণ হারালেন অলবিট্রেক্ট, মাঙ, হেপনার ও বেক। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্টাউফেনবার্গকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হলো। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। এরপর হাজার হাজার সন্দেহভাজন লোককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। তাদের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল জনতার আদালতে। এই আদালতের ভার ছিল নাৎসী বিচারক রোনাল্ড ফ্রিসলার-এর ওপর।

কিন্তু জেনারেল ক্রমকেও শেষ পর্যন্ত রেহাই দিলেন না স্বয়ং হিটলার। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কাপুরুষতার অভিযোগে তাঁকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল হিটলারের অন্যতম বিশ্বস্ত জেনারেল ক্যানারিসকেও।

এইবার ফিল্ড মার্শাল রোমেলের পালা। রোমেলের নাম বলে দিয়েছিলেন কর্ণেল হফেকার। হিটলার রোমেলের নাম ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত আছে জেনে চমকে উঠলেন। রোমেল সম্পর্কে জার্মানবাসীর দুর্বলতার কথা হিটলার জানতেন। তাই রোমেলকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হিটলার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে চাননি। হিটলার ঠিক করলেন রোমেলকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হবে এবং প্রচার করা হবে আঘাতের ফলে রোমেলের মৃত্যু ঘটেছে। জেনারেল স্পাইডেল রোমেলের বাড়ী গিয়েছিলেন। রোমেলকে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হিটলারের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বোঝাতে। রোমেল হিটলারের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন হিটলারের রুশ আক্রমণের পর থেকে এবং তাঁর অনেকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। রোমেল স্পাইডেলকে বলেছিলেন,—'That Pathological liar, now completely mad. He (Hitler) is venting his sadism on the conspirators of July 20th ; and this won't be the end of it !'

রোমেল ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে হিটলার জুলাই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কাকেও রেহাই দেবে না। রোমেল নিজেও জানতেন তাঁর পরিণতি কি ?

হিটলারের নির্দেশে জেনারেল বার্গডর্ফ ও মাইসেল এক শিশি মারাত্মক বিষ নিয়ে রোমেলের বাংলোয় এসে উপস্থিত হলেন। রোমেলের ব্যাপারটা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। বীর ফিল্ড মার্শালকে হিটলারের নির্দেশ

জানানো হলো। রোমেল তাঁর স্ত্রী, পিতামাতা ও পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিটলার প্রেরিত দু'জন জেনারেলের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। যাবার সময়ে রোমেল স্ত্রীকে জানিয়ে গেলেন, '১৫ মিনিটের মধ্যেই তোমরা আমার মৃত্যুসংবাদ জানতে পারবে।' রোমেলের পরণে ছিল তাঁর আফ্রিকান কোরের সেই পোষাক। গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলেন বার্গডর্ফ ও রোমেল। মিনিটখানেক পরেই রোমেলের মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালের ডাক্তার সার্টিফিকেট দিলেন 'মাথায় রক্তক্ষরণের ফলে রোমেলের মৃত্যু ঘটেছে।' সবই সাজানো ব্যাপার। হিটলার ফ্রাউ রোমেলকে স্বামীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে টেলিগ্রাফ পাঠালেন। অথচ হিটলারের আদেশে নিষ্ঠুরভাবে রোমেলকে হত্যা করা হলো। এইভাবেই হিটলার ষড়যন্ত্রকারীদের একে একে ধরাধাম থেকে বিদায় করে দিলেন।

শেষ হলো এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত অধ্যায়। হিটলার কিন্তু তখনো এক সম্মোহন শক্তির গুণে অধিকাংশ জার্মানবাসীর হৃদয় মন জয় করেছিলেন। সুশিক্ষিত জার্মানবাসীদের কাছে এটা এক অদ্ভুত যাদুর খেলা বলে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তাই উইলিয়ম শাইয়ারার বলেছেন, "By a hypnotism that defies explanation—at least by a non-German Hitler held the allegiance and trust of this remarkable pe ple to the last."

হিটলার এইবার শুনতে পেলেন আরও শোচনীয় খবর। মিত্রপক্ষ বেলজিয়াম অধিকার করে নিয়েছে, ফ্রান্সে বিধ্বস্ত হয়েছে নাৎসীবাহিনী। বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স এখন মিত্রপক্ষের হাতে। পূর্বদিক থেকে লালফৌজ এগিয়ে আসছে দুর্দম গতিতে। উদ্দেশ্য রাইখ দখল করা। লালফৌজ পূর্ব প্রাশিয়ার সন্নিকটে ১৮০ ডিভিসন সৈন্য নিয়ে এসে পড়েছে। আগষ্ট মাসের মধ্যেই রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া হাতছাড়া হয়ে গেল জার্মানীর। ফ্রান্স দখলে সর্বাপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব দাবী করে আমেরিকার জেনারেল প্যাটন। তিনি ছিলেন ট্যাঙ্ক যুদ্ধে রোমেলের সমকক্ষ। আগষ্টের মধ্যে ৫ লক্ষ নাৎসীবাহিনী মিত্রশক্তির হাতে বন্দী হলো। ফলে জার্মানী সবদিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ল।

প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাণ্ডষ্টেড আক্ষেপ করে বললেন যুদ্ধ সেপ্টেম্বরেই শেষ। তাই রাণ্ডষ্টেড হিটলারকে সন্ধির প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। হিটলার কিন্তু তার সংকল্পে অটল।

সৈন্য সংগ্রহের জন্য তিনি ১৫ থেকে ১৮ বৎসরের জার্মান ছাত্রদের কাছে আবেদন রাখলেন। ৫ লক্ষ ছাত্র যুদ্ধে যোগ দিল। যুদ্ধে যোগ দিল আরও প্রায় ১৮২,০০০ যুবতী মেয়ে। তা সত্বেও শেষরক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠলো। মিত্রপক্ষের সেনাধ্যক্ষ আইজেনহাওয়ার আর মন্টগোমারীর বিশাল বাহিনী তীব্রবেগে রুঢ় অঞ্চলের দিকে ধাবিত হলো। সেইখান থেকেই তারা বার্লিনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে।

নাৎসীবাহিনীর প্রচণ্ড বাধাদানে নয় হাজার বৃটিশ প্যারাশ্যুটের মধ্যে সাত হাজারই মৃত্যুবরণ করল।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪-এর এক সন্ধ্যা। প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাণ্ডস্ট্যাড্ত ডেকে পাঠালেন কিছু জেনারেল আর ফিল্ড মার্শালকে। তাঁদের নিয়ে গেল একটি বাসে করে ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে জিজেনবার্গে। এখানকার ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার থেকে হিটলারের নির্দেশে চার দিনের মধ্যে পশ্চিমে শুরু করলেন প্রচণ্ড এক ঝটিকা আক্রমণ। হিটলার স্থির করলেন এক বিশাল নাৎসীবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে আইসেনহাওয়ারের তৃতীয় আর প্রথম বাহিনীর ওপর। হিটলারের বুঝতে ভুল হল ১৯৪০ আর ১৯৪৪ এক নয়। মিত্রপক্ষ এখন জার্মানীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এই আক্রমণ নাৎসী-বাহিনীকে পূর্বাঞ্চলে দুর্বল করে দেবে।

রাণ্ডস্ট্যাড ও গুডেরিয়ান হিটলারকে বোঝাতে চাইলেন যে রুশ বাহিনীর শক্তি এখন কম নয়। হিটলার তাঁদের কথায় কোন গুরুত্বই দিলেন না। বরং তিনি ভয়ানক চটে গেলেন। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা হিটলারের নির্দেশই মেনে নিলেন। তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন হিটলারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

হিটলার গোপনে পাইলট অটো স্করজেনীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে কিছু জার্মান সৈন্যসহ আমেরিকানদের ছদ্মবেশে আইসেনহাওয়ারের সৈন্যবাহিনীতে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন যে তাবেই হোক আইসেনহাওয়ারকে হত্যা করতে হবে। হিটলারের এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। ফলে প্রাণ দিতে হল বহু নাৎসী সৈন্যকে।

মিউজ নদীর তিন মাইলের মধ্যে উপস্থিত নাৎসী বাহিনীকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করল আইসেনহাওয়ার। আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাছে প্রচণ্ড মার খেলো নাৎসীবাহিনী। সৈন্য ও অস্ত্রবল শেষ। ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে জার্মানীর। পূর্বাঞ্চলের অবস্থা আরো শোচনীয়। গুডেরিয়ান হিটলারকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করলেন। হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুডেরিয়ান হিটলারকে জানিয়ে দিলেন যে পূর্বাঞ্চলে ফ্রন্ট তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। তাই সাহায্য প্রয়োজন। অস্ত্রসস্ত্র ও সৈন্য সামন্ত। গুডেরিয়ানের কথা হিটলার গ্রাহ্য করলেন না। বাস্তবিকপক্ষে ১৯৪৫ সালের ১২ই জানুয়ারী রুশ সৈন্যবাহিনী ঝুকভের নেতৃত্বে ঝড়ের বেগে ওয়ারশ দখল করল। ফলে নাৎসীবাহিনী নিশ্চিহ্ন হল। পূর্বাঞ্চলে রুশবাহিনীকে বাধা দেবার মত কোন নাৎসীবাহিনী সেখানে আর ছিল না।

২৭শে জানুয়ারী হিটলার বাঙ্কারে বসে খবর পেলেন রুশসৈন্য ওডার নদী অতিক্রম করে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছে। হিটলার ভাবলেন ব্রিটেন ও আমেরিকা রুশবাহিনীকে আর বেশিদূর এগোতে দেবে না। হিটলারের একান্ত অনুগত সেনাপতি গোয়েরিঙ আর জডল হিটলারকে বোঝালেন যে ব্রিটেন ও আমেরিকা নিশ্চিত রুশবাহিনীকে বাধা দেবার জন্য জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলাবে। এটা যে নির্বোধের প্রলাপ বকা সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না।

"The generals seem to have had no doubts whatsoever that the British and American armies would then join them in the war against Russia to prevent, as they said, Europe from becoming Bolshevik.'

১৯৪৫ সালের বসন্তকাল। রাইখের অন্তিমসময় উপস্থিত। চারদিক থেকে দুঃসংবাদ আসতে লাগল। জার্মানীর কয়লা উৎপাদন প্রায় বন্ধ। মিত্রবাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। পেট্রোলের অভাবে সাঁজোয়া বাহিনীর গতি হয়ে গেছে স্তব্ধ। বোমা নিক্ষেপণ কেন্দ্র শত্রুর দখলে। নৌবাহিনী বিধ্বস্ত।

তা সত্ত্বেও মার্কিন ও ব্রিটিশ অধিকর্তাদ্বয় এক অনাগত আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত। এই ভীতি মার্কিন ও ব্রিটিশ সমর দপ্তরের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারা খবর পেয়েছিল যে হিটলার অ্যাটম বোমা তৈরি করে ফেলেছেন এবং যে কোন মুহূর্তে উনি তা কাজে লাগাবেন। হিটলারের বোমা বানাবার সুযোগ ছিল। গটেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অটো হান, ফোর্মিও ও আরো অনেক বৈজ্ঞানিক এব্যাপারে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু অ্যাটম বোমা তৈরি করার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা হিটলারের অনীহাহেতু কাজে পরিণত হল না। অ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্য ইউরেনিয়ামও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত জার্মান অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়াতে কিন্তু হিটলার তা কাজে লাগাননি। ব্রিটেন ও আমেরিকা তখন সেই কথাটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই এই অ্যাটম বোমা ভীতি ব্রিটেন ও আমেরিকাকে বেশ কিছুদিন চিন্তাক্লিষ্ট করে রেখেছিল। "As for the German atom-bomb project, which have given London and Washington much worry, it had made little progress due to Hitler's lack of interest in it" —William Shirer.

হিটলার সন্দেহবশত ইহুদী পরমাণু বিজ্ঞানীদের জার্মানী থেকে বিতাড়িত করলেন। আইনস্টাইনও বাদ গেলেন না। এরপর এই সমস্ত বিজ্ঞানী নীল বোরের নেতৃত্বে ডেনমার্ক-এ পরমাণু গবেষণায় লিপ্ত হলেন। তাঁরা আইনস্টাইনের মারফৎ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পরমাণু বোমা তৈরীর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। যার ফসল ম্যানহাটন প্রোজেক্ট। পরমাণু বোমা তৈরী হল সর্বপ্রথম আমেরিকাতে। যে পরমাণু বোমার নিষ্ঠুর আঘাতে জাপানের 'হিরোসিমা' ও 'নাগাসাকি' শহরের লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানই এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী। হিটলার আর একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তিনিই কৌশলে এই সমস্ত পরমাণু বিজ্ঞানীদের দিয়ে জার্মানীতে সকলের আগেই পরমাণু বোমা তৈরী করাতে পারতেন। শক্রদের করতে পারতেন ধ্বংস।

কিন্তু জার্মানী এখন প্রকৃতপক্ষে চারদিক থেকে ছিন্নভিন্ন। রাশিয়া Oder Neisse লাইন ধরে ড্রেসডেন এবং বার্লিন অভিমুখে রওনা হয়েছে। মার্কিন সৈন্তরা জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে রাইন নদীর তীরে এসে উপস্থিত হোল। তাঁর সঙ্গে ছিল প্রায় ৮৬ ডিভিসন মার্কিন সৈন্ত। উত্তরদিকে ব্রিটিশ সৈন্ত রয়েছে ব্রিমেন ও হামবুর্গের পথে। দক্ষিণে ফ্রান্স দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে জার্মানীতে প্রবেশ করল। চারদিক থেকে বার্লিন শহরকে মিত্রপক্ষের সৈন্তরা ঘিরে ফেলেছে। রাইন নদীর ওপর ও পেনহাইম ব্রীজ ধ্বংস করার প্রভূত চেষ্টা করেও জার্মান সৈন্তরা বিফল হল। ফলে শক্রপক্ষ অতি সহজেই রাইন নদী অতিক্রম করে বার্লিনে প্রবেশ করার সুযোগ পেল।

১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ। জেনারেল প্যাটন বিশাল ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে ওপেন হাইম ব্রীজের ওপর দিয়ে রাইন নদী অতিক্রম করলেন। সঙ্গে ছিল বিশাল ফরাসী বাহিনী। কয়েকদিনের মধ্যে জার্মানীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্ত ধ্বংস হলো। ২০শে জুলাই আততায়ীর বোমা বিস্ফোরণে হিটলারের কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হোল। হিটলার এখন রুগ্নপ্রায। ভগ্নহৃদয়ে তিনি শুনতে পেলেন রুশসৈন্তও বার্লিনের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে চলে এসেছে।

হিটলার জেনারেল স্পীয়ারকে ডেকে বললেন এই যুদ্ধে পরাজয় হলে জার্মান জাতিরও বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না। সমগ্র জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস করার পরিকল্পনা হিটলারের মাথায় ছিল। এক-কথায় তিনি পোড়ামাটি-নীতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, যাতে জার্মানীর কোন সম্পদ শক্রর হাতে পড়তে না পারে।

জার্মানীর সৌভাগ্য জেনারেল অ্যালবার্ট স্পীয়ারই হিটলারের এই নির্দেশ কার্যকরী করতে দেননি। অবশ্য তাঁর সঙ্গে কিছু জার্মান অফিসারও ছিলেন। আর ছিল মিত্রবাহিনীর দুর্দম অগ্রগতি। ব্রিটিশ ও কানাডার সৈন্তবাহিনী এগিয়ে চলেছে বার্লিনের দিকে। জার্মান জেনারেল মডেল ২১ ডিভিসন সৈন্ত নিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন ব্রিটিশ ও কানাডার সৈন্তবাহিনাকে। কিন্তু পরাজিত হলেন। জার্মানীর প্রায় ৩,২০,০০০ সৈন্ত বন্দী হল। তিনি আত্মহনন করে শক্রর হাতে বন্দী হওয়া থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ন্যুরেমবার্গে এসে উপস্থিত হল আমেরিকার সৈন্তবাহিনী। ওডার নদী অতিক্রম করে রুশ সৈন্তবাহিনীও উপস্থিত হল বার্লিনের উপকণ্ঠে। ২৫শে এপ্রিল মার্কিন বাহিনী ও রুশবাহিনী বার্লিনে মুখোমুখি হল। ফলে বার্লিন উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

হিটলারের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বার্লিনে এসে মিত্রবাহিনী প্রচণ্ড মার খাবে। হিটলারের সেই আশা ব্যর্থ হলো। অ্যালবার্ট স্পীয়ার প্রথমে হিটলারের খুব কেরে বড় সুহৃদ ছিলেন। কিন্তু স্পীয়ারের সঙ্গে হিটলারের মতবিরোধ ঘটে নানা কারণে। স্পীয়ার মনে করতে লাগলেন জার্মানীর স্বার্থে হিটলারের মৃত্যুর প্রয়োজন। তাই তিনি হিটলারের ভূগর্ভস্থ বাংকারে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

স্পীয়ার এই সময় রাইন অঞ্চলে গিয়ে কারখানার শ্রমিককর্মচারী ও সেনা-নায়কদের সঙ্গে দেখা করেন। হিটলার সম্পর্কে তাদের মনোভাব জানতে চান। স্পীয়ার বিস্মিত হন যখন তিনি বুঝতে পারলেন তখনো পর্যন্ত জার্মানীর শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিককর্মচারী হিটলারের সমর্থক। স্পীয়ার হিটলারকে হত্যা করার চিন্তা ত্যাগ করেন। তবে তিনি হিটলারকে অত্যন্ত কঠোরভাবে জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় অবধারিত। তাই তিনি যেন মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করতে প্রস্তুত থাকেন।

১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল। হিটলারের ছাপ্পান্নতম জন্মদিন। হিটলারের ভক্তবৃন্দ তাঁকে বার্গহফে বেরস্টেগ্যাডনে তাঁর বাড়িতে চলে যেতে অনুরোধ করেন। অ্যালপাইন অঞ্চলে তাঁর এই বাড়ি। হিটলার তাঁর প্রিয় আবাসভূমিতে আর যেতে পারেননি। তাঁর অন্তিম সময় খুবই দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে হামবুর্গ ও ব্রেমেন। রুশ-মার্কিন সৈন্য এল নদীর তীরে। বার্লিনে শোনা যাচ্ছে রুশ কামানের গর্জন।

হিটলার চ্যান্সেলারীর ৫০ ফুট নিচের বাংকারে। নিদারুণ ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন। ২০শে জুলাই-এর ঘটনার পর তিনি আর কাকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হিটলার বুঝতে পারছেন তিনি কারও ওপর নির্ভর করতে পারবেন না। সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করছে। সকলেই তাঁকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করছে। তিনি গোয়েবলস, কাইটেল, বোরম্যান, ইয়েডল ও আরও অনেক জেনারেলকে ডেকে কাছে বসালেন। সকলেই এসেছিলেন বাংকারে তাঁদের নেতাকে জন্মদিনে প্রীতি উপহার দিতে। হিটলার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "I am lied to on all sides. I can rely on no one. They all betray me The whole business makes me sick. If anything happens to me, Germany will be left without a leader. I have no successor."

তিনি জানিয়ে দিলেন গোয়েরিঙ জনগণের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তাঁর কাজের জন্য আর হিটলারকে পার্টি বাতিল করেছে তাঁর হঠকারিতার জন্য। হিটলার তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি যে আত্মহত্যা করে যুদ্ধ পরাজয়ের জ্বালা জুড়াবেন এটা স্থির নিশ্চিত। হিটলার যখন এরকম মানসিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন সেই সময় গোয়েবলস এসে তাঁকে খবর দিলেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্টের মৃত্যু ঘটেছে। হিটলার যেন একটু শক্তি পেলেন মনে। তিনি বলে উঠলেন 'ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট'-এর মত তাঁরও জয় সুনিশ্চিত। তিনি বলে গেলেন ফ্রেডেরিককেও এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু রুশ সম্রাজ্ঞী জারিনার মৃত্যু ফ্রেডেরিককে যুদ্ধ পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। রুশসৈন্যরা জার্মানী দখল না করে ফিরে গিয়েছিল।

হিটলার কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন মার্কিন সৈন্যরা বার্লিন পরিত্যাগ করে চলে যাবে না। রুশ, মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের সৈন্যরা বার্লিনকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ক্ষণিকের জন্য হিটলার উৎফুল্ল হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সেই আনন্দ শূন্যে মিলিয়ে গেল। মিত্রপক্ষের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলে বার্লিন শহর বিধ্বস্ত হোল।

হিটলার এবার মরিয়া হয়ে বিচার করতে লাগলেন তাঁর ভাগ্যরেখা ও কোষ্ঠী। হিমলারের কাছে অর্থাৎ হিমলারের খুবই গোপন বিভাগে হিটলারের দু'খানা কোষ্ঠী সযত্নে রক্ষিত ছিল। এই কোষ্ঠী দুটি তৈরি করেছিলেন তাঁর জ্যোতিষী কার্লওসিজ। ব্রেখটেসগ্যাডেনে আলপাইনের পাহাড়ের কোলে হিটলারের বাসভবনে ওসিজ থাকতেন। বাসভবনের ওপরে ছাদে ৫ খানা আলাদা কক্ষ ছিল। সেইগুলিকে বলা হতো 'নক্ষত্র কুঠি'। সেই ঘরে জলন্ত অঙ্গার থেকে আলো আসত। একটা সুইচ টিপলে আকাশে গ্রহ ও স্থির নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যেত। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা দিয়ে যেন এই ঘরগুলি তৈরি হয়েছিল। এই ঘরে ওসিজ ও হিটলার ভিন্ন আর কেউ প্রবেশ করতে পারতেন না।

ওসিজ কোষ্ঠী দুটির প্রথমটি তৈরি করেছিলেন ১৯১৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয়টি ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩। প্রথমটিতে জার্মান রাইখের 'ভাগ্যলিপি' বর্ণিত ছিল, দ্বিতীয়টিতে ছিল হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর জয় পরাজয়, তাঁর ভবিষ্যত জীবন ইত্যাদি। দুটি কোষ্ঠীতেই বলা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে। ১৯৪১ পর্যন্ত চলবে জার্মানীর জয়ের পালা। তারপর থেকে বেশ কয়েকটা যুদ্ধে জার্মানীকে পরাজয় বরণ করতে হবে এবং তা চলবে ১৯৪৫-র এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। আবার ১৯৪৫-এর আগষ্ট মাস থেকে জার্মানীর শুভ দিনের সূচনা হবে। জার্মানীর পুনরুত্থান ঘটবে ১৯৪৮-এ। ওসিজ হিটলারের জীবনের সীমারেখা টেনেছিলেন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত।

প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস জার্মানবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে জার্মানীর সুদিন আবার আসবে। কোষ্ঠীই তা বিচার করে রেখেছে। অন্তিম সময়ে মানুষ খড়-কুটোকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। জার্মানীর আজ সেই অবস্থা। অবশ্য কোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করে বর্তমান যুগেও অনেক রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করেন। জ্যোতিষীরা যেন তাঁদের উপদেষ্টা। হিটলারের কাছেও ওসিজ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। তাঁর বাক্যকে হিটলার বেদবাক্য বলে মনে করতেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রেগন সম্পর্কেও এরকম দুর্বলতার কথা শোনা গিয়েছিল।

বাঙ্কারে হিটলারের জন্মদিন পালনের ৫ দিন আগে অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল ইভা ব্রাউ
এসে পৌঁছালেন। তিনি একা থাকতেন হিটলারের ব্রেখটেসগ্যাডেনের বাসভব
লোকচক্ষুর অন্তরালে। হিটলার প্রণয়িনী ইভা সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে
বই-এর শুরুতে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগিনী গেলীর সা
হিটলারের প্রেম যখন গভীর হয়ে ওঠে সেই সময় ইভা কয়েকবার আত্মহত্যা করত
চেয়েছিলেন। অবশ্য অনেকের মতে গেলীর মৃত্যুর পর ইভার সঙ্গে হিটলারে
সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গেলীর আত্মহত্যার পর হিটলার ইভা ব্রাউনের মধ্যে গভীর প্রেমের স্বা
পেয়েছিলেন। তাই ইভাই ছিলেন হিটলারের জীবনসঙ্গী। ইভাও হিটলারকে
গভীরভাবে ভালবাসতেন। তবে নির্জনে তাঁর জীবন কেটেছে। কাইটেল ন্যুরেমবা
বিচারের সময় ইভা সম্পর্কে বলেন যে, ইভা ছিলেন অপূর্ব মহিলা। নির্জনে দি
কাটাতেন। দেখা দিতেন কদাচিৎ। ইভা কাজ করতেন হফম্যান নাম
হিটলারের এক বন্ধুর ফটোগ্রাফারের দোকানে। সেখানেই হিটলারের সঙ্গে তাঁ
পরিচয় হয়। জীবনের অন্তিম লগ্নে, হিটলার ইভাকে স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি
দিলেন। ইভা হিটলারের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করলেন।

জার্মানীকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল যুদ্ধ চালাবার সুবিধে
জন্য। হিটলার সকল নাৎসী নেতাদের নির্দেশ দিলেন যাদের বার্লিনে থাকার
প্রয়োজন নেই তারা যেন উত্তর বা দক্ষিণদিকে তাঁদের সুবিধেমত স্থানে চলে যায়
জার্মানীর অনেক আমীর-ওমরাহ বার্লিন ত্যাগ করে চলে গেলেন। পড়ে রইল কেবল
অসহায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারী।

প্রভুভক্ত গোয়েবলস, ক্ষমতালোভী বোরম্যান রইলেন হিটলারের সঙ্গে। প্রধান
সেনাপতি কাইটেল ও ইয়েডেল গেলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে সেনাবাহিনীর হেড
কোয়ার্টারে। নৌ সেনাপতি ডোয়েনিৎস গেলেন পশ্চিমে সমুদ্রপারের হেড
কোয়ার্টারে। হিটলার নির্দেশ দিয়ে চললেন বার্লিনে ও বার্লিনের চতুর্দিকে যে সমস্ত
সৈন্য সামন্ত রয়েছে তারা যেন সবাই এক জায়গায় আসে এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী ও জঙ্গী
বিমান বাহিনী নিয়ে একযোগে বার্লিনের দক্ষিণ ভাগে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ করে।

কিন্তু হায় কে কার কথা শুনে। হিটলার বাঙ্কারে বসে আকাশকুসুম ভাবছেন।
সব বৃথা। ২১শে এপ্রিল ষ্টাইনারকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। বার্লিন
মিত্রশক্তির প্রবল বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হবার উপক্রম হোল। ষ্টাইনারকে পাল্টা বিমান
আক্রমণের হুকুম দিলেন হিটলার। কিন্তু কোথায় তখন ষ্টাইনার। ২২শে এপ্রিল
থেকে ষ্টাইনারের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। সারাদিন হিটলার দুশ্চিন্তায়
কাটালেন। বেলা তিনটায় হিটলার মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। এই সভায় উপস্থিত
ছিলেন কাইটেল, ইয়েডেল ও দুই সেনাপতি বুর্গডর্ফ ও ক্রেবস। মন্ত্রণাসভায়
হিটলার জানতে পারলেন জার্মান সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা নেই।
হিটলার ক্রোধে ফেটে পড়লেন। ঘরময় করলেন পায়চারি। বলতে লাগলেন

রুশ সৈন্যদের তুলনায় জার্মানরা হীনবল। হিটলার স্থির করলেন তিনি বাঙ্কারে থেকে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তিনি ভাবলেন ফেলেলস্টিং এবং কিন্তু মার্শাল জোরনারের বাহিনী এখনো অক্ষত। এদের দিয়েই একটা পাল্টা আঘাত হানা যাবে। কিন্তু সবই নিষ্ফল আলোচনা বা চিন্তা। হিমলার ও রিবেনট্রপ হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়ে টেলিফোন করলেন। হিটলার উত্তর দিলেন তিনি বার্লিন ত্যাগ করবেন না। এই কথা বেতারে প্রচার করার জন্য হিটলার সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন। পরক্ষণই আবার তিনি অপ্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

কাইটেলকে নির্দেশ দিলেন অবশিষ্ট বাহিনীর নেতৃত্ব নিতে। কাইটেল অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। হিটলার গোয়েরিঙ-এর কথা উল্লেখ করলেন। কাইটেল বললেন কোন সৈনিকই রাইখ মার্শালের নামে যুদ্ধ চালাতে রাজী হবে না। হিটলার ধমক দিয়ে বললেন যুদ্ধ। যুদ্ধ চালাবার মত জার্মানীর ত কিছুই অবশিষ্ট নেই। হিটলারের কণ্ঠে এই প্রথম জার্মানীর অসহায় অবস্থার কথা 'যা নিষ্ঠুর সত্য' শোনা গেল। হিটলার উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। বলতে লাগলেন প্রত্যেকেই তাঁকে প্রতারণা করেছে। কেউ তাকে সত্য বলেনি। সেনাবাহিনীও তাঁকে মিথ্যা বলেছে। হিটলার আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্থির করলেন গোয়েরিঙকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবেন।

হিটলারের ডাক্তার ছিলেন মরেল। মরেল হিটলারকে যে সমস্ত উত্তেজক ঔষধ দিতেন সেগুলির ফল তাঁর শরীরের ওপর মারাত্মকভাবে দেখা দিত। সাময়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করার জন্য বা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য হিটলার এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করতেন না। অন্যান্য ডাক্তাররা তাঁকে কিছু বললে হিটলার তাঁদের ধমক দিতেন। বলতেন মরেলের মত ডাক্তার হয় না। তাই তারা চুপ হয়ে যেতেন।

১৯৪৫ সালে মৃত্যুর কিছু আগে। জেনারেল বলট এসেছিলেন হিটলারের কাছে একটি মিলিটারী রিপোর্ট দিতে। বলট দেখলেন হিটলার যেন নির্জীব হয়ে গেছেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছেন। একটি অঙ্গ তাঁর অবশ হয়ে গেছে। চোখের সেই পূর্বের বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি আর নেই। চোখ দুটো হয়ে গেছে ঝাপসা।

গোয়েরিঙ হিটলারের স্থলাভিষিক্ত হবার আশায় দিন কাটাচ্ছেন। হিটলার এখন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। গোয়েরিঙ ২৩শে এপ্রিল হিটলারকে একটি তারবার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি হিটলারকে হুমকি দিয়ে লিখলেন যে হিটলার কি ২৯শে জুন ১৯৪১-এর আদেশানুযায়ী রাইখের নেতৃত্বভার তার ওপর তুলে দিতে রাজী আছেন? তিনি সেইদিনই রাত ১০ টার মধ্যে এর উত্তর চান। তা না হলে তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য নিজের বিবেচনামত ব্যবস্থা নেবেন। গোয়েরিঙ-এর তারবার্তা হিটলারকে অস্থির করে তুলল। মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে এত বড় আঘাত, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা তিনি হজম করতে পারলেন না। গোয়েরিঙ-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে গোয়েরিঙ-এর পূর্ব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে হিটলার তাঁকে প্রাণে মারলেন না, তবে বন্দী করার আদেশ দিলেন। এই দিনই হিমলার লুবেককে সুইডিশ দূতাবাসে বসে কাউন্ট বার্নাদোতের কাছে প্রস্তাব দিলেন তিনি যেন আইসেনহাওয়ারকে জানিয়ে দেন যে জার্মানী আত্মসমর্পণ করতে রাজী। হিটলার ২/১ দিনের মধ্যেই আত্মহত্যা করবেন এটাও বার্নাদোতকে জানালেন।

হিটলারের কাছে হিমলারের এই বিশ্বাসঘাতকতার খবর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছায়নি। ২৪শে এপ্রিল হিটলার ডেকে পাঠালেন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রিটার ভন গ্রীমকে। গ্রীম রুশ বিমান বহরের আঘাতে আহত। তবুও হিটলারের নির্দেশে তিনি চলে এলেন। গোয়েরিঙ সম্পর্কে সব কথা হিটলার তাঁকে জানালেন। তিনি আরও জানালেন যে তিনি গোয়েরিঙকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাই তাঁর জায়গায় তিনি গ্রীমকে নিযুক্ত করতে চান বিমানবাহিনীর প্রধান হিসাবে। হিটলার জানতেন না যে এই নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই কেননা জার্মান লাফওয়াফ ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

২৫শে এপ্রিল। অবিরাম রুশ বোমাবর্ষণে বাঙ্কার ঘন ঘন কেঁপে উঠছে। হান্না রিৎশ একান্তে হিটলারকে জার্মানীর স্বার্থে বাঙ্কার ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন। রিৎশ বললেন জার্মানী ফুয়েরারকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। হিটলার উত্তরে হান্নাকে জানালেন দেশের সম্মানের জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন। এতে দেশের গৌরব বাড়বে। একজন সৈনিক হিসেবে তিনি বার্লিনকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে চেয়েছেন এটা জার্মানবাসী মনে রাখবে। ক্ষণিক পরেই হিটলার বললেন এখনো তিনি আশা পোষণ করেন যে ভেংকো দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে এসে রুশ সেনাদের সরিয়ে দেবেন। নতুন উদ্যমে জার্মানরা আবার এগিয়ে যাবে। কিন্তু ভেংকোর কোন খবর পাওয়া গেল না।

"Thus by April, 24th Hitler had in turn rejected every attempt to alter his decision, after his customary vacillation he had firmly reached."—Trevor Ropper.

এরই মধ্যে রুশসৈন্য সমস্ত বার্লিনে চক্রব্যূহ রচনা করে ফেলেছে। এখন বাঙ্কার থেকে কারও কোন জায়গায় পালাবার পথ নেই। বাঙ্কারে হিটলার দিনে ২/৩ বার মন্ত্রণাসভা বসাচ্ছেন। অবশ্য এতে কোন লাভ নেই। গোপনে খবর এসে পৌঁছালো যে পূর্বদিক থেকে রুশসৈন্য এবং পশ্চিম দিক থেকে মার্কিন সৈন্য এসে হাত মিলিয়েছে।

বার্লিনে অনবরত বোমাবর্ষণ চলেছে। বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় চলছে মুখোমুখী যুদ্ধ। রুশসৈন্য বার্লিনের সব রাস্তা ঘিরে ফেলেছে। তারা বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে টানেলের দিকে এগিয়ে আসছে। হিটলার নির্দেশ দিলেন 'স্প্রে' নদীর জল বন্ধ করার সুইস দ্বার যেন খুলে দেওয়া হয়। যাতে সেই জলের প্রবল স্রোত রুশ সৈন্যদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে শত শত আহত জার্মান সৈন্যকেও।

হিটলার আরও নির্দেশ দিলেন যে যখনই কোন শহরের সামনে শত্রুসৈন্য দেখা দেবে তখনই সেই শহরের কারখানা, ওয়াটার-ওয়ার্কস, নদীর ওপর সেতু, ইলেকট্রিসিটি সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ মন্ত্রী 'স্পীয়ার'-এর সঙ্গে এ নিয়ে হিটলারের প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা হয়। স্পীয়ার হিটলারকে মুখের ওপর বলে দিলেন যে তিনি এই আদেশ কার্যকর করতে দেবেন না। কেন না এই আদেশ কার্যকরি হলে ভবিষ্যতে জার্মানবাসীদের প্রভূত অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে। ২৪শে এপ্রিল স্পীয়ার হিটলারকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে গেলেন।

নবনিযুক্ত লাফৎওয়াফ-এর প্রধান সেনানায়ক গ্রীম ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল হেলিকপ্টারে করে বার্লিন শহর পরিদর্শন করলেন। কোন জায়গায় কোন বিমানের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। বিমানক্ষেত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

হিটলার ভেংকোর সৈন্যদলের আশা ত্যাগ করলেন। বোরম্যান এক জরুরী বার্তা পাঠালেন অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে। বোরম্যান বুঝতে পারলেন ফুয়েরারের মৃত্যুর দিন সমাগত। অতএব তিনি নিজের মতে এখন ফুয়েরারের আড়ালে থেকেই দেশ শাসন করবেন. এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

২৮শে এপ্রিল। প্রচার দপ্তর এক অবিশ্বাস্য খবর প্রচার করল। ভয়ঙ্কর সেই সংবাদ। হিটলার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। খবরে প্রচারিত হলো হেইনরিখ হিমলার কাউণ্ট বার্ণাদোতের মাধ্যমে আইসেনহাওয়ারের কাছে জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বি বি. সি. থেকে এই খবর চারিদিকে প্রচার করা হচ্ছে।

ক্রোধে হিটলার কাঁপতে লাগলেন। পায়চারি করলেন ঘরময়। তাঁর বাঁ হাত নিস্তেজ। পা দুটো টেনে টেনে চলতে লাগলেন। হিটলার হিমলারকে পেলেন না। তিনি তো তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। হিটলার তাই হিমলারের প্রতিভূ, লিয়েজোঁ অফিসার ফেগেলাইনকে বন্দিশালা থেকে বের করে আনলেন। হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাঁকে তিনি অনেক প্রশ্ন করলেন। ফেগেলাইন ছিলেন ইভা ব্রাউনের আপন ভগ্নীপতি। ফেগেলাইন হিটলারের জেরায় উত্তরে কি বলেছিলেন জানা যায় নি। তবে ফেগেলাইনকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। হিটলারের নির্দেশে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হলো।

ইভা ভগ্নীপতিকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করলেন না। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতায় উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই সময় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠা বৈমানিক শ্রীমতী হান্না রিৎশ বাঙ্কারে উপস্থিত ছিলেন। হান্না রিৎশ ভারতেও এসেছিলেন। নেহরুর অতিথি হয়ে তিনি কিছুদিন দিল্লীতেও ছিলেন। হান্না বলেছেন, ইভা নাকি সেই সময় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। যাঁকে সামনে পেতেন তাঁকেই বলতেন 'হায় বেচারা, বেচারা অ্যাডলফ সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু জার্মানী যেন অ্যাডলফকে না হারায়।'

ফেগেলাইনের মৃত্যুদণ্ডকে দণ্ডিত করে হিটলার অন্যদিকে মন দিলেন। এবার

তিনি ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করে বৈধ স্বীকৃতি দিতে চলেছেন। হিটলার ইভা এবং বিশ্বস্ত কুকুর (অ্যালশেসিয়েন) ব্লণ্ডী ছাড়া আর কাউকেও তাঁর অনুগত এবং একান্ত বিশ্বাসী বলে ভাবতেন না। অথচ এই ইভা সম্পর্কে জার্মানীর ৯৫% লোক কিছুই জানতো না। ইভার সঙ্গে তিনি কোনদিন একই গাড়িতে ভ্রমণ করেননি। একই মঞ্চে বসে সর্বসাধারণের কাছে ইভার সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। ইভা অন্যান্য দর্শকের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনেছেন বহুবার। তারপর চলে গেছেন ব্রেখস্টেসগ্যাডনের বাসভবনে। নির্জনে ১৪/১৫ বছর কাটিয়েছেন। এ রকম একাকীত্ব তাঁকে একবার আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছিল। অবশ্য কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। হিটলার এবার মৃত্যুর আগের দিন তাঁকে বিয়ে করে তাঁর স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দেবার কথা জানালেন।

২৯শে এপ্রিল রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে তাঁদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হল। এই দুঃসময়ে বিয়ের জন্য রেজিষ্ট্রেশন অফিসার যোগাড় করা কষ্টসাধ্য ছিল। গোয়েবলস ওয়ালটার ওয়াগনার নামক একজন ইনসপেক্টরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। ইনি এক সময়ে গোয়েবলসের বিয়েরও রেজিষ্ট্রেশন অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। ওয়াগনার ছিলেন গোয়েবলসের অধীনস্থ একজন কর্মচারি।

বাঙ্কারের ছোট্ট সভাকক্ষে বসলেন হিটলার ও ইভা। ওয়াগনার পুরোহিতের কাজ করলেন। আর সাক্ষী হিসেবে রইলেন বোরম্যান ও গোয়েবলস। সংক্ষেপে সব সারা হলো। জার্মানীতে বিয়ের আগে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হতো। দুজনে শপথ বাক্য পাঠ করলেন। দুজনেই বললেন তাঁদের শরীরে রয়েছে 'অবিমিশ্র আর্যরক্ত'। তাঁদের কোন বংশগত ব্যাধি নেই। তারপর যথাস্থানে স্বাক্ষর করলেন দুজনে। ইভা স্বাক্ষর করতে গিয়ে ইভা 'বি' অর্থাৎ ব্রাউন লিখতে যাচ্ছিলেন ভুলক্রমে। তিনি 'বি' কেটে লিখলেন 'হিটলার' ও 'nee ব্রাউন' অর্থাৎ ব্রাউন নামে জন্ম। বোরম্যান ও গোয়েবলস এই বিয়ের সাক্ষী হলেন।

এই বিয়ের কুড়ি বছর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি জুকভ ঘোষণা করেন যে এই বিয়ের দলিল তাঁদের হস্তগত। কেননা বাঙ্কারে প্রথমে তাঁরাই প্রবেশ করেছিলেন। অতএব এই দলিল তাঁদের হস্তগত হওয়া স্বাভাবিক।

বিয়ের পরে হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এলো। আনন্দোৎসব হলো। গোয়েবলস দম্পতি নাচলেন। গাইলেন। নাচতে নাচতে অশ্রুবিসর্জন করলেন। হিটলার তাঁর আত্মহত্যার কথা আবার ঘোষণা করলেন। বললেন তাঁর জীবনাদর্শ নাৎসীবাদ শেষ। এর পুনরুত্থান আর হবে না। তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি এই যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান। পেতে চান চিরন্তন আরাম।

এরপর হিটলার পাশের ঘরে গেলেন। তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ক্রাউয়ংকে ডাকলেন। লিখতে বললেন তাঁর দু'খানা উইল। হিটলার বলে গেলেন। "প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক আর দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা সম্বলিত।

হিটলার তাঁর রাজনৈতিক উইলে সমস্ত কিছুর জন্ত ইহুদী জাতিকে দায়ী করে গেছেন। ১২ বছর ধরে তিনি জার্মানীকে নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন আর চার বছর প্রায় সারা ইউরোপ তিনি শাসন করেছেন। কিন্তু ইহুদী জাতির ওপর ঘৃণা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মনে বিরাজমান ছিল। তিনি লিখলেন, "It is untrue that I, or anybody else in Germany, wanted war in 1939 It was wanted and provoked exclusively by those international politicians who either came of Jewish stock, or worked for Jewish interests. Afrer all my offers of disarmament, posterity cannot place the responsibility for those war on me......"

"একথা মিথ্যা যে আমি বা জার্মানীর আর কেউ এই যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদী এবং যারা তাদের জন্ত কাজ করেছে তাদের কীর্তি···এখন আমার সৈন্যদল নেই বলে রাষ্ট্রপতিভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না, ইহুদীরা যাতে আমা:কে নিয়ে হিষ্ট্রিয়াগ্রস্ত জনতার জন্ত একটি নগ্ন তামাশার সৃষ্টি করতে পারে।"

তিনি জার্মানীর পতনের জন্ত সরাসরি দায়ী করেছেন জার্মান সেনাবাহিনীকে। দ্বিতীয়পর্বে উল্লেখ করেছেন তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম।

তিনি নির্দেশ দিলেন যে গোয়েরিঙ-এর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবেন অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস। তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন হিমলার ও গোয়েরিঙকে। এইবার নতুন সরকারে কারা থাকবেন সেই নির্দেশ তিনি দিয়ে গেলেন। ডোয়েনিৎসকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন গোয়েবলস হবেন জার্মানীর চ্যান্সেলার। মন্ত্রিপরিষদে থাকবেন বোরম্যান ও সেইস ইন্‌কার্ট। রিবেনট্রপকে বাদ দিলেন।

এরপর তিনি সরকার ও দেশবাসীর উদ্দেশে লিখে গেলেন যে তারা যেন জাতিগত আইন চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করে এবং নির্মমভাবেই আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদকে প্রতিরোধ করে।

এবার তিনি ডেকে পাঠালেন গোয়েবলস, বোরম্যান, ক্রেবস ও বার্গডর্ফকে। নির্দেশ দিলেন উইলে সাক্ষী হিসেবে সই করতে। রাত শেষ।

তিনি এবার ব্যক্তিগত উইল লিখলেন। এই উইলে কেনইবা তিনি ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করলেন, কেনইবা দুজনই আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন সেই ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন দেশবাসীকে। তাঁর ব্যক্তিগত সামান্ত সম্পত্তি তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর আত্মীয়বর্গকে।

উইলের শেষ ছত্রে হিটলার লিখলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইভা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছেন। তাঁদের ইচ্ছে তাঁদের মৃতদেহ যেন তাঁর কর্মক্ষেত্রেই ভস্মীভূত করা হয়। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসী দলকে দান করলেন। দলের অস্তিত্ব লোপ পেলে এই সম্পত্তি হবে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটলে এই সম্পত্তি অন্ত কাউকেও দেওয়ার নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট 'চিত্রসম্ভার' তিনি তাঁর জন্মভূমি 'লিঞ্জ' (Lintz) শহরের

আত্মহত্যা নির্বাচনের জন্য গিয়ে গেলেন। উইল লেখা শেষ হলে তিনি ভোর ৪ টায় শুতে গেলেন। এবার গোয়েবলস-এর উইল লেখার পর্ব। বোরম্যান অবশ্য ঘোষণা করলেন বার্লিনের পতন ঘটলে বিশ্বাসঘাতকদের খতম করতে হবে। এই মর্মে তিনি সেনাবাহিনীকে ব্রেখটেসগ্যাডেনে একটি নির্দেশ পাঠালেন। গোয়েরিঙ-এর উদ্দেশ্যেই যে নির্দেশ তা বুঝতে কারুও অসুবিধে হলো না।

গোয়েবলস অবশ্য কট্টর হিটলার ভক্ত। তিনি ও তাঁর স্ত্রী পুত্রকন্যাসহ হিটলারের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার সংকল্পের কথা তাঁর উইলে লিখে গেলেন। তিনি লিখলেন যে ফুয়েরার তাঁকে 'চ্যান্সেলারের' পদ গ্রহণ করার জন্য উইলে অনুরোধ করে গেছেন। কিন্তু তিনি তা মানতে পারছেন না। জীবনে এই প্রথম তিনি ফুয়েরার নির্দেশ অমান্য করতে চলেছেন। এজন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ফুয়েরারকে ত্যাগ করতে অপারগ। মানবতা ও ব্যক্তিগত আনুগত্য তাঁদের ফুয়েরার সঙ্গেই আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করছে। অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁরা ফুয়েরার সঙ্গেই থাকতে চান।

এবার হিটলারের শেষ নির্দেশ পৌঁছে দিতে হবে ডোয়েনিৎসের কাছে। উইলের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল মেজর উইলি জোহানমিয়ার, উইলহ্যম জ্যাণ্ডার আর হেইনস লোরেঞ্জের হাতে। দুইজনই এস. এস নেতা। বোরম্যান সঙ্গে একটা চিঠিও পাঠালেন ডোয়েনিৎসকে। রুশসৈন্য অধ্যুষিত বার্লিনের মধ্য দিয়েই এই নির্দেশ নিয়ে যেতে হবে।

যদিওবা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা ডোয়েনিৎসকে উইলের প্রতিলিপি পৌঁছে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয়নি।

অন্তিম পরিণতি

হিটলার মুসোলিনীর অন্তিম পরিণতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন তাঁর কপালেও যদি এরকম পরিণতির কথা লেখা থাকে। হিটলার তাই আত্মহত্যা করার আগে আর একবার সকলকে বলে গেলেন যে তাঁদের দেহ দুটি (ইভা ও হিটলার) যেন পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়। যেন শত্রুহাতে পড়ে মুসোলিনীর মরদেহের মত বিদ্রূপের পাত্র হয়ে না উঠে।

২৯শে এপ্রিল। অপরাহ্ন, হিটলারের আদেশে তাঁরই বিশ্বস্ত কুকুর ব্লণ্ডীকে গুলি করে হত্যা করা হলো। সেই দিনই হিটলার তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারীর হাতে বিষের ক্যাপসুল তুলে দেন। রুশ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার আগে তাঁরা যাতে বিষের ক্যাপসুল খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। দুঃখ করে হিটলার তাঁদের বললেন এর চেয়ে ভালো উপহার দেবার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।

৩০শে এপ্রিল। কয়েকজন জেনারেল বার্লিনের বিভিন্ন জায়গার খবর নিয়ে ফুয়েরার কাছে এলেন। হিটলার এখন তাঁর শেষ ভাষণের জন্য প্রস্তুত। দুপুর বেলা মন্ত্রণাসভা বসলো। হিটলারের শেষসভা। খবর এলো রাষ্ট্রভবনের উত্তর বরাবর স্প্রেখালের ওপর 'ভাইডেন ডামার' ব্রিজের কাছে এসে গেছে রুশসৈন্য তাই উত্তরের পথও রুদ্ধ। রাষ্ট্রভবনের কাছে ফসষ্ট্রটে যে টানেলটি রয়েছে তাও রুশ সৈন্যের দখলে। হিটলার ২টার সময় লাঞ্চ সারলেন। ইভা ব্রাউন এলেন না। সম্ভবত মৃত্যুচিন্তায় তিনি কাতর। সুন্দর পৃথিবীর রূপ রস, গন্ধ থেকে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি বঞ্চিত হতে চলেছেন। ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে চলেছেন স্বামীর সঙ্গে। অন্তিমলগ্নে মানুষের মনে কত ভাল চিন্তার উদ্রেক হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। হয়ত তিনি ভাবছেন হিটলার হতে চেয়েছিলেন 'বিশ্বের সম্রাট' তা হলে তিনি হতেন 'বিশ্বের সম্রাজ্ঞী'। আজ তাঁরা দুজনেই আত্মহত্যার জন্য সময় গুণছেন। নিষ্ঠুর নিয়তির কথা ভেবে ইভা হয়ত কেঁদে আকুল। হয়ত গোপনেই সেই অশ্রুধারা অঝোরে ঝরছে।

লাঞ্চের পর হিটলার বিশ্রামের জন্য গেলেন নিজের কামরায়। গোয়েবলস পত্নী এ সময় হিটলারের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করার অনুমতি চাইলেন। হিটলারের খানসামা লিঙের হাত দিয়ে একখানা ছোট্ট চিরকুট পাঠালেন হিটলারের কাছে। হিটলার সম্মত হলেন না গোয়েবলস পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে। কি মনে করে তিনি আবার মত পাল্টালেন। করিডরে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোয়েবলস পত্নী। হিটলার এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে গোয়েবলস। তাঁরা দুজনে হিটলারকে আত্মহত্যার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। সম্ভবত ইভা ব্রাউনও মনে প্রাণে তাই চাইছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু কোন ফল হল না। হিটলার বেশী বাক্যব্যয় না করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। মৃত্যুর সময় আগতপ্রায়।

হিটলারের ঘরের করিডরে দাঁড়িয়েছিলেন হিটলারের অন্তরঙ্গ হিতৈষীবৃন্দ ও জেনারেলরা। সংখ্যায় তারা ছিলেন প্রায় ২০ জন। এতদিনের সঙ্গী তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে হবে। তাঁদের করুণ চাহনীতে মনে হয় পাষাণগাঁথা প্রাসাদপুরীর হৃদয়ও বিদীর্ণ হচ্ছিল। করিডরে সকলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়েছিলেন গোয়েবলস ও তাঁর পত্নী। নতমস্তকে, নিস্তব্ধে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন প্রিয় নেতার অপেক্ষায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ইভাকে সঙ্গে নিয়ে হিটলার বাইরে এলেন। করিডরে দণ্ডায়মান সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। ছোট্ট ভাষণ দিলেন। শেষ বিদায় নিয়ে হিটলার ঘরে ঢুকে গেলেন।

২৯শে এপ্রিল রাত্রিতে (প্রায় ৩টার সময়) হিটলার নিজকক্ষে বাংকারের সব মন্ত্রী ও জেনারেলদের নিয়ে একটা মন্ত্রণাসভা ডেকেছিলেন। সেই সময় উপস্থিত সকলেই জার্মানীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। শপথ নিয়েছিলেন রাশিয়ানরা বাংকারে প্রবেশ করলে সকলেই একযোগে বিষভর্তি ক্যাপসুল খেয়ে

আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু কেবলমাত্র গোয়েবলস ও তার পত্নী ছাড়া আর কেউ এই প্রতিজ্ঞাপালন করেননি।

হিটলারের বিদায় নেওয়ার পর কারও আর বুঝতে অসুবিধে হলো না কি ঘটতে যাচ্ছে? সকলেই নিজের মনের খুশিতে আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন। নৃত্যগীত করার এ সুযোগ হয়তো তাঁদের আর আসবে না। এই তো শেষ। তাই তাঁরা তাঁদের শেষ মনোবাসনা পূরণ করলেন।

বাঙ্কারের এইরকম একটা পরিবেশে এবং কঠোর বাতাবরণের মধ্যে গোয়েবলসের ছটি শিশুকে দেবদূতের মত দেখাচ্ছিল। এঘর থেকে ওঘরে ছুটাছুটি করছে তারা। অবোধ শিশু, যুদ্ধের কিইবা তারা বোঝে! হান্না রিৎশ যতদিন বাঙ্কারে ছিল ততদিন তারা রিৎশের কাছে গান শুনেছে। তাদের দিন কেটেছে আনন্দে। নির্লিপ্ত, নিরুদ্বিগ্ন ছয়টি শিশুর মুখমণ্ডল যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরে গেছে। নন্দনকাননে প্রস্ফুটিত ছয়টি সতেজ কলি যেন আনন্দসাগরে ভাসছে। তাদের ভরসা কাকা হিটলারের ওপর। হিটলার তাদের আপনজন। হিটলারের নামের অনুকরণে তাদের প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষরে রয়েছে 'H'.

হিটলার তাঁর কক্ষে প্রবেশ করার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন করিডরে একমাত্র যারা হিটলারের শেষকৃত্য সম্পাদন করবে তারা ছাড়া আর কেউ না থাকে। তাই করিডরে তারাই ছিল, অন্যরা অন্যত্র সরে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাইরে অপেক্ষারত লোকজনেরা হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। হিটলার হলেন ধরাশায়ী। রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তাঁর বিছানাপত্র। তিনি মুখের মধ্যে পিস্তল ঢুকিয়ে গুলি করেছেন। তার আগের মুহূর্তে ইভাকে দিয়েছেন একটা বিষভর্তি ক্যাপসুল। ইভা সেটা খেয়ে চিরনিদ্রায় প্রভুর পাশে শায়িত। সময় তখন বিকেল ৩-৩০ মিঃ। করিডরে অপেক্ষারত লোকজনেরা ছুটে ঘরে প্রবেশ করে এই দৃশ্য অবলোকন করলো। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইংরেজ মেজর (Intelligence Branch-এর) ট্রেভর রোপার বলেছেন, "After an interval they entered the suite. Hitler was lying on the sofa, which was soaked with blood. He had shot himself through the mouth. Eva Brown was also on a sofa, also dead. A revolver was by her side, but she had not used it; she had swallowed poison. The time was half-past three."

এর কিছুক্ষণ পর আর্তুর অক্সম্যান (Artur Axmann) হিটলারের সেনাবাহিনীর প্রধান এসে হাজির হলেন। গোয়েবলস এলেন একটু পরেই। হিটলারের মৃতদেহ পরীক্ষা করা হলো। লিঙে (হিটলারের খানসামা), গুনিশ (হিটলারের অ্যাডজুটেণ্ট), বোরম্যান ঘরে ঢুকলেন। গুনিশ হিটলারের ড্রাইভার ক্যাম্পকাকে ডাকলেন। ১০ লিটার পেট্রল নিয়ে বাঙ্কার সংলগ্ন বাগানে যেতে নির্দেশ দিলেন। হিটলারের শেষ ইচ্ছে ছিল তাঁর 'মৃতদেহ'টিকে যেন পুড়িয়ে ছাই

করে ফেলা হয়। যাতে শত্রুহাতে পড়ে মুসোলিনীর মৃতদেহের মত তাঁর মৃতদেহেরও ওরকম দুর্দশা না ঘটে।

সকাল থেকেই অন্যান্য বাঙ্কার থেকে হিটলারের বাঙ্কারে আসার সব দরজা জানালা বন্ধ ছিল। যাতে হিটলারের মৃতদেহ তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয় লোকজন ছাড়া অন্য কেউ দেখতে না পারে। রক্তে রাঙা হিটলারের মৃতদেহ কম্বলে জড়ানো হল। জড়ানো হল ইভা ব্রাউনকেও। এলো লিঙে। এলো আরও দুজন এস. এস. সৈন্য। ধীরে ধীরে মৃতদেহ দুটি করিডরে নিয়ে আসা হলো। বাইরের দরজা দিয়ে মৃতদেহ দুটি বাগানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। এত সাবধানতা সত্ত্বেও একজন পুলিশ প্রহরী ছুটে এলো। ছুটে এলো এরিক ম্যান্সফিল্ড (Erick Mansfield), সে তখন duty-তে ছিল। সে জানত না হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। সে দেখল যে 'funeral procession'-এ রয়েছেন বোরম্যান, বুর্গডর্ফ গোয়েবলস, গুনিশ ও লিঙে এবং ক্যাম্পকা। গুনিশের ধমক খেয়ে ম্যান্সফিল্ড তার জায়গায় চলে গেল। তবে সব কিছুই সে বুঝতে পারল।

এরপর মৃতদেহ দুটি বাগানে নিয়ে যাওয়া হল। মৃতদেহ দুটি পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হল। দেহগুলির ওপর ছড়ানো হল পেট্রল। কিন্তু এমন সময় রুশ বিমান থেকে বাঙ্কারের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা বর্ষিত হতে লাগল। মৃতদেহ সৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ রেখে সকলকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হল। গুনিশ অবশ্য এরই মধ্যে একটি কম্বলে আগুন জ্বালিয়ে তা পেট্রললিপ্ত মৃতদেহ দুটির দিকে ছুঁড়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। উপস্থিত সকলেই হিটলারের মৃতদেহকে সামরিক কায়দায় স্যালুট জানিয়ে দ্রুতপদে সরে পড়ল। গুনিশ পরে বলেছেন যে হিটলারের মৃতদেহ সৎকার করতে গিয়ে তিনি জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছিলেন, "The burning of Hitler's body, he said was the terrible experience in his life."—Trevor Ropper.

অন্যান্য সকলে বাগান প্রাঙ্গণ থেকে সরে গেছে রুশ বোমার ভয়ে। আছে শুধু duty-রত প্রহরী ম্যান্সফিল্ড ও কারনাউ। তারা লক্ষ্য করলো হিটলার ও ইভার দেহ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় রয়েছে। সমস্ত শরীর পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু ছাই হয়ে যায়নি। ১০ লিটার পেট্রলে মৃতদেহ দুটিকে ছাই করা যায় না। মৃতদেহ পোড়াতে গেলে কত সময় লাগে, কত জ্বালানি লাগে তা একমাত্র হিন্দুরাই জানে। অবশ্য সেই হিসেবনিকেশ এখানে করা নিরর্থক।

একটু পরেই বাগানে ফিরে এলেন গুনিশ, বোরম্যান, গোয়েবলস, লিঙে ও অন্যান্য সকলে। তখন বোমাবর্ষণ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রয়েছে। এবার তারা গোপনে মৃতদেহ দুটিকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পুলিশের বড় কর্তার কথামত ঠিক করা হল দুজন বলিষ্ঠ লোক। একজনের নাম "মেডের সাউলেন" অন্যজনের "হানস্‌হফবেক"। আবার শুরু হল বাঙ্কারে প্রচণ্ডশব্দে রুশ বোমাবর্ষণ। কিছুক্ষণ পর বোমাবর্ষণ বন্ধ হল।

সৌভাগ্যের ব্যাপার হল যে বোমার ঘায়ে বাগানে একটি বিরাট গর্ত তৈরী হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল দুটি মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য কারা যেন এই গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। সেই গর্তে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ দুটি রাখা হল। মাটি দেওয়া হল সযত্নে। বোরম্যান, গুন্সিশ, হিটলারের সেক্রেটারীরা ও আরও অনেকে এখন হিটলার বা ইভার মৃতদেহ নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করছেন না। চিন্তাভাবনা করছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখন তাঁরা রুশ সৈন্যব্যূহ ভেদ করে নিজেদের জীবন বাচাতে ব্যস্ত। একমাত্র গোয়েবলস ও তাঁর পত্নীই ব্যতিক্রম। তাঁরা ফুয়েরার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি শেষ মুহূর্তেও। জীবন দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন তাঁরাই ফুয়েরার অকৃত্রিম সহকর্মী ও মরমী বন্ধু।

এখন ফুয়েরার নেই। বাঙ্কারের প্রহরীদ্বয় ম্যান্সফিল্ড ও কারনাউ লক্ষ্য করল যে বাঙ্কারে বসে হিটলারের দায়িত্বসম্পন্ন অনুচরেরা ধূমপান করছে। বাঙ্কারে ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল। হিটলারের আদেশেই তা করা হয়েছিল। তাঁর অনুচরেরা এখন সেই আইনভঙ্গ করলো। "Everyone was smoking in the Bunker. During Hitler's life that had been absolutely forbidden, but now the headmaster had gone and the boys could break the rules."

হিটলার ডোয়েনিৎসকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেছেন। সেই খবর কিন্তু তিনি তখনো জানতে পারেন নি। তিনি ছিলেন একজন নাবিক। কর্ম-দক্ষতার জন্য নৌবাহিনীর সর্বপ্রধান হন। রাজনীতি তিনি বুঝতেন না বা তাঁর সেই অভিজ্ঞতাও ছিল না। তিনি ছিলেন পরম হিটলার ভক্ত। বোরম্যানকে হিটলার করে গেছেন পার্টি মিনিষ্টার। বোরম্যান প্রথমে ডোয়েনিৎসকে হিটলারের অভিমত জানান নি। জানান নি তাঁর মৃত্যুসংবাদও। ডোয়েনিৎস তখন জার্মানীর উত্তরে চেলসহউগ-হলষ্টাইনে। বোরম্যান ভাবছেন যদি ডোয়েনিৎস তাঁকে 'পার্টি মিনিষ্টার'-এর পদ না দেন।

সাতপাঁচ ভেবে বোরম্যান ডোয়েনিৎসকে তারবার্তা পাঠালেন। হিটলারের অভিমত জানিয়ে দিলেন। তবে হিটলারের আত্মহত্যার সংবাদ দিলেন না, ডোয়েনিৎস তো স্তম্ভিত। দুদিন আগেও তিনি ফুয়েরার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। হিমলার হিটলারের স্থলাভিষিক্ত হবেন তাও তিনি জেনে গিয়েছেন। বোরম্যানের টেলিগ্রাম তাঁকে হতচকিত করে দিল।

ডোয়েনিৎস বোরম্যানের তারবার্তা পড়ে হিটলারকে একখানা উত্তর পাঠালেন। হিটলার যে মৃত তা তিনি তখনও জানেন না। ডোয়েনিৎস উত্তরে জানালেন, 'আমার প্রিয় নেতা, আপনার প্রতি আমার সার্বিক আনুগত্যের কথা জানাচ্ছি। আমি আমার সাধ্যমত সব করবো। বার্লিন থেকে আপনাকে মুক্ত করবোই। ভাগ্যদেবী যদিও আমাকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসেবে জার্মানীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করছে আমি কিন্তু আমার এই পদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। সৈনিক হিসেবে আমি এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যেটা হবে বীর জার্মানজাতির উপযুক্ত।'

বোরম্যান হিটলারের মৃত্যুসংবাদ ডোয়েনিৎজকে না জানাবার কারণ একটাই পাছে ডোয়েনিৎস বোরম্যানকে পার্টি মিনিষ্টারের পদ দিতে অস্বীকৃত হন। বোরম্যান, চেলসহউগ-হলেষ্টাইন যাবার মতলব করছেন ডোয়েনিৎসের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু রুশ সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে সেইখানে পৌছানো অসম্ভব ব্যাপার।

বোরম্যান, গোয়েবলস, অক্সম্যান, ক্রেবস, বুর্গডফ´ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। ১লা মে, ১৯৪৫ ক্রেবসকে সন্ধিপ্রস্তাবসহ রুশ সেনাধ্যক্ষ মার্শাল জুকভ-এর কাছে পাঠান হলো। ক্রেবস ১৯৩৯ সালে 'রুশ-বার্লিন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। 'স্তালিন' (Stalin) তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনও করেছিলেন। ক্রেবস রুশভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই গোয়েবলস ও বোরম্যান আশা করেছিলেন জুকভ তাঁদের সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেবেন। সন্ধি প্রস্তাবে তাঁরা হিটলারের মৃত্যুসংবাদও জানিয়ে দেন। জানিয়ে দেন হিটলারের উইলের কথা। কাদের ওপর বর্তমান জার্মান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার হিটলার দিয়ে গেছেন তা তাঁরা জুকভকে জানালেন। তাঁরাই যে এই প্রস্তাব পাঠালেন তাও গোয়েবলস উল্লেখ করলেন।

জুকভ কিন্তু এই সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

জুকভ বোরম্যান ও গোয়েবলসকে জানিয়ে দিলেন যে জার্মানীকে 'unconditionally surrender' করতে হবে। নচেৎ কোন সন্ধিপ্রস্তাব তিনি মেনে নেবেন না। জুকভ-এর এ প্রস্তাব তাঁরা মানতে পারলেন না। তাঁরা, গোয়েবলস বাদে কিভাবে বাঙ্কার থেকে পালিয়ে ডোয়েনিৎসের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন—সেই ফন্দি আঁটছিলেন। তখন বেলা ৩-৩০ মিঃ।

গোয়েবলস সব বিস্তারিত জানিয়ে ডোয়েনিৎসকে টেলিগ্রাম করলেন। হিটলারের আত্মহত্যার সংবাদও তাঁকে জানানো হলো। ডোয়েনিৎস এখন তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন। অবশ্য হিটলারের উইলের পুরো কপি তিনি তখনো দেখেননি।

রাত ৯॥টা। হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র থেকে হিটলারের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হলো। রাত ১০-২০ মিনিটে ডোয়েনিৎস যে হিটলারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাও প্রচার করা হলো বেতারে। গোয়েবলস ডোয়েনিৎসকে তাঁর সংকল্পের কথাও জানিয়ে রেখেছিলেন।

এবার গোয়েবলস তা কাজে পরিণত করতে চলেছেন। রাত ১০-৩০ মিঃ। গোয়েবলস ফ্রাউ গোয়েবলসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে গেলেন। এর আগে স্থির করে রেখেছিলেন ছয়টি শিশুসন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পরিকল্পনা। অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্কারের একজন ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। গোয়েবলসের সন্তানরা তখন দুগ্ধ পান করছিল। গোয়েবলস পত্নীসহ বাইরে এলেন। ঘরের মধ্যে ছিল তখন ছয়টি নিষ্পাপ শিশু আর ডাক্তার।

ডাক্তার শিশুদের আদর করলো। কুশল জানতে চাইলো। সুন্দর লজেন্স দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। ছয়জন শিশুই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। লজেন্স খাবার

আশায় তাড়াতাড়ি গ্লাসের মুখ গলায় ঢালল। হাত বাড়াল ডাক্তারকাকুর দিকে। লজেন্স চাইল। ডাক্তারকাকু ছয়জনকে একসঙ্গে লজেন্স খেতে হবে বলে মিষ্টি সুরে বললেন। মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। অন্তরের দহন জ্বালা কিন্তু তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল। কিন্তু শিশুরা বুঝতে পারল না। বড় মেয়েটি খানিকটা আন্দাজ করতে পারল। তাকে বোঝানো হল। সকলের হাতেই দেওয়া হল। প্রায় একই সঙ্গে ছয়জনেই লজেন্সগুলি মুখে পুরলো। নিমেষে ছয়টি নিষ্পাপ শিশুর নিষ্প্রাণ দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাক্তার করিডরে অপেক্ষারত গোয়েবলসকে ইঙ্গিতে কি যেন বললেন। গোয়েবলস পত্নী সব বুঝতে পারলেন। শত হলেও মাতৃহৃদয়। যদিওবা সবই হলো তাঁদের পূর্ব পরিকল্পনা মত। তবুও ফ্রাউ গোয়েবলস নিজেকে সামলাতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে দুজনই নিজেদের পরিকল্পনা মত আত্মহত্যার জন্য তৈরী হলেন।

গোয়েবলস তাঁর অ্যাডজুটেণ্টকে ডাকলেন। পূর্বের কথামত তাকে নির্দেশ দিলেন। বাগানে গিয়ে তাঁরা দুজনে দাঁড়ালেন। গোয়েবলসের নির্দেশমত পেছন থেকে তাঁদের গুলি করা হল। দুটো গুলিই ছিল যা দুজনের দেহ মাটিতে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। গোয়েবলস ও তাঁর পত্নীর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মৃতদেহ দুটি কম্বলে জড়ানো হল। সেগুলিকে আগুন দেওয়া হল। পেট্রলের আগুনে দেহদুটি অর্ধদগ্ধ হল। তারপর সব শেষ।

বাঙ্কারে যারা ছিল এখন সকলেই রুশ সৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হল বোরম্যানের নেতৃত্বে। পালাতে গিয়ে অনেকেই ধরা পড়ল। বোরম্যান রুশসৈন্যের গোলার আঘাতে ভূতলে পতিত হলেন। মৃত্যু এসে তাঁর সব পার্থিব আশার বিলুপ্তি ঘটালো। বোরম্যানের সঙ্গে হিটলারের উইলের একটি কপিও ছিল। তা শত্রুহাতে পতিত হল।

ফুয়েরার সৃষ্ট থার্ডরাইখ টিকে ছিল আর মাত্র সাত দিন। বেতারে ডোয়েনিৎসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্পের কথা ডোয়েনিৎসের কণ্ঠস্বরে ভেসে উঠল। অবশ্য তিনি ভালভাবেই জানতেন আর বেশীদিন নয়। অচিরেই তাসের ঘরের মত থার্ডরাইখের প্রতিটি কংক্রীটের দেওয়াল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আর পুনরুত্থান কোনদিনও সম্ভব হবে না।

২৯শে এপ্রিল জার্মানবাহিনী ইতালিতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো। ৪ঠা মে উত্তর-পশ্চিমে মণ্টোগোমারীর বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল জার্মানবাহিনী। পরদিন আত্মসমর্পণ করল কেসার লিংয়ের বাহিনী। খেলা শেষ।

১৯৪৫-এর ৭ই মে রাত ২-৪১ মিঃ। রীমস-এর এক ছোট বিদ্যালয় ভবনে ডোয়েনিৎস নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। জার্মানীর পক্ষে জডল, মিত্র পক্ষের থাকলেন জেনারেল ওয়ালটার বেডেল স্মিথ। আর জেনারেল ইভান সুসলোপারভ ছিলেন রাশিয়ার পক্ষ থেকে।

জডল মিত্রপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছোট্ট ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বিজয়ী পক্ষের কাছে অনুরোধ রাখলেন তাঁরা যেন জার্মানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। মিত্রপক্ষের কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না। লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানবাসী কৃপাপ্রার্থী হয়ে বিজয়ীপক্ষের দিকে বাঁচার আশায় সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জার্মানী এখন পুব ও পশ্চিমে বিভক্ত। রাশিয়া দখল করে আছে পুব জার্মানী আর মিত্রপক্ষ (তবে আমেরিকাই প্রধান) পশ্চিম জার্মানী।

১৯৪৫-এর ২৩শে মে মিত্রপক্ষ ডোয়েনিৎসের অস্থায়ী সরকার ভেঙ্গে দিল। গ্রেপ্তার করল সকলকেই। হিমলার ও ১১জন এস. এস. সহকর্মীসহ বেভেরিয়াতে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। পটাসিয়াম সাইনাইডের পিল মুখে পুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি ২/১ মিনিট বেচে ছিলেন। ব্রিটিশ ডাক্তার বাঁচাবার বহু চেষ্টা করেও বিফল হলেন।

কট্টর নাৎসী নেতারা ধরা পড়ল। যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার জন্য গঠিত হল ট্রাইবুনেল। নাম হ্যুরেমবার্গ মিলিটারী ট্রাইবুনেল।

২১জনকে ট্রাইবুনেলের সামনে নিয়ে আসা হল। রুডলফ হেস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, সেনাধ্যক্ষ কাইটেল, জডল, নাৎসী-ফিলোজফির উদ্‌গাতা রোজেনবার্গ, ইহুদী নিধনকারী জুলিয়াস ষ্টাচার, ভন প্যাপেন, ভন স্কিরাক, ওয়ালদার ফাঙ্ক প্রমুখ ব্যক্তিগণের বক্তব্য শোনা হল। বিচার হলো। রায় দেওয়া হলো। এই বিচারপর্ব সমাধা হতে বেশ সময় নিয়েছিল।

সাতজন লাভ করেছিলেন কারাদণ্ড। তাঁরা হলেন রুডলফ হেস, রেডার, ফাঙ্ক, স্পীয়ার ও স্কিরাক, নিউরথ ও ডোয়েনিৎস।

১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবরের বেলা ১টায় ফাঁসিতে ঝুলানো হল রিবেনট্রপ, কাইটেল, রোজেনবার্গ, ফাঙ্ক, জডল, ষ্টাচার, সেইশ ইনকার্ট, ফ্রিক ও অন্যান্যদের।

গোয়েরিঙ ফাঁসির দড়ি গলায় পরার আগেই গোপনে আমদানী করা বিষাক্ত ক্যাপস্থল খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হিটলারের স্বপ্নের হাজার বছরের থার্ড রাইখের অবলুপ্তি ঘটল মাত্র ১২ বছর ৩ মাসে। নাৎসী-দলের ঘটল অবলুপ্তি।

হিটলার নিশ্চয় যুদ্ধের জন্য অনেকাংশে দায়ী। যে নৃশংস ধ্বংসলীলা তিনি চালিয়েছিলেন তা সত্যি ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটা রাখতে গেলে অনেক কিছুই মনে পড়ে। জার্মানীর তৎকালীন অবস্থা। ভার্সাই শান্তি চুক্তির সর্ত ও মিত্রশক্তিবর্গের জার্মানীকে নিষ্পেষণের কাহিনী। জার্মানীকে হিটলারই সেই সময় নেতৃত্ব দিয়ে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। জার্মানী অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তার পঙ্গু আর্থিক অবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠল। প্রযুক্তি বিদ্যার চরম উৎকর্ষতা গুণে শিল্পের অস্বাভাবিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পঙ্গু অর্দ্ধভুক্ত জার্মান জাতির মনে হিটলার তাঁর যাদুস্পর্শে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর আশ্চর্য স্মরণশক্তি, তাঁর অভূতপূর্ব বক্তৃতা দানের ক্ষমতা, অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান, সামরিক বিষয়ে তাঁর অসাধারণ

পাণ্ডিত্য, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ গুণের জন্ত জার্মানবাসী তাঁকে অনন্ত সাধারণ মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন হিটলারের চোখের ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অনতিক্রম্য। না হলে ভিনদেশী একজন অল্পশিক্ষিত লোক সুসভ্য জার্মানদের কিভাবে নিজের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালনা করলেন! তিনি তো ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন অতি সাধারণ সৈনিক। প্রমোশন পেয়ে কর্পোরলের ওপর উঠতে পারেন নি। তার মধ্যে অনন্ত সাধারণ প্রতিভা না থাকলে তিনি কি এত বড় একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে পারতেন? তাদের মধ্যে কি জাগাতে পারতেন সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়ার মনোভাব ও শক্তি?

তিনি জার্মানীকে কেন নিজের মাতৃভূমির মর্যাদা দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তিনিই একমাত্র বলতে পারতেন। কোন ঐতিহাসিকের লেখায় এই ব্যাপারে আমি সঠিক কিছু খুঁজে পাইনি। স্বদেশ প্রেমিক হিসেবে হিটলার ছিলেন নবজাগ্রত জার্মানীর আদর্শ মানব। ব্যাভেরিয়া সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগলাভ করে তাঁর বীর ধমনী নেচে উঠেছিল। তরুণ জার্মানরা তাঁর আত্মচরিত পাঠে তাঁর পরিচয় পেয়েছে। তাই তো তারা তাঁকে স্বদেশপ্রেমিক ও আদর্শবীর বলে দেবতার আসনে বসিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হাসপাতালে আহত অবস্থায় অপর আহত সৈনিকের জার্মানী সম্বন্ধে গ্লানিসূচক বক্তব্য শুনে ক্ষোভে ও ঘৃণায় ফেটে পড়েছিলেন। গ্রাম্য ধর্মযাজকের কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পতনের সংবাদে মাতৃহারা শিশুর ন্যায় কেঁদেছিলেন। ভার্সাই সন্ধির গ্লানিকর শর্তে তিনি মর্মে মর্মে তীব্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভব করেছিলেন। জার্মানী তাঁর পরিচয় পেয়েছিল। তাই তাঁকে পেয়ে জার্মানবাসী মন্ত্রমুগ্ধ ও আত্মহারা হয়ে উঠেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর (A. J. P. Taylor) হিটলার সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, **"Hitler supplied a powerful dynamic element but it was fuel to an existing engine. He was in part creation of versailles, in part the creation of ideas that were common in contemporary Europe."**

তিনি আরও বলেছেন হিটলার জার্মানীকে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রের চিন্তাধারাও প্রায় তাঁরই মত। তারাও চায় ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত করে তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। এই সমস্ত শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রের জোরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সচেষ্ট। তার নিদর্শন আমরা বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতেও দেখতে পাচ্ছি। তাই টেলর স্পষ্টত বলেছেন, **"In international affairs there was nothing wrong with Hitler except that he was a German."**

এই ব্যাপারে বিচারক রাধাবিনোদ পালের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রী পাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধে অভিযুক্ত জাপানী নেতাদের বিচারের জন্ত গঠিত

টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে একজন বিচারক হিসেবে গিয়েছিলেন। মিত্রশক্তিবর্গ এই আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন জাপানী যুদ্ধ অপরাধীদের।

শ্রী পাল তাঁর রায়ে জাপানী নেতাদের যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত করেননি। তিনি ভিন্ন রায় দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর রায় ছিল 'minority' রায়। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তথাপি তাঁর রায় বিশ্বের দরবারে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পরিষ্কার ভাষায় "বিশুদ্ধ আইনের এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে নানা বিধি ও আইনের নজীর ও ঘটনার দৃষ্টান্ত তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, অতীতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যে সমস্ত কার্য করেছে, জাপান তার অতিরিক্ত কিছুই করেনি। চুক্তি ও সন্ধি-শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ, অন্য দেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেদের দলে আনা, অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন, যুদ্ধবন্দীদের কিংবা নারী ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় অত্যাচার ও আনুষঙ্গিক বর্বরতা ইত্যাদি সমস্তই অতীতে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি গোপন সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত কূটনীতি ও 'পাওয়ার পলিটিক্স'-এর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যোগদান সম্পর্কে স্তালিনের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের আগেই গোপন চুক্তি হইয়াছিল এবং সেই চুক্তি এমন এক সময় সম্পাদিত হইয়াছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের বাহ্যত বন্ধুত্বের সম্পর্কই ছিল।" (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৭৫)।

তাই বিচারপতি ডঃ পাল তাঁর সুদীর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সমস্ত জাপানী নেতাকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করে মুক্তি দানের সুপারিশ করেছিলেন। ঠিক একই রায় কি জার্মানীর যুদ্ধ অপরাধীদের ক্ষেত্রে খাটে না—যদি ডঃ পালের যুক্তি ও আইনের ধারায় বিচার করা যায়।

হিটলারের দোষগুণ সব যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণাড হিয়েডেন (Kornard Hieden) তাঁর 'ওয়ান ম্যান এগেইনষ্ট ইয়োরোপ' (One Man Against Europe গ্রন্থে বলেছেন যে,

"Adolf Hitler as man and politician, is a leader, an enemy and a mirror of our European civilization.

He is a leader because his actions are based on a very pessimistic—anticipation of the destiny of Europe as a whole in the coming years, and he hopes to arise from its ruins as the ruler, and perhaps the reformer.

He is an enemy because he rejects the conception of a Europe of nations with equal rights, made up of free men and women, plans the oligarchy of a few strong men, ruling millions of the weak, and therefore works for the dissolution of contermporary Europe, which contains the delicate seeds of future union.

He is a mirror of our time, for his strange personality, with its contradictions of pathos and unbridled passion, revolt and submission, greatness and depression, is the extreme type of modern man; technically, highly developed; and socially, profoundly unsatisfied.

Our time has given him unfettered power; his effectiveness depends on his immediate responsiveness to momentary circumstances. Humanity's despair in face of its problems has created his type and same reflection will remove it again. For if humanity could not march forward without this kind of leadership it would not have the strength to survive."

ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের প্রতি যে হিটলারের মনে সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল তা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন। আত্মহত্যা করার আগে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উইলে বলে গেছেন যে তাঁর সঞ্চিত শিল্পকলাগুলি দিয়ে যেন 'লীঞ্জে' একটি মিউজিয়াম তৈরী করা হয়।

এই ব্যাপারে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্স থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে তাঁর 'বেরখস্টেসগ্যাডনের' বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ফ্রান্সের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। হিটলার তাঁদের সঙ্গে কথা বলে খুবই আনন্দ উপভোগ করেন। ফ্রান্স শিল্পীর দেশ। ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পে ফ্রান্স সমৃদ্ধ। হিটলার তা ভালোভাবে জানতেন। হিটলার 'প্যারিস আর্ট প্রদর্শনীর' ওপর নানান আলোচনা করলেন তাঁদের সঙ্গে। হিটলার 'প্যারিসের আর্ট প্রদর্শনী' দেখার জন্য খুবই উৎসাহী এবং তিনি তাঁদের জানালেন একজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর হিসেবে তিনি 'প্যারিসের আর্ট প্রদর্শনী'র সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি প্যারিসে গিয়ে স্বচক্ষে এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন না তাই তাঁর মনে খুবই দুঃখ। একজন প্রতিনিধি তাঁকে প্যারিসে যেতে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ফরাসীরা প্যারিসে ফুয়েরারকে দেখলে আনন্দ পাবে। হিটলার দুঃখভরে একটু হাসলেন এবং বললেন অবসর গ্রহণের আগে তাঁর পক্ষে প্যারিস যাওয়া সম্ভব হবে না। হিটলারের শিল্পী মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ফুটে উঠেছে এখানে। সেই সঙ্গে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সংঘর্ষের একটা ইঙ্গিতও রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে হিটলার হতে চেয়েছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট না থাকায় তিনি 'আর্ট স্কুলে' চেষ্টা করেও ভর্তি হতে পারেননি। বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পর পর দুবার অকৃতকার্য হয়ে পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। বাঁচার তাগিদে রাজনীতিকে তিনি তাঁর পেশা করেন। হয়ে গেলেন বিশ্বের সেরা ডিক্টেটর। চিত্রশিল্পী হলে বিশ্ব-ইতিহাসে তিনি স্থান করে নিতে পারতেন কিনা বলা কঠিন, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা ও জার্মানীর ফুয়েরার হিসেবে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে খারাপ হোক বা ভালো হোক একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে একথা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্দীশিবিরে হিটলারের নির্দেশে নাৎসীবাহিনীর অমানুষিক বর্বরতার কথা সর্বজনবিদিত। লক্ষ লক্ষ ইহুদী, পোল, রুশ জার্মান বন্দীশিবিরে হিটলার ও তাঁর ঘাতকবাহিনীর নির্দেশে নির্বিচারে নিহত হয়েছে। সে কাহিনী যেমন মর্মান্তিক, তেমন নৃশংস। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী মানবহৃদয়ে কত শূন্তি করে, দেহে জাগায় শিহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর হাতে প্রথম বলি পোল্যাণ্ড। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড দখল করল হিটলার। পাঁচ বছর ধরে পোলিশদের ওপর চলেছে হিটলারের নাৎসীবাহিনীর অকল্পনীয় অত্যাচার। সামরিক, অসামরিক, শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকসহ সমস্ত পোলিশ নাগরিকের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল সে সমস্ত বীভৎস অত্যাচার কাহিনী অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। সেই কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করেছিল তাতে আধুনিক যান্ত্রিক-যুদ্ধ সম্পর্কে এক ভয়ঙ্কর দিক উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠেছিল। রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছিল যে আগেকার ব্যক্তিপ্রধান যুদ্ধের সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধের কোন মিল নেই। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "It is now a gigantic machinery of destruction set in motion by an invisible hand Perhaps it is this depersonalisation that has led to the disappearance of humanity in modern wars ......"

"বর্তমানে যুদ্ধটা দাঁড়িয়েছে একটি বিশাল ধ্বংসকারী যন্ত্রের মধ্যে এবং এ যন্ত্রের গতিবেগ অদৃশ্য হস্তের দ্বারা পরিচালিত। মনে হয়, এ প্রকার যান্ত্রিকতার জন্যই আধুনিক যুদ্ধের মধ্য থেকে মানবিকতা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে।"

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, জার্মানীতে বন্দীশিবিরগুলির সূত্রপাত হয় হিটলারের ক্ষমতালাভের শুরু থেকেই অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল থেকে। গোয়েরিঙ ছিলেন হিটলারের একান্ত অনুগত পার্শ্বচর। জার্মানীতে বন্দীশিবির স্থাপনের পরিকল্পনা এবং কিভাবে সেগুলিতে বন্দীদের আটক রেখে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হবে সে চিন্তা প্রথম উদিত হয়ছিল গোয়েরিঙ এর মাথায়।

১৯৩৩ সালে গোয়েরিঙ ছিলেন প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তদুপরি তিনি ছিলেন সেখানকার রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের সর্বময় কর্তা। নাৎসী রাজত্বের বিরোধী কম্যুনিস্ট ও ইহুদীদের খতম করার সংকল্প নিয়ে গোয়েরিঙ বন্দীশিবিরগুলি স্থাপন করেছিলেন। ব্যাভেরিয়া আবার হিটলার ও গোরিরিঙকে পথ দেখালো। এ সময় ব্যাভেরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হল ভবিষ্যতের জঘন্যতম ডাচাউ (Dachau) ক্যাম্প। ভবিষ্যতের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলির পথপ্রদর্শক হল এই ডাচাউ বন্দীশিবির।

জার্মানী ও জার্মানীর বাইরে জার্মান অধিকৃত জায়গাতে ছোট বড় বহুসংখ্যক বন্দী-শিবির গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ সাল। হিটলার হিমলারকে এস. এস. বাহিনীর অধিকর্তাপদে অধিষ্ঠিত করলেন। জার্মান পুলিশের সর্বাধিনায়ক হিসেবেও তিনি নিযুক্ত হলেন। হিমলার অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। বন্দীশিবিরে নিধন যজ্ঞের সর্ব-প্রধান হিসেবে হিটলার তাঁর কাজ আরম্ভ করেন। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সূচনা হলো বন্দীশিবিরগুলিতে। ১৯৪২ সালের শেষদিকে হিমলার নির্দেশ দিলেন যে, বন্দী-শিবিরগুলিতে হত্যা কমাতে হবে। কেন না বন্দীদের দিয়ে শ্রমিকের কাজ করানো হতো জার্মানীতে এবং জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে। অতএব নির্বিচারে বন্দীহত্যা জার্মানী এবং জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে শ্রমিক পাবার সমস্যা দেখা দিল। এ সমস্ত বন্দীদের এস. এস. বাহিনী পরিচালিত কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কাজে লাগানো হতো।

পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশ হিটলারের করতলগত হয়েছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এ সমস্ত দখলীকৃত জায়গায় বন্দীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। তবে পোল্যাণ্ডের ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা ছিল সর্বাধিক। হিটলার পোলিশদের সম্পর্কে ১৯৪০ সালে পোল্যাণ্ডের শাসনকর্তা হানস ফ্রাঙ্ককে বলেছিলেন যে পোলরা শ্রমশিবিরেরই যোগ্য। তাদের কাজে কোন স্পৃহা নেই, তারা অলস ও জড় পদার্থবিশেষ। তাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। পোল্যাণ্ডকে জার্মানীতে শ্রমিক যোগান দিতে হবে। পোলিশদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যাবে না।

ইউরোপীয় ইহুদীদের বধ্যভূমি ছিল পোল্যাণ্ড। হিটলারের "দি নিউ অরডার" বা নব বিধানের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত তখন ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপের প্রভু হবার স্বপ্নে হিটলার তখন বিভোর। ইউরোপ থেকে শ্লাভ ও ইহুদীদের নির্মূল করার জন্য হিটলার ও তাঁর নাৎসী নেতারা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। কেন না নাৎসী নেতাদের মতে এরা হচ্ছে অতীব ইতর প্রাণী। এদের সুসভ্য ইউরোপে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। হিটলার ঘোষণা করলেন সমগ্র ইউরোপকে করতে হবে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের প্রধান-কেন্দ্র। পোল্যাণ্ডে অবস্থিত বন্দীশিবিরগুলিতে পোল্যাণ্ড, জার্মানী, অস্ট্রীয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, গ্রীস, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া থেকে ধৃত লক্ষ লক্ষ ইহুদী বন্দীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়েছিল।

বন্দীশিবিরগুলি ছিল দু' ধরনের। প্রথম প্রকার বন্দীশালাকে বলা হতো আটক বন্দীশালা। এখানে বন্দীদের অমানুষিক খাটুনির পর পাঠানো হতো। শ্রান্ত, অবসন্ন, অনাহার ও অর্ধাহারক্লিষ্ট বন্দীরা ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতো। আর কতকগুলি বন্দীশিবির ছিল শুধু সংহার করার জন্য। ইংরেজীতে এগুলোকে বলা হতো "ডেথ ক্যাম্প।"

পোল্যাণ্ডে ছিল পাঁচটি বৃহৎ বন্দীশিবির। আউসভিৎস (Auschwitz), বার্কেনাউ (Birkenau), মাজডানেক (Majdanek), ষ্টাটহফ (Stuthof) এবং গ্রস-রোজেন। এছাড়াও ছোটবড় আরও অনেক বন্দীশিবির ছিল পোল্যাণ্ডে। আউসভিৎস, বার্কেনাউ, পোজ্নান, ম্যাজডানেক, চেলমেনো ও ট্রেবেলিঙ্কো বন্দীশিবির ছিল ইহুদী বন্দীদের জন্য সংরক্ষিত।

বন্দীশিবিরগুলি ছিল বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যুপুরী। এ সমস্ত বন্দীশিবিরে নাৎসীবিরোধী পোলিশ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও যাজকদেরও হত্যা করা হতো। ইহুদীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। একমাত্র চেলমেনো বন্দীশিবিরে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ইহুদীকে খতম করা হয়েছিল। ট্রেবেলিঙ্কো আর একটি কুখ্যাত বন্দীশিবির। এই বন্দীশিবিরটি ছিল ফাঁকা জায়গায়। ট্রেবেলিঙ্কো রেল স্টেশনের পাশেই। এই বন্দীশিবিরে হত্যা করা হয়েছিল ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ইহুদীকে।

তবে ট্রেবেলিঙ্কো বন্দীশিবিরে একবার ইহুদী বন্দীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। অনেক বন্দী পালিয়ে যায়। এস. এস. বাহিনীর অনেককে বিদ্রোহীরা হত্যা করেছিল। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী বন্দীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। বিদ্রোহীদের বন্দীশিবিরে আটক করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বীভৎস লেলিহান আগুনের শিখায় হাজার হাজার ইহুদী যুবক-যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বধ করা হয়েছিল। তাদের ক্রন্দন রোলে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। নিষ্ঠুর এস. এস বাহিনীর হিটলারের অনুগত ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে এই ক্যাম্পটি তুলে দেওয়া হয়।

পোল্যাণ্ড কেন সমগ্র ইউরোপের নাৎসী জার্মানীর বন্দীশিবিরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল আউসভিৎস বন্দীশিবির। বিশালকায় এই বন্দীশিবিরের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দৈনিক ১০ হাজার মৃতদেহ দাহ করা হতো। বিশালসংখ্যক বন্দীকে একাধারে হত্যা করা যেমন কষ্টসাধ্য ছিল তেমনি কষ্টসাধ্য ছিল মৃতদেহগুলিকে পোড়াবার ব্যবস্থা করা। কেন না এত বিশালসংখ্যক মৃতদেহকে পোড়াতে গেলে গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। বিপুলসংখ্যক মৃতদেহের পোড়া গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। ফলে আশে-পাশের জনগণের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো তা হিমলার বা তাঁর নাৎসী ঘাতকদের বুঝতে অসুবিধে হতো না।

যুদ্ধশেষে অনুসন্ধানে জানা যায় যে এ ক্যাম্পের রেজিস্ট্রী খাতায় প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার বন্দীর নাম ছিল। এদের বেশির ভাগই প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর অনাহারে অর্ধাহারে মৃতপ্রায় হয়ে থাকত। প্রায় পঁচাত্তর ভাগই মারা যেতো অনাহারে, অধিক শারীরিক পরিশ্রমে। অবশিষ্টদের গ্যাস চেম্বারে সংহার করা হতো।

এ ছাড়া পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত বন্দীদের নিধনের জন্য প্রায় ত্রিশটি বন্দীশিবির খোলা হয়েছিল। যুদ্ধের পর সোভিয়েত জেনারেলরা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলেন এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ সোভিয়েত বন্দীকে অত্যন্ত বর্বর অত্যাচারে নিধন করা হয়েছিল। এমনকি খাস জার্মানীতে ৩৬ লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীকে আটক করে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র কয়েকশত শ্রমিক কাজের জন্য জীবিত ছিল। আর বাকী সব অনাহারে, অর্ধাহারে, অমানুষিক অত্যাচারে ও সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ কথা রোজেনবার্গের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়। রোজেনবার্গ ছিলেন নাৎসীদের তাত্ত্বিক নেতা।

ওয়ারশতে ইহুদীদের থাকার জন্য একটা আলাদা পাড়া বা গ্রাম ছিল। এটা ছিল

দৈর্ঘ্যে ২১/২ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। এটাকে বলা হতো ওয়ারশ ঘেটো। ওয়ারশ ঘেটোর বীভৎস অত্যাচার কাহিনী পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদী সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান এবং পোলিশ জনগণকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যে সমস্ত পন্থা নাৎসীবাহিনী অবলম্বন করেছিল তা যেমন হৃদয়বিদারক তেমনি বীভৎস।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রায় ৬০১/২লক্ষ ইহুদী এবং পোলিশ নাগরিক নিহত হয়েছিল। তার মধ্যে যুদ্ধের জন্য নিহতের সংখ্যা হচ্ছে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার আর নাৎসী সন্ত্রাস-এর কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে ৫৩ লক্ষ ৮৪ হাজার। এর মধ্যে পোলিশ ইহুদীর সংখ্যা হচ্ছে ৩২ লক্ষ। ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার পোলিশ নাগরিককে দাসশ্রমিক হিসেবে জার্মানীতে পাঠানো হয়। পোল্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি ছিল জার্মান অধিকৃত জায়গাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি।

নাৎসীদের স্থাপিত বন্দীশিবিরগুলির মধ্যে ত্রিশটি ছিল 'ডেথ ক্যাম্প'। এগুলি হলো আউসভিৎস, বার্কেনাউ, অসউইচেম, বেলসন, মাইডানেক, ডাচাউ, চেলমেনো, ট্রেবেলিঙ্কো, বুখেনভাগু, বেলজেক, উলজেক প্রভৃতি। এ সমস্ত বন্দীশিবিরে অনাহারে, অর্ধাহারে রেখে এবং শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে অধিকাংশ বন্দীদের হত্যা করা হতো। রুশ বিশেষজ্ঞদের মতে কেবলমাত্র আউসভিৎস বন্দীশিবিরেই চল্লিশ লক্ষ বন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল বিভিন্ন নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে। হিটলার ও তাঁর নাৎসীবাহিনী সবচেয়ে বেশি খুন করেছে ইহুদী, রুশ ও পোলিশদের। এমন বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নজির যা জাতি বিদ্বেষ-জনিত, বিশ্ব-ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ইহুদী সমস্যার চরম সমাধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। ১৯৩৯ সালে ৩০শে জানুয়ারী যুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েকদিন আগে হিটলার প্রচণ্ড রোষে ঘোষণা করলেন যে, "If the international Jewish financiers……should again succeed in plunging the nations into a world war the result will be……the annihilation of the Jewish race throughout Europe"

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস। নাৎসী অফিসারদের মনে এ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হল যে জার্মানীর যুদ্ধজয় অবধারিত। হিটলারের অন্যতম বিশ্বস্ত ঘাতক হাড্রিশ অফিসারদের বুঝালেন যে, সারা ইউরোপে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ ইহুদী আছে তাদের সকলকে অবিলম্বে নির্মূল করতে হবে। তাই তিনি ইংলণ্ডসহ প্রত্যেক দেশের ইহুদীদের সংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করলেন। গেস্টাপো বাহিনীর অন্যতম কর্তা আইখম্যান বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালেন যে, পূর্বদিকের ২০ লক্ষ ইহুদীকে ইতিমধ্যে শেষ করা হয়েছে।

কিছুদিন নাৎসী নেতাদের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। কে কত তাড়াতাড়ি গ্যাসচেম্বারে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে ইহুদীদের খতম করতে পারে—এটাই ছিল নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়। "Speed was an important factor, especially at Auschwitz, where toward the end the camp was setting new records by gassing 6000 victims a day."

আউসভিৎস বন্দীশিবিরের একসময়ে দায়িত্বভার ছিল Rudolf Hoess এর উপর। Hoess ছিলেন একজন খুনী-আসামী। জন্ম ১৯০০ সালে। তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ক্যাথলিক ধর্মগুরু তাঁকে ব্যাডেনের ক্যাথলিক চার্চে ক্যাথলিক-পুরোহিত হিসেবে যোগ দিতে বলেছিলেন। ব্যাডেনে তাঁর একটি ছোট দোকান ছিল। ক্যাথলিক ধর্মগুরুর কথা তিনি রাখলেন না। ১৯২২ সালে হিটলারের আকর্ষণে তিনি নাৎসীদলে যোগ দিলেন। ১৯২৩ সালে নাজিবিরোধী এক শিক্ষককে খুন করেন। যার জন্য তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হয়ে গেলেন নাজিদলের প্রথমসারির নেতা। ১৯২৮ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

নাৎসী ডেথ ক্যাম্পের দায়িত্বভার পড়ল তাঁর উপর। প্রথমে ডাচাউ বন্দীশিবির পরে ১৯৪১ সালের জুন মাসে এলেন আউসভিৎস বন্দীশিবিরের ক্যাম্প-কম্যাণ্ডার হিসেবে। লক্ষ লক্ষ ইহুদী খুনে তাঁর হাত লাল হয়ে গেল। খুনের নেশায় মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি। পরিদর্শনে গেলেন ট্রেবেলিংকো বন্দীশিবিরে। সেখানকার ক্যাম্প কম্যাণ্ডান্টকে জিজ্ঞেস করলেন কত তাড়াতাড়ি তারা বন্দীদের সংহার করছেন। উত্তরে জানতে পারলেন ছয় মাসে তারা আশি হাজার বন্দীকে সংহার করতে সক্ষম হয়েছেন।

Hoess ঠিক করলেন তিনি আরও তাড়াতাড়ি ইহুদী বন্দীদের হত্যা করতে পারবেন আউসভিৎস বন্দীশিবিরে। তাই তিনি মনোক্সাইড গ্যাসের পরিবর্তে জিকলিন 'বি' গ্যাস ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলেন। জিকলিন 'বি' গ্যাস তিন থেকে পনের মিনিটের মধ্যে গ্যাস চেম্বারের সকলকে সাবাড় করতে সক্ষম। এভাবে আউসভিৎস বন্দীশিবিরের চারটি গ্যাস চেম্বারে দৈনিক মোট ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার পর্যন্ত বন্দীকে খতম করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

নাৎসী জল্লাদরা যে কত লোককে খুন করেছিল তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা শক্ত। তবে তাদের হাতে অগণিত ইহুদী, রুশ ও পোলিশ যে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরীহ স্ত্রী জাতির উপর নাৎসীবর্বরদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী বিশ্ব-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ছোট ছোট ইহুদী, রুশ ও পোলিশ মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী এখনো সুস্থ মানুষের মনে শিহরণ জাগায়।

সুন্দর নিষ্পাপ শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার বর্ণনা রয়েছে বিভিন্ন পুস্তকে। এ সমস্ত কাহিনী পড়তে পড়তে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। শিশুদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইহুদী মায়েরা তাদের আঁচলের নীচে শিশুদের ঢেকে রাখত। কিন্তু নিষ্ঠুর ঘাতকের হাত থেকে একটি শিশুরও নিস্তার পাবার উপায় ছিল না। মায়ের আঁচলের নীচ থেকে তাদের টেনে বের করে নিয়ে আসত ঘাতকেরা। অনেক সময় শিশুদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখতো সর্বসমক্ষে। আর তারা মেতে উঠত পৈশাচিক আনন্দে। অনেক সময় চুণ ভর্তি চৌবাচ্চায় শিশুদের ছুঁড়ে ফেলে দিত। ছটফট করতে করতে কিভাবে শিশুরা মারা যেতো তা নাৎসী ঘাতকরা মহা আনন্দে লক্ষ্য করতো। ওয়াগন ভর্তি বন্দীদের নিয়ে যাবার সময় শিশুদের মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জানালা

দিয়ে ঢুঁকে ফেলে দেওয়া হতো। অনেক সময় শিশুদের পা ধরে আছাড় মেরে মা-বাবার সামনে হত্যা করা হতো। "The killings were done in this way that particular S S. men or Policemen would seize them by the legs and then smash the heads of the children aganist the trunks of trees"—William Shirer.

এ সমস্ত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যে কোন সুসভ্য মানুষের কল্পনার অতীত। অথচ হিটলারের জল্লাদবাহিনীর মনের ওপর এরকম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ইউরোপে ৬০ লক্ষ (আনুমানিক) নিহত ইহুদীর মধ্যে ১৬ বছরের কম বয়সের শিশুরা ছিল প্রায় ১২ লক্ষ। এরকম নিষ্পাপ শিশুহত্যা হিটলারের হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কিনা সেরকম কোন কথা ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না।

যুদ্ধ শেষ হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকে নাৎসী বন্দীশিবিরগুলিতে নৃশংস অত্যাচারের কথা শোনা যাচ্ছিল। অনেকের কাছে এ সমস্ত কথা অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কাইজারের জার্মানীর অনেক বীভৎস অত্যাচারের কথা শোনা যেত। যেগুলো আদৌ সত্য বলে শেষে কেউ মেনে নিতে পারেনি। তাই হিটলারের নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনীও অনেকেই নিছক গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

ইউরোপের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার তখন ছিলেন আইসেনহাওয়ার। আইসেনহাওয়ার যুদ্ধশেষে গোথা (Gotha) শহরের কাছে বন্দীশিবির পরিদর্শন করেন। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের হৃদয়ে সাধারণত দয়ামায়া কম থাকার কথা। তাঁরা দেখেছেন যুদ্ধে অসংখ্য মৃত্যু। মৃত্যুর চিহ্ন তাঁদের মনে খুব কমই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কোমলতার স্থান তাঁদের হৃদয়ে নেই বললেই চলে। তা থাকলে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রের অগণিত মৃত্যুর দৃশ্য সহ্য করতে পারতেন না। এরকম একজন বলিষ্ঠ সেনানায়কের মনেও গোথা শহরের কাছে অবস্থিত বন্দীশিবিরের বীভৎস দৃশ্য দেখে করুণার সঞ্চার হয়েছিল। এখানকার দানবীয় ধ্বংসলীলা আইসেনহাওয়ারের মনকে ভীতি-বিহ্বল করে তুলেছিল। তিনি অবিলম্বে ওয়াশিংটনে তারবার্তা প্রেরণ করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আইনসভার সদস্যদের গোথা শহর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। যাতে তাঁরা এসে স্বচক্ষে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন দেখে যেতে পারেন!

আউসভিৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দায়িত্বভার ছিল রুডলফ হেসের ওপর। এখানে আটক বন্দীদের গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু ঘটাবার আগে নাৎসী ঘাতকরা কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করত। হেস সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে গ্যাস চেম্বারকে তিনি শিল্পে পরিণত করতে চান। ট্রেবেলিঙ্কো বন্দীশিবিরে ইহুদীদের নিধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল মনোক্সাইড গ্যাস এখানে তিনি ব্যবহার করলেন জিকলন 'বি' ক্যাপসুল। তিন থেকে পনের মিনিটের মধ্যে সব কাজ শেষ।

গ্যাস চেম্বারের সংলগ্ন ছিল কবরখানা। বীভৎস গ্যাস চেম্বারকে বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় থাকত না। বাইরে থেকে মনে হতো নিছক কতকগুলি

মানুষের বাড়ি। সেখানে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছে নাৎসী জল্লাদ ছাড়া আর কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারতো না। হিমলারের আদেশে মৃত্যুপথযাত্রী বন্দীদের ধোঁকা দেবার অপূর্ব সব ব্যবস্থা ছিল। অপূর্ব সঙ্গীতের ধ্বনি বন্দীদের আকৃষ্ট করে রাখত। আর সেখানে অপূর্ব রূপসীদের নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গীতধ্বনি আর রূপবতীদের নৃত্য পরিবেশন বন্দীদের মনে চমক জাগাতো।

গ্যাস চেম্বারের অপরূপ ব্যবস্থা। কয়েক হাজার ইহুদী স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুকে আনা হত গ্যাস চেম্বারে। তাদের জামা, কাপড় সব খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হতো। নাৎসী জল্লাদদের নির্দেশে নগ্ন বন্দীরা স্নানের জন্য কামরায় প্রবেশ করত। স্নানের জলের আশায় উপরে shower-এর দিকে তাকিয়ে থাকতো। আশে পাশে তাকিয়ে বুঝতে পারতো জল নিষ্কাশনের কোন জায়গা নেই। তখনই তারা বুঝতে পারতো কি ঘটতে চলেছে! মুহূর্তমাত্র চিন্তা করার সুযোগ পেতো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবনা-চিন্তা উধাও হয়ে যেতো। সার্জেন্টের নির্দেশে হাইড্রোজেন সাইনাইডের ক্যাপসুল ও জিকলন 'বি' ফেলে দেওয়া হতো একটি পাত্রে রাখা তরল পদার্থে।

হতভাগ্য বন্দীরা দেখতে পেতো কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত কামরা গ্যাসে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট আরম্ভ হয়ে যেতো। প্রাণভয়ে তারা পালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সবই ছিল নিষ্ফল প্রচেষ্টা। মিনিট ৩।৪-এর মধ্যে সব ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। আর ঘাতকের দল কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতো বন্দীদের বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য। গ্যাস চেম্বারের মেঝেতে গাদাগাদি করে রয়েছে পিরামিডের মত মৃতদেহের স্তূপ। শিশুসন্তান মায়ের বুকে জড়িয়ে আছে, যেন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার শেষ নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছে। স্বামী স্ত্রী আলিঙ্গনরত অবস্থায় রয়েছে। ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব সকলের বাঁচার শেষ চেষ্টার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এভাবে হাজার হাজার বন্দী হত্যা করে নাৎসী ঘাতকের দল মনে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি উপলব্ধি করেছিল।

এরপর গ্যাস চেম্বার থেকে এ সমস্ত মৃতদেহ অপসারণের জন্য বাধ্য করা হতো মৃত্যুপথযাত্রী আর একদল বন্দীকে। তাদের 'গ্যাস মাস্ক' পরিয়ে মৃতদেহ অপসারণের কাজে লাগাতো। এভাবে চলত এক একদল ইহুদী বন্দীদের নিধনযজ্ঞ। নিষ্ঠুর হিটলারের হৃদয় হয়ত এ সমস্ত সংবাদে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতো। নাৎসী ঘাতকদের এ রকম নিষ্ঠুর কাজ চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শাহের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল।

এ সমস্ত মৃতদেহ পোড়াবার জন্য বিশাল আকারের অসংখ্য চুল্লীর প্রয়োজন হতো। বিষাক্ত ক্যাপসুল ও চুল্লী তৈরির জন্য জার্মানীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। এ কাজের জন্য এগিয়ে এসেছিল আই জি. ফারবেন কোম্পানী, আই. এ. টপ্‌ফ অ্যাণ্ড সনস, এরফার্ট প্রভৃতি কোম্পানী। এখান থেকে তারা প্রচুর অর্থও আয় করতে লাগলো।

কিন্তু নাৎসী ঘাতকদের এ সব পাপ কাজ চাপা থাকল না। জার্মান জনসাধারণ অচিরেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেল। কেন না চুল্লীতে শব দগ্ধ করার

গন্ধ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। তাই ইহুদী সমস্যার 'চূড়ান্ত সমাধানে' অসুবিধে দেখা দিল। এ সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ড অবলীলাক্রমেই চলেছিল।

অনেক সময় এ সমস্ত মৃতদেহ কেনার জন্য বড় বড় জার্মান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। এ সমস্ত মৃতদেহের চর্বি থেকে তৈরি হতো সাবান, কষ্টিক সোডা আর চামড়া দিয়ে তৈরি হতো বাতির আচ্ছাদন, হাতের দস্তানা ইত্যাদি। এভাবে বড় বড় ব্যবসায়ীরা কোটি-কোটি মার্ক আয় করেছে। আর মৃতদেহ পোড়া ছাই সার হিসেবে বিক্রি করেও লাভবান হয়েছে প্রচুর বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

"There was testimony at Nuremberg trials that the ashes were sometimes sold as fertilizer. One Danzig firm, according to a document offered by the Russian prosecution, constructed an electrically heated tank for making soap out of human fat. Its 'recipe' called for 12 pounds of human fat, 10 quarts of water and 8 ounces to a pound of caustic soda···all boiled for two or three hours and then cooled"—William Shirer.

ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময় Hoess এর এক জবানবন্দি থেকে জানা যায় একমাত্র ১৯৪৪ সালেই আউসভিৎসের গ্যাস চেম্বারে তিন লক্ষ হাঙ্গেরীয় ইহুদীকে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। কিন্তু এতে খরচ পড়ত বেশি। তাই বন্দীদের হত্যা করার রীতি পাল্টানো হলো। এরপর বিশাল ফাঁকা জায়গায় বন্দীদের দিয়ে কবর খুঁড়ে রাখা হতে লাগল। হাজার হাজার বন্দীকে একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। তাদের কবর দিয়ে দিত অন্য একদল মৃত্যুপথযাত্রী ইহুদী বন্দী। এভাবেই চলেছিল ক্রমাগত বন্দীহত্যা।

শুধুমাত্র নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকেননি হিটলার বা তাঁর পার্শ্বচরবর্গ, চূড়ান্ত সমাধানের কাজকে লাগানো হল লাভের অঙ্গ হিসেবে। বন্দীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার আগে তাদের ঘড়ি, সোনার আংটি, চোখের চশমা, সোনার দাঁত (ডাক্তারকে দিয়ে তুলে নিত) প্রভৃতি নিয়ে নিত। লক্ষ লক্ষ ইহুদী ও অন্যান্য বন্দীদের কাছ থেকে এ সমস্ত মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করত। এর পরিমাণও ছিল বিশাল। এ সমস্ত বন্দীদের কিছুই নষ্ট করতে চাননি হিটলার। শুধুমাত্র প্রাণটা নিয়ে নিয়েছিলেন।

ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময় বন্দীশিবিরের কম্যাণ্ডার অসওয়েল্ড পোল জবানবন্দিতে বলেছিলেন যে বন্দীদের কাছ থেকে সংগৃহীত এ সমস্ত জিনিসের বিশাল সম্ভার গড়ে উঠেছিল। তবে এর আর্থিক মূল্য কত হবে তা তিনি নিরূপণ করতে পারবেন না। এভাবে সংগৃহীত সম্পদ সব রাইখ ব্যাঙ্কে জমা করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু সংগৃহীত সম্পদের খুব সামান্য অংশই ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিল। বেশির ভাগ সম্পদই আত্মসাৎ করেছিল হিমলার ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা। যুদ্ধশেষে এ সমস্ত সম্পদের বিশাল একটা অংশ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মৃত্যু শিবিরগুলিতে লুকানো অবস্থায়।

ওয়ারশ ঘেটোর হত্যাকাণ্ড

ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময় বহু প্রত্যক্ষদর্শী নাৎসী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন নাৎসী গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ ইহুদী অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অবশ্য সবাই এভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেনি। কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে ওয়ারশ ঘেটোর ৬৬০০০ ইহুদীবন্দী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ওয়ারশতে ইহুদী বন্দীদের রাখার জন্য একটা আলাদা পাড়া বা গ্রাম তৈরি করা হয়েছিল। এটা ছিল দৈর্ঘ্যে ২½ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরা ছিল। এটাকে বলা হতো ইহুদী পাড়া বা ওয়ারশ ঘেটো।

১৯৩০ সালের শরৎকালে হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করেন। পোল্যাণ্ড দখল করে ৪ লক্ষ ইহুদীকে ঘিরে ফেলেন। চার লক্ষ বন্দী ইহুদীকে রাখা হয় এই ওয়ারশ ঘেটোতে। এখানকার আগের ইহুদী সংখ্যা ছিল ১,৬০০০০। আরও চার লক্ষ ইহুদীকে রাখার ফলে তাদের সকলের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল।

জার্মানীর কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী ওয়ারশ ঘেটোতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানাও খুলেছিল। বন্দী ইহুদীদের কারখানায় বেগার খাটানো হতো। এদের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ভোগ করত ব্যবসায়ীরা। আর অসহায় অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত ইহুদীরা অনেকেই কঠোর পরিশ্রমে প্রাণত্যাগ করত। ওয়ারশ ঘেটোতে এভাবে ১৯৪২-এর অক্টোবরের মধ্যে ১০৩২২ জনকে খতম করা সম্ভব হয়েছিল। ফুয়েরের জেন স্ট্রুপ ছিলেন এই ওয়ারশ ঘেটোর কম্যাণ্ড্যাণ্ট।

হিমলার অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি জেন স্ট্রুপকে নির্দেশ দিলেন ওয়ারশ ঘেটোর ইহুদীদের আরও বেশি সংখ্যায় খতম করতে। স্ট্রুপ নির্দেশমত কাজ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ৬০০০০ ইহুদী নাৎসী জল্লাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। বিদ্রোহী ইহুদীদের হাতে ছিল কয়েকটি পিস্তল, রাইফেল আর মেশিনগান। তারা এ দিয়ে ১২ জন নাৎসীকে খতম করল। পাঁচদিন ধরে নাৎসী ঘাতকের দল তাদের দমন করতে পারল না হিমলার নির্দেশ দিলেন বিদ্রোহী ইহুদিদের ঘর বন্ধ করে বের হতে না দিতে। তারপর তাদের আগুন লাগিয়ে দেবার নির্দেশ এলো। বিদ্রোহী হাজার হাজার ইহুদী নিজের ঘরে পুড়ে মরল। তিন লাখের ওপর বন্দীকে সরিয়ে নিয়ে রাখা হলো ট্রেবেলিঙ্কো বন্দীশিবিরে। সেখানে তাদের গ্যাস চেম্বারে খতম করা হয়। আর আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে মরল ২৭৪৬৪ জন ইহুদী ওয়ারশ ঘেটোতে। এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি ইহুদীদের সংহার করা হলো। ওয়ারশ ঘেটো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

অ্যাডলফ হিটলারের 'নববিধান' এর কাজ আরও জোরকদমে এগিয়ে চলল। হিটলারের অনুগামী দু' শত নাৎসী ডাক্তার বন্দীদের উপর এক নারকীয় ডাক্তারী গবেষণা শুরু করল। এ গবেষণার আড়ালে ছিল শয়ে শয়ে ইহুদী স্ত্রী-পুরুষকে হত্যা করার পরিকল্পনা। যে সমস্ত ডাক্তার এ সমস্ত কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জার্মানীর খ্যাতনামা ডাক্তার। জার্মানীর কোন বিদগ্ধ ডাক্তার কিন্তু এ নারকীয় গবেষণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নি।

ডাক্তারী গবেষণার নামে হত্যা করা হল ইহুদী, পোল ও রুশদের। তার মধ্যে ইহুদীর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। নিষ্ঠুরতম গবেষণা, বীভৎস তার রূপ। Alan Bullock তাঁর Hiller, A Study in Tyranny গ্রন্থে বলেছেন যে, এ সমস্ত ডাক্তারী গবেষণা চালানো হতো কোন অবেদনিক বা চেতনানাশক ঔষধ প্রয়োগ না করেই। বন্দীদের আর্ত চীৎকারে গবেষক ডাক্তারদের মনে করুণার উদ্রেক হতো এ রকম কথা কোন বইতে লেখা নেই। "Among other uses to which concentration camp prisoners were put was to serve as the raw material for medical experiments by S S. doctors···All the experiments were conducted without anaesthetics or the slightest attention to the victims' sufferings"—Alan Bullock.

স্ত্রী ও পুরুষ বন্দীদের কোন একটা কামরায় আটক করে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হতো এবং ডাক্তাররা তার ফলাফল লক্ষ্য করত। যতক্ষণ না বন্দীরা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করত ততক্ষণ এ experiment চলত। চাপের ফলে বন্দীদের যে অবর্ণনীয় কষ্ট হতো তা ডাক্তাররা নির্লিপ্তভাবে লক্ষ্য করত। আর হতভাগ্যদের আর্তচীৎকার ডাক্তারদের মনে কোন রকম করুণার উদ্রেক করত না।

কোন কোন সময় বন্দীদের দেওয়া হতো মারাত্মক ডোজের টাইফাস ও জণ্ডিসের ইনজেকশন। উন্মুক্ত বরফের জলে সময় সময় বন্দীদের চুবিয়ে রাখা হতো। কিছু কিছু বন্দীর উপর মানুষ-গিনিপিগের মত ব্যবহার করা হতো। তাদের দেহে ফুটিয়ে তোলা হতো বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগে নালীঘা।

এই বীভৎস ও নারকীয় কর্মযজ্ঞে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল "উলফ্রাম সীভারস' নামক এক নাৎসী জল্লাদ। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে সীভারস আউসভিৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করল কয়েক শত নারী ও পুরুষ। ডঃ হার্ট আর নাৎসী নরঘাতক যোসেফ ক্র্যামার ছিলেন এ কাজে সীভারসের সহযোগী। ক্র্যামারকে বলা হতো 'বেলসনের পশু'। এটাই ছিল হিংস্র ক্র্যামারের উপযুক্ত নাম।

আগষ্ট মাস ! ১৯৪৩ সাল। ক্র্যামার আশিজন ইহুদী নারীবন্দীকে নিয়ে এল নাৎসীউইলার গ্যাস চেম্বারে। স্নানের নাম করে তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল গ্যাস চেম্বারের এক বড় ঘরে। বন্দীদের জামা কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র খুলে রাখা হল অন্য একটি ঘরে। বন্দীরা ঘরে প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নলের সাহায্যে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সাইনাইড ক্যাপস্যুলের গ্যাস। আর্তক্রন্দনে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ৮০টি মৃতদেহ ভূতলে লুটিয়ে পড়ল। তারা কি ঘটতে চলেছে তাও বোঝার সুযোগ পেল না। অপূর্ব ডাক্তারী গবেষণা। ভবিষ্যতের বংশধরেরা এ সমস্ত গবেষণার কাজে কতখানি উপকৃত হবেন জানি না। তবে নাৎসী ডাক্তারদের ঘৃণ্য পৈশাচিক কার্যকলাপ ভবিষ্যতের মানুষের মনকে বিস্মিত করেছে এটা নিশ্চিত। যতই এই সমস্ত কথা জনসমাজে উদ্ঘাটিত হচ্ছে ততই তারা মানুষ হিটলারের বীভৎস স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারছে।

এ সমস্ত মৃতদেহগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল অধ্যাপক ডঃ হার্টের গবেষণাগারে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য। নৃশংসভাবে বন্দীদের হত্যা করে মানবদেহ নিয়ে নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জার্মানীতে প্রায় ৫০টি গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম একটি গবেষণাগারের নাম হচ্ছে "Institute for Military Scientific Research." William Shirer বলেছেন যে, "By June 1943. Sievers has collected at Auschwitz the men and women who were to furnish the skeleton for the scientific measurements of Professor Dr. Hirt at the University of Strassburg."

ন্যুরেমবার্গ আদালতে বিচারের সময় ক্র্যামার বলেছিলেন যে তিনি একটা নলের মধ্যে দিয়ে সাইনাইড ক্যাপস্যুলের গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দিতেন। অন্য একটি নলের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ভেতরে বন্দীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। সাইনাইডের ভয়ঙ্কর গ্যাস আধ থেকে এক মিনিটের মধ্যেই গ্যাস চেম্বারের সকলকে নিহত করত। দরজা খোলার পর দেখা গেল আশিটি নগ্ন নারীদেহ ভূতলে শায়িত। সকলের গায়ে বিষ্ঠা মাখা।

এরপর মৃতদেহগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হত ডঃ হার্টের কাছে ডাক্তারী গবেষণার জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ক্র্যামার বলেছেন এভাবে মৃত্যু ঘটাতে অর্থাৎ ইহুদী নারী বন্দীদের হত্যা করতে তার মনে বিন্দুমাত্র দয়া বা অনুকম্পার সৃষ্টি হয়নি। কারণ তিনি এভাবে খুন করার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

নাৎসী ডাক্তারদের বীভৎস গবেষণার আরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। বুখেনভাল্ড (Buchenwald) বন্দীশিবিরে ইহুদী বন্দীদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের আরও ২/১টি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরটি ছিল ভাইমার থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত। ভাইমার ছিল বিশ্ববিখ্যাত মনীষী গ্যয়টে ও শিলারের জন্মস্থান। এই বন্দীশিবিরে যে সমস্ত ইহুদী বন্দী ছিল তাদের অনেকের হাতে ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর উল্কি। তাদের নিষ্ঠুরভাবে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করে উল্কিসহ হাতের চামড়া তুলে নেওয়া হতো। এ সকল চামড়া দিয়ে বুখেনভাল্ড-এর কম্যাণ্ডান্টের স্ত্রী ফ্রাউ ইলসে কখের শখের টেবিল ল্যাম্পের ঢাকনা তৈরি করা হতো।

১৯৪৫ সালে মার্কিন সৈন্যরা এ বন্দীশিবির মুক্ত করল। স্থানীয় অধিবাসীরা বন্দীশিবিরের অত্যাচার কাহিনী কিছুই জানত না। তারা পরে এ বন্দীশিবিরে এসে এখানকার বীভৎস অত্যাচারের নিদর্শন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এ ছাড়াও ছিল আরও এক ধরনের বীভৎস ডাক্তারী গবেষণা। কোন কোন ইহুদী পুরুষ বন্দীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বেশ কিছু সময় চূড়ান্ত ঠাণ্ডায় বরফ জলে রেখে দেবার পর তারা যখন প্রচণ্ড শীতে নিঃসাড় হয়ে পড়ত তখন তাদের তুলে নিয়ে এসে তাদের প্রত্যেককে নগ্নদেহ দু'জন নারীর মাঝখানে রেখে দিয়ে গরম বস্ত্রে তিনটি দেহকে

আবৃত করে রাখত। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখতো এতে হতভাগ্যদের দেহে কিরূপ উত্তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে এবং পরক্ষণেই তাদের সহবাসে বাধ্য করা হতো।

"The test persons were chilled in the familiar way—dressed or undressed in cold water at various temperatures····Removal from the water took place at a rectal temperature of 86 degrees····

In eight cases the test persons were placed between naked womae on a wide bed. The women were instructed to struggle up to the chilled person as closely as possible. The three persons were then covered with blankets····This test person died with symptoms of a brain haemorrhage, later confirmed by autopsy····. Only test person, (Dr. Rascher concluded) whose physical state permitted sexual intercourse warmed up surprisingly fast and also showed a surprisingly return of full bodily well-being."

এমন নৃশংস ডাক্তারী পরীক্ষার (যা মানুষের যৌন বিকৃতির পরিচায়ক বলে মনে করা যেতে পারে) নিদর্শন বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল।

ন্যুরেমবার্গে ডাক্তারদের বিচারের সময় তাদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে যে, তিনশজন ইহুদী বন্দীর উপর এরূপ কদর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। তার মধ্যে ৮০/৯০ জন সরাসরি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খুবই কম সংখ্যক লোক এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। বেশির ভাগই উন্মাদ অথবা অর্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

লিডিসের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা

রাইনহার্ড হেড্রিশ নামটি খুনী হিসেবে বিশ্ব-ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত। তিনি ছিলেন জার্মান সিকিউরিটি পুলিশের সর্বময় কর্তা। দশনধারী, তার চোখদুটি যেন খুনের নেশায় সব সময় জলত। তার দানবীয় অত্যাচার কাহিনী তাকে ইতিহাসে খুনী হেড্রিশ নামে অভিহিত করে রেখেছে। গেস্টাপো প্রধান হিমলারের চোখের মণি ছিলেন তিনি। অবশ্য হিমলারের প্রতিও তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতেন সময় সময়। আর হিটলারের গোপন নির্দেশে তিনি ছিলেন অর্ধেক ইউরোপের রক্ষক। তার কপালে অবশ্য বেশিদিন এ সুখ স্থায়ী হয়নি। চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসীরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই তারা সুযোগের সন্ধানে ছিল তাকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করার জন্য।

২৯শে মে, ১৯৪২ সাল, হেড্রিশ যাচ্ছিলেন প্রাগের দিকে তার মার্সিডিস গাড়ি চড়ে। তাঁর মন ছিলো খুশিতে ভরপুর যেহেতু কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েক হাজার ইহুদীকে তিনি সংহার করেছিলেন। ইহুদী খুনের আনন্দে আত্মহারা হেড্রিশ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে

গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হেড্রিশের হাতে গাড়ির ষ্টীয়ারিং যেন নিখুঁত-ভাবে পথ অতিক্রমণের পালা সাঙ্গ করে প্রাগে পৌঁছে যাচ্ছিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ এক বোমা এসে পড়ল হেড্রিশের গাড়ির উপর। বোমার আঘাতে তাঁর গাড়ি হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। হেড্রিশের দেহ হল ছিন্নভিন্ন।

বোমা নিক্ষেপ করেছিল জ্যান কুবিক ও যোশেফ গ্যারিক নামক দু'জন চেক যুবক। বোমাটি ছিল ইংলণ্ডে তৈরি। হেড্রিশের ছিন্নভিন্ন দেহ পাঠানো হলো হাসপাতালে। ৪ঠা জুন হেড্রিশের মৃত্যু ঘটল। হেড্রিশের আততায়ীর বোমায় এরূপ মৃত্যুতে হিটলার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

হিটলারের কড়া নির্দেশে ৯ই জুন নাৎসী পুলিশ ঘাতকবাহিনী লিডিসে এসে হাজির হল ট্রাক ভর্তি করে। সংখ্যায় ছিল তারা বিপুল। এসেই তারা লিডিস গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। গ্রামবাসীদের গ্রাম থেকে বহির্গমনের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হল। সকল গ্রামবাসীকে আটক করে অশ্বশালায় না হয় গোলাবাড়িতে রাখা হল। হেড্রিশকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সে জায়গাটা ছিল লিডিসের কাছাকাছি। নাৎসী ঘাতকদের অধিনায়ক ছিল ম্যাক্স রোসটক নামক একজন হিংস্র নাৎসী।

১০ই জুন সকাল থেকে চললো হত্যালীলা। ১৭২ জনকে হত্যা করা হল গুলি করে। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলেছিল এই নারকীয় হত্যালীলা। লিডিসকে জনশূন্য করা হল। সমস্ত ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল। লিডিস ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। হিটলারের পৈশাচিক অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে রইল লিডিসের পোড়ামাটি।

শুধু লিডিসই নয়, ১৯৪৪ সালের ১০ই জুন ফ্রান্সের ওরাডুর নামক এক গ্রামও হিটলারের নির্দেশে এভাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল। এ হল হিটলারের নববিধান। যার বলে হিটলারের জল্লাদ বাহিনী নির্বিচারে ইউরোপে চালিয়েছিল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। কিন্তু মানবসমাজের সৌভাগ্য হিটলারের হাজার বছরের স্বপ্নের রাইখ ১২ বছরের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁরই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য।

রুশবন্দীদের ওপর নিষ্ঠুর নাৎসী অত্যাচার

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ইহুদী, পোলিশ ও রুশদের ওপর নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার ছিল সর্বাধিক। যেহেতু যুদ্ধটা ছিল সর্বাত্মক সুতরাং যুদ্ধবন্দীদের ওপর অত্যাচারটাও ছিল সর্বাত্মক। ন্যুরেমবার্গের আদালতে জার্মানদের বাছাই করা যুদ্ধাপরাধ (War Crimes) সম্পর্কে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হয়েছিল, সেই নিয়ে ২২ খণ্ড রিপোর্ট তৈরি হয় এবং এই সমস্ত অপরাধের অধিকাংশই ঘটেছিল হিটলারী জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকৃত অংশে।

হিটলার মনে করতেন জার্মানরা খাঁটি আর্য। আর রুশরা হচ্ছে আর্যদের চোখে অতীব নিকৃষ্ট জীব। অতএব রুশরা অনাহারে মরলেও জার্মানদের বা পৃথিবীর কোন ক্ষতি নেই। জার্মানীর রাজনৈতিক মতাদর্শে ছিল রুশদের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজয়ী জার্মানদের হাতে রুশদের মৃত্যু হিটলারের মতে একান্ত কাম্য। হিটলার, গোয়েরিঙ,

গোয়েবলস সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে ৩০ লক্ষ রুশ যদি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তাতে জার্মানদের কিছু আসে যাবে না। হিটলার ঘোষণা করলেন একজন বন্দী রুশ কিম্বা রুশ নাগরিক জার্মানদের হাতে বন্দী হলে তাকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে জার্মানরা অপারগ। এজন্য যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানরা রাশিয়ার বিশাল অংশ দখল করে নিয়ে সেখানকার বন্দী রুশ নাগরিকদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল যা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে জার্মানদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলা যায়। হিটলার রুশ ও ইহুদী বন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যুদ্ধের সময় যখন জার্মান কলকারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন হল তখন প্রায় ৩০ লক্ষ রুশবন্দীকে শ্রমিকের কাজের জন্য জার্মানীতে চালান করা হয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীতে বিদেশী দাস শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ।

রুশ সামরিক গ্রন্থকার জি. ডেবোরিন তাঁর 'সিক্রেটস অব দি সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে জার্মানীতে যুদ্ধবন্দীসহ সমগ্র বিদেশী দাস শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৪ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। এজন্য জার্মান কর্তৃপক্ষ সবসময় শ্রমিক বিদ্রোহের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতো। কেন না বন্দী শ্রমিকদের ওপর নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারের কোন সীমা পারসীমা ছিল না।

জার্মান অধিকৃত দেশগুলিতে সে দেশের গরিলাবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই গরিলাবাহিনী সুযোগ পেলে জার্মান সৈন্যকে খুন করতে পিছপা হত না। গরিলা-বাহিনী একজন জার্মানকে হত্যা করলে তার প্রতিশোধ নিতো অসংখ্য লোককে খুন করে। এভাবে নাৎসীবাহিনী লিডিসের মত কত গ্রাম যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর ইহুদীদের গন্ধ পেলে তাদের নির্মূল করত নাৎসী ঘাতকবাহিনী। নাৎসী ঘাতকরা কিয়েভের কাছেই এক লক্ষ ইহুদী পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে নিধন করেছিল। পাইকারিভাবে হত্যা চালিয়েছিল বাল্টিক রাজ্যগুলিতে এবং বাইলোরাশিয়া থেকে শুরু করে ক্রিমিয়া পর্যন্ত দেশগুলিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীকে অনাহারে ঠাণ্ডায় বা উন্মুক্ত স্থানে রেখে নিষ্ঠুরভাবে মারা হল।

জার্মানরা পোলিশ, ইহুদী ও রুশদের হত্যা করার ব্যাপারে কোন আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের ধার ধারত না। গোয়েরিঙ রুশ বন্দীদের করুণ ও ভয়াবহ অবস্থা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট সিয়ানোকে বলেছিলেন যে রুশ যুদ্ধবন্দীরা নরমাংসের জন্য লালায়িত। এইতো কয়েকদিন আগে একজন জার্মান প্রহরীকে খেয়ে ফেলেছে। এ যেন ক্ষুধার্ত রুশবন্দী সম্পর্কে গোয়রিঙ-এর এক আশ্চর্য রকমের প্রহসন।

রুশ যুদ্ধবন্দীদের জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাদের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে রেখেছিল তা দেখে পাষাণ হৃদয়েও করুণার উদ্রেক করেছিল সে সময়। একজন হাঙ্গেরীয়ান ট্যাঙ্ক অফিসার যুদ্ধের পর লিখেছিলেন যে একদিন যুদ্ধের সময় রোভনাতে অবস্থান করার সময় খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে অদূরে শত শত কুকুরের চিৎকারে তাঁর কর্ণকুহর বিদীর্ণ হচ্ছিল। একদিকে কুকুরের আর্ত চীৎকার অন্যদিকে আহ্বানের

গোঙানির শব্দ হাঙ্গেরীয়ান অফিসারের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। নিজের আর্দালীকে নিয়ে খানিকটা অগ্রসর হলেন। হঠাৎ বিচিত্র এক দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত। তিনি দেখতে পেলেন হাজার হাজার রুশবন্দী খোলা মাঠে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পড়ে আছে। প্রায় ৮০ হাজার রুশবন্দী এভাবে অনাহারে মৃতপ্রায়। তিনি বুঝতে পারলেন তাদেরই গোঙানি ও চাপা আর্তনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন।

স্বচক্ষে এইদৃশ্য হাঙ্গেরীয়ান অফিসার দেখলেন। এভাবে অনাহারক্লিষ্ট প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় রাখা রুশবন্দী সৈন্যদের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ যে মৃত তা তাঁর বুঝতে অসুবিধে হলো না। আর পঁচিশ শতাংশ ছিল অর্ধমৃত। নিষ্ঠুর জার্মান ঘাতকবাহিনী সকলকেই একসঙ্গে গাদা করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে হাঙ্গেরীয়ান অফিসার স্থির থাকতে পারলেন না। সেখান থেকে সরে গেলেন।

মার্কিন সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়ম শাইয়ারের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, জার্মানীতে রুশ যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিল ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় রুশ বন্দীদের সংখ্যাটা ছিল বেশি। ১৯৪৫ সালে বিজয়ী মিত্রপক্ষ যখন এই সমস্ত যুদ্ধবন্দী শিবির মুক্ত করে তখন মাত্র ১০ লাখের মত বন্দীকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

লক্ষ লক্ষ রুশবন্দীকে এভাবে অনাহারে রেখে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না। নাৎসী পার্টির দার্শনিক রোজেনবার্গ ফিল্ডমার্শেল কাইটেলকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তখন রাশিয়াতে যে পরিমাণ খাদ্য ছিল তা দিয়ে অনশনক্লিষ্ট রুশ যুদ্ধবন্দীদের অনায়াসে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেত। কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যু স্বেচ্ছায় ঘটানো হয়েছিল। অটো ওলেনডর্ফ নামক জার্মান সিকিউরিটি সার্ভিসের একজন বড় কর্তা স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের ওপর হুকুম ছিল সমস্ত ইহুদী ও কম্যুনিস্ট কর্মকর্তাদের খতম করার এবং, গোটা রুশ অভিযানের সময় এই আদেশ কার্যকরী করা হয়েছিল।

ন্যুরেমবার্গের আদালতের এক জেরার উত্তরে অটো ওলেনডর্ফ গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরই আদেশে তাঁর অধীনস্থ নাৎসীবাহিনী এক বছরে ৯০ হাজার স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। ইহুদী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদী শিশুদের হত্যা করতে নাৎসী ঘাতকের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হতো না।

হিটলারের নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী যে কোন সুস্থ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। তবে হিটলারের পাষাণ হৃদয় এর জন্য এতটুকু বিচলিত হয়নি তা তাঁর বিচিত্র জীবন কাহিনী থেকে জানা যায়। এখানেই রয়েছে হিটলারের দৃঢ় ও নিষ্ঠুর মানসিকতার নিদর্শন।

বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবনে হিটলার

আলপ্‌স পর্বতের পাদদেশে বেরখটেসগ্যাডনে ছিল হিটলারের পার্বত্য বাসভবন। এখানে হিটলারের অনেক পার্শ্বচর স্থায়ীভাবে থাকত। ইভা ব্রাউনকেও এখানে বেশ কয়েকবছর কাটাতে হয়েছে একাকীত্বের মধ্যে। হিটলার এখানে বসে তাঁর জেনারেলদের

সঙ্গে অনেক দুরূহ ব্যাপারে আলোচনা করতেন। সিদ্ধান্ত নিতেন আর নানান পরিকল্পনা রচনা করতেন। এ বাসভবনটি ছিল হিটলারের নব নব পরিকল্পনা রচনা করার গবেষণাগার।

১৯২৩ সাল। তখনো হিটলার জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করেননি। তবে তিনি নাজিনেতা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। একার্ট (Eckart) এবং এসার (Esser) নামধারী দু'জন নাৎসী নেতা এলেন প্লাটারহফ (Platterhof) নামক এক সরাইখানায় বেরখটেসগ্যাডনের সন্নিকটে। তাঁরা এসেছিলেন হিটলারের গ্রীষ্মাবকাশের জন্য একটা জায়গার সন্ধানে। হিটলার-এ স্থানটিকে পছন্দ করলেন। পার্বত্যদেশের অপরূপ শোভায় হিটলারের মন আনন্দে ভরে গেল। হিটলারের নির্দেশে বেরখটেসগ্যাড়নেই তৈরি হল "বার্গহফ" (Berghof) নামক এক বিশাল প্রাসাদ। পশ্চিম অস্ট্রীয়া ও বেভেরিয়া সীমান্তেই অবস্থিত ছিল স্থানটি। 'Hitler fell in love with the lovely mountain country ; it was here that he later built the spacious villa, Berghof, which would be his and where he would spend much of his time until the wars."

হিটলার ১৯২৫ সালের ৭ই এপ্রিল অস্ট্রীয়ার নাগরিকত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে সেখানে চিঠি পাঠান। তখনো কিন্তু হিটলার জার্মানীর নাগরিক নন। এ ব্যাপারে প্রথমদিকে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে।

জার্মানীর একক ও অদ্বিতীয় নায়ক হিটলারের বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবন ছিল লক্ষ লক্ষ জার্মানের নয়নের মণি। তাদের তীর্থস্থান। হিটলারের এ বাসভবনের ফটো বিক্রি হতো জার্মান ছেলেমেয়েদের কাছে। তাদের কাছে-এ ফটো ছিল সোনার চেয়েও দামী।

বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবনে লোকজন খুব বেশি থাকত না। তবে অনেক পাহারাদার থাকতো যারা এখানকার প্রতিটি জিনিসের ওপর নজর রাখতো। কিছু কিছু অফিসারও অবশ্য স্থায়ীভাবে থাকতেন এখানে। আর চারদিকে গেস্টাপো গুপ্তচরদের সজাগ দৃষ্টি থাকতো যাতে কোন আততায়ী এসে তাদের প্রিয় নেতার জীবনের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

এখানে অফিসারদের এবং জেনারেলদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল অঢেল। তাদের জন্য থাকত অপূর্ব রূপসী পরিচারিকা। অনেকসময় সুন্দরী যুবতী বন্দিনীকে এখানে নিয়ে আসা হতো পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার জন্য। পলিন কোলার, এমা, গ্রেটি, ক্যারেন প্রমুখ অনেক বন্দিনীকে পরিচারিকা হিসেবে রাখা হয়েছিল এখানে।

পলিন কোলার ছিল হিটলারের খাস পরিচারিকা। চার বছর সে হিটলারের পরিচারিকা হিসেবে বেরখটেসগ্যাডনে কাটিয়েছে। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে সে একটা বই লিখেছিল। বইটার নাম "I was Hitler's Maid" বা "আমি হিটলারের বাঁদী ছিলাম"। এই বইতে বেরখস্টেগ্যাডনের বাসভবনের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনেরও বেশ কিছু পরিচয় এই বই থেকে পাওয়া যায়।

বাইরের বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল এ বাসভবন। অনেক পরিচারিকা এখানে তাদের জৈবিক ক্ষুধা মিটাবার জন্য বেছে নিয়েছিল তাদের মনের মানুষ। আবার অনেক পরিচারিকাকে জোরপূর্বক অফিসাররা তাদের স্বাভাবিক জৈব প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। অনেক সময় গেস্টাপো যুবকরা বন্দিনীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়েছে। পলিন কোলার ছিল এ সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। হাউসম্যান নামক এক নাৎসী নেতা পলিনের দেহ সম্ভোগ করেছে। তা পলিন স্বীকার করেছে। পলিন স্পষ্টতই বলেছে যে এ সমস্ত ব্যাপারে হিটলারের পরোক্ষ সম্মতি ছিল।

অনেক সময় পালাক্রমে এখানে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে রাখা হতো হিটলারের পার্শ্বচর ও পাহারাদাররা যাতে জৈব প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করতে পারে। পলিন বলেছে বাস্তববাদী হিটলার ভালোভাবেই জানতেন যে, তাঁর যে সমস্ত পার্শ্বচর ও পাহারাদার স্ত্রী পুত্র বিবর্জিত অবস্থায় এ বাসভবনে বাস করছে তাদের জৈব প্রয়োজনে যুবতী রমনীর প্রয়োজন। হের হাউসম্যান, হের কেষ্টনার, হের কিটনার প্রমুখ গেস্টাপো নেতা এখানে স্থায়ীভাবে থাকত। আর গোয়েবলস, গোয়েরিঙ, হিমলার, হেস, রিবেনট্রপ, বোরম্যান প্রমুখ নেতাদের হিটলারের নির্দেশে এখানে বিভিন্ন সময়ে জরুরী কাজে আসতে হতো।

এখানে যে সমস্ত দাস-দাসী থাকত তাদের দেখাশুনার ভার ছিল একজন গেস্টাপো নেতার ওপর। তার নাম সিলিবেন।

পলিন কোলার ছিল মুলার নামক একজন জার্মানীর ফ্যাক্টারী ফোরম্যানের স্ত্রী। পলিনের বাবা ছিলেন একজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট। তারা থাকত 'কার্লসরুতে'। হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর থেকে জার্মানীতে আরম্ভ হয়েছিল সন্দেহবশে লোকদের ওপর অকথ্য অত্যাচারও ধরপাকড়। হিটলার নিজেকে শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য এমন কোন ঘৃণ্য কাজ নেই যে করেননি। সব সময় তিনি কল্পিত শত্রু ভয়ে ভীত হয়ে থাকতেন। তাই স্তালিনের মত তিনিও শত্রুনিধনে মেতে উঠেছিলেন। এতে অনেক নিরীহ মানুষকে অকারণে শুধু সন্দেহবশে প্রাণ দিতে হয়েছে।

পলিন কোলারের বাবা, মা ও স্বামী কার্টিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করেছে গেস্টাপো বাহিনী। পলিন কোলার তখন একটি লণ্ড্রীতে কাজ করত। স্বামীকে গ্রেপ্তার করার পর পলিন কার্লসরুতে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলো না। চলে গেল মিউনিকে। সেখানে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বাড়িতে কাজ নিল। ঝি-এর কাজ করেই তাকে কোনরকমে দু'বেলা অন্নসংস্থান করতে হতো। এখানে কোলার বেশ কিছুদিন কাটাল।

একদিন শিক্ষকমশাইয়ের স্ত্রী দেখতে পেলেন পলিন ঘরের এক কোণে গভীর মানসিক যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শিক্ষকমশাইয়ের স্ত্রী বুঝতে পারলেন পলিনের কোন গুপ্ত ক্ষত আছে হৃদয়ে। স্ত্রীরা সাধারণতঃ অন্য স্ত্রীলোকের ব্যথা সহজেই ধরতে পারে। শিক্ষকমশাইয়ের স্ত্রী পলিনের কাছ থেকে সুকৌশলে সব জেনে নিলেন। পলিন তখন ক্ষোভে দুঃখে হিটলারকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল। শিক্ষকমশাই অন্য ঘর থেকে সব শুনতে পেলেন। শিক্ষকমশাই গুপ্তচরের কাজ করার এক সহজ সুযোগ পেয়ে গেলেন। আর

বুঝতে পারলেন পলিন যেভাবে হিটলারকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল পলিনকে তাঁর বাসায় রাখলে সমূহ বিপদ ঘটবে। নানান সাত পাঁচ ভেবে এবং গেস্টাপোদের কাছে নিজের ভাবমূর্ত্তি উজ্জল করার মানসে পলিনের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন যথাস্থানে।

যথাসময়ে গেস্টাপোদের দু'জন যুবক এসে হাজির। শিক্ষকমশাইয়ের বাসা থেকেই পলিনকে তারা গ্রেপ্তার করল। পলিনকে তারা তাদের গাড়িতে উঠতে বলল। পলিন ত বিস্ময়ে হতভম্ব। শুধু শিক্ষকমশাইয়ের নিষ্ঠুর আচরণের কথা ভাবতে লাগল। জোর করে তারা পলিনকে গাড়িতে তুলল। পলিনের প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

পলিনের বয়স তখন ২৩। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব। পলিনের ভরা যৌবনের অপূর্ব চেহারা যুবক দু'জনের মনে দোলা দিল। গাড়িতে পলিনের দু'পাশে যুবকদ্বয় বসল। পলিন যে অপূর্ব সুন্দরী ছিল তা নয়। তবে লোভনীয় ছিল। ক্রমে গেস্টাপো যুবকদ্বয়ের হাত অবাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে তাকে আলিঙ্গনের জন্য যুবকদ্বয় অস্থির হয়ে উঠল। পলিন নিজেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা এই চেষ্টা। গাড়ির মধ্যেই চুম্বনে চুম্বনে পলিনের গাল ও ওষ্ঠ লাল হয়ে গেল।

পলিনকে নিয়ে আসা হল মিউনিকের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে; সেখানে একজন যুবক সার্জেণ্ট তাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করল তার স্বামী রাজনীতি করে কিনা? কিম্বা বাবা, মা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিনা? পলিন উত্তরে 'না' ছাড়া আর কিছুই বলল না।

তখন সার্জেণ্ট পলিনকে জিজ্ঞেস করল সে হিটলারকে গালাগাল দিয়েছিল কেন? পলিন জানালো যে সে হিটলারকে কোন গালিগালাজ করেনি। স্বামী, বাবা ও মাকে গেস্টাপোরা বিনা অপরাধে বন্দি করায় সে গেস্টাপোদের অভিসম্পাত দিয়েছে। সে মানুষের দরবারে নালিশ জানাইনি। জানাবেও বা কি করে? শুধু নিজের এ পরিণতির জন্য গেস্টাপোদের দায়ী করে ভগবানের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। ভগবান তার লিখিত আবেদন নিতে পারেন না। তাই নিজের চোখের জলে ভগবানের কাছে তার করুণ মিনতি জানিয়ে তাঁর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেছে।

সার্জেণ্ট পলিনের ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা করল। তাকে তার জন্য সংরক্ষিত ঘরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিল সার্জেণ্ট। সেখানে আরও অনেক বন্দিনী রয়েছে। পলিন দেখলো মিউনিকের এ জেলখানায় রয়েছে আরও ১৫০ জন বন্দিনী। তাদের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। তার মধ্যে শতকরা ৯০ জন ধরা পড়েছে এক মাসের মধ্যে। এদের মধ্যে যারা রূপসী তাদের বিপদটাই ছিল সর্বাধিক। তারা ওখানকার কর্মকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতো না। যেন কর্মকর্তা-দের যৌন কামনা বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তাদের ওখানে বিনা অপরাধে বন্দী করে আনা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে জার্মানীতে সে সময় এরকম ঘটনাই ঘটেছে বেশি। এক একজন গেস্টাপো যেন এক একজন ক্ষুদে হিটলার।

পলিনকে ডাক্তার পরীক্ষা করলো। তবে বিবস্ত্র করে নয়। প্রয়োজনবোধে বিবস্ত্র করে মেয়েদের পরীক্ষা করবার রীতি চালু ছিল। তার জন্য কর্মকর্তা বা ডাক্তারদের

কোন অপরাধ হতো না। তবে পলিন ত অপূর্ব রূপসী ছিল না। তার উপর বয়সেও সে কিছুটা বড। তাই হয়ত সে রেহাই পেয়ে গেল বিবস্ত্র হওয়ার হাত থেকে।

পলিন যে ঘরে ছিল সে ঘরে আরও দু'জন বন্দিনী ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম বার্টা বিয়নার অন্যজনের নাম জেটি। বার্টা গেস্টাপোদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। এবং, একজন গেষ্টাপোকে তারই কোমরের ছুরি নিয়ে আঘাত করেছিল। তার ফল স্বরূপ বার্টার কপালে জুটল অকথ্য অত্যাচার। হাত পা বেঁধে তার পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হল বেয়নটের তীক্ষ্ণ ফলা। বার্টার তীব্র আর্তনাদে সারা ঘর প্রকম্পিত হল; বার্টার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর তার নিষ্প্রাণ দেহের ওপর চলল পৈশাচিক অত্যাচার। যৌনাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিল। বার্টা গেস্টাপোদের যৌন লালসার শিকার হলো।

জেটি ছিল এক ডাক্তারের স্ত্রী। হিটলারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডাক্তার নানান ভাবে অনেক সময় মতামত প্রকাশ করে ফেলতেন। অচিরে সে সংবাদ গেস্টাপোদের কাছে পৌঁছে গেল। ডাক্তার তা বুঝতে পেরে জার্মানী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার মতলব করছিল। কিন্তু তা সম্ভব হল না। গেস্টাপোদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার জন্য জেটিকে নিয়ে এক নিশিথে বেরিয়ে পড়ল। বার্লিনের রাস্তায়, অলিতে গলিতে গেস্টাপোদের গুপ্তচর বিচরণ করত চব্বিশ ঘণ্টা। তাই কারও পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

তবে ডাক্তার ও জেটি বার্লিন সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে পাড়ি দেবার মতলব করছিল। শেষ রক্ষা করতে পারল না। হয়ত ডাক্তার একা পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু জেটির ভুলের জন্য তা সম্ভব হল না। দূর থেকে গেস্টাপোদের কয়েকজন যুবককে দেখে ভয়ে জেটি ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরল। জেটি তাদের হাতে পায়ে ধরে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল। কে কার কথা শুনে? জোর করে গেস্টাপোরা ডাক্তারকে নিয়ে গেল। জেটির চোখের সামনেই তাকে গুলি করে হত্যা করল। জেটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় আটক করে রাখল। জেটি ছিল অপূর্ব রূপসী। তাই জেটিকে গেস্টাপোদের যৌন লালসার শিকার হতে হবে এতে আর আশ্চর্য কি?

গেস্টাপো বাহিনীর প্রায় প্রত্যেকেই ছিল যৌন লালসায় পরিপূর্ণ। তাদের অতৃপ্ত কামনাবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য জেলখানায় রাখা হত অপূর্ব সুন্দরী নারীদের। বিশেষত যুবতীদের। সময় সময় বন্দিনীদের ওপর তীব্র অত্যাচার চলতো। বন্দিনীরা অত্যাচারে আর্তনাদ করতো। আর তাদের আর্তনাদে প্রকম্পিত হতো আশেপাশের ঘরগুলি। পলিন নিজের ঘর থেকে এ সমস্ত জিনিস স্বচক্ষে অবলোকন করত। কারো ওপর অত্যাচার চালাবার সময় তা অন্যান্য বন্দিনীদের দেখার সুযোগ করে দিত জেল কর্তৃপক্ষ। একমাত্র কারণ যাতে অন্যান্য বন্দিনীরা বুঝতে পারে এরকম অত্যাচার তাদের কপালেও জুটবে যদি তারাও অবাধ্য হয়।

একদিন পলিন দেখতে পেলো যে জেলখানার ডাক্তারের নির্দেশে গেস্টাপোবাহিনীর লোকেরা একজন তরুণীকে জোর করে ধরে নিয়ে আসছে। মেয়েটির হাত পা বাঁধা।

মেয়েটির অপরাধ সে ডাক্তারের কপালে একবার একটি খালি দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিল। ডাক্তার মেয়েটিকে ডাক্তারী পরীক্ষার নাম করে যৌনসুখ উপভোগ করতে চেয়েছিল। মেয়েটি ডাক্তারের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাতের কাছে দোয়াত পেয়ে তা ছুঁড়ে মেরেছিল। তাই শাস্তির জন্য হাত পা বেঁধে মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসছিল।

মিউনিকের গভর্ণর বন্দিনীদের জেলখানার নিয়মশৃঙ্খলা মানার জন্য নির্দেশাবলী পাঠিয়ে দিতেন। ওখানে লেখা থাকত জেলখানায় কেউ জেলকর্তৃপক্ষের কোন আদেশের অবাধ্য হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে।

যাই হোক, হাত পা বাঁধা মেয়েটির ওপর ডাক্তারের নির্দেশে চললো অমানুষিক অত্যাচার। চাবুকের কষাঘাতে মেয়েটির শরীরে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটির নিষ্প্রাণ দেহ সহসা ভূলুন্ঠিত হলো। নারী প্রহরীরা এসে অচৈতন্য ও রক্তাক্ত মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। পলিন এ দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। পলিন বুঝতে পারল গেস্টাপোদের কথার অবাধ্য হলে তার জীবনেরও এরকম পরিণতি ঘটবে।

এবার পলিনের বিচার শুরু হলো। সব জিজ্ঞাসাবাদের পর পলিনকে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল। নির্দেশ হল তাকে এ ছয় মাস বন্দীজীবন কাটাতে হবে ডাচাউ-এর বন্দীশিবিরে। তবে পলিন মিউনিক পুলিশ সার্জেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেল। সার্জেন্ট জোর করে পলিনের দেহভোগ করে হিংস্র পশুর আনন্দ উপভোগ করল। এখানেই ছিল গেস্টাপোদের বাহাদুরী। অসহায় মেয়েদের ওপর যৌন অত্যাচার ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

পলিনসহ তিনজন বন্দিনীকে ডাচাউ ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। পুলিশ পাহারায় তাদের ডাচাউ বন্দীশিবিরে নিয়ে আসা হলো। এই কুখ্যাত বন্দীশিবিরের নাম শুনলে মানুষের মন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

পলিন ডাচাউ বন্দীশিবিরে এসে উপস্থিত হল। তাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। পলিন বিবস্ত্র হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ডাক্তার নিষেধ করল। বলল তার প্রয়োজন নেই। ডাক্তার বুঝতে পারলেন যে পলিনের মিউনিকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই এখানে এসে সে বিবস্ত্র হতে চাইছিল ডাক্তারী পরীক্ষার রীতি অনুযায়ী। পলিন এখন বুঝতে পারল গেস্টাপো ডাক্তারদের মধ্যে কিছু সৎ লোকও আছে। যাদের মানবিকতাবোধ এখনো শুকিয়ে যায়নি।

ডাচাউ বন্দীশিবিরে অনেক অত্যাচার পলিন স্বচক্ষে দেখেছে। সে এখান থেকে ছয় মাস পর মুক্তি পেল। কিন্তু যাবে কোথায়? সহায় সম্বলহীন পলিন উদ্‌ভ্রান্তের মত নানান চিন্তা করতে লাগল। তারপর সাহসে ভর করে কাছাকাছি এক হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হল। ঝি-এর কাজ করার অভিজ্ঞতা তার ছিল। সেখানে হোটেল মালিক তাকে পরিচারিকা হিসেবে রাখল। কিছুদিন পর হোটেলটি উঠে গেল। পলিনকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যপথ বেছে নিতে হল।

হোটেলের মালিক পলিনকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখত। তার অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে হোটেলের মালিক তাকে হের কেষ্টনার নামক এক গেস্টাপো নেতার কাছে পাঠাল। গেস্টাপোনেতা পলিনকে তার বাড়িতেই পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে বলল। পলিন কাজে লেগে গেল। কিন্তু গেস্টাপো নেতা কেষ্টনার ছিলো অত্যন্ত কামাসক্ত। তার স্ত্রী ছিল অপূর্ব রূপসী। তবে এক স্ত্রীতে তার মন উঠতো না। সম্ভবত তার দেহসুখ পরিতৃপ্ত হত না। এর মধ্যে দিন কয়েকের জন্য কেষ্টনার-পত্নী বোনের বাড়িতে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য।

কেষ্টনার পলিনকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে গেল। ফ্রাউ কেষ্টনার ছিল অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রমহিলা। কেষ্টনারের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ।

কেষ্টনার ছিল গেস্টাপো নেতাদের মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। হিটলারের অতীব প্রিয়পাত্র। ফ্রাউ কেষ্টনারের অবর্তমানে পলিনকেই কেষ্টনার তাঁর স্ত্রীরূপে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করত। ফ্রাউ কেষ্টনার অচিরে জিনিসটা বুঝতে পারল। একদিন পলিনকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রচণ্ড ঝগড়া হলো। ফ্রাউ কেষ্টনার স্বামীকে 'ডাইভোর্স' করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। অন্য কোন উপায় না দেখে কেষ্টনার পলিনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। বেরখটেসগ্যাডনে হিটলারের নিজস্ব একজন পরিচারিকার জরুরী বেরখটেসগ্যাডনে প্রয়োজন হয়েছিল। কেষ্টনার পলিনকে সেখানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল।

কেষ্টনার এর মধ্যে বুঝে ফেলেছে যে পলিনকে হিটলারের পরিচারিকা নিযুক্ত করলে ভালোই হবে। পলিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ করতে পারবে। কেষ্টনার পলিনকে কথাটা খুলে বলল। পলিন হিটলারের খাস পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে রাজি কিনা জানতে চাইল। পলিন ত শুনেই বিস্মিত হয়ে গেল। হিটলারের খাস পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার তার সৌভাগ্য হবে সেটা সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। মনে মনে স্থির করে নিল যে সে এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না। এইভাবে তার মন আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো যে সে সুযোগমত হিটলারকে দিয়ে তার স্বামী ও মা-বাবাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবে। স্বয়ং ফুয়েরারকে সে সব খুলে বলবে।

কেষ্টনার পলিনকে নাজি পার্টির সদস্যা করে নিল। পলিন যথারীতি নাজিপার্টির সংবিধান অনুযায়ী শপথ নিল। তারপর তার জন্যে নূতন পোষাক এলো। তার পোষাকের (বুকের বাঁ দিকে) ওপর নাজি পার্টির স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত ব্যাজ লাগানো হল। পলিনকে নিয়ে গেস্টাপোবাহিনীর দু'জন জাঁদরেল নেতা বেরখটেসসগ্যাডনের দিকে রওনা দিল।

অবশেষে পলিনকে নিয়ে তারা বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবনে এসে উপস্থিত হল। হিটলার তখন স্টাডিতে ছিলেন। কিছুসময় পরে হিটলার স্টাডি থেকে বের হলেন। গেস্টাপো নেতাদ্বয় হিটলার সমীপে গিয়ে পলিন সম্পর্কে বললেন। হিটলার গম্ভীরভাবে পলিনকে অটো সিলবিন-এর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সিলবিন ছিল হিটলারের বাসভবনের পরিচারিকাদের দেখাশোনার মালিক। কাকে কোথায় কাজ দেওয়া হবে, কে কোথায় থাকবে সবই অটো সিলবিন ঠিক করে দিত।

সিলিবেন পলিনকে তার ঘর দেখিয়ে দিল। নিয়মকানুন সম্পর্কে বলে দিল বিস্তারিত-ভাবে। বলে দিল গোপনীয়তা রক্ষা করার কথা। জানিয়ে দিল বেরখটেসগ্যাডেনের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে কেউ সেখানকার আইনকানুন রক্ষায় অবাধ্য হলে তাকে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে।

পলিন দেখতে পেল বেরখটেসগাডনের বাসভবন একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুপ্তচরবাহিনী। এদের নজর এড়িয়ে কেউ কোন কাজ করবে হিটলারের বিরুদ্ধে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

জার্মানীর সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল হিটলার সর্বশক্তিমান আর তাঁর জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বিলাসিতা বিবর্জিত। কিন্তু এ ধারণা খুব সঠিক একথা বলা মুস্কিল। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কাহিনী তাঁর খুবই কাছের লোকের কাছ থেকে যা জানা গেছে তাতেই এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত পলিন কোলারের লেখা "I was Hitler's maid" এ বই পড়ে হিটলার সম্পর্কে অনেক গোপন কথা জানা যায়।

বেরখটেসগ্যাডেনের (Berchtesgaden) নিজস্ব বাসভবন ছিল একটি সমৃদ্ধশালী রাজপ্রাসাদ। এখানে প্রতিটি ঘর, প্রতিটি আসবাবপত্র, প্রতি পদক্ষেপেই যেন ঐশ্বর্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিমুহূর্ত ছিল বিলাসবহুল ; আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ঢাকা। প্রধান খাবার ঘরটি ছিল ষাট ফুট লম্বা ও চল্লিশ ফুট চওড়া। একটি ওক কাঠের টেবিল শোভা পেত ঘরের মাঝখানে। ঘরময় ছড়ানো ছিটানো স্নিগ্ধ ও নীলাভ আলোতে অপূর্ব শোভা ধারণ করত ঘরটি। কিন্তু আলোর উৎস জানার সুযোগ ছিল না। দুদিকের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র। মেঝেতে ছিল অপূর্ব পার্সিয়ান কার্পেট।

রাজকীয় ডাইনিং টেবিলে অতিথিরা খেতো রূপোর থালায়। চোখ জুড়িয়ে যেতো রূপোর থালা ও ডাইনিং টেবিলের অপরূপ সুষমায়। বেরখটেসগ্যাডনের বাড়িটি ছিল আল্পস্ পর্বতের পাদদেশে। এখান থেকে আল্পস্ পর্বতের তুষারাবৃত চূড়া বাতায়ন পথে চোখে পড়তো। অতিথিদের থাকার জন্য ১৪টি কক্ষ ছিল। ঘর সংলগ্ন স্নানাগার। প্রতিটি পাথরের তৈরি। ইতালি থেকে পাথর পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং মুসোলিনী হিটলারের স্নানাগার তৈরির জন্য। হিটলারের শয়ন কক্ষের দেওয়ালগুলি ছিল ধূসর রঙের। প্লাষ্টার করা। তার ওপর ছিল জার্মানীর পৌরাণিক কাহিনীর নয়ন বিমুগ্ধকর অপূর্ব সব চিত্র। প্রতি কক্ষের সঙ্গেই ছিল বইয়ের অপূর্ব তাক। এতে হিটলারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন-ক্যাম্ফ' অবশ্যই শোভা পেতো। প্যারিস থেকে আনা কিছু Sex-এর বইও এখানে থাকতো। রান্নাঘরগুলি ছিল জাকজমকপূর্ণ। হিটলালেরর জন্য ছিল আলাদা রান্নাঘর। একজন গেস্টাপো কর্মীর সতর্ক দৃষ্টি থাকতো তার প্রভুর ওপর। যাতে কেউ তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে না পারে।

ছাদে ছিল পাঁচটি কামরা। কামরাগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল নক্ষত্রকুঠি। এখানে যাওয়া আসার সুযোগ ছিল মাত্র দু'জন লোকের। একজন স্বয়ং হিটলার অন্যজন কার্ল

ওসিজ। ঘরের সিলিং ছিল নীল রঙের। কাঁচের তৈরি। ঘরের আলো আসতো জলন্ত অঙ্গার থেকে। সুইচ টিপলে আকাশে গ্রহ ও স্থির নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যেত। এ ঘরের আলো কোন সময় নিভত না।

ওসিজ ছিলেন রোগা। বয়স ছিল বত্রিশ বা তেত্রিশ। তিনি কদাচিৎ ঘরের বাইরে যেতেন। তিনি ছিলেন জার্মানীর অন্যতম শক্তিধর মানুষ। তিনি ছিলেন নাৎসী জার্মানীর রাসপুটিন। ওসিজ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব খবরাখবর হিটলারকে দিতেন। হিটলার তাঁর জেনারেলদের চেয়ে ওসিজকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। হিটলারের সঙ্গে ওসিজের এতখানি নিকট সম্পর্ক অনেকেই ভালোমনে নিতে পারেন নি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত হিটলার ক্ষমতায় থাকবেন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হিটলারের জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন।

হিটলার সিনেমা পাগল ছিলেন। এখানে তাঁর নিজস্ব একটা সিনেমাগৃহ ছিল। সেখানে আসন ছিল ২০টি। বিশেষ কিছু ছবির প্রতি হিটলারের ঝোঁক ছিল। কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের ভয়ঙ্কর-জীবন্ত ছবিগুলি তোলা হত। হিটলার ছবির মাধ্যমে সেগুলো দেখতেন। ডাচাউ ও বুচেনওয়াল্ড বন্দীশিবিরের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের দৃশ্য দেখে তিনি অপরিসীম তৃপ্তিবোধ করতেন।

এখানকার বাড়িটি ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো। হিটলার যেন সব সময় শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হিটলারের স্টাডি ঘরের দরজায় লাগানো থাকতো একটি বৈদ্যুতিক চোখ। সে যেন সারাদিন নজর রাখছে অজ্ঞাত কোন শত্রুর প্রতি। ঘরে হাতের কাছেই থাকতো বোতামযুক্ত একটি বোর্ড। মাঝখানে ছিল লাল রঙের একটি মূলচোখ। লালবোতামটি প্রয়োজন বোধে টিপলে তাঁর নিজের ঘর ব্যতিরেকে অন্য ঘরগুলি টিয়ার গ্যাসে পূর্ণ হয়ে যেতো। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠত সৈনিক ব্যারাকে।

মানচিত্র সম্পর্কে হিটলারের ছিল প্রচণ্ডরকমের দুর্বলতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানচিত্র ছিল তাঁর ঘরে। তিনি নিজের পছন্দমত বিশ্বের মানচিত্র পালটাতে চেয়েছিলেন। দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো থাকতো মানচিত্র। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারগুলিও মানচিত্রে পরিপূর্ণ থাকত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন জার্মানীর মানচিত্র হবে বিশ্বব্যাপী। যেমন এক সময় বলা হতো ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। লণ্ডনের এক বিশাল মানচিত্র তাঁর ঘরে শোভা পেতো। সেখানে অঙ্কিত ছিল লণ্ডনের বড় বড় বাড়ি ঘর। জার্মানীর ও মধ্য ইউরোপের ব্রোঞ্জের মানচিত্রও তাঁর ঘরে থাকতো। সেখানে জার্মান তৃতীয় রাইখের সুস্পষ্ট সীমারেখা দেওয়া ছিল।

হিটলার সময় সময় লম্বা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন শিক্ষকের মতো। মনে হতো জেনারেলরা তাঁর ছাত্র আর তিনি তাঁদের জ্ঞানী শিক্ষক। মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে জার্মানীর বিরাটত্ব ও শক্তির কথা বলতে বলতে জার্মানীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের সীমারেখা তিনি বলে দিতেন। তিনি থাকতেন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ। জেনারেলরা তাঁদের প্রভুর আত্মবিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হতেন। তাঁদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত

হতো। ফুয়েরারের অমৃতবাণী তাঁরা মুগ্ধবিস্ময়ে শ্রবণ করতো। কোন কোন সময় হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যেতেন।

হিটলারের পড়ার নেশা ছিল অসাধারণ। অনেকটা নেপোলিয়নের মতো। জার্মানীর ইতিহাস ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবনে তাঁর লাইব্রেরী ছিল অপূর্ব শোভায় সজ্জিত। বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের বই তাঁর লাইব্রেরীতে থাকতো। যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী সম্বলিত ইতিহাসের বই ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জার্মানীর ইতিহাস সম্বলিত পুস্তকাবলি তিনি একাগ্রমনে পড়ে যেতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো। তাঁর কাছে ব্রিটিশরাজ ছিল আদর্শ বীর। বাইরে থেকে ব্রিটিশজাতিকে তিনি যতই ঘৃণার চোখে দেখুন না কেন ব্রিটিশজাতির সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত।

তাঁর বেরখটেসগ্যাডনের বাসভবনে সব কিছুই চলত যান্ত্রিক নিয়মে। হিটলারের টেলিফোনে আড়ি পাতার সুযোগ ছিল না কারও। তাঁর বাসভবন লক্ষ লক্ষ জার্মানদের কাছে ছিল তীর্থস্থানস্বরূপ। হিটলারের কাছে তাঁর প্রিয়জনের দৈনিক চিঠি আসতো প্রায় ৬০০। এখানে হিটলারের আর একটি বাসস্থান ছিল। এই বাসস্থানের নাম ছিল 'ঈগলস নেট'। সমতল থেকে প্রায় ছয় হাজার ফুট উঁচুতে ছিল এই বাসস্থান। উঁচু পর্বত শিখরে লোহা ও কাঁচ দিয়ে তৈরি ছিল এই বাসস্থান। পাহাড়ের বুক বেয়ে লিফট হিটলারকে কয়েক মিনিটের মধ্যে এই স্থানে পৌঁছে দিত। দুটো কামরাযুক্ত ছিল এই বাড়িটি। আসবাবপত্র এখানে বিশেষ কিছু থাকত না। কেবলমাত্র থাকত একটা বিশাল সোফা, একটি বসার ডেস্ক ও পড়াশুনা করার টেবিল ও দুটো বড়মাপের টেলিস্কোপ।

হিটলার গভীর মনোযোগের সঙ্গে নানান পরিকল্পনা করতেন এখানে বসে। এখানে তাঁর মানসিক চিন্তাধারার ব্যাঘাত ঘটাতে কোন টেলিফোন বেজে উঠত না। এক একটা যুদ্ধের আগে এখানে বসেই হিটলার জেনারেলদের সঙ্গে পরিকল্পনা রচনা করতেন। হিটলারের গগণচুম্বী আকাঙ্ক্ষার অনেক পরিকল্পনা হিটলার এখানে বসেই করেছেন।

বাইরের জগতের অনেকের ধারণা ছিল হিটলার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ছিলেন নির্লোভ। সাত্ত্বিক খাবারই তিনি খেতেন। মাছ মাংস মদ তিনি স্পর্শ করতেন না। মাংস তিনি খেতেন না সত্যি কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রচুর পরিমাণে মাছ থাকতো। সময় সময় সামান্য পরিমাণে মদ খেতেন। গোয়েরিঙ-এর মত ভোজন রসিক তিনি ছিলেন না তবে তিনি খেতে পারতেন ভালোই।

তিনি দৈনিক আধ পাউণ্ড পনির বা মাখন জাতীয় খাদ্য খেতেন। ভেজিটেবেল স্যুপে প্রচুর মাছ, আলুর ব্যঞ্জন, পাঁচ মিশালি বাদাম এক প্লেট-এ ছিল তাঁর দুপুরের খাবার।

পানীয়ের মধ্যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় ছিল কফি। দৈনিক ২০/২১ কাপ কফি খেতেন। বিড়ি বা সিগারেট তিনি খেতেন না। অর্থাৎ তামাক জাতীয় কোন জিনিস তিনি স্পর্শ করতেন না এবং কেউ এ সমস্ত জিনিস তাঁর সামনে খাক তা তিনি পছন্দ করতেন না।

হিটলারের অনিদ্রাজনিত রোগ ছিল। হিটলার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। হিটলারের সত্যিকারের কাজ আরম্ভ হতো রাত ৮টার পর নৈশভোজ সমাপনান্তে। নৈশভোজের পর স্টাডিতে বসে হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যেতেন। গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন ভি. আই. পিদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন কোন সময় রাত শেষ হয়ে যেতো। মোরগের ডাক প্রত্যুষের আগমনী ধ্বনি ঘোষণা করত। হিটলার যখন ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতেন তখন গান শুনে বা বাজনা শুনে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। কিন্তু চোখে ঘুম তাঁর ছিল না। ঘুম না হলে আবার তিনি চলে যেতেন স্টাডিতে।

হিটলার নিজে কখনো ড্রাইভ করতেন না। কিন্তু তাঁর চালকের ওপর নির্দেশ ছিল ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে যেন গাড়ি চলে। উদ্দাম মানুষটির জীবনের গতির সঙ্গে গাড়ি চলার গতি যাতে ঠিক থাকে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। হিটলার তাঁর অনিদ্রাজনিত রোগের জন্য দেশ বিদেশের কত যে ঔষধ খেয়েছেন তার ইয়াত্তা নেই, তবুও তিনি এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাননি।

বেরখটেসগ্যাডেনের বিশাল প্রাসাদপম বাড়ীতে দাসদাসীদের থাকার জায়গা ছিল আলাদা। তাদের জন্য তাস, দাবা, টেবিল টেনিস খেলার সব সাজসরঞ্জাম থাকত। হিটলারের ঠিক অবিকল নকল আরও বেশ কয়েকজন জার্মানীতে ছিল। তাই অনেক সময় আসল হিটলারের পরিবর্তে নকল হিটলারকেই ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। শত্রুরা যাতে বিভ্রান্ত হয়। হিটলারের এক দাসী পলিন কোলারের লেখা থেকে হিটলারের ডাবলস সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনী জানা যায়।

একবার পলিন কোলার বেরখটেসগ্যাডনের বাড়ীতে পায়চারি করার সময় লক্ষ্য করেন যে হিটলার এমা নাম্নী এক পরিচারিকার সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলছেন। আর তার বাম হাতে রয়েছে সিগারেট। পলিন জানতেন হিটলার তামাকের ধোঁয়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। সেই লোকটি সত্যি যদি হিটলার হন তাহলে কিভাবে এত সিগারেট খাচ্ছেন। এ যেন এক অভাবনীয় দৃশ্য পলিন অবলোকন করলেন। পলিন বিস্ময়াভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। পলিন আরও লক্ষ্য করলেন হিটলার এমার সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন। এ সমস্ত দৃশ্য দেখে পলিন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। এমা পলিনের অবস্থা লক্ষ্য করলো।

এমা ধীর পদক্ষেপে পলিনের কাছে এল। এমা পলিনকে সবিনয়ে বলল যার সঙ্গে সে টেবিল টেনিস খেলছিল সে আসল হিটলার নয় হিটলারের ডাবলস। পলিন তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। হিটলারের এই ডাবলস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বে কতরকম কাহিনী চালু আছে। তাদেরই একজনকে পলিন স্বচক্ষে দেখতে পেলো।

ঘরে বাইরে হিটলার ছিলেন অগণিত শত্রু পরিবৃত্ত অবস্থায়। শত্রুর হাতে যে কোন সময় তাঁর মৃত্যু ঘটা অসম্ভব ছিল না। তাঁকে আবার তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দকে সময় সময় দেখা দিতে হতো। কুচকাওয়াজে অংশ নিতে হতো। প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাঁদের

প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করতে হতো। তাঁর একান্ত অনুগত বন্ধুরা বিশেষত রাজনৈতিক বন্ধুরা তাঁর জীবনের ওপর কোন আঘাত আসুক তা কল্পনা করতে পারত না। তাই অনেক সময় তাঁর ডাবলসই দূর থেকে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতো এবং মাঝে মধ্যে তাদের হিটলারের হয়ে বুকে বুলেট গ্রহণ করার ঝুঁকি নিতে হতো।

হিটলারের ডামিকে খুব কাছ থেকে হয়ত চেনা যেতো খুব খুঁটিয়ে দেখলে। তা না হলে বোঝার সাধ্য কারও ছিল না। হিটলারের ডাবলসরা অনেক সময় হিটলারের হয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনতার মন জয় করতো। এর জন্য তাদের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ নিতে হতো। গেস্টাপোরাই হিটলারের ডাবলস খুঁজে বের করত। হিটলারের সঙ্গে নিখুঁত মিল আছে এ রকম লোকই তারা খুঁজে বের করেছিল।

হিটলারের ডাবলসদের প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা ছিল। তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো যে তারা হিটলারের ভাবভঙ্গী আচার আচারণ বক্তৃতাদান ইত্যাদি যথাযথ অনুকরণ করতে পারত। পলিন কোলারের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে হিটলারের তিনজন 'ডাবলস' ছিল। তাদের নাম কোলার উল্লেখ করেছে। এগুলি অবশ্য এদের ছদ্মনাম। আসল নাম বহুদিন আগেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এ তিনজনের ছদ্মনাম ছিল লিটল উইলি, ওল্ড বিসমার্ক ও পুঞ্জী। এদের একজন থাকতো বেরখটেসগ্যাডনে, একজন মিউনিকে আর একজন বার্লিনে। তারা থাকতো এস. এস. কোয়ার্টারে।

নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে প্রয়োজন ছাড়া তাদের যাওয়া নিষেধ ছিল। এরা সকলের কাছেই ছিল ঠাট্টার পাত্র অথচ এরা ছিল সর্বাপেক্ষী আত্মোৎসর্গকৃত লোক। কারও কাছে থাকার উপায় ছিল না এদের। আর এস. এস. গার্ডরা সবাই এদের চোখে চোখে রাখত।

একবার পুঞ্জী নাৎসীদের এক জরুরী সভায় উপস্থিত থাকার জন্য হিমলার ও গোয়েরিঙসহ যাচ্ছিল। পুঞ্জীকে হিটলার ভ্রমে গুলি চালান এক আততায়ী। পুঞ্জীর কাঁধে আঘাত লাগল। সে অবস্থায় সে কাকেও বুঝতে না দিয়ে মিটিং সেরে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরল। তাকে কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হল। হিটলার তাকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ৫০০০ মার্কস পুরস্কার দিয়েছিলেন। হিটলারের আরও একজন ডামি ছিল। তার নাম হচ্ছে মুলার। মুলারও হিটলারের ডাবলস হিসেবে বহু সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছে, তাঁর হয়ে কাজ করেছে।

তবে যতদূর জানা যায় ডাবলসের ব্যাপারে হিটলারকে একবার অন্তত বেশ অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেভেরিয়ার কোন এক জরুরী সভায় হিটলারের ডাবলস উপস্থিত থেকে ভাষণ দিচ্ছিল। আর সে সময় বেভেরিয়ার শাসক আয়োজিত এক সভায় হিটলার স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। এবার হিটলারের ডাবলসের আসল রহস্য অনেকের কাছেই উদ্‌ঘাটিত হল। মিউনিকের পত্র পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হল। গেস্টাপোবাহিনীর দু'জন অফিসার এর জন্য দণ্ডিত হল।

হিটলারের পিতা ধর্মমতে ক্যাথলিক ছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের শক্তি ও সংগঠন

হিটলারকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল। ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষা, চার্চের ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু হিটলারের মনে দোলা লাগিয়েছিল। হিটলার নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্নিহিত ভাবধারা তাকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল যদিও তিনি কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতকে তিনি সহ্য করতে পরেতেন না। এ ধর্মের প্রতি ছিল তার গভীর ঘৃণার ভাব। প্রোটেষ্টাণ্ট পাদ্রীদের সম্পর্কে তার কঠোর মন্তব্য সকলকে বিস্মিত করত। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "The (The Protestant Clergy) are insignificant little people, submissive as dogs, and they sweat with embarrassment when you talk to them." খ্রীষ্টান চার্চের সাংগঠনিক শক্তিকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে নয়। "In Hitler's eyes Christianity was a religion fit only for slaves ; he detested its ethics in particular. Its teaching, he declared, was a rebellion against the natural law of selection by struggle and the survival of the fittest. Taken to its logical extreme, Christianity would mean the systematic cultivation of the human faiture."

হিটলার ধর্মকে মানুষের দুর্বলতার ও বিফলতার নিদর্শন হিসেবে দেখেছেন। দেখেছেন ধর্ম-জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। ধর্ম জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুরণের প্রতিবন্ধক —এ কথা হিটলার বার বার বলেছেন। খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের উৎখাত করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। জার্মান জনগণের মানসিক শক্তি বুদ্ধিমানসে খ্রীষ্টধর্মকে জার্মানী থেকে উৎখাত করার জন্য তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে তিনি এতটুকু পিছপা হননি। এখানেই রয়েছে হিটলারের চিন্তাধারার সঙ্গে মার্ক্সীয় মতবাদের ঘনিষ্ঠতা। অর্থাৎ এখানেই রয়েছে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজমের মূলগত মিল।

মার্ক্স ধর্মকে আফিং-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। হিটলার বলতেন ধর্ম বিজ্ঞানকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। মার্ক্স এবং হিটলার দু'জনই প্রায় একই সুরে ধর্মকে রাষ্ট্রশক্তি থেকে উৎখাত করার জন্য বলেছেন। আবেগ বা গভীর অনুভূতিকে হিটলার তার ক্ষমতার উৎস বলে মনে করতেন। "Emotion to him was a raw material of power." হিটলার ছিলেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁর মধ্যে সৌজন্য, মায়া দয়া প্রভৃতি কোন গুণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে তিনি যখন সুস্থ মনে থাকতেন তখন তিনি অতীব সুন্দর সঙ্গী হিসেবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর মন তখন গভীর রসিকতার আনন্দে মেতে উঠতো। অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা করে তিনি তাঁর সঙ্গী জেনারেলদের মাতিয়ে রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ছিল এক আশ্চর্যরকমের ক্ষমতা। যা খুব কম প্রতিভাবনে লোক অর্জন করতে পেরেছিল তদানীন্তন কালে। এখানেই নিষ্ঠুর হিটলার বিশ্বের অন্য যে কোন মানুষের কাছ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন।

হিটলারের জীবনে নারী ছিল এক মূর্তিময়ী প্রেমের আধার। Alan Bullock যথার্থই বলেছেন যে, 'Hitler enjoyed and was at home in the company of woman." তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই তিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়েছিলেন মেয়েদের কাছ থেকে। ফ্রাউ হেলেনে বেখষ্টেইন (Frau Helen Bechstein , ফ্রাউ ক্যারোলা হফম্যান (Frau Carola Hoffman) এবং ফ্রাউ উইনিফ্রিড ওয়াগনার (Frau Winnifried Wagner)—জার্মানীর এ সমস্ত রূপসী মহিলারা তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জীবনের উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন জার্মানীর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

প্রচুর মেয়ে হিটলারের সম্মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। হিটলারের বিশাল সমাবেশগুলিতেও নারীর সংখ্যাই থাকতো সর্বাধিক। হিটলার বারবার স্বীকার করেছেন যে তাঁর ক্ষমতা দখলের জন্য নারীদের দান ছিল অপরিসীম। নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর নাৎসী পার্টি নারীদের সর্বাধিক ভোট পেয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। তাই নারীর প্রতি তাঁর একপ্রকার সহজাত দুর্বলতা ছিল।

"Countess Reventlow proclaimed Hitler 'the coming Messiah'; he was surrounded by motherly women friends"··· সত্যি জার্মানীকে সে সময়ে ঘোর সঙ্কট থেকে মুক্তিদানের জন্যই অবতাররূপে হিটলারের আগমন ঘটেছিল—এই ছিল জার্মানীর শতকরা ৯০ ভাগ স্ত্রীলোকের মত।

জার্মানীর ক্ষমতা দখলের জন্য জীবনের প্রথম দিকে তিনি প্রভূত চেষ্টা করে বিফল হন। হতাশায় তিনি তখন একরকম ভেঙে পড়েছিলেন। তখন নাজী পার্টির সংগঠনও খুব একটা শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এ সময় হতাশাজনিত নানান মানসিক রোগের তিনি শিকার হয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর এ মানসিক অপসাদ থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন জার্মানীর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা এবং বৌয়েরা। তাঁরা ছিলেন তাঁর উৎসাহদাত্রী প্রেরণার উৎস। "Hitler himself admitted that women had 'played a not insignificant part in my political career"—J. C. Fest.

টেবিলে বসে গল্পগুজবের সময় রূপসী মেয়েরা উপস্থিত থাকলে হিটলার উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। তাঁর চোখে মুখে অপূর্ব ভাব পরিলক্ষিত হতো। মনে হতো প্রেমের বন্যায় তিনি ভেসে যাচ্ছেন। রূপসী মেয়েদের সঙ্গে রসালাপে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তবে তাঁর সঙ্গে কেউ তর্ক করতে পারতো না। তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। হিটলার বলতেন যে সমস্ত নারী ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃত্বের অধিকারিণী হতে চান না তাঁরা সমাজের এবং দেশের শত্রু। তাঁরা সমাজের মঙ্গল চান না। একটা জাতির

অস্তিত্ব নির্ভর করে সে জাতির নারীদের ওপর। সন্তান উৎপাদনই নারী জাতির অন্যতম কর্তব্য। তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, "Every child which woman brings into the world is a battle which she wins for the existence or non-existence of her nation." বাস্তববাদী হিটলার বিশ্বাস করতেন যে একটি জাতির বংশবৃদ্ধি ব্যতিরেকে বিশ্বে সে জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই নারী জাতির সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর সে জাতির অস্তিত্বের বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি নির্ভর করে।

হিটলারের যৌন জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা কাহিনী বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা আছে। কেউ কেউ মনে করেন হিটলার সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে ভিয়েনাতে তিনি যখন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখন হয়ত কুসংসর্গে পড়ে এ রোগের শিকার হন।

হিটলারের সম্পর্কে তাঁদের এ অনুমানের পেছনে অবশ্য কোন জোরালো যুক্তি নেই। তবে তাঁরা মনে করেন যে হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম‍প্‌ফ'-এ সিফিলিস রোগ সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। এ রোগ সম্পর্কে তিনি অতীব স্পর্শকাতর এবং ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন সিফিলিস এবং এর পটভূমি গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট এবং প্রধান কাজ।" হিটলারের সময় জার্মানীতে সিফিলিস রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে হিটলার খুবই হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এ রোগের প্রতিরোধের ব্যাপারে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হতো তা শুধু নিরর্থকই নয়, অনর্থকারীও বটে। তারা রোগের আসল কারণ নির্ণয় না করে নিরাময়ের লক্ষণগুলো বেছে তার চিকিৎসা করত। হিটলার 'মেইন ক্যাম‍প্‌ফ'-এ সিফিলিস রোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে স্বদেশবাসীকে এ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুরোধ করে গেছেন।

হিটলার সিফিলিস সম্পর্কে বলেছেন, 'সবশেষে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কে বলতে পারে যে রোগের লক্ষণ তাঁর মধ্যে হয়েছে কিনা।" তিনি দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেছেন যে অনেক নিরোগ লোকেরও এ রোগটা আবার উদয় হয়েছে এবং তাঁর অজ্ঞাতেই এ রোগটা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অনেক বিদগ্ধ ডাক্তারও হিটলারের জীবনের শেষদিকের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন যে, "Hitler contracted syphilis while he was a youngman in Vienna:" অর্থাৎ ১৯১৩ সালে ভিয়েনাতে থাকাকালীন তিনি এ রোগে আক্রান্ত হন। Alan Bullock বলেছেন, "This may well be malicious gossip but it is worth adding that more than one medical specialist has suggested that Hitler's latter symptoms—Psychological as well as physical could be those of a man suffering from tertiary stage of syphilis."

যাই হউক হিটলার সম্পর্কে এ সমস্ত কথা সবই অনুমানভিত্তিক। মেইন 'ক্যামপ্‌ফ'-এ সিফিলিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যত বংশীয়দের কল্যাণের জন্য দেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করার ব্যাপারে জার্মানীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ রোগের প্রতিরোধের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্য সার্বিক প্রচার অভিযান চালানো একান্ত প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেছেন যে যৌনরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ হলো গণিকাবৃত্তি, মিথ্যা-সংস্কার ও মিথ্যা জনমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গণিকাবৃত্তিকে হিটলার অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর মতে পারিপার্শ্বিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এ রোগকে সীমাবদ্ধ করা যায়, করা যায় এ রোগের দূরীকরণ। তার জন্য হিটলার যুবক যুবতীদের অল্পবয়সে বিয়ের সুযোগ দানের ওপর জোর দিয়েছেন।

অবশ্য হিটলারের এ রোগ ছিল কিনা সে ব্যাপারে তথ্য সম্বলিত কোন ডাক্তারী রিপোর্ট আজ অবধি পাওয়া যায় নি। সুতরাং বলা যায় হিটলার সিফিলিস রোগের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তৎকালীন জার্মানীর সমাজ ব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব দেখে এবং দেশের যুবক যুবতী তথা দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই একজন সুস্থ চিন্তাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক নেতা হিসেবে এসব কথা বলেছেন, এটা মেনে নিতে কারও আপত্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, হিটলার ছিলেন পুরুষত্বহীন। মেয়েদের জৈবক্ষুধা মিটাবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি ভাগ্নী গেলীর সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তারপর একে একে অনেক নারী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে রেনেট মূলার, জেনি জুগো, ইভা ব্রাউন, ইউনিটি মিটফোর্ড প্রমুখ অন্যতমা। এদের মধ্যে রেনেট মূলার, জেনি জুগো ও গেলী আত্মহত্যা করে হিটলারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই পুজি হ্যানফস্টেঙ্গল (Putiz Hanfstangl) বলেছেন যে, হিটলার নিশ্চিতভাবে পুরুষত্বহীন বা impotent ছিলেন। না হলে এঁরা আত্মহত্যা করতো না। পুজি হ্যানফস্টেঙ্গল ছিলেন হিটলারের বেভেরিয়া জীবনের একনিষ্ঠ সঙ্গী। এ সময় তিনি হিটলারের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেরিয়েছেন। তবে এটা নিশ্চিত যে ইভা ব্রাউন হিটলারকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছেন। তিনি হিটলারকে ছেড়ে যাননি বা আত্মহত্যা করে হিটলারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান নি। বরঞ্চ হিটলারকে খুবই গভীরভাবে কাছে পেতে চেয়েছেন। অতএব হিটলারের সম্পর্কে এ সমস্ত মন্তব্য গ্রহণ-যোগ্য একথা বলা যায় কি করে।

যাই হউক, হিটলারের প্রথম জীবনের গল্প করার নারী সঙ্গীদের মধ্যে ছিল বন্ধু ফটোগ্রাফার হফম্যান কন্যা হেনি হফম্যান (Henny Hoffmann), নুরেমবার্গের ফিল্ম ডাইরেক্টর লেনি রিফেনস্থল (Leni Riefenstahl), ইংলণ্ডের স্যার অসওয়াল্ড মসলের শ্যালিকা ইউনিটি মিটফোর্ড (Unity Mitford)। মিউনিকে থাকাকালীন ইউনিটি মিটফোর্ড ছিলেন হিটলারের সঙ্গে গল্পগুজবের একান্ত সঙ্গী। ইউনিটি মিটফোর্ড

এক সময়ে হিটলারকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে সম্ভব না হওয়ায় তিনি হতাশায় আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন।

ইউনিটি মিটফোর্ড হিটলারকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বলতে দ্বিধা নেই হিটলারকে তিনি জীবন্ত ভগবানের মতো পূজো করতেন। পূজারিনী বেশেই হিটলার সমীপে এসে তিনি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা উজাড় করে দিতেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে হিটলারের জয়গান করতেন। তিনি বলতেন হিটলার হচ্ছেন বিশ্বের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। জার্মানী তাঁকে নেতা হিসেবে পেয়ে গর্বিত। তিনি বলতেন হিটলার হচ্ছেন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। জার্মানী ও তার ফ্যুয়েরার হিটলার আর ইংলণ্ড একসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের হিতসাধনে সচেষ্ট হবে।

ইউনিটি মিটফোর্ড অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রাখতেন যে হিটলারই হচ্ছেন জার্মানীর প্রকৃত ত্রাণকর্তা। জার্মানীর গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার মানসে স্বয়ং বিধাতা যেন হিটলারকে প্রেরণ করেছেন। বলবীর্যে দীপ্যমান হয়ে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী সমগ্র বিশ্বকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছিল। হিটলার নিঃস্ব, ক্লান্ত জার্মানীর হৃদয়ে নবরক্ত সঞ্চারিত করেছেন। তাই সমগ্র জার্মানী হিটলারের পাদমূলে ফুলের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। একদিন সারা বিশ্ব হিটলারের বিশাল প্রতিভার পরিচয় পাবে এ ব্যাপারে মিটফোর্ড নিশ্চিত।

গোয়েবলসের প্রচারযন্ত্র হিটলারকে দেবতা করে তুলেছিল জার্মানবাসীদের কাছে। তিনি প্রচার করতেন একমাত্র ইভা ব্রাউন ছাড়া হিটলার নাকি আর কোন নারীসঙ্গ কামনা করেননি। তবে একথা যে সঠিক নয় বহু লেখকের লেখা থেকে তার প্রমাণ মেলে। পলিন কোলার তাঁর লেখা 'I was Hitlers' Maid' বা "আমি হিটলারের বাঁদী ছিলাম" গ্রন্থে যা বলেছেন তা অতীব বিস্ময়কর। তবে অস্বাভাবিক নয়। কেননা হিটলার ত' রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। তাই নারীসঙ্গ তাঁর কামনার বাইরে থাকবে তা ত' বলা যায় না।

তবে জার্মানদের কাছে হিটলার ছিলেন অতিমানব। অতি পবিত্র। বিশুদ্ধ আর্য রক্তে উদ্ভাসিত। কাম লোভ মদ মাৎসর্য্য বিহীন লোক। যা একমাত্র ধ্যানী সাধু-সন্তদের মধ্যে দেখা যায়।

পলিন কোলার ছিলেন জার্মান রমনী। হিটলারের পরিচারিকা। অতি কাছ থেকে তিনি হিটলারকে দেখেছেন। তাঁকে তাঁর তুলির টানে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। কোলার বলেছেন হিটলারের গোটা জীবনটাই নারীময়। হিটলার যখন সাধারণ রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে জার্মানীর বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন তখন রমনীরাই তাঁর সভাস্থল ভরিয়ে তুলতো। রমনীদের ভোটের জোরেই হিটলার ও তাঁর নাৎসীদল ক্ষমতা দখল করেছিল জার্মানীতে। রুর অঞ্চলের অসংখ্য বিত্তশালী জার্মানের বাস ছিল। তাঁদের স্ত্রীদের অর্থ, সোনা-দানা ও গহনাতে পার্টি-তহবিল ভরে উঠেছিল বন্যার স্রোতের মত এসে। এই অর্থ হিটলারের পার্টি তহবিলে জমা হতো। যা হিটলারকে তাঁর ক্ষমতা দখলের সহজতম পথ করে দিয়েছিল।

হিটলার প্রেমের স্বাদ যার কাছ থেকে সর্বপ্রথমে অনুভব করেছিলেন তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাগ্নী গেলী। সে ব্যাপারে মোটামুটি আলোচনা প্রথমদিকে করা হয়েছে। তবু খানিকটা এখানে উল্লেখ করা গেল।

গেলী ছিলেন হিটলারের ভগ্নী এঞ্জেলা রাউবলের কন্যা। ১৯২৫ সালে ওবারসালজবার্গে (Obersalzberg) হিটলারের বাসভবন ঠিক করার জন্য ভগ্নী এঞ্জেলা গেলীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। হিটলারের সঙ্গে এখান থেকেই গেলীর আলাপ। গেলী তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা। অত্যন্ত সাদাসিদে ধরনের। কিন্তু খুবই আকর্ষণীয়া ছিলেন গেলী। গেলী ভালো গান করতে পারতেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩১ সালে গেলীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন হিটলারের অন্যতমা সঙ্গী। মামা হিটলারের সঙ্গে গেলী মিউনিকে থাকতেন।

হিটলার উল্লেখ করেছেন মিউনিকে গেলীর সঙ্গে তিনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির মধ্যে দিন যাপন করেছেন। গেলী বয়সে হিটলার অপেক্ষা ২০ বছরের ছোট ছিলেন। তবুও হিটলারের মনপ্রাণ গেলীতেই আচ্ছন্ন ছিল। প্রেমপ্রীতি ভালবাসা বিশ্বজনীন। এর স্বাভাবিক গতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। কে, কাকে কখন ভালবাসবে তা বোঝা মুস্কিল। হিটলারের গেলীর প্রতি আকর্ষণ যে খুবই তীব্র ছিল সে ব্যাপারে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। কিন্তু গেলী মামাকে তাঁর পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিলেন কিনা প্রেমের ডালি উজাড় করে দিয়ে সে ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করা শক্ত।

গেলী হিটলারের প্রেমে খানিকটা বাঁধা পড়েছিল এবং হিটলারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর অন্তরঙ্গ প্রেমিকা হিসেবে বিচরণ করতেন। কিন্তু তিনি হিটলারের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতি পরায়ণা। তাঁর মনে প্রচণ্ডরকমের ঈর্ষাও ছিল। হিটলার গেলীকে কোথাও যেতে দিতেন না। গেলীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে হিটলার কোনরূপ গুরুত্ব দিতেন না।

গেলী ভিয়েনাতে একজন সঙ্গীতশিল্পীর কাছে গান শিখতে যেতেন। হিটলারের সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হবার পর গেলীর ভিয়েনাতে গান শিখতে যাবার পথও রুদ্ধ হয়ে গেল। তদুপরি হিটলার গেলীকে ধীরে ধীরে সন্দেহ করতে লাগলেন। এমিল মরিস (Emil Maurice) ছিল মিউনিকে হিটলারের মোটর গাড়ির চালক। হিটলার গেলীকে দু-একবার মরিসের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে দেখেছেন। হয়ত এটা আদৌ সত্যি নয়। কেন না গেলী ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেমালাপ করবে সেখানে হিটলার বর্তমান সেটা চিন্তা করা যায় না। তবে ভিয়েনাতে যার কাছে গেলী গান শিখতে যেতেন তার সঙ্গে গেলীর একটা আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একথা অনেক লেখকই স্বীকার করেছেন। পারিবারিক জীবনে গেলীর ওপর হিটলারের এই অত্যাচার গেলী মেনে নিতে পারলেন না।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সালের সকাল ৯টা। হিটলার বন্ধু ফটোগ্রাফার হফম্যানকে সঙ্গে নিয়ে মিউনিক ছেড়ে হামবুর্গের পথে রওনা দিলেন। মিউনিক ছাড়ার সময় হিটলার গেলীকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। আদর করলেন। কিন্তু গেলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন

লক্ষ্য করলেন না। গেলীর মনের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব চলছে তা ক্ষুরধার বুদ্ধিমান হিটলার বুঝতে পারলেন না।

ন্যুরেমবার্গে সবেমাত্র প্রবেশ করেছেন হিটলার। হঠাৎ Wireless-এ খবর পেলেন গেলী আত্মহত্যা করেছে। Hess (হেস)-এর কাছ থেকেই হিটলার এই মর্মান্তিক সংবাদটি শুনতে পেলেন। Hess হিটলারকে বললেন গেলী হিটলার বের হবার কিছু সময় পরেই নিজের ফ্ল্যাটেই গুলি করে নিজের জীবনদীপ নির্বাপিত করেছেন। হিটলার গেলীর আত্মহত্যার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। ফিরে এলেন মিউনিকে।

হিটলারের বন্ধু হফম্যান হিটলার ও গেলী উভয়কেই খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাঁদের দুজনকেই তিনি অতীব ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। হফম্যান বলেছেন যে গেলী অন্য কাকেও ভালবাসতেন, যার কাছে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি গেলীর সঙ্গীত শিক্ষক, ভিয়েনায় যার কাছে গেলী গান শিখতে যেতেন। কিন্তু হিটলার গেলীকে খাঁচার পাখির মত বন্ধ করে রাখতে চাইতেন তাঁর স্বাধীন মতবাদকে অগ্রাহ্য করে। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর এরকম খবরদারি অনেকেই সহ্য করতে পারে না। বিশেষত স্বাধীনচেতা গেলী যে তা মেনে নিতে পারবেন না তা ত খুবই স্বাভাবিক।

যে কারণেই হউক গেলীর আত্মহত্যা হিটলারকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করেছিল। Alan Bullock বলেছেন, "Whatever the reason, Geli's death dealt Hitler a greater blow than any other event in his life. For days he was inconsolable and his friends feared that he would take his own life." বন্ধু হফম্যান হিটলারের সঙ্গে থেকে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ না করলে হিটলার হয়ত আত্মহত্যা করে ১৯৩১ সালে নিজের জীবনের ইতি টানতেন। বিশ্বের ইতিহাস তখন অন্যভাবে লেখা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা হতো কিনা সেটাও বলা যায় না। হিটলারের মৃত্যু ঘটলে জার্মানীকে শৌর্যে-বীর্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে পরাক্রান্ত করে তোলার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জার্মানীতে ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করা শক্ত। হিটলারের মত এতখানি মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তি তদানীন্তন কালে জার্মানীতে ছিল না—এটা নিশ্চিত।

কারও কারও মতে হিটলার মাংস বা মদ স্পর্শ করতেন না। তার আসল কারণ হচ্ছে গেলীর মৃত্যুশোক। পরবর্তী জীবনে হিটলার গেলী সম্পর্কে যখনই কোন কথা বলেছেন তখনই তাঁর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। বার্গহফে (Berghof) হিটলারের বাসভবনে সব সময় গেলীর ফটো শোভা পেতো। মিউনিকে যে ঘরে গেলী আত্মহত্যা করেছিলেন সে ঘরটি একটা তীর্থস্থানের রূপ পরিগ্রহ করিয়েছিলেন হিটলার। গেলীর ফটোতে ধূপ-ধুনা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হতো। এ যেন কোন দেবতার স্তব-স্তুতির স্থান। হিটলারের বার্লিনের বাসগৃহেও গেলীর ফটো শোভা পেতো। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা না একটা রহস্য থাকে। গেলীর প্রতি হিটলারের এই আসক্তিকে তাঁর বিচিত্র জীবনের এক রহস্যময় ঘটনা বলা যেতে পারে।

বন্ধু হফম্যানের বুদ্ধিমত্তা, একান্ত বন্ধুপ্রীতি জার্মানীর তদানীন্তনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিটলারের জীবন রক্ষা করলো। হফম্যানের বুদ্ধিকৌশলেই হিটলারের জীবন থেকে বিষাদের কালিমা মুছে গেল। নবপ্রভাতের সূর্যের কোমল রশ্মি হিটলারের ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে দিল। হিটলার সুস্থ মস্তিষ্কে আবার চিন্তার সুযোগ পেলেন।

প্রিয়তমার বা প্রিয়তমের মৃত্যু মানুষের কাছে যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন কালের গতিতে সে তা ভুলতে পারে বলেই সে সংসার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর আবর্তন চক্রে মানুষ চলে। সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করে যে মানুষ এগিয়ে যায় সেই মানুষ জীবনে চলার পথে সাফল্য লাভ করে। তাই গেলীর মৃত্যু হিটলারের জীবনে ছন্দপতন ঘটাবে এটা সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। দুর্বলচিত্ত মানুষের মনে অনেক সময় এই ধরনের আঘাত মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে দেয়। এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত বিশ্বে বর্তমান। তবে হিটলার ত অনেক কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। জার্মানীর মত এরকম একটা শ্রেষ্ঠ জাতির অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সুতরাং গেলীর মৃত্যুর মতো এরকম কঠোর আঘাত ধীরে ধীরে তিনি সইয়ে নিতে পারবেন তাতো সহজেই অনুমেয়।

হিটলারের জীবনে আবার দ্বিতীয় রমণীর আবির্ভাব ঘটল। হিটলার তখন তৃতীয় রাইখের চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত। গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের পদলেহী। হিটলারকে প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে গোয়েবলস তাঁর কাছ থেকে সুযোগ সুবিধে আদায় করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। গোয়েবলস বুঝতে পারতেন গেলীর মৃত্যুতে হিটলার হয়ত সাময়িক কঠোর আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নারী-পিয়াসী মন দৈহিক কামনা বাসনার উর্দ্ধে থাকতে পারবে না।

দৈহিক সুখভোগ না হলে হিটলারের মানসিক সুখভোগ যে অসম্ভব তা গোয়েবলস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। অন্তরের সুতীব্র অনুভূতিতে উপলব্ধি করে গোয়েবলস চাইলেন হিটলারকে আবার প্রেমের জোয়ারে ভাসাতে। সে সুযোগ গোয়েবলস পেয়ে গেলেন। রেনেট মূলার ছিলেন একজন বিশিষ্টা জার্মান অভিনেত্রী। অপূর্ব রূপসী। তাঁর রূপের মোহে অনেক জার্মান যুবকের হৃদয় আলোড়িত হয়েছে।

বেরস্টেসগ্যাডনে হিটলারের বাসভবনে সিনেমায় ষ্টেজ ছিল। হিটলারকে মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি দেবার জন্য গোয়েবলস তাঁকে সেক্স ভায়োলেন্সের বই দেখাতেন। গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের একনিষ্ঠ প্রচার সচিব। রেনেট মূলার অভিনীত যে সমস্ত বইতে সেক্স ভায়োলেন্সের আতিশয্য রয়েছে সেই সমস্ত বইগুলিই গোয়েবলস হিটলারকে দেখাতে আরম্ভ করলেন। হিটলার অল্প কিছুদিনের মধ্যে রেনেটের ভক্ত হয়ে উঠলেন। মুখে কিছু না বললেও গোয়েবলস হিটলারের চোখ দেখে বুঝতে পারতেন হিটলার রেনেটের অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব চাক্ষুষ উপভোগ করার জন্য আগ্রহী। ধূর্ত গোয়েবলস হিটলারকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন তিনি রেনেটকে তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছুক কিনা? হিটলার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এক শুক্রবার রেনেট মূলারকে গোয়েবলস হিটলারের বাসভবনে নৈশভোজে উপস্থিত

থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রেনেট নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বেরস্টেসগাডেনে হিটলারের বাসভবনে উপস্থিত হলেন। সেই নৈশভোজে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে গোয়েবলস, গোয়েরিঙ এবং আরও দুজন নাৎসী নেতা ছিলেন। রেনেট মূলার যথাসময়ে এসে হাজির হলেন। তখনো হিটলার এসে পৌছাননি। মূলারের মনের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব। হঠাৎ ফ্যুয়েরারের এই নিমন্ত্রণ কোন অমঙ্গলের কিছু নির্দেশ দিচ্ছে না ত! এরূপ সাত-পাঁচ ভেবে রেনেট যখন চিন্তাক্লিষ্ট-চিত্তে অপেক্ষারত তখন হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকলেন।

রূপসী রেনেট উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন অন্যান্যরাও। হিটলার নিজের চেয়ারে বসলেন। গোয়েবলসের নির্দ্দেশে রেনেট গিয়ে বসলেন হিটলারের পাশের চেয়ারে। ভোজনপর্ব শেষ হল। দু-একটা বাক্য বিনিময় হলো রেনেটের সঙ্গে হিটলারের। রেনেটের রূপে হিটলার মুগ্ধ। হিটলার বিগলিত।

এরপর হিটলার সকলকে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে গেলেন। রেনেট গভীর মনোযোগের সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে কিছু কিছু বই দেখছিলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বই পড়তে আরম্ভ করলেন রেনেট। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলেন তিনি ও হিটলার ভিন্ন ঘরে আর কেউ নেই। এরপর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

হিটলারের বাক্‌শক্তি রহিত হল। হিটলার রেনেটের চোখের দিকে তাকালেন। স্যালুটের ভঙ্গীতে রেনেটের দিকে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। রেনেট বিস্মিত। রেনেট স্তব্ধ। কি বলবেন রেনেট তা ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না। হিটলার একই-ভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানা সরিয়ে আনলেন। রেনেট বিস্ময়াবশত নয়নে হিটলারের দিকে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলেন।

হিটলার রেনেটকে বললেন এভাবে তিনি দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা রাখেন। যখন স্ট্রমট্রুপারের অভিবাদন গ্রহণ করেন তখন ঠিক এভাবে তিনি প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন যা তাঁর আর কোন জেনারেলের পক্ষে সম্ভব নয়। যুগে যুগে কত বীর-পুরুষের দল নারীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে সে নারীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ান, প্রমুখ বীরগণের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। হিটলার রেনেটের রূপের আগুনে আত্মাহুতি দিতে যেন প্রস্তুত। হিটলারের কাছে কিন্তু রেনেট পুরোপুরি ধরা দিতে রাজী নন। তবুও জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা, একচ্ছত্র অধিনায়ক, তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ত নেই!

হিটলার রেনেটকে নিয়ে সিনেমার হলঘরে গেলেন। রেনেটকে পাশে বসালেন। হিটলারের তখন আর গেলীর কথা ভাববার সময় কোথায়? রেনেটের রূপের জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইলো হিটলারের দেহ-মন। ধীরে ধীরে হলঘরের বাতি নিভল। পর্দার ওপর ছবিগুলি ভেসে উঠল। সিনেমা আরম্ভ হল। রেনেট অভিনীত ছবিই দেখানো হচ্ছিল। হিটলার তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরায় প্রেমের অনুভূতি উপলব্ধি করতে লাগলেন।

হিটলার তাঁর অব্যক্ত প্রেম ব্যক্ত করার জন্য হাত দু'খানা রেনেটের দেহখানির দিকে প্রসারিত করলেন। ধীরে ধীরে রেনেটের গুপ্ত অঙ্গের দিকে হিটলারের কম্পিত হস্ত-

যুগল এগিয়ে গেল। রেনেটের দেহের গুপ্ত অঙ্গের অনুভূতি হিটলার দেহে-মনে উপলব্ধি করতে লাগলেন। চুম্বনে চুম্বনে রেনেটের লাল ঠোঁট দুটো আরও লাল হয়ে উঠল। কেমন যেন এক বিচিত্র দৈহিক ও মানসিক অনুভূতিতে রেনেট আবিষ্ট হয়ে গেলেন। হিটলারের দেহে তাঁর মাথা ও গা এলিয়ে দিলেন। হিটলার রেনেটের বক্ষে হাত রাখলেন। ধীরে ধীরে রেনেটের ব্লাউজের হুক খুলে গেল। রেনেটের হৃষ্টপুষ্ট স্তনযুগল যেন হিটলারের হাতের স্পর্শে স্ফীত হয়ে উঠল। রেনেট তৃপ্তির আবেগে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। হঠাৎ হলঘরের আলো জ্বলে উঠলো! সিনেমা সো যে কখন ভেঙ্গেছে সেদিকে তাঁদের কোন খেয়াল ছিল না। কেন না হলে দর্শনার্থীর সংখ্যা মাত্র দু'জন। হিটলার ও রেনেট।

হলে লাইটের আলোতে হিটলার তাঁর সম্বিত ফিরে পেলেন। মোহবেশে স্বপ্নের রাজ্য থেকে যেন তাঁরা আবার ধরাধামে ফিরে এলেন। হলের আলো যেন শত্রুতা করে হিটলার ও রেনেটের দৈহিক সুখভোগের ছন্দপতন ঘটালো। নিঃসন্দেহে ফ্যুয়েরারের প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না। নিজেকে সংযত করলেন। জার্মান সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা এখন রেনেটের হাতের মুঠোয়। রেনেট এসেই যেন হিটলারকে জয় করে ফেললেন। কিন্তু হিটলার রেনেটের জীবন-সীমানা বেঁধে দিলেন।

পরদিন হিটলার রেনেটকে একটি প্লেনে করে বার্লিনে পাঠিয়ে দিলেন। বার্লিনে হিটলারের ফ্ল্যাটেই রেনেটের থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফ্ল্যাট সাজানো হল অপরূপ সব জিনিষপত্র দিয়ে। সমস্ত ঘর ফুলে ফুলে ভরে গেল। মহামূল্যবান হীরক-খচিত অলংকার, ফার-এর পোষাক রেনেটের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

গোয়েবলসের দেহমনে আনন্দের বান ডাকলো। গোয়েবলসের প্রচারযন্ত্র ধীরগতিতে এগিয়ে চলল। বিজয়শঙ্খ বেজে উঠল। অভিনেত্রীরূপে রেনেট মুলারের প্রশস্তিতে পত্র-পত্রিকা ভরে গেল। এতদিন রেনেট ছিলেন শুধু একজন বিশিষ্টা অভিনেত্রী কিন্তু আজ যেন তিনি জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা ফ্যুয়েরারের অর্দ্ধাঙ্গিনী। জার্মানীর প্রথম লেডি। জার্মানীর মহারানী।

রেনেটকে সিনেমায় এবং থিয়েটারে অভিনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হবার জন্য বার্লিনে থাকতে হতো। রেনেটের গভীর টানে হিটলারকে ছুটে আসতে হতো বার্লিনে। দৈহিক ও মানসিক সুখের সঙ্গী রেনেটের মিলন পিয়াসী হিটলার দুটি মাস বার্লিনে কাটালেন। অপূর্ব আলোরছটায় বার্লিন চ্যান্সেলারী ভবন ঝলমল করতে লাগলো। আর নাৎসী-বাহিনীর প্রিয়নেতা হিটলারকে পাহারা দেবার জন্য সদাসর্ববা প্রস্তুত থাকতো গেস্টাপো অনুচরের দল।

গেলী মামা হিটলারকে দেহ সম্ভোগের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মন দিতে পারেনি। যার জন্য গেলী করল আত্মহত্যা। রেনেটের পক্ষে হিটলারের দুরন্ত কামনা-বাসনা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। গেলীর মত তিনিও ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাঁর স্বাধীন সত্তাকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন হিটলার গেলীর মত।

গেলীর মত রেনেটের মনও পড়ে থাকতো তাঁর একান্ত প্রিয়তম এক ইহুদী যুবকের

কাছে। অপূর্ব রূপবান এক ইহুদী যুবকের আবির্ভাব হিটলারের জীবনে নিয়ে এসেছিল এক বিরাট অভিশাপ। ইহুদী যুবক হিটলার ও রেনেটের মাঝখানে যেন এক বিরাট প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো। অনেকের মতে ইহুদী বিদ্বেষের এটাও একটা কারণ।

অচিরে হিটলার রেনেটের ইহুদী যুবকের প্রতি আকর্ষণের কথা জানতে পারলেন। তীব্র ক্ষোভে একদিন তিনি তাঁর উপস্থিত জেনারেলদের বললেন তিনি ইহুদীদের ক্ষমা করবেন না। তাদের তিনি সবংশে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দেবেন।

ইহুদী যুবকের প্রতি রেনেটই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর জন্য ইহুদী যুবক কোনক্রমেই দায়ী ছিলেন না। ইহুদী যুবকটি ছিলেন এক কোটিপতির সন্তান। হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে এই তরুণ ইহুদী যুবককে বন্দীশিবিরের বাইরে রেখেছিলেন হিটলার তাঁর নিজের স্বার্থে। করুণায় নয়। কেন না হিটলারের হৃদয়ে ইহুদীদের প্রতি কোন করুণার স্থান ছিল না। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসার প্রয়োজনে এই ইহুদী যুবককে হিটলারের প্রয়োজন ছিল।

বার্লিনে অশ্বারোহণে এই যুবক প্রতিদিন প্রাতভ্রমণে বের হতো। কোন এক শুভ বা অশুভ লগ্নে রেনেটের সঙ্গে এ যুবকের পরিচয় ঘটে। প্রথম দর্শনেই রেনেট বিমোহিত হয়ে যান। রেনেটকে ইহুদী যুবক পাগল করে দিল। রেনেটের মনের অগোচরেই যেন এই ইহুদী যুবক তাঁর দৈহিক ও মানসিক সুখশান্তির আধার হয়ে উঠল। রেনেটের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল এই ইহুদী যুবক। দুজনে গোপন স্থানে মিলিত হতে লাগলেন বিভিন্ন সময়ে। দু'জনে সুযোগ বুঝে দৈহিক ও মানসিক সুখভোগে লিপ্ত হতে লাগলেন। ইহুদী যুবকের প্রেমের আগুনে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন রেনেট। ইহুদী যুবককে শয়নে স্বপনে ধরে রাখার জন্য তাঁর মন প্রাণ আকুল হয়ে উঠছিল। কিন্তু হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর চোখে ধূলো দেবার ক্ষমতা তাঁর যে নেই সেই কথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন।

তাই রেনেটের মন সব সময় এক অজানা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়ে অচিরেই হয়ত তাঁদের দু'জনকেই ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে। এদিকে হিটলারের নির্দেশে রেনেটের ওপর আরও কড়া নজর রাখা হল। রেনেটের তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ইহুদী যুবককে রেনেট বুঝালেন। তাঁকে রেনেট বার্লিন থেকে প্যারিসে চলে যেতে অনুরোধ করলেন।

ইহুদী যুবক গেস্টাপো বাহিনীর নজর এড়িয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেতর দিয়ে প্যারিসে এসে হাজির হলেন। রেনেটও নানান ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে গেস্টাপোদের চোখে ফাঁকি দিয়ে প্যারিসে চলে এলেন। প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলেন রেনেট ও ইহুদী যুবক। হিটলার গেস্টাপোবাহিনীর কর্তাদের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। কয়েকজনের ওপর শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হল, তাদের কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য। হিটলার চিন্তাই করতে পারেন নি যে রেনেট এভাবে গেস্টাপো বাহিনীর নজর এড়িয়ে প্যারিসে পাড়ি দিতে পারবেন।

দৈহিক ও মানসিক কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির আধার রেনেটের অবর্তমানে হিটলার

প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। গেস্টাপো বাহিনীকে কঠোর আদেশ দিলেন যেভাবে হোক রেনেটকে খুঁজে বের করতে হবে। হিটলারের জীবন বিষাদময় হয়ে উঠল। গেলীর মৃত্যুর পর রেনেটকে পেয়ে হিটলার কিছুটা মানসিক সুস্থিরতা লাভ করেছিলেন। সেও যখন টিকল না হিটলার উদ্‌ভ্রান্তের মত অসহনীয় কষ্টে দিন যাপন করতে লাগলেন।

স্বাধীন প্যারিসে বাধাবন্ধনহীন জীবনে রেনেট ও ইহুদী যুবক চুটিয়ে প্রেমের স্বাদ উপভোগ করতে লাগলেন। দৈহিক কামনা বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি তাঁরা পরস্পরে অনুভব করলেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু গেস্টাপো বাহিনীর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় তাঁদের ছিল না। গেস্টাপো বাহিনীর দু'জন কুশলী যুবক সদা সর্বদা তাঁদের পেছনে লেগে থাকতো। নাৎসী গুপ্তচর তখন সারা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। কোথায় কখন রেনেট ও মুলার ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার সব খবরাখবর নাৎসী গুপ্তচরেরা রাখতো। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরার লেন্সে রেনেট ও ইহুদী যুবককে ধরে রাখতো। রেনেটের স্বপ্নের ও বাস্তবের প্যারিসের জীবন শেষ হয়ে এলো। হিটলারের কাছে গোপনে রেনেটের বিচিত্র প্যারিসের জীবনের কাহিনী চলে যেতো।

গেস্টাপো বাহিনীর দুই যুবক একদিন বার্লিনে এসে উপস্থিত হলো হিটলারের নির্দেশে। রেনেট ও ইহুদী যুবকের প্রেম নিবেদনের অনেক ছবি যেগুলি তারা গোপনে তুলেছিল সেগুলি হিটলার সমীপে রাখল। হিটলার ত ছবি দেখে ক্রোধে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। রেনেটকে ছলে-বলে-কৌশলে প্যারিস থেকে নিয়ে আসার জন্য হিটলার নির্দেশ দিলেন। রেনেটের বাবা, মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন জার্মানীতে বসবাস করতেন। অতএব রেনেট হিটলারের নির্দেশে জার্মানীতে ফিরে না এলে তাঁদের কি অবস্থা হবে তা তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন।

রেনেট ও ইহুদী যুবকের বিচিত্র ভঙ্গীমার ছবিগুলি ছিল জীবন্ত। রেনেট কোথাও নৃত্যরতা আর ইহুদী যুবক তাঁর কোমরে হাত দিয়ে সোহাগে উৎফুল্ল। কোথাওবা জড়িয়ে ইহুদী যুবক রেনেটের দুটো ওষ্ঠে চুম্বনরত। আবার কোথাও বিবস্ত্র রেনেটের শরীরের দিকে ঝুঁকে ইহুদী যুবক অপূর্ব মানসিক পরিতৃপ্তি অনুভব করছে। কোথাওবা সীন নদীর ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরছে। কোথাওবা কোন হোটেলে নিশিযাপনের জন্য চলেছে। এ সমস্ত জীবন্ত ছবি হিটলারকে উন্মাদ করে তুলল।

হিটলারের খাস পরিচারিকা পলিন কোলারকে হিটলার ডাকলেন। রেনেট সম্পর্কে সব খুলে বললেন। গেস্টাপো বাহিনীর নেতৃস্থানীয় দু' ব্যক্তির সঙ্গে পলিন কোলারকে সীমান্ত ষ্টেশনে যেতে নির্দেশ দিলেন। এদিকে প্যারিসে অতি সঙ্গোপণে রেনেটকে হিটলারের বার্তা পৌছে দেওয়া হল। রেনেটও ভয়ে কম্পমান। কি ঘটতে চলেছে তার জীবনে তা রেনেটের বুঝতে অসুবিধে হলো না। হিটলারের নির্দেশ মতো এস. এস, বাহিনীর দুই তরুণ যুবকের সঙ্গে রেনেট সন্ধ্যা নাগাদ সীমান্ত ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে রেনেটকে স্বাগত জানালো পলিন কোলার।

কোলারকে দেখে রেনেট খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলেন। রেনেট কোলারের কাছে জানতে চাইলেন হিটলার কি রেনেটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। কোলার

রেনেটের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। কোলার রেনেটের কথায় কোন উত্তর দিতে পারলেন না শুধু নিজের চোখের জলধারা মোচন করে বললেন রেনেটের হিটলারের আনুগত্য অস্বীকার করে প্যারিসে পালিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। কেন না ফ্যুয়েরার রেনেটকে তাঁর অপকর্মের জন্য ক্ষমা করবেন না। আর জার্মানীর অধিনায়ক বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর হিটলার যখন তাঁর প্রেমপিয়াসী তখন তাঁকে অবহেলা করে রেনেট কি সুখভোগ করতে পারবেন ? বেরস্টেসগ্যাডনে আসার পথে কলোন ও স্টাটগার্টের হোটেলে তাঁরা দুটি রাত কাটালেন। তৃতীয় দিন বিকেলে তাঁরা বেরস্টেসগ্যাডনে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ছিল দুই গেস্টাপো যুবক। যুবকদ্বয় সব সময় তাঁদের ছায়ার মত অনুসরণ করল। রেনেট বুঝতে পারলেন তাঁর কপালে কি ঘটতে চলেছে।

রাত ১১টায় হিটলারের কক্ষে রেনেটের ডাক পড়লো। হিটলার রেনেটকে দেখে প্রথমে খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। হিটলারকে অভিবাদন, করার কোন সুযোগ পেলেন না রেনেট। ম্লানমুখে ও নতমস্তকে চিত্রার্পিতের ন্যায় হিটলারের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। হিটলার মুখ তুললেন। তাঁর চোখ দুটি যেন ক্রোধে জ্বলছে। রেনেটের মনে হলো প্রজ্বলিত আগুনের হলকা এসে তাঁর শরীরের চামড়াকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। গায়ে ফোসকার দহন জ্বালা অনুভূত হতে লাগল। অনুভব করতে লাগলেন এবার বুঝি তাঁর সম্পূর্ণ শরীর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাঁর নশ্বর দেহ। না তা হলো না। হিটলার রেনেটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন না।

হিটলার হুঙ্কার ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন। রেনেটকে নগ্নভাষায় বেশ্যা বলে সম্বোধন করে বললেন রেনেট একজন নীচ প্রকৃতির কুলটা নারী। তাই সে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসে সুদর্শন ইহুদী যুবককে তার শয্যাসঙ্গিনী করেছে।

হিটলার বলে চললেন এ সমস্ত ইহুদী যুবকের প্রতি তিনি অতি শীঘ্রই তাঁর বিষমাখানো তীর নিক্ষেপ করবেন। ইহুদীদের তিনি তিলে তিলে ধ্বংস করবেন। তাই রেনেটকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বললেন প্যারিসে ইহুদী যুবকের সঙ্গে সে তার আসঙ্গলীপ্সা চরিতার্থ করার জন্য যে মিলিত হয়েছিল তার প্রতিমুহূর্ত্তের ছবি হিটলারের কাছে আছে। অতএব সে যে হিটলারের হাত থেকে রেহাই পাবে না এ কথা রেনেটের বুঝা উচিত ছিল।

রূপসী রেনেটের চোখমুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এলো। হঠাৎ ভূতলে লুটিয়ে পড়লো তার দেহ। তার বাক্‌শক্তি রহিত হল। প্যারিসে তাঁদের যুগলমিলনের প্রতিটি ছবি যে হিটলারের নখদর্পণে তা তার বুঝতে অসুবিধে হলো না। তাই রেনেট হিটলারের কাছে তা লুকোবার চেষ্টা না করে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে লাগল। হিটলার রেনেটের অবস্থা দেখে নিজেকে খানিকটা সংযত করলেন।

রেনেট হিটলারকে বললেন যে তিনি হিটলারকে সত্যি সত্যি ভালবাসেন। তবে ইহুদী যুবকের প্রতি তাঁর যে আসক্তি তা তিনি স্বীকার করলেন এবং হিটলারের সামনে প্রতিজ্ঞা করে বললেন এরকম ভুল তিনি আর করবেন না। ফ্যুয়েরারকে এবার থেকে

তিনি তাঁর দেহ মন দিয়ে পূজো করবেন আরাধ্য দেবতার মত। এখন থেকে হিটলারই তাঁর ধ্যানের গুরু।
রেনেটের চোখের কোণে কালি। বিষাদময় ম্লান মুখ। তাঁর অপূর্ব রূপের ছটা কে বা কারা যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে কেড়ে নিয়েছে। হিটলার রেনেটের মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না। তাঁকে কাছে ডাকলেন। হঠাৎ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় হিটলার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হিটলারকে এভাবে কাঁদতে কেউ কোনদিন দেখেনি। হিটলার রেনেটেক আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রেনেটের অদর্শনে তিনি পাগল। তাঁর চিন্তার শক্তি তিনি রেনেটের কাছ থেকেই পাচ্ছিলেন। জার্মানীর উন্নতিকল্পে তাঁর পরি-কল্পনা জার্মান জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা করার সব প্রেরণা যেন তিনি রেনেটের কাছ থেকে পাচ্ছিলেন। রেনেটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছেদ হলে তা জার্মানী ও জার্মান জনগণের পক্ষে খুবই অমঙ্গলদায়ক হবে। পুরুষের অর্দ্ধেক শক্তির উৎস তার অর্দ্ধাঙ্গিনী। এ কথা হিটলার রেনেটকে খোলাখুলি বললেন।

হিটলারের বাচনভঙ্গী অতীব সুন্দর। রেনেটের মন জয় করার পক্ষে যথেষ্ট। রেনেট হিটলারের মানসিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। রেনেট ইহুদী যুবকের কথা ভুলতে পারছেন না। তবুও নিজের মনের জোরে ইহুদী যুবকের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমকে অবদমিত করে হিটলারকেই তিনি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমের আধার হিসেবে দেখবেন বলে স্থির করলেন।

এরপর থেকে প্রায় দুমাস রেনেট হিটলারকে নিয়ে থাকলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে রেনেট এখন হিটলারের সঙ্গী। হিটলারের কাজের শক্তি চারগুণ বেড়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে হিটলার রেনেটকে জিজ্ঞাসা করলেন যে রেনেট কি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছে? রেনেট হিটলারকে অনুনয়ের সুরে বললেন তিনি যে ভুল করেছেন তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। হিটলারের মধ্যেই তিনি তাঁর মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছেন। রেনেট হিটলারের কাছে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করলেন। হিটলার রেনেটের কথাতে বিগলিত, হিটলার উৎফুল্ল। ছলনাময়ী নারীর অন্তরকে বুঝার ক্ষমতা যে হিটলারের নেই। হিটলার রেনেটের মুখের কথা শুনেছেন কিন্তু অন্তরের কথা শুনতে পাননি। রেনেট ইহুদি যুবককে ভুলতে চেষ্টা করলেও তাঁর অন্তরের গভীরতম স্থানে ইহুদি যুবকের জন্য যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা সারাবার ক্ষমতা কারও ছিল না।

হিটলারকে কথা দিয়েছেন সত্যি কিন্তু রেনেট ইহুদি যুবকের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছেন। দু'মাস কেটে গেল। ইহুদি যুবকের জন্য নিজের অন্তরের টানকে প্রশমিত করতে পারলেন না। ইহুদি যুবকের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি। অথচ ইহুদী যুবকের কাছে তাঁর যাবার পথ চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। রেনেট অনেক ভেবেচিন্তে নিজেকে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বুঝতে পারলেন এভাবে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার ইতি টানাই শ্রেয়। এরকম দ্বিধা দ্বন্দ্বে রেনেট যখন ক্ষতবিক্ষত তখন তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবার মত কেউ তাঁর কাছে আসেনি। হিটলারকে তিনি

তাঁর দেহ সম্ভোগের সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু মুখে বললেও মনপ্রাণ সঁপে দিতে পারেননি।

রেনেট বুঝতে পারলেন বিপুলা বিশ্বের সুখভোগ তাঁর কপালে আর বেশিদিন জুটবে না। গেলীর ন্যায় রেনেটকেও খাঁচার পাখির মত বন্দী করে রাখলেন হিটলার। হিটলার ছাড়া রেনেটের আর কোন সঙ্গী সাথী নেই। তবে রেনেট নিজের জীবনের ইতি টানার আগে শেষবারের মত ইহুদী যুবকের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

ইহুদি যুবক সেই সময় মন্টিকার্লোতে অবস্থান করছে। রেনেটের চিন্তায় সেও কাতর। তবে রেনেটকে যে আর দেখতে পাবে না সে ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত। তাই ইহুদী যুবক আপন কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখে বেশি। রেনেটের সঙ্গে তার সুখমিলন স্মৃতি ধীরে ধীরে সে ভুলে যেতে চায়। সময় মানুষকে সব ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু রেনেটকে ত সময় তাঁর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে পারল না। তাই বলা যায় সব মানুষ ত সমান নয়। স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রী ভেদে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয়। গেলী ও রেনেটের জীবন এ ব্যতিক্রমের প্রকৃষ্ট উদাহারণ। এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ভুরিভুরি রয়েছে।

রেনেট সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আবার পালিয়ে গেলেন। গেলেন মান্টিকার্লোতে। ইহুদী যুবকের সঙ্গে শেষ বারের মত দেখা করার অদম্য অকাঙ্ক্ষায়। ত্নদিন মাত্র মান্টিকার্লোতে রেনেট ইহুদী যুবকের সঙ্গে কাটালেন। প্রিয়তমকে কাছে পেয়ে জীবনের সব কিছু উজাড় করে দিলেন। নিজে যে অচিরে মৃত্যুবরণ করে সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে চলেছেন তাও ইহুদী যুবককে জানিয়ে দিলেন। প্রিয়তমার মনের ব্যথা দূর করার ক্ষমতা ইহুদী যুবকের নেই। তাই তাকে তার প্রিয়তমার ভবিতব্যকে মেনে নিতে হল। ত্নদিন পর রেনেটকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাল ইহুদী যুবক।

প্রেমাস্পদের কাছ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিয়ে রেনেট ফিরে এলেন বার্লিনে। ঢুকে গেলেন নিজের কামরায়। হিটলারকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগ দিলেন না। হিটলার ভেবেছিলেন পরদিন রেনেটকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর এরকম মানাসিকতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করবেন। রেনেট কিন্তু হিটলারকে সে সুযোগ দিলেন না। ওদিনই মধ্যরাতে চারতলার কামরা থেকে লাফিয়ে পড়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

রেনেটের এরকম মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেন না হিটলারের হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোন রাস্তা তাঁর কাছে খোলা ছিল না। হিটলার রেনেটের প্রিয়তম ইহুদী যুবককে পরে খুন করেছিলেন কিনা সে কাহিনী জানা যায়নি। তবে লক্ষ-লক্ষ ইহুদী নিধনে হিটলার যেভাবে মেতে উঠেছিলেন রেনেট প্রিয়তম ইহুদী যুবক কি সে নিধন যজ্ঞ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল?

হিটলার রেনেটের মৃত্যুতে গভীর শোকে নিমজ্জিত হলেন। তিনটি বিনিদ্র রাত্রি যাপন

করলেন। মনের দুঃখে তিনি যেন জীবনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন। গোয়েবলস তাঁর একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগলেন। গেলীর মৃত্যুর পর যেমন বন্ধু হফম্যান তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াতেন। এবার স্বয়ং গোয়েবলস হিটলারকে গভীর শোক থেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এলেন।

ধীরে ধীরে হিটলারের মানসিক যন্ত্রণা প্রশমিত হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনজনের ব্যথা ভুলতে পারে বলেই সে বেঁচে থাকতে পারে এ সুন্দর পৃথিবীতে। শোক-তাপ, দুঃখ, প্রিয়জনের মৃত্যু অহরহ ঘটে চলেছে এ বিশ্বে। কারণে অকারণে আকস্মিকভাবে বিধির অমোঘ বিধানে মানুষ তার নিকট জনকে হারাচ্ছে। মানুষ যেন ভগবানের হাতের ক্রীড়নক। তাই তাকে বিধির বিধান বলে মেনে নিতে হচ্ছে।

হিটলার আবার জার্মানীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে লাগলেন। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে কিভাবে সারা বিশ্বের দরবারে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারেন সে গবেষণায় মন দিলেন। তবে ইহুদী জাতির ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা তাঁর ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। গোয়েবলস হিটলারের মানসিক অবসাদ কাটাবার জন্য নতুন নারীর খোঁজ করতে লাগলেন।

গোয়েবলস ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। এবার তিনি হিটলারকে উপহার দিলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন কয়েকবার। গোয়েবলস-পত্নী ছিলেন অপূর্ব রূপসী। কিন্তু গোয়েবলসের দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিশেষত গোয়েবলসের নতুন নতুন নারী না হলে চলে না—এটা তাঁর স্ত্রী ভালোভাবেই জানতেন। জেনি জুগো ছিলেন একজনা বিখ্যাত অভিনেত্রী। অনেকটা রেনেটের মতো। খুবই আকর্ষণীয়া মহিলা। গোয়েবলসের রক্ষিতা হিসেবে সে বহুদিন গোয়েবলসের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে নিশিযাপন করেছে। তা গোয়েবলস পত্নী জানতেন। কিন্তু কোন সময় আপত্তি করেননি বা স্বামীর সঙ্গে এ ব্যাপারে বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হননি।

গোয়েবলস পত্নী ভাবতেন স্বামী যখন তাঁকেও ভালবাসেন, আর তিনি একা যখন তাঁর দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে পারছেন না, তখন জেনি জুগো গোয়েবলসের রক্ষিতা হিসেবে থাকলে তাতে তাঁর আপত্তির কি আছে? থিয়েটারে, সিনেমায়, অভিনয়ে জেনি জুগো শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে বহু পুরস্কারও পেয়েছেন। সিনেমা-থিয়েটারে জেনি জুগো যেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমন স্বাক্ষর তিনি অনেক পুরুষের দেহ-মনেও রেখেছেন।

গোয়েবলস সুকৌশলে জেনি জুগোকে নিয়ে একদিন হিটলারের বেরস্টেসগ্যাডনের বাসভবনে এসে উপস্থিত হলেন। হিটলারের সঙ্গে একান্তে আলাপ করার সুযোগ করে দিলেন জেনি জুগোকে। হিটলার আবার নারীর মোহে আকৃষ্ট হলেন। বেশ কিছুদিন হিটলারের কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত করলেন জেনি জুগো। কিন্তু জেনি জুগোও হিটলারকে গেলী ও রেনেটের মতো বেশিদিন ভালবাসতে পারলেন না। মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে তিনি হিটলারকে কাছে পেতে চাননি। হিটলারের ঔদ্ধত্য হয়ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। হয়ত হিটলারের দৈহিক কোন ঘাটতি ছিল যার জন্য তিনি স্ত্রীলোককে

সন্তুষ্ট করতে পারতেন না। এটা অবশ্য কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন। Alan Bullock তাঁর Study in Tyrrany গ্রন্থে বলেছেন যে, "Putzi Hanfstangl, who Knew Hitler well in his Bavarian days and later, says plainly that he (Hitler) was impotent."

সবই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। তবে জেনি জুগো খুব অল্পদিনই হিটলারের কাছে ছিলেন। জেনি জুগোর মন অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলো। হিটলারের চোখে ধুলো দিয়ে অন্য কাকেও যে ভালোবাসা অসম্ভব তা জেনি জুগো ভালভাবেই জানতেন। তাই গেলী ও রেনেটের মতো আত্মহত্যা করে তিনিও হিটলারের অক্টোপাসের মতো বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম করুণাময় বিশ্বপিতার শ্রীচরণে আশ্রয় নিলেন। হিটলারের জীবনের তিনটি নারীই একইভাবে তাঁর হাত থেকে মুক্তি নিলেন। একের পর এক নারী হিটলারের জীবনে এসেছে, যেমন এসেছিল নেপোলিয়ানের জীবনে। কিন্তু একমাত্র ইভা ব্রাউন ছাড়া অন্য কোন নারী তাঁকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে ভালবাসতে পারেনি—যেমন যোসেফাইন ব্যতিরেকে আর কোন নারী নেপোলিয়ানকে গভীরভাবে ভালবাসা দিতে পারেনি।

একের পর এক নারী হিটলারের জীবনে এসেছে কিন্তু টিকেনি। হিটলার নারী বিবর্জিত জীবন কল্পনাও করতে পারেননি। গোয়েবলস প্রচারের জোরে হিটলারকে জার্মানবাসীর কাছে দেবতা করে তুলেছেন। হিটলার আদতে রক্ত-মাংসের মানুষ। অতএব শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া তাঁর দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার ক্ষমতা আর কারও থাকতে পারে না। জেনি জুগো হিটলারের জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পর তাঁর মানসিক যন্ত্রণা খুবই কঠোর হয়ে উঠেছিল। এবারও বন্ধু হফম্যান তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। গেলীর মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন হিটলারকে রক্ষা করেছিলেন হফম্যানই। এবারও হফম্যান হিটলারকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে তাঁর জীবনকে সুস্থির করে তুললেন। এবার গোয়েবলস আর সুযোগ পেলেন না প্রভুকে পরিতৃপ্ত করার।

হফম্যান হিটলারকে তাঁর ফটোগ্রাফিক দোকানে নিয়ে যেতেন। হিটলারের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটা শিল্পীমন বিরাজমান ছিল। হফম্যানের দোকানে ইভা ব্রাউন কাজ করতেন। ইভা ব্রাউন ছোটবেলা থেকে অংকন শিল্প ফটোগ্রাফির প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। হিটলার একদিন তাঁর দু'জন নাৎসী নেতাসহ হফম্যানের দোকানে এসে হাজির হন। দোকানে তখন ইভা ছিলেন কর্মরতা। ইভা হিটলারকে দেখে সৌজন্য প্রকাশ করে বসতে অনুরোধ করলেন। ইভার বাচনভঙ্গী ছিল অপূর্ব। কিছুক্ষণ পর হফম্যান এলে হিটলার ইভা সম্পর্কে জানার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করলেন। হফম্যানের সব কথা শুনে হিটলার ইভার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

ইভা অপূর্ব রূপসী ছিলেন এই কথা কেউ বলবে না, তবে তিনি ছিলেন খুবই আকর্ষণীয়া। বয়সের দিক থেকে ইভা ছিলেন ৩০-এর উর্দ্ধে। বলা যায় প্রায় ৩১ বছর বয়স ছিল তাঁর, যখন হিটলার তাঁকে প্রথম দেখেন। যে কোন রূপবান ও স্বাস্থ্যবান পুরুষকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা ইভার ছিল। তাঁর দেহ ছিল নিটোল। লম্বায় ছিলেন

৫´-৫´´। অপূর্ব শারীরিক গঠন ছিল তাঁর। চালচলন ছিল বীরত্বপূর্ণ। তাঁর চোখের চাহনিতে যে কোন সুদর্শন লোককে ভোলাবার মত প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। চোখমুখ ছিল প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত। চোখের মণি-দুটি যেন কাকেও আকর্ষণ করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। বক্ষযুগল ছিল সমুন্নত ও লোভনীয়। কোমরের মাপ ও পেছন দিকটা যেন বিশ্ব সুন্দরীদের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষকে আকর্ষণ করার প্রতিটি জিনিস যেন তাঁর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে চড়িয়ে রয়েছে।

তাঁর ছিল প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। কথাবার্তা খুব কমই বলতেন। হাবেভাবে মনে হতো কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। কিন্তু ইভা ব্রাউন ছিলেন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ফ্রিজ ব্রাউনের মধ্যম কন্যা। তাঁরা ছিলেন তিন বোন। সিম্বাকের এক সরাইখানায় বাস করতেন। হাতের কাজ করে তাঁর বাবা যা আয় করতেন তা দিয়ে দুঃখে-কষ্টে তাঁদের সংসার চলতো। ফটোগ্রাফির প্রতি ইভার আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই তাঁকে তাঁর বাবা হফম্যানের ফটোর দোকানে কাজ শিখতে দিয়েছিলেন। সেখানে অতীব মনোযোগের সঙ্গে ইভা কাজ করতেন।

হফম্যানের দোকানে হিটলারের আগমনে ইভার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। হিটলার ইভার অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হলেন। হিটলারের মনে দোলা লাগল। ইভাও হিটলারের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য মনে মনে স্থির করলেন। হিটলারকে বিয়ে করার এক উদগ্র বাসনা তাঁর মনকে আলোড়িত করল। "She told her friends that Hitler was in love with her and that she would make him marry."

—Alan Bullock

ইভা ছিলেন হিটলারের অবসর সময়ের কথা বলার সঙ্গী। হিটলার যখন ঘরে বিশ্রামরত সেই সময় ইভা তাঁর ঘরে চলে যেতেন। সুযোগ বুঝে হফ্‌ম্যান ইভাকে বর্লিন চ্যান্সেলারীতে নিয়ে যেতেন। হিটলার সুযোগ মতো সকলের অলক্ষ্যে ইভার সঙ্গে প্রেমপাগল যুবকের মত গল্পগুজব করতেন। হিটলারের সঙ্গে ইভার এরকম সম্পর্ক হিটলারের বোন Frau Raubal সহ্য করতে পারতেন না। ফ্রাউ রাউবেল ছিলেন গেলীর মা।

গেলীর মৃত্যুর পর ফ্রাউ রাউবেল ভেবেছিলেন হিটলার আর কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। তা ত' হলোই না বরঞ্চ হিটলার ইভার সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হলেন। ফ্রাউ রাউবেল অনেক চেষ্টা করেছিলেন হিটলার আর ইভার সম্পর্কে চিড় ধরাতে। কিন্তু তা তিনি পারেন নি। স্বামীর মৃত্যুর পর ফ্রাউ রাউবেল হিটলারের কাছেই থাকতেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রাউ রাউবেল জার্মানী ছেড়ে চলে যান। ইভা তখন খানিক স্বস্তি পেলেন মনে।

কিন্তু গোয়েবলস ইভাকে সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষত ইভাকে গোয়েবলস হিটলারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেননি। তাই প্রভুর কৃপালাভ করার সৌভাগ্য এবার

তাঁর কপালে জুটেনি। আর ইভা ছিলেন প্রচণ্ড রকমের দাম্ভিক। তিনি প্রথম প্রথম গোয়েবলসকে মোটেই আমল দিতেন না। একমাত্র রিবেনট্রপ ব্যতিরেকে তিনি কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন না।

ইভা বেশির ভাগ সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেন। ইভা থাকতেন হিটলারের মিউনিকের ফ্ল্যাটে। হিটলার প্রয়োজনবোধে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। কোন কোন সময় ইভা হিটলারের বেরস্টেসগ্যাডনের বাসভবনে বাস করতেন। হিটলারকে ইভা গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু গোয়েবলস ইভার ওপর প্রতিশোধ নেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এক অশুভ মুহূর্ত্তে।

বার্লিনে হিটলার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিয়ে গোয়েবলস এক ভোজনসভার আয়োজন করলেন। ইভাকেও আমন্ত্রণ জানানো হলো। ইভা আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য যথাসময়ে ভোজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। এলেন হিটলার। এলেন গোয়েরিঙ, রিবেনট্রপ, নিউরথ, বোরম্যান প্রমুখ নাৎসী নেতারা। ইভা ভোজসভায় একপাশে গিয়ে বসে রইলেন স্নিগ্ধ শান্ত অথচ গম্ভীর মুখে। হিটলারের সঙ্গে জনসমক্ষে তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাই বলতেন না।

গোয়েবলস ভোজসভায় প্রবেশ করে ইভাকে নির্দেশ করে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন যে এখানে এখন একজনা মহিলা আছেন যাঁর দেহে ইহুদী রক্ত প্রবাহিত। ইভা সম্পর্কে আরও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা গোয়েবলসের কথার মধ্যে ফুটে উঠলো। ইভা গোয়েবলসের মনোভাব বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করলেন না। কয়েকবার শুধু হিটলারের দিকে অর্থপূর্ণ নয়নে তাকালেন। হিটলার কি বুঝলেন জানি না তবে গোয়েবলসকে সংযত হতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন ইভা সম্পর্কে সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে।

ইভা কি সত্যি ইহুদী বংশজাত? এই প্রশ্ন হিটলারের মনে জাগল। এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করা হল। তদন্তে তার উল্টোটাই উদ্‌ঘাটিত হল। প্রমাণিত হল ইভার ধমনীতে আর্য রক্ত প্রবাহিত। হিটলার ক্ষুব্ধ হলেন। গোয়েবলসকে ইভা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের জন্য কৈফিয়ত তলব করলেন।

গোয়েবলসের অবস্থা তখন কে দেখে? যেন তাঁর হৃৎপিণ্ড বিদারিত হচ্ছে। ভয়ে অর্ধমৃত গোয়েবলস হিটলারের কাছে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন। ইভাকে চিঠি পাঠালেন মার্জনা ভিক্ষা করে। ইভা ক্ষমা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

বার্লিনের পত্রপত্রিকায় ইভা প্রশস্তিতে ভরে উঠল। ইভাকে নিয়ে হিটলার প্রফুল্ল চিত্তে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। হিটলার ইভাকে বার্লিনে আসার বিশেষ সুযোগ দিতেন না। কিম্বা প্রকাশ্য জনসমাবেশে তিনি হিটলারের সঙ্গী হিসেবে ঘুরে বেড়াতে পারতেন না। প্রথম প্রথম বড় ভোজসভায় যখন হিটলার তাঁর পারিষদসমূহ একত্র হতেন ইভার সেখানে থাকার অনুমতি মিলতো না। একাকীত্বই ছিল ইভার বেশির ভাগ সময়ের সঙ্গী।

ইভা ব্রাউনের বোন গ্রেটেলের (Gretl) সঙ্গে হিমলারের একান্ত সচিব ফ্যাগেলিন (Fegelein) এর বিয়ে হয়। বোনের বিয়ের পর থেকে ইভা বাইরে বেরোবার সুযোগ পেলেন। ইভা বাইরের লোকের কাছে নিজের পরিচয় দিতেন ফ্রাউ ফ্যাগেলিনের বোন বলে। যাতে হিটলারের জীবনের ওপর কোন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। ইভা জীবনে কিছুই ত' পাননি। শুধু মৃত্যুর পূর্বে হিটলার তাঁকে বৈধ স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—এ পর্যন্তই। অথচ তিনি হিটলারকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। তাঁর ভালবাসার মধ্যে এতই গভীরতা ছিল যে হিটলারের নির্দেশে তিনি প্রায় ১২টি বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে গেছেন। কেবলমাত্র হিটলার ভিন্ন আর কারও সঙ্গে তাঁর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হতো না।

হিটলার গেলী, রেনেট ও জেনি জুগোর ওপর এই শর্ত আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ হিটলারের খাঁচার পাখীর মতন জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে চাননি, আবার হিটলারের নির্দেশ অমান্য করে অন্যত্র সরে যাবার কথাও ভাবতে পারেনি। তাই আত্মহত্যা করে তাঁরা তাঁদের জীবনের সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

ইভা কিন্তু হিটলারের সব নির্দেশই মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন। ইভা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল বীভৎস জিনিস। খেলাধূলা, পড়াশুনা, ফটোগ্রাফি শিক্ষা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তাঁর ছোটবেলার জীবন কেটেছে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সাঁতারু। তিনি সিনেমা দেখতে ভালবাসতেন। সেক্স-ভায়োলেন্সের ওপর ছবি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি বেরস্টেসগ্যাডনে বেশির ভাগ সময় থাকতেন। সেখানে সিনেমার জন্য হলঘরও ছিল। তিনি ও হিটলার একত্রে বসে অপূর্ব সব ছবি দেখতেন সেখানে।

হিটলারের একান্ত আপনজন হবার জন্য হিটলারের কাছে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অনেক সময় বিনা কারণে হিটলারের দ্বারা তিনি নির্যাতীতও হয়েছেন তথাপি হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। তবে একটা ভয় তাঁর মধ্যে ছিল। হিটলার যদি অন্য কোন নারীতে আসক্ত হয়ে তাঁকে অবহেলা করেন তা হলে তাঁর কি অবস্থা হবে?

হিটলার কোন সময় দু' তিন সপ্তাহ পর পর ইভার কাছে আসতেন। তখন তিনি ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন হিটলার অন্য কোন নারীতে আকৃষ্ট হলেন কিনা এই ভেবে। তাই তিনি হিটলারের কাছে স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি পেতে চাইছিলেন অতি শীঘ্রই। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না কোনক্রমে। কেন না হিটলার ইভাকে স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দিতে তখনো কোন সিদ্ধান্ত নেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে হিটলার যুদ্ধের নানান ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশি। সমাজ জীবন থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেন। এ সময়ে ইভা অনেকটা স্বস্তি বোধ করছিলেন এই ভেবে যে হিটলার এখন আর কোন নারীতে আকৃষ্ট হবার সুযোগ পাবেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে হিটলার খুব বেশি ইভার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতেন না। আর ইভারও বার্লিন চ্যান্সেলারীতে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা

করা নিষেধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইভা বেরস্টেসগ্যাডনের বিশাল রাজভবনে একাকীই কাটাতেন বেশি সময়।

তবে এক এক সময় হিটলার ইভার টানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন অনেক জরুরী কাজের মধ্যেও। ইভা ব্রাউন হিটলারের এ ভালবাসা আদায় করেছিলেন হিটলারের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জোরে। ইভা এরকম গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসার জোরে হিটলারকে শেষ পর্যন্ত জয় করে নিলেন। মৃত্যুর কিছু সময় আগে ইভাকে হিটলার তাঁর স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। Alan Bullock যথার্থই বলেছেন, "Before that Hitler always refused to discuss marriage on the grounds that it would be a hindrance to his career."

হিটলার জীবনে অনেক নারীর সান্নিধ্যে এসেছেন। আসক্ত হয়েছেন অনেক নারীতে। দৈহিক সুখ তিনি আদায় করেছিলেন অনেক নারীর কাছ থেকে। কিন্তু ইভা ব্যতিরেকে অন্য কোন নারী তাঁকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে ভালবাসতে পারেননি। ইভার অন্তরের গভীর অনুভূতি হিটলারকে তাঁর ধ্যানের দেবতা করে তুলেছিল। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় হিটলারের অসহায় অবস্থা ইভাকে শোকে মুহ্যমান করে তুলেছিল। দিনরাত অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানের কাছে হিটলারের মঙ্গল কামনা করতেন তিনি।

নেপোলিয়ানের প্রথমা পত্নী যোসেফাইনের সঙ্গে ইভার চারিত্রিক দিক থেকে অনেক সাদৃশ্য ছিল। ইভা যেমন হিটলারের শেষ পরিণতি কি হবে বুঝতে পেরে পাগলিনীপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, যোসেফাইনও নেপোলিয়ানের পতনের পর ঘোর মানসিক কষ্টে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের চিন্তায় হতাশাজনিত বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে (অনেক রোগভোগের পর) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরশান্তি লাভ করলেন। আর ইভা ও হিটলার স্বামী-স্ত্রীরূপে দু'জনই আত্মহনন করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন যখন বুঝতে পারলেন এ ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন উপায় নেই।

স্তালিন ও হিটলার

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২। নরওয়ের ফ্রিডম টু পাবলিশ কমিটির চেয়ারম্যান সিগমুণ্ড স্ট্রমে কলকাতায় এসেছিলেন পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড আয়োজিত বইমেলার অশোককুমার স্মৃতি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। স্ট্রমে ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী মানুষ।

পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড আয়োজিত বইমেলায় অশোককুমার স্মৃতি বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'প্রকাশনা ও গণতন্ত্রের স্বাধীনতা'। স্ট্রমে তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশের একনায়কদের নিষ্ঠুর মানসিকতার কথা তুলে ধরেছেন সর্বসমক্ষে। তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন দেশের একনায়কগণ মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। তাঁদের মতামতকে গলা টিপে করেছে হত্যা।

তাঁর বক্তৃতায় ছিল অত্যন্ত দুঃখজনিত কঠোর ভাষা। স্তালিন কিভাবে রাশিয়ায় অত্যাচার চালিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট একটা দিক তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য আগত উপস্থিত সুধীবৃন্দ এর কোন প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। স্ট্রমের বক্তব্যকে কটু হলেও সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্ট্রমে বলেছেন যে, "কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিকদের কে না ভয় পায় ? অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী এঁদের লেখনীর কাছে জব্দ।" কেন না এঁদের লেখনী অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে গদিচ্যুত করতে সক্ষম। স্ট্রমে বলেছেন যে, "রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন), দক্ষিণ-আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় যে রাজনৈতিক পালাবদল অবিশ্বাস্য গতিতে ঘটে গেল তাতে পরিস্থিতির খুব একটা রদবদল হয়নি। তবে একথা অনস্বীকার্য রাশিয়ায় বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে অত্যাচারী হিসেবে শ্রেষ্ঠ যোসেফ স্তালিনের আমলে দু কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ রবার্ট কনকোয়েস্ট নরহত্যার এ হিসেব দিয়েছেন।"

রাশিয়ায় স্তালিনের সময় সংবাদপত্রে বা অন্য কোন লেখায় স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। যাঁরা স্তালিনের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেননি তাঁদের যেতে হয়েছে কারাগারে। তাঁদের লেখনীকে করে দিয়েছিল স্তব্ধ। তাঁদের আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনচেতা মানুষকে থাকতে হয়েছে শ্রমিক শিবিরে বা পাগলা গারদে।

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসন, ভিৎকেভিচ, কে. সিমোনিয়ান্তস প্রমুখ সুধীজনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা অনেকের জানা। কবি ইউসিপ মাণ্ডেলস্তাম, গল্পকার ইসাক বাবেল, অভিনেতা-নাট্যকর ভসভিলোভ প্রমুখ সুধীজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের বন্দীশিবিরে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য। বরিস পাস্তেরনাক, পাউস্তভস্কির মতো বিশ্ববিশ্রুত লেখক স্তালিনের কাছে আত্মসমর্পণ করে কোনরকমে প্রাণে বাঁচলেন। স্তালিনের অত্যাচারে কত লেখক-শিল্পী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রখ্যাত লেখক ও মনীষী ইয়েসেনিন ও মায়কোভস্কি আত্মহনন করে স্তালিনের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেলেন।

স্তালিন ভালোভালেই জানতেন জনসাধারণের বিদ্রোহী সত্তাকে জাগ্রত করার ক্ষমতা রাখে লেখনী। এই পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য স্তালিন লেখকদের কণ্ঠরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সলঝেনিৎসন যথার্থই বলেছেন যে স্তালিন স্বেচ্ছাচারী জারের মত শক্তিধর লেখককে ভয় করতেন। কেন না স্তালিন জানতেন শক্তিধর লেখকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে সমান্তরাল সরকার।

প্রকাশনা বন্ধের জরুরি নির্দেশ থেকে শ্রমশিবিরে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্নস্তরে বিভিন্নভাবে লেখক নির্যাতন চলেছে জারের আমল থেকে। পুশকিন থেকে সলঝেনিৎসন পর্যন্ত কোন লেখক এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি। তবুও বলতে হবে রুশ সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জারতন্ত্রকে উপেক্ষা করে পুশকিনের জীবিতকালেই। তলস্তয়, গোর্কি, দস্তয়ভস্কি প্রমুখ মনীষী

লেখকদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্য, নেক্রাসভ আলেক্সাণ্ডার ব্লকের কাব্যসম্পদ গড়ে উঠেছিল জারতন্ত্রের উৎপীড়নের মধ্যে। জারের ষড়যন্ত্রে পুশকিন নির্বাসিত হলেন, দণ্ডিত হলেন মৃত্যুদণ্ডে। সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে নির্বাসিত হলেন দস্তয়ভস্কি। গোর্কি হলেন কারারুদ্ধ। ঋষিতুল্য তলস্তয়কে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

লেনিনের যুগে লেখক শিল্পীরা খানিকটা হয়ত স্বস্তি পেয়েছিলেন। তবে তলস্তয় ও গোর্কির সঙ্গে লেনিনের মানসিক সংঘাত ছিল। সে যাই হোক স্তালিনের যুগে নেমে আসে আরও সুদৃঢ়, সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত নির্যাতন লেখক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের ওপর। লেখক, শিল্পী, কবি ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের এবং কুলাকদের খুনের রক্তে স্তালিনের হাত রঞ্জিত হল। লৌহ যবনিকার সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে তদানীন্তনকালে এসব খবর আমাদের দেশে বিশেষ এসে পৌঁছাত না। স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভের আমল থেকে স্তালিনের অত্যাচার কাহিনী জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। আর গর্বাচেভের আমলে এ সমস্ত কাহিনী লোকের ঘরে ঘরে প্রচারিত হতে থাকে।

রাশিয়া এখন বিভিন্ন স্বতন্ত্ররাজ্যে বিভক্ত। কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট ষ্টেটস্ নামে পূর্বতন রাশিয়া এখন পরিচিত। সলঝেনিৎসন, বরিস পাস্তারনেক, নেক্রাসভ, ব্রডস্কি প্রমুখ লেখকদের নিষিদ্ধ বই এখন সেখানকার পুস্তকবিপনিতে অনায়াসে পাওয়া যায়। কম্যুনিস্ট শাসনের নাগপাশ থেকে এখন তারা মুক্ত। তবুও যেন কোথাও কোথাও তারা বাধা অনুভব করে। তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীন মতামতকে এখন আর কেউ হয়ত স্তব্ধ করছে না। তাই স্তালিন যুগের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী নূতন লেখকদের হাত থেকে বের হয়ে আসছে। সেখানকার জনগণ অধীর আগ্রহে এ সমস্ত জানার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মনে হয় মানুষের মনে চেতনা সৃষ্টি করার সুমহান দায়িত্ব আজ সেখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর ন্যস্ত।

স্তালিন বুদ্ধিজীবীদের ও অন্যান্য সন্দেহভাজন লোকদের কণ্ঠরোধ করে নিজের এক-নায়কতন্ত্রকে নির্দিষ্টপথে চালিত করেছেন। অসংখ্য বেদনাদায়ক মৃত্যু ও ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে তাঁর শাসনের রথ চালিয়েছেন। অসহায় রুশ জনগণ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন ভয়ে, ত্রাসে। তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা সামান্যতম প্রতিবাদ করেছেন তাঁদেরই তিনি নিষ্ঠুর হাতে খুন করেছেন, না হয় বছরের পর বছর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

স্তালিন ও হিটলারের মধ্যে এখানেই গভীর মিল রয়েছে। দু'জনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হিসেবের তুলনামূলক সমালোচনা করলে কার স্থান প্রথম হবে তা বলা মুস্কিল।

হিটলার পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করলেন ১৯৩৩ সালে। প্রেসিডেন্ট ফন হিণ্ডেনবার্গের হাত থেকে হিটলার নতুন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হিটলার হলেন রাইখ চ্যান্সেলার। প্রভুত্ব কায়েম করল ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট পার্টি বা নাৎসী পার্টি। এ পার্টির কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। যে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হল এই পার্টির কর্তৃত্ব জার্মানীতে।

বাহ্যত ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট পার্টি জাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তা বলে প্রতীয়মান হলেও

এ পার্টির কাজ কারবার ছিল মূলত স্বাধীনতা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। স্তালিনের ন্যায় হিটলারও নাৎসী পার্টির বিরুদ্ধে মতাবলম্বীদের ওপর দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন। জার্মানীর হাজার হাজার সুধীজন হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর নির্দেশে বন্দী হলেন, অনেকেই মৃত্যুভয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন, অনেককেই বন্দী হয়ে যেতে হল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, অনেকেই আত্মহনন করে হিটলারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, কেউ হলেন নিহত। ১৯৩৩-১৯৪৩ সালের মধ্যে অসংখ্য গুণীজন জার্মানী ছেড়ে বিদেশে পালালেন। বিদেশে তাঁরাই জার্মান সংস্কৃতির গৌরবশিখা প্রজ্জ্বলিত করলেন। বিদেশে জার্মান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেন তাঁরা।

ন্যাশনাল সোস্যালিজমের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের লেখা বই পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন হিটলার ও তাঁর গেস্টাপো নেতারা। সঙ্গে জুটল ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট মতাবলম্বী বার্লিন ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রের দল। তাঁরা জনসমক্ষে বিরোধী লেখকদের এবং ইহুদীদের লেখা লক্ষ লক্ষ বই পুড়িয়ে ফেললেন। অনেক সাহিত্যিকের লেখা জার্মানীতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এ সমস্ত লেখকদের অন্যতম হলেন টমাস-ম্যান ও তাঁর ভাই হাইনরিশ ম্যান, বেরটল্ট ব্রেশট্, আলফ্রেড ডোয়েবলিন, রবার্ট মুসিল, এরিয়া মারিয়া রেমার্ক প্রমুখ। বিশ্ব সংস্কৃতির পীঠস্থান ভাইমারের উপকণ্ঠে হিটলার স্থাপন করলেন কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বুখেনভাল্ড।

যে সমস্ত অধ্যাপক ও অন্যান্য গুণীজন ভাইমার সাধারণতন্ত্রের পতনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা এখন বুঝতে পারলেন হিটলার জার্মানীর সুস্থ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। স্তালিনের ন্যায় হিটলারও বুদ্ধিজীবীদের ভয়ের চোখে দেখতেন। প্রচণ্ড রকমের অবিশ্বাস করতেন। বুদ্ধিজীবীদের বাদ দিয়ে যে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয় তা যে তিনি বুঝতেন না তা নয়। তাই তিনি গোড়াতে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের অনেকের সমর্থন তিনি প্রথম দিকে পেয়েছিলেন, যার বলে বলীয়ান হয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন জার্মানীর। ধীরে ধীরে তিনি বুদ্ধিজীবীদের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। পাছে তাঁরা ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে এবং জনসাধারণের মনকে তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলে এ ভয়ে।

তাঁর সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বের্নহার্ড রাস্ট। হিটলার তাঁর ক্ষমতা খর্ব করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। এ ভার অর্পণ করলেন দলীয় নেতার ওপর। এদের অত্যাচারে ইহুদী অধ্যাপকরা জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিম্নমুখী হতে লাগল। জার্মান, বার্লিন ও গটিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অনেক বিজ্ঞানীই বিদেশে পাড়ি দিলেন মৃত্যুভয়ে। জার্মানীর এর জন্য প্রভূত ক্ষতি হল। নীলবোর, অটো হান, ম্যাকস প্লাংক, আইনেষ্টাইন প্রমুখ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিজ্ঞানীরা বিদেশে পাড়ি দিলেন। বিশেষত তাঁরা ছুটে গেলেন আমেরিকায়। এর ফলে জার্মানী যেমন বঞ্চিত হল এ সমস্ত গুণী বিজ্ঞানীদের অবদান থেকে অন্যদিকে অন্যান্য দেশ বিশেষত আমেরিকা এঁদের স্থান দিয়ে প্রভূত লাভবান হল। এ সমস্ত বিজ্ঞানীরা কিন্তু

রাশিয়াতেও আশ্রয় চেয়েছিলেন কিন্তু সন্দিগ্ধ স্তালিন এঁদের রাশিয়ায় স্থান দিতে রাজী হলেন না।

এখন থেকে জার্মানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র ভর্তি করার অধিকার ন্যস্ত হল নাৎসী যুব দলের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাৎসী যুব দলের নেতা ছিলেন বালডুর ফন্ শিরাখ। শিরাখ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। শিরাখ এমন ব্যবস্থা করলেন যে বিদ্যালয়ের ভাল ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ব্যাপারে আর মাপকাঠি রইল না। জার্মান ছাত্রছাত্রীদের মেধা নয় নাৎসীদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্কই জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্রধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত হতে লাগল। নাৎসী দলের কার্যকলাপ যারা সুষ্ঠু মনে করল না বা যারা নাৎসী পার্টির সমালোচনা করতে লাগল তাদের যতই মেধা থাকুক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়ে যেতে লাগল। জার্মান ছাত্রদের চেয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফল করতে লাগল।

স্তালিন যেমন বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ প্রভৃতি যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁদের গুলাগ, জেক, কারাগাণ্ডা, ভরকুটা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে পলে পলে দগ্ধ করেছেন, হিটলারও ঠিক একই পন্থা অবলম্বন করে তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের বিশেষত ইহুদীদের আউসউৎস, মেভানেক, ট্রেবালিংকা, ডাচাউ প্রভৃতি বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে তাদের ওপর চালিয়েছেন বর্বর অত্যাচার।

অত্যাচার চালাবার দিক থেকে দু'জনই একই পথের পথিক। মনে হয় তাঁদের ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য এবং বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস করার জন্য বজ্রকঠিন সংকল্প করেই তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। রবার্ট কনকোয়েস্ট-এর ভাষায় যদি স্তালিন রাশিয়ায় দু কোটি লোককে খুন করে থাকেন তাহলে হিটলার অন্তত এক কোটি লোককে খুন করেছিলেন। তার মধ্যে অবশ্য ইহুদীদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

হিটলার বা স্তালিন কেউ কিন্তু জোর করে ক্ষমতা দখল করেননি। তাঁরা দু'জনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিলেন সুকৌশলে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে। তাঁদের সহজাত বুদ্ধি কৌশলে তাঁরা জনচিত্ত জয় করেছিলেন। স্তালিন ছিলেন জর্জিয়ার অধিবাসী আর হিটলার অস্ট্রীয়ার। তাই স্তালিন ছিলেন রাশিয়ায় ভিনদেশী এবং হিটলারও তাই ছিলেন জার্মানীতে।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়া জারের শাসন থেকে মুক্ত হল। কিন্তু রাশিয়া তখন দেউলিয়া। অর্থ নেই, চাষবাস নেই, শস্য নেই, নেই কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি। অভাবে ঘোড়া ভেড়া যা ছিল মানুষের বাড়িতে তাও গেল মারা। সাত বছরের যুদ্ধে চাষীদের যন্ত্রপাতি সব খোয়া গেল।

১৯২০-২১ সাল। মহামারির আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল দেশে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। চাষীর ছেলেদের পেটে অন্ন নেই। গায়ে জামা নেই। পরনে কাপড় নেই। অনাহারে মারা পড়তে লাগল ছেলে, বৃদ্ধ, নর-নারী, শিশু পুত্র-কন্যা। অনাহারে জীর্ণ শরীরে বিনা বস্ত্রে শীতক্লিষ্ট অগণিত লোক প্রাণ বিসর্জন দিল। কে কাকে

দেখে। লেনিন তাঁর নেপ বা নিউ ইকনমিক পলিসি প্রবর্তন করে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটাবার প্রয়াস চালালেন। সমাজতান্ত্রিক সমবায় ব্যবস্থা চালু করলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেও লেনিন সাদর আহ্বান জানালেন।

রাষ্ট্রের হাতে রইল খনি, রেলপথ আর ভারীশিল্প। এ সবের অবস্থাও তখন খুবই খারাপ ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় রইল ছোট ও মাঝারি শিল্প, দোকান পাট ইত্যাদি। নিউ ইকনমিক পলিসি রাশিয়ার অর্থনীতিকে কিছুটা স্বস্থির করল।

১৯২৪ সাল। লেনিনের মৃত্যু ঘটল। দেশের অর্থনীতির রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল না। যদিও বা দেশের শ্রীবৃদ্ধিমানসে রুশ শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের অভাব ছিল না।

শ্রমিকরা খাদ্য ছাড়া অন্য কোন মজুরি পেত না। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেশে নতুন নতুন কলকারখানা ও দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের পথ সুগম করল। ক্ষমশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় অংশই ছিল পুঁজিতন্ত্রী।

চাষবাস ছিল ছোট ছোট মালিকদের হাতে। এদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। মোটামুটি ধনী। এরা কুলাক নামে পরিচিত ছিল। রাষ্ট্রের সম্পদ ছলে বলে কৌশলে এরা করায়ত্ত করত এবং ছোট চাষীদের ঠকিয়ে এরা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হতো। লেনিন বুঝতে পারলেন এভাবে চললে পুঁজিতন্ত্রই আর্থিক ভিত্তি বজায় রাখবে, সমাজতন্ত্র নয়। লেনিন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য পুঁজিতন্ত্রকে তিনি বাদ দিতে পারলেন না। তবে লেনিন ও তাঁর অনুগামীদের লক্ষ্য ছিল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া ভেবেছিল যে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত জার্মানীতে বিপ্লব ঘটবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। রুশ শ্রমিকদের চেয়ে জার্মান শ্রমিকরা ছিল অনেক বেশী কর্মঠ, বুদ্ধিমান, কর্মে নিপুণ। জার্মান শ্রমিকরা ইউরোপে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এ ধারণা লেনিনেরও ছিল। ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২০ ও ১৯২৩ সালে জার্মানীতে এ বিপ্লব আসন্ন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু জার্মানীতে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। শুধু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আর স্তালিনের অনীহার জন্য।

১৯২৩ সালে স্তালিনের প্ররোচনায় জার্মানীতে কম্যুনিস্টরা ভাইমার সাধারণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায়। স্তালিন তখন রুশ কমুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। লেনিন জীবিত, তবে অসুস্থ। স্তালিন কম্যুনিস্টদের দ্বারা জার্মান সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে চুপচাপ ছিলেন। জার্মান সাধারণতন্ত্রের উৎখাত করে কম্যুনিস্টরা জার্মানীর শাসনভার গ্রহণ করুক স্তালিন তা চাইতেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে জার্মানীতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন রাশিয়ার পক্ষে সুবিধেজনক হবে, তবে কম্যুনিস্ট শাসন নয়।

স্তালিন চীনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ চালিয়ে যাক এটাও ছিল চীনা কম্যুনিস্ট

পার্টির কাছে স্তালিনের গোপন নির্দেশ। যাতে রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য স্তালিনের এই নির্দেশ ভবিষ্যতে জার্মানী ও চীনে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। A. J. P. Taylor তাই বলেছেন, "In 1923, when Stalin was only mounting to power, the German communists were ordered into rebellion in Humburg, not in order to win a victory in Germany but solely to make things easier for Russia. Similarly, the Chinese Communists were ordered to work with Chiang Kaishek so as to make Russia more secure in the far East ; and this brought them almost to destruction in 1927. Both these were great blunders."

রাশিয়া বিদেশের সাহায্য ব্যতিরেকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে পারবে কি না লেনিনের জীবিত কালে এটা নিয়ে তেমন জোর চিন্তা ভাবনা হয়নি। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর এ প্রশ্ন উঠল। স্তালিন তখন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। অনেক বলশেভিক নেতাও মতামত প্রকাশ করলেন যে বিদেশের প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। স্তালিনও অবশ্য প্রথমে এরকম মত পোষণ করতেন। পরে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিন তাঁর মত পরিবর্তন করেন। বিশেষত ট্রটস্কির মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মত পাল্টান। স্তালিনকে কিন্তু বিদেশের প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়েছিল—মুখে সে যতই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করুক না কেন।

স্তালিন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন সোভিয়েত রাশিয়া নিজ দেশের শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করে দেশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়তে সক্ষম। বিদেশের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবুও স্তালিনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না বলা যায় না। স্তালিন তত্ত্ববিশারদ ছিলেন না। তবে দেশের লোকের নাড়ী বোঝার তাঁর ক্ষমতা ছিল। দেশের লোকের অন্তরের কথা তিনি প্রকাশ করলেন। তিনি কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করলেন না।

স্তালিন ছিলেন দক্ষ সংগঠক। পার্টির সাধারণ সম্পাদক। রুশরা বিপ্লবের পর সাত বছর রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। অতএব বিদেশের শ্রমিকদের সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের দেশের কৃষি-শিল্প ইত্যাদির উন্নতি ঘটানো যাবে না তা রুশরা বিশ্বাস করত না। স্তালিন ঘোষণা করলেন রুশ শ্রমিক, কৃষক সকলেই দেশ গড়ার ক্ষমতা রাখে। স্তালিন রুশদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করলেন। স্তালিন যাই বলুক না কেন তাঁকে বিদেশের প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। দেশের শিল্প সংস্থায় বহু আমেরিকান ইন্জিনীয়ার ও অন্যান্য দেশের প্রযুক্তিবিদরা নিযুক্ত হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাতে কাজ করতে যাতে দেশের শ্রমিকদের সুবিধে হয় তার জন্য স্তালিন বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিয়ে রুশ শ্রমিক, ইন্জিনীয়ারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

জিনোভিয়েভ ও কমেনেভ ছিলেন রাশিয়ার দুই তাত্ত্বিক নেতা। ১৯২৫ সাল।

পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন তাঁর প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। তার জন্য স্তালিনকে বেগ পেতে হয়নি। স্তালিনের প্রস্তাব জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁরা বললেন মার্ক্সীয় আন্তর্জাতিকতার জায়গায় স্তালিন জাতীয় সাম্যবাদ প্রবর্তন করতে চলেছেন। ট্রটস্কি স্তালিনের প্রস্তাবের সমালোচনা করলেন। কিন্তু স্তালিন পার্টির অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করলেন।

স্তালিন ছিলেন জর্জিয়ার অধিবাসী, ককেশাস প্রদেশের লোক। রুশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ এক প্রজাতন্ত্রী দেশের লোক। যেমন নেপোলিয়ান ছিলেন ফ্রান্সের অধীনস্থ কর্সিকার অধিবাসী আর হিটলার ছিলেন অস্ট্রীয়ান।

স্তালিনের বাবার নাম বেসো যুগশাভিলি (Beso Dzhugashvili) আর মার নাম একতেরিনা যুগশাভিলি (Ekaterina Gheladze Dzhugashvili)। স্তালিনের বাবা জাতিতে ছিলেন মুচি। কোন অভিজাত ভূস্বামীর ঘরে স্তালিনের বাবার জন্ম। মাও ছিলেন জর্জিয়ার এক ক্রীতদাসের সন্তান। বিয়ের পর সংসারের আর্থিক দৈন্য নিরসনের জন্য তিনি ধোবার কাজ করতেন, কোন কোন সময় দর্জির কাজ করেও অর্থ রোজগার করতেন। স্তালিনের জন্মের পর একতেরিনা মনে প্রাণে যীশুর কাছে প্রার্থনা জানাতেন যাতে ছেলে একজন ধর্মযাজক হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। একতেরিনা রুশ ভাষায় কথাও বলতে পারতেন না। স্তালিন রাশিয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। রাশিয়ার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও মা কিন্তু ককেশাস ছেড়ে আসেননি বা রুশ ভাষা শেখার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। "Ekaterina never learned to speak Russian, and even after her son's rise to power, she had no desire to leave her home in the Caucasus"—David Wallechinsky.

স্তালিনের আসল নাম যুগশাভিলি। ১৯১৩ সালে জারের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তখন তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাঁর ছদ্মনাম জোসেফ ভিসারিনোভিচ স্তালিন। জর্জিয়ার গোরি নামক স্থানে তাঁর জন্ম। স্তালিন ছিলেন এক নির্যাতিত দেশের সন্তান। এদিক থেকে তিনি ছিলেন অধিকাংশ বলশেভিক নেতা থেকে স্বতন্ত্র।

নয় বছর বয়সে মায়ের ইচ্ছেতে তাঁকে এক ধর্মীয় পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ পাঠশালার ছোটজাতের ছেলেদের পড়াশুনার সুযোগ ছিল না। পাঠশালার শিক্ষকরা স্তালিনের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেলেন। তবে তাঁরা এটাও বুঝতে পারলেন যে স্তালিনের অন্যের ওপর খবরদারি করার মানসিকতা প্রবল। শিক্ষকরা তাঁকে স্থানীয় পাদ্রীর কাছে পাঠালেন। পাদ্রীমশাই স্তালিনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ছাত্রবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। ধর্মীয় পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে তাঁকে তিফলিসের ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। সে ১৮৯৪ সালের কথা। তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। এই বিদ্যালয়ের কাজ ছিল জর্জিয়ানদের রুশীয় ভাবাপন্ন করার জন্য শিক্ষা দেওয়া ও মানসিকতা গড়ে তোলা।

কঠোর শাসনে স্তালিন বাঁধা পড়লেন। ছাত্রদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারেও শিক্ষকরা নজর রাখতেন। অধর্মীয় বই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হত না। কিন্তু স্তালিনের জানার আগ্রহ ছিল অপরিসীম আর ভিক্টর হুগো ছিল তাঁর প্রিয় লেখক। লা মিজারেবল ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। লা মিজারেবল এবং মার্ক্সীয় দর্শন সংক্রান্ত বই পড়তে গিয়ে স্তালিন পাদ্রীর হাতে ধরা পড়েন। স্তালিনকে এক চোরা কুঠরিতে বন্দী করে রাখা হয়। ধর্মীয় বিদ্যালয়ের বদ্ধ আবহাওয়া স্তালিনকে অস্থির করে তুলল। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। যোগ দিলেন এক গুপ্ত সমাজতন্ত্রী দলে। সেখানে রেলওয়ে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। কার্ল মার্ক্সের দর্শন তাঁকে অনুপ্রেরণা যোগালো। তিনি হয়ে গেলেন মার্ক্সবাদী।

ধর্মীয় বিদ্যালয়ের গোঁড়া শিক্ষকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যোগ দিলেন জর্জিয়ার শ্রমিক সংগঠনে। এ সময় তাঁকে অনেক ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছে। লেনিনের সঙ্গে তাঁর কিছু মতভেদ থাকলেও তিনি জানতেন লেনিনকে উপেক্ষা করে তাঁর পক্ষে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। তাই তিনি লেনিনের একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে উঠলেন। শ্রমিক সংগঠক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জেলে যেতে হয়েছে অন্তত পাঁচবার।

১৯১৩ সাল। পঞ্চমবার তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হল। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এশিয়ার দূরতম প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে। তাঁর মুক্তি এলো বিপ্লবের পরে। জর্জিয়ার ছোট ছোট জাতিগুলোর বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার জন্য তিনি নানান উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হলেন। এতে তিনি সকলের নজরে এলেন।

বিপ্লবে জয়যুক্ত হবার পর রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করল। স্তালিন অ-রুশীয় দেশগুলির সমস্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে দেখাশুনার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

১৯২২ সাল। স্তালিন রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। রুশ বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার বলশেভিক নেতারা অধিকাংশই বাইরে চলে যেতে থাকেন। স্তালিন কিন্তু বাইরে যাননি। দেশের অভ্যন্তরে থেকে গুপ্ত সমিতি তৈরি করে সংগঠন মজবুত করেছিলেন। যদিওবা কারাগারেই তাঁকে থাকতে হয়েছে বেশিদিন। দেশের অভ্যন্তরে থেকে সংগঠনের কাজ করার দরুন তাঁকে স্থানীয় লোকেরা চিনেছিল বেশি। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

এর মধ্যে পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর পলিটব্যুরোর সদস্য হিসেবে স্তালিন পার্টির প্রধান পাঁচজনের একজন হয়ে উঠলেন। পাঁচজন পার্টি প্রধান হলেন লেনিন, কামেনেভ, ট্রটস্কি, বুখারিন আর স্তালিন। পরে জিনোভিয়েভকেও পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। জিনোভিয়েভ কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশানালের সভাপতি নিযুক্ত হলেন। ট্রটস্কি ছিলেন গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত, বুখারিন ছিলেন সংবাদপত্র ও প্রচারের দিকে। লেনিনের শেষ জীবনের প্রধান সহকারি ছিলেন কামেনেভ। পার্টির সব কিছুই ছিল এ পাঁচজনের হাতে।

স্তালিন পার্টির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পার্টিকে জাতির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন। সুযোগ পেয়ে গেলেন পার্টিতে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার। রাশিয়ার সংবিধান রচনার ভার পড়ল স্তালিনের ওপর। লেনিন অবশ্য সংবিধানের খসড়া দেখে দিলেন। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রইল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, রেলপথ ও যানবাহন ব্যবস্থা। পরে স্তালিন নিজের মনোমত করে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পুলিশের ভার অর্পণ করলেন মস্কোর ওপর।

রাজনৈতিক পুলিশের ক্ষমতা 'মস্কোর' হাতে ন্যস্ত করে স্তালিন নিজের ক্ষমতা দখলের পথ সুদৃঢ় করার সুযোগ করে নিলেন। জর্জিয়ায় অর্থাৎ তাঁর নিজের জন্মভূমিতে স্তালিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল। রাজনৈতিক পুলিশের সহায়তায় স্তালিন জর্জিয়ায় তাঁর বিপক্ষ দলকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা পাকা করে নিলেন। স্তালিনের নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিপক্ষ দল জর্জিয়াতে অতিষ্ট হয়ে উঠল। স্তালিন তাদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। লেনিন তখন শয্যাশায়ী। গুরুতর অসুস্থ। স্তালিনের নিষ্ঠুর মানসিকতা, রূঢ় ব্যবহার, ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত সবই লেনিন নীরবে লক্ষ্য করছিলেন।

লেনিন স্তালিনের এরকম উগ্র মানসিকতা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন তাঁর অবর্তমানে স্তালিনের বর্বর অত্যাচারে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক নিষ্পেষিত হবে। অগণিত লোককে মৃত্যুবরণ করতে হবে স্তালিনের হাতে। লেনিন হতাশায় এক জায়গায় লিখলেন যে পার্টির ভাঙনের পথ আগতপ্রায়। দারুণ অসুস্থ তখন লেনিন। লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, স্তালিন তাঁর মনোমত সংবিধান কংগ্রেস অধিবেশনে পেশ করার ব্যবস্থা করেন। লেনিন অসুস্থ অবস্থায় মুখে মুখে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কিছু নোট দিয়ে গেলেন। এটা ছিল লেনিনের স্তালিনের বিরুদ্ধে বিবৃতি। স্তালিনের চিন্তাধারাকে লেনিন দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়। যতই স্তালিনের বর্বর অত্যাচারের খবর তাঁর কাছে এসে পৌঁছাতো ততই তিনি শিহরিত হয়ে উঠতেন। স্তালিনের বীভৎস অত্যাচারের খবরে লেনিনের হৃদযন্ত্র কাঁপতে থাকতো। স্তালিনের ওপর তিনি সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে পার্টি কমরেডদের বললেন যে স্তালিন রাশিয়ায় ক্ষমতায় এলে দেশের সর্বনাশ অবধারিত। দেশের অগণিত লোক স্তালিনের হাতে নিহত হবে। তাই তিনি বলে গেলেন, "স্তালিন বড় রূঢ়। এই দোষ সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে অসহ্য। আমি পার্টি কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করি যে স্তালিনকে ওপথ থেকে সরিয়ে এমন কাউকে নিযুক্ত করা হউক যিনি (স্তালিনের চেয়ে) আরও ধৈর্য্যশীল (আদর্শের প্রতি) আরও শ্রদ্ধাশীল, যিনি আরও বিনয়ী এবং সহযোগীদের প্রতি আরও মনোযোগী।"

১৯২৩ সাল। পার্টি কংগ্রেস বসল। লেনিন তখন অসুস্থ। গুরুতরভাবেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে আসার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের জয় হল সব দিক থেকে। স্তালিন পার্টিযন্ত্রকে মনের মত করে তৈরি করলেন। স্তালিন নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক পুলিশ

বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন তাদের তিনি নিজের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করতে লাগলেন। স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার মধ্যে স্তালিন নিরাপত্তার ওপর জোর দিলেন অধিক। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করলেন বেশি।

২১শে জানুয়ারী, ১৯২৪-এর লেনিন মারা গেলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার নিলেন স্তালিন। শবদেহ নিয়ে যাওয়া হলো রেড স্কোয়ারে। লেনিনের শবদেহ রাখা হল সেখানে। লেনিনের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা এটা চাননি। স্তালিনের দূরদৃষ্টি ছিল অপরিসীম। স্তালিন বুঝতে পেরেছিলেন যে রাশিয়ার অধিকাংশই কৃষিজীবী, শিক্ষায় অনগ্রসর। তারা রেড স্কোয়ারে লেনিনের শবদেহ দেখে তৃপ্ত হবে। আর এর জন্য স্তালিনের গুণগান করবে। রেড স্কোয়ারে রক্ষিত লেনিনের শবদেহ তাদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী তাদের প্রিয় নেতার শবদেহ দেখে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লাগল। এখানেই রয়েছে স্তালিনের কৃতিত্ব।

লেনিনের উইল সত্ত্বেও স্তালিন পার্টি কংগ্রেসে অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করে নিজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এর অবশ্য বিশেষ কিছু কারণও ছিল। স্তালিন ছিলেন ২০ বছরের বলশেভিক আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন দশ বছর। স্বভাবতই এদিক থেকে তিনি জনগণের খুবই কাছের লোক ছিলেন। দ্বিতীয়ত ট্রটস্কি ও লেনিনের মধ্যেও খুব একটা প্রীতির ভাব ছিল না। দু'জনের মানসিকতাও ভিন্ন ধরনের ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মোটেই মনের মিল হতো না। তা সত্ত্বেও ট্রটস্কি লেনিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বিপ্লবের শেষদিকে। লেনিনের মতবাদকেও তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মার্ক্সীয় মতবাদে গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁদের। তথাপি তাঁরা লেনিনের বিরুদ্ধে অনেক সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। রুশ বিপ্লব সময়োচিত নয় বলে দেশের লোককে উস্কানি দিয়েছেন। লেনিনের ব্যক্তিত্বের জন্য অবশ্য তাঁদের মুখ খোলার উপায় ছিল না। লেনিন সবই জানতেন। কিন্তু সকলকেই ক্ষমা করেছিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে। একমাত্র স্তালিনের বর্বর অত্যাচারকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

১৯২৪ সালের ৪ঠা মে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে লেনিনের উইল পড়া হলো। পরে পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের উইল সম্পর্কে জানানো হবে কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। স্তালিন কিছুটা সন্ত্রস্ত হলেন। স্তালিন সুকৌশলে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে হাত করলেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ স্তালিনের চেয়ে ট্রটস্কিকে ভয় করতেন অধিক। তা স্তালিন ভালোভাবেই জানতেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ ভাবতেন ট্রটস্কি বোধ হয় বোনাপার্ট হয়ে উঠছে। স্তালিনকে তাঁরা অধিকতর ভালো লোক বলে মনে করতেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সাহায্য ও সহযোগিতা স্তালিনকে রক্ষা করল।

জিনোভিয়েভ বললেন লেনিনের উইলটা সাধারণের মধ্যে প্রচার না করে পার্টির

ক্ষমতাবান কয়েকজন প্রতিনিধির কাছে পাঠানো হোক। এ প্রস্তাব অধিক ভোটে গৃহীত হল। স্তালিনের বড় বিপদ কাটলো। তাঁর ক্ষমতা দখলের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে লাগল।

স্তালিন অতি সন্তর্পণে তাঁর ক্ষমতা মজবুত করতে লাগলেন। তিনি একে একে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করেন। নিজের কূটকৌশলে তাঁর পলিটব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যকে স্বমতে নিয়ে আসেন। বিরোধীরা যাঁরা তাঁর মত মেনে নিলেন তাঁদের তিনি পার্টিতে ফিরিয়ে নিয়ে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করলেন। ট্রটস্কি কিন্তু তাঁর মতে সায় দিলেন না। ট্রটস্কিকে নির্বাসনদণ্ড দেবার জন্য পার্টির কাছে প্রস্তাব দিলেন। তাতে কাজ হলো।

স্তালিন ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। স্তালিন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন মূলত দুটি কারণে। প্রথমত স্তালিনের জনগণের ইচ্ছে উপলব্ধি করার গভীর ক্ষমতা ছিল। সেই ইচ্ছেকে কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করারও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। স্তালিন যে পরার্থে কাজ করছেন সেই বোধটুকু জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত করার শক্তি তাঁর ছিল।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে স্তালিন ছিলেন এক নিপীড়িত দেশ ও শোষিত শ্রেণীর সন্তান। তিনি হয়ত সেই জন্যই নীচতলার লোকেদের মর্মবেদনা অনুভব করতেন। লেনিনের সময় রাশিয়া ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। স্তালিন যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তিনি শতকরা ৯০ জন কৃষকের সমর্থন লাভ করেছিলেন। কৃষকরা বলত "ঘাস কিভাবে গজায় তা স্তালিন কান পেতে শুনেন।" স্তালিন বলতেন আন্দোলনের পিছনে পড়ে থাকলে একা পড়ে যেতে হবে, আর বেশি এগিয়ে গেলে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। তাই তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তাতে তাঁর সাফল্যও এলো।

নানান মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে স্তালিন ছিলেন অনবদ্য। বহুমতের মধ্যে তিনি নির্ভুল পথ নির্দেশ করতে পারতেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম কয়েক বছরে দেশের শ্রীবৃদ্ধির কথা মানুষের চোখের সামনে ভাসত।

পরে স্তালিন তাঁর নীতি পরিহার করেন। যে কৌশল অবলম্বন করে তিনি তাঁর ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন সেই কৌশল তিনি পরিত্যাগ করে অন্য উপায়ে তাঁর ক্ষমতার স্থায়িত্ববিধানে সচেষ্ট হন। বিরোধীদের তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর সাহায্যে treat করতে থাকেন। অবশ্য এ ধরনের পুলিশি অত্যাচার রুশদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কেন না প্রথমে জারের শাসনে তারপরে লেনিনের আমলে এই পুলিশবাহিনীর দাপটে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে।

লেনিন প্রতিবিপ্লবীদের সামাল দেবার জন্য সাধারণ আইনের ওপর নির্ভর না করে চেকা নামক এক পুলিশ দপ্তরের সৃষ্টি করেছিলেন। স্তালিন ও সর্বপ্রকার বিরোধীপক্ষকে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর ওপর তাদের দমনে ভার দিয়েছিলেন। স্তালিন তাঁর ক্ষমতায় সমাসীন থাকার জন্য এমন কোন অপরাধ (বা কৌশল যাই বলা হোক না কেন) নেই যা করেননি।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর বলেছেন যে, "What Stalin wants

from his men is rigid obedience to orders, not criticism nor even facts that go against his policy." বলা যায় স্তালিন তার জনগণের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। তাই টেনিসনের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, স্তালিনের আমলে রাশিয়ার জনগণের অবস্থা ছিল—"Theirs not to reason why, Theirs but to do and die."

স্তালিন নিঃসন্দেহে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে স্তালিনের অমানুষিক অত্যাচার হিটলারের বর্বর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য যেভাবে একে একে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন খুব উচুস্তরের রাজনৈতিক কুশলী। কিভাবে কাকে কখন কাজে লাগিয়ে পরে তাঁকে খতম করতে হয় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিপ্লবের প্রথমদিকে স্তালিন কোন সময় লেনিনের কথার অবাধ্য হননি এবং ভেতরে ভেতরে নিজের ক্ষমতা দখলের পথ পরিষ্কার করেন। এ জে. পি. টেলর যথার্থই বলেছেন যে, "Stalin is a political tactician of the highest order. He knows how to play men off against each other and how to keep himself in the background. In the first year of the revolution Stalin was the only one who never differed from Lenin or challenged his leadership ; yet all the time Stalin was building up for himself a control of the party machinery which even Lenin could not dispute."

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, লেনিন স্তালিনের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। স্তালিন কামনেভ, জিনোভিয়েভ এবং বুখারিনের সহায়তায় নিজেকে রক্ষা করেন। এঁরা সকলেই ছিলেন বলশেভিক দলের প্রথম সারির নেতা। স্তালিন বুখারিন ও জিনোভিয়েভকে কাজে লাগিয়ে ট্রটস্কিকে হত্যা করেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর বুখারিনকে দিয়ে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে সংহার করেন। পরে বুখারিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মামলা দাখিল করে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বুখারিন ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক নেতা ১৯২৪-র পর পলিটব্যুরোর সদস্য হন। ১৯২৬-এর পর নির্বাচিত হন কমিণ্টার্ন-এর সদস্য। স্তালিন প্রয়োজনবোধে হাসতে হাসতে লোক খুন করতে পারতেন। স্তালিন ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত পথের কাঁটা অপসারিত করেন। অথচ এঁদের হাত ধরেই তিনি রাশিয়ার ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। হিটলারের সঙ্গে স্তালিনের অদ্ভুত মিল রয়েছে এ সমস্ত দিক থেকে।

হিটলারও একইভাবে যাঁদের হাতে ধরে ক্ষমতা দখল করেছিলেন (যেমন রোয়েম, স্ট্রাসার, গ্রেগর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ) তাঁদের প্রত্যেককে একে একে বিভিন্ন সাজানো মামলায় জড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছিলেন। স্তালিন ও হিটলার দু'জনই একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। দু'জনই ছিলেন নিষ্ঠুরতার প্রতীক।

অথচ তাঁরা দু'জনেই দেশের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতিকে পঙ্গু অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদিক থেকে স্তালিন ও হিটলারের কৃতিত্ব অনবদ্য।

স্তালিন বুদ্ধিকৌশলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যৌথ খামার পরিকল্পনা কার্যকরী করেন, চাষীদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পথে নিয়ে যান। দেশকে আধুনিক শিল্পে সমৃদ্ধশালী করেন এবং দেশবাসীকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে লোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা শুনেন মস্কোর খেয়াল বশে। আমেরিকার দক্ষ ইন্‌জিনীয়ার ও কারিগরদের সহায়তায় বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলেন দেশে। রাশিয়ার অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাতে তৎপর হন স্তালিন।

স্তালিন সাহায্য চাইলেন সমৃদ্ধ দেশগুলির কাছে। লেনিনের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের কথা বাদ দিয়ে স্তালিন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করেন।

বিপ্লবের পর পার্টি ক্ষমতা দখল করল ঠিক কিন্তু সেই ক্ষমতা ধরে রাখা সহজসাধ্য ছিল না। তার জন্য অনেক পরিশ্রম, ত্যাগ, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ঘরে-বাইরে স্তালিনকে। তাই তাঁকে মেতে উঠতে হয়েছিল খুনের নেশায়। দেশের স্বার্থে খানিকটা ও নিজের স্বার্থে ত' বটেই। তার জন্য দেশকে গড়তে অনেক বছর লেগেছিল।

দেশের মধ্যে সম্পত্তিচ্যুত জমিদাররা বৈদেশিক সাহায্যে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ল। জার্মানীর কাইজার পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক অঞ্চল দখল করে নিল। ব্যারন ম্যানার হাইম গড়লেন বিপ্লববিরোধী সরকার। ফিনল্যাণ্ড তাঁকে করল সাহায্য। শস্য, কয়লা, লোহা, পেট্রল কেড়ে নেওয়ার জন্য উত্তর ককেশিয়াতে বিদেশী সৈন্য ঢুকল। ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠালো। বহিঃশক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলেছিল ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ল্যাৎভিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া সব রাশিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেল। বেসারবিয়া চলে গেল রোমানিয়ার দখলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে যথার্থই বলেছেন যে, "রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালীন অবস্থা; দেশে ও বাইরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণ কার্যের ভিতটা যতটা শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক-তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টি কার্যে দুই পক্ষ আছে. উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।"

দেশকে সমৃদ্ধির পথে আনতে গিয়ে স্তালিনকে তাই কঠোর হতে হয়েছিল, যেমন বিধ্বস্ত জার্মানীকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে কঠোর হতে হয়েছিল হিটলারকে।

স্তালিন প্রায় ৩০ বছর রাশিয়াতে একনায়ক হিসেবে দেশশাসন করে গেছেন। হিটলার তাঁর ক্ষমতায় ছিলেন ১২ বছর। স্তালিনের কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী আর হিটলারের গেস্টাপোবাহিনী ছিল তাঁদের দু'জনের শক্তির উৎস। স্তালিন ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী একনায়ক আর হিটলার বিজিত। তফাৎ এখানেই।

১৯১৭-১৯২৭ পর্যন্ত দশ বছর স্তালিন রাশিয়ায় স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁর নব

নব কলাকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। হিটলার প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জার্মানীতে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। দু'জনের ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি ছিল একই রকম। জোর করে তাঁরা ক্ষমতা দখল করেননি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের বুদ্ধিকৌশলে তাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। হিটলার ১৯৩৩ সালের জার্মানীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পান। হিটলার কিন্তু ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত জার্মান নাগরিক ছিলেন না। স্তালিন জর্জিয়ান হলে কি হবে রাশিয়ার নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। হিটলারের জার্মানীর নাগরিকত্ব পেতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল।

১৯২৬ সালে স্তালিন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে দেশের সার্বিক উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। যৌথখামারে কৃষকদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। ভারী শিল্প কারখানা স্থাপনের কাজে হাত দিলেন বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলেন।

রাশিয়ার কুলাক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। স্তালিন তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। পাদ্রীর দলও স্তালিনের নতুন সংস্কারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। তবে শিক্ষিত যুবক যুবতী, অধ্যাপক, শিক্ষক এমন কি সরকারি কর্মচারীরা স্তালিনের ডাকে এগিয়ে এল দেশের শ্রীবৃদ্ধি মানসে।

স্তালিনকে বাধ্য হয়ে পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য কুলাক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor বলেছেন, "Stalin forced it through with an obstinacy......, forced it over millions of dead bodies. Other Bolshevik leaders lost their nerves and wanted to call a halt. Stalin never wavered. He had committed himself to collectivization, and he was determined to achieve it at whatever cost in human suffering."

যৌথখামার এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে স্তালিনকে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করতে হয়েছে। অন্যান্য বলশেভিক নেতারা স্তালিনকে রক্তপাত বন্ধ করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা গৃহযুদ্ধের অন্তিম পরিণতির কথা ভেবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য স্তালিন সংকল্পে ছিলেন অটল। তাঁর ইস্পাত কঠিন সংকল্প থেকে তাঁকে এতটুকু কেউ নড়াতে পারল না। লক্ষ লক্ষ কুলাক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের রক্তে স্তালিনের হাত রঞ্জিত হল।

স্তালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। দেশী, বিদেশী সকল দক্ষ শ্রমিক, বাস্তুকার প্রভৃতির সাহায্য চাইলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থাপিত হতে লাগল যৌথখামার, কলকারখানা বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলে। ১৯৩০ সালে ১লা মে তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়া রেলপথের উদ্বোধন হল। বিল স্তাটক ছিলেন এই লাইন তৈরির বড়কর্তা। সাহায্য পেয়েছিলেন জাপানী-কম্যুনিস্টদের নেতা কাতিয়ামার। কাতিয়ামা তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। অনুধ্যুষিত প্রান্তর ও

মরুভূমির উত্তর-দক্ষিণে হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথ স্থাপিত হল। এটাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বপ্রথম সাফল্য। স্তাটফ ছিলেন রুশ গৃহযুদ্ধের পুরনো যোদ্ধা। এ রেলপথ এশিয়ার ইতিহাসের ধারা বদলে দিল। সাইবেরিয়ার গম আর কাঠের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার তুলোর সংযোগ ঘটল।

রেল লাইনের ধারে ধারে নতুন নতুন লোকবসতি স্থাপিত হতে লাগল। স্তাটফ স্থানে স্থানে জনগণের কাছে তাদের সাফল্যের কথা বলে যেতে লাগলেন। যাযাবর কাজাকরা এসেছিল এ রেললাইন উদ্বোধন উৎসবে। তাদের অনেক ছেলে শ্রমিকের কাজে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য পুরস্কার পেল। রেলপথ তৈরির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের ১২ বছর আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

একে একে চারদিকে কারখানা স্থাপিত হতে লাগল। মার্কিন ইন্‌জিনীয়ারদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় স্তালিনগ্রাদে বিশাল ট্রাক্টর কারখানা স্থাপিত হল। স্তালিন-গ্রাদে কারখানা গড়তে অনেকের জীবন গেল। গ্রীষ্মকালে গরমে ইস্পাত গলানো উনুনের ধারে অনেকেই মূর্ছা গেল। জিভকোভিচ্‌, কোভার্ট ও নিন্‌চাক নামক তিনজন আমেরিকান ইন্‌জিনীয়ারের দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং সঙ্গে রুশ শ্রমিকের অফুরন্ত কর্মোদ্যমে স্তালিনগ্রাদের বিশাল ট্রাক্টর কারখানা স্থাপিত হল।

অল্পবয়স্ক অদক্ষ কম্যুনিস্ট কর্মীদের অসাধারণ মনোবল, দেশের প্রতি তাদের অকৃত্রিম আনুগত্য ও স্তালিনের দূরদৃষ্টি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করল। "লেনিন এবং তাঁর পরে স্তালিনও কাজের শৃঙ্খলা, হিসাবনিকাশ আর দায়িত্বই চেয়েছেন। যে দেশ যান্ত্রিক উৎপাদনে এখনও অনভ্যস্ত, সে দেশের পক্ষে এ শিক্ষা যেমন শক্ত, তেমনি দরকারী।" তবে রুশরা যে শিখছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল সর্বত্র। স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টর কারখানার পর স্থাপিত হল খারখভ ট্রাক্টর কারখানা। মার্কিন বিশেষজ্ঞ রাস্কিন ছিলেন খারখভ কারখানার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে।

ক্রমে স্তালিনগ্রাদে, খারখভে, ইউক্রেনে, কুজ্‌নেৎস্কে ও আরও অন্যান্য স্থানে ট্রাক্টর কারখানা, ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠতে লাগল। মার্কিন ইন্‌জিনীয়ার, রুশ ইন্‌জিনীয়ার, ইনস্পেক্টর সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কারখানা গড়ার ও শিল্পোৎ-পাদনের কাজ দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করল। "অদক্ষ মজুরের ঘাটতি পূরণের জন্যে আফিসের কেরানী, ছাত্র, অধ্যাপক ইত্যাদিসহ হাজার হাজার লোক তাদের ছুটির দিনে বিনা পারিশ্রমিকে খাটতে এগিয়ে এল। সে সময় চারদিন অন্তর একদিন ছুটি থাকত; সুতরাং দেশের সমগ্র অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ প্রতিদিন ছুটি পেত।"

১৯৩০-১৯৩৩ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্রকার অনুন্নত খামার একত্রিত হয়ে দু'লক্ষ বৃহদাকার খামারে পরিণত হল। সেগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হল যৌথ-মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা। ট্রাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার চালু হল। পুরোহিতদের প্ররোচনায় চাষীরা ট্রাক্টর দেখলে ঢিল ছুঁড়তো। বলত শয়তানের কল।

ট্রাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা চাষ করার ফলে মাঠে ফলন হচ্ছিল ভাল। চাষীদের অবস্থারও কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হল। উদ্বৃত্ত শস্য যেত কুলাকদের হাতে।

বামপন্থীরা চাইত জোর করে চাষীদের যৌথ খামারে আনতে। দক্ষিণ-পন্থীরা চাইত কুলাকদের হাতে কিছু ক্ষমতা দিতে। স্তালিন ও তাঁর বামপন্থীরা কুলাকদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পরিকল্পনা করল। স্তালিন ঘোষণা করলেন শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একান্তভাবে কাম্য।

১৯৩৩ সাল। জানুয়ারী মাস। স্তালিন পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিকে জানালেন শিল্পে অনুন্নত কৃষিপ্রধান রাশিয়া আজ বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম শুরু হয় ১৯২৮ সালে। চার বছর তিন মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়। শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা আগে যেখানে ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ এখন হয়েছে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি ২০ লক্ষ। শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২½ গুণ। রাশিয়াতে এখন তৈরি হচ্ছে ট্রাক্টর, তৈরি হচ্ছে ইস্পাত, অটোমোবাইল, বিমানপোত। রাসায়নিক শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি ও আরও নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে। দেশের লোক প্রথমে না বুঝলেও এখন বুঝতে পারছে কৃষি ও ভারী শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি না হলে দেশের অগ্রগতি বিপন্ন হতো। ফলে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হতো।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে বসে রাশিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রেখেছিল আর নাৎসী নেতা হিটলার ইউক্রেন কুক্ষিগত করার মতলবে ছিলেন—১৯৩৩ সালে। বিভিন্ন শিল্পে এবং সামরিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটাতে না পারলে জাপান ও জার্মানীর হাত থেকে রাশিয়ার বিপদের যে সম্ভাবনা ছিল এটা নিশ্চিত।

স্তালিন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী রিপোর্টে বললেন, "যে দেশ একশ বছর পিছনে পড়েছিল এবং তার পিছিয়ে পড়ে থাকার দরুন মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, তাকে চাবুকে সচেতন না করে আমরা পারিনি। যদি তা না করতাম, তা হলে আধুনিক যন্ত্র শিল্পের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুঁজিবাদীদের বেষ্টনীর মধ্যে আমাদের নিরস্ত্র অবস্থায় পড়ে থাকতে হতো।"

১৯৩৫ সালের মধ্যে যৌথ খামার পরিকল্পনা একটি স্থায়ীরূপ নিল। খামারের জন্য রচিত হলো আদর্শ সংবিধান। খামার পরিচালনার জন্য একটি আদর্শরীতি চালু হলো। এর ফলে চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হলো শিক্ষার সম্প্রসারণ। চাষীরা লিখতে পড়তে শিখল। চাষীরা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকল। স্থাপিত হলো কৃষি গবেষণাগার। ল্যাবরেটরি কুটিরে বা চাষের গবেষণাগারে চাষীরা নিজ নিজ কাজ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেল।

১৯২২ সালে রাশিয়ার নতুন সংবিধান রচিত হবার পর দেশের মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার এলো। লোক নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে লাগল। তারা দেশের বীরদের খবর রাখত। ১৯৩৫ সাল। ৬ই ফেব্রুয়ারী। সোভিয়েত কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল জাতির পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের সংবিধান রচনা করতে হবে। একত্রিশজন অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে কমিশন গঠিত হলো সংবিধানের যুগোপোযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য। স্তালিন ছিলেন কমিশনের সভাপতি। মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন বুখারিন। মূলত বুখারিনই সংবিধানের

প্রায় সবটুকুই রচনা করেছিলেন। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যাতে সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তার ব্যবস্থা রাখা হলো। জার্মানীতে তখন ফ্যাসিস্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। মনে হলো এ সংবিধান যেন জার্মানীর ফ্যাসিস্ট সংবিধানের জবাব।

চীন থেকে শ্রীমতী সান ইয়াৎ সেন এই সংবিধানকে স্বাগত জানালেন। জেনেভায় শান্ত হ্রদের ধারে বসে রোমা রেঁলা বললেন, "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এতকাল ছিল মানুষের স্বপ্নের বস্তু মাত্র; এই সংবিধান থেকে তারা প্রাণ পেলো।"

একদিকে সংবিধান লেখা হচ্ছিল অন্যদিকে তার কতকগুলো ধারা স্তালিনের পরোক্ষ নির্দেশে লঙ্ঘিত হচ্ছিল। স্তালিন বুঝতে পারলেন যে সংবিধান যখন রচিত হয়েছে এবং যেখানে রয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের মূল আইন তখন তাঁর তৈরি রাজনৈতিক পুলিশের দিকে কেউ নজর দেবে না! ১৯২২ সালে রাজনৈতিক পুলিশ সংস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেন স্তালিন এবং এ সংস্থার ওপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করেন তিনি নিজেই। এ সংস্থা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে উঠতে লাগল। এরা রাষ্ট্রের সংবিধান বা আইনের কোন মর্যাদা রাখতো না। ফলে স্তালিনের রাজত্বের ত্রিশের দশক থেকেই শুরু হলো বিভীষিকার রাজত্ব।

স্তালিনের যুগে সকলেই যেন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হতে চাইছিল। স্তালিনের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করার কোন সাহস ছিল না। ছিল না প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা। যারা গ্রেপ্তার হতো তারা ভাবত তারা ত' কোন অন্যায় করেনি, তাহলে কেন তাদের গ্রেপ্তার করছে? হয়ত ভুলবশত, পরে ছেড়ে দেবে। এই মিথ্যা আশ্বাস তারা মনে মনে পোষণ করত। তাই তারা স্তালিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন সমষ্টিগত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেনি। নিছক সন্দেহবশে অনেকেই গ্রেপ্তার হতো দিনে, রাতে, ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে।

রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশবাহিনীর ওপর নির্দেশ ছিল তারা যেন সরকারি অফিসার ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর কড়া নজর রাখে। প্রয়োজনবোধে সন্দেহ হলে জোরপূর্বক যেন তাদের সম্পত্তি দখল করা হয়। এদের ওপর যেন বলপ্রয়োগ করা হয় এবং গ্রেপ্তার করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গুপ্ত পুলিশবাহিনী নির্বিচারে জনগণের ওপর অত্যাচার চালাতো। লেনিনের আমলে 'চেকা' নামক এক পুলিশ সংস্থার হাতে রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। পরে এর নাম হয় জিপিইউ। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন সংস্থা। স্তালিনের আমলে নাম দেওয়া হয় ওগপু অর্থাৎ সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংস্থা। পরে আবার এ সংস্থাকে এনকেভিডি (১৯৩৪—১৯৪৩) নামে অভিহিত করা হয়।

১৯১৮ সাল। লেনিন শ্রেণীশত্রুকে খতম করার ডাক দিলেন। রুশভূমিকে জীবাণুমুক্ত করতে এ ছিল তাঁর নির্দেশ। লেনিন তাঁর পার্টি কমরেডদের জানালেন এবং জনসভায় সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে, "এমন কোন শহর, কারখানা বা গ্রাম নেই যেখানে বুদ্ধিজীবী নামধারী নাশকতা সংগঠক নেই?" সলঝেনিৎসিন বলেছেন যে, লেনিন ও স্তালিন

বিশ্বাস করতেন বুদ্ধিজীবীরা চিরকালই সুষ্ঠু প্রশাসনের প্রতিবন্ধক। এরা হচ্ছে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কীটের দল।

লেনিনের আমলে 'চেকা' ছিল শাস্তিবিধায়ক সংস্থা। এরা একাধারে গ্রেপ্তার, অনুসন্ধান, বিচার সবই করত এবং রায়ও দিত। নিছক সন্দেহবশে নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করত। লেনিন ও স্তালিন এরপর বিপ্লবে সাংস্কৃতিক বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য গীর্জা ধ্বংসের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। গীর্জার সমর্থনে গণবিক্ষোভ আরম্ভ হলো। অনেক সন্ত ও সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী বন্দীহস্তে গুপ্ত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। ফলে পাদ্রী-সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী অনেকেরই প্রাণ গেল। গীর্জাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। শিশুদের ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ হলো। ধর্মমহাযাজক তিখনকে গ্রেপ্তার করা হলো। বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। বন্দীদের নির্বিচারে দশ বছর জেলে থাকতে হতো। তাঁরা জেল থেকে বের হয়ে আর নিজ বাসস্থানে ফিরতে পারত না। তাদের আবার অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্মকে রাশিয়া থেকে উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো।

লেনিন-স্তালিনের মত একই পথ অবলম্বন করেছিলেন হিটলার খ্রীষ্টধর্মকে জার্মানী থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। হিটলার কোন ধর্মেতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। হিটলার বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনের বিফলতার অন্যতম কারণ তার অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ়ভাবে এই ধারণা মনে মনে পোষণ করতেন যে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট পাদ্রীর দল জার্মানীর সর্বনাশের মূল কারণ। হিটলার পৌত্তলিকতার ঘোরবিরোধী ছিলেন। জার্মানী থেকে এ সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য তিনি চেষ্টার কসুর করেননি।

হিটলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধ শেষ হলে তিনি খ্রীষ্টধর্মকে জার্মানী থেকে সমূলে উৎপাটিত করবেন। যুদ্ধ শেষ হলো। হিটলারের অন্তিম প্রয়াণ ঘটল। ফলে তাঁর খ্রীষ্টধর্মকে উৎখাত করার সংকল্প ফলপ্রসূ হল না। Alan Bullok বলেছেন যে, 'Once war was over, he (Hitler) promised himself, he would root out and destroy the influence of the Christian Churches."

শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, সমাজবাদী, মেনশেভিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের ওপর লেনিন ও স্তালিনের পুলিশবাহিনী যখন কঠোর অত্যাচার শুরু করল গোর্কি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। লেনিন গোর্কিকে জানালেন 'কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে গেছে'। কিন্তু তিনি গোর্কিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনায় কত অবিচার ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে রাশিয়াতে। তাই তিনি গোর্কিকে উপদেশ দিলেন, "পচে গলে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্য আয়ুক্ষয় করবেন না।" লেনিনের সঙ্গে গোর্কির মানসিক সংঘাত লেগেই থাকতো। ফলে গোর্কিকে ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিদেশে কাটাতে হয়েছে।

স্তালিনের যুগে নৃশংসতার সূত্রপাত হয় ১৯২৭ সালের জুন মাসে। ২৭শে জুন ওয়ারসতে রুশ রাষ্ট্রদূত খুন হলো। সংবাদপত্রগুলি এই গুপ্তহত্যার খবরে ভরা থাকত। গুরু

হলো স্তালিনের নির্দেশে সন্দেহবশে রুশ নাগরিকদের গ্রেপ্তারের পালা। প্রাক্তন নৈরাজ্যবাদী, সমাজবাদী বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের ধরা হতে লাগল। মস্কোর পাড়ায় পাড়ায় তল্লাসী আরম্ভ হলো। ক্রমে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। লুবিয়াঙ্কা ও বুতুর্কিতে বন্দীদের জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। তাই বন্দীদের বিপুল সংখ্যায় পাঠানো আরম্ভ হলো 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে'। এ দ্বীপপুঞ্জকে বলা হতো স্তালিনের অত্যাচারের সুমেরু প্রদেশ।

গুলাগ উপসাগরে অবস্থিত ছিল এ দ্বীপপুঞ্জ। রুশ ভূখণ্ডের সঙ্গে এ দ্বীপপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য মানসিক সংযোগ বর্তমান ছিল। এ দ্বীপপুঞ্জ ছিল মূলত জেক উপজাতি অধ্যুষিত। এখানেই স্থাপিত হয়েছিল স্তালিনের আমলে বন্দীদের রাখার ও তাদের ওপর অত্যাচার চালাবার সর্ববৃহৎ কারাগার। হিটলারের ডাচাউ, আউসভিৎস প্রভৃতি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের কারাগারের তুলনা চলে।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে ক্রমে দূষিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হতে লাগল। জাতির জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দিল স্তালিনের অত্যাচারের বাড়াবাড়ি। পুরনো ইন্‌জিনীয়ারদের দিয়ে দেশ গড়ার কাজ আরম্ভ করেছিলেন স্তালিন তাঁর শাসনকালের প্রারম্ভে। ধীরে ধীরে এ সমস্ত ইন্‌জিনীয়ার ও বুদ্ধিজীবীকে স্তালিন সন্দেহ করতে লাগলেন। এঁরাই দেশের পুনর্গঠন বছরগুলিতে শিল্প, কারখানা, রাস্তাঘাট সব গড়েছিলেন। দেশে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছিল। তারপর হঠাৎ এঁদেরই নিষ্ঠাহীনতার অপবাদ দিয়ে খতমের তালিকায় রাখা হলো।

১৯২৭ সালের শেষদিকে পূর্ণ উদ্যমে অর্থনৈতিক অসাফল্যের কারণ খোঁজা হচ্ছিল। স্তালিনের রাজনৈতিক পুলিশবাহিনী হঠাৎ আবিষ্কার করল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অসাফল্যের কারণ পুরনো ইন্‌জিনীয়ার ও বুদ্ধিজীবীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ। সলঝেনিৎসনের লেখা 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ' বই থেকে জানা যায় যে, ইজভেস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পের মুখ্য ইন্‌জিনীয়ার ল্যাডিনেস্কি সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে একবছর বন্দীজীবন যাপন করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গেরিন, চেখভ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের এবং পুরনো ইন্‌জিনীয়ারদের মেরুদণ্ড এক বছরের মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের গোড়ায় স্তালিন বুঝতে পারলেন যে এ সমস্ত পুরনো ইন্‌জিনীয়ারদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া দেশকে শিল্প সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

স্তালিন তাঁদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করলেন। স্থির করলেন পুরনো কারিগরী বুদ্ধিজীবীদের বিনাশের পরিবর্তে তিনি তাদের কাজে লাগাবেন।

কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অত্যাচারের মাত্রাটা বাড়তে লাগল। লক্ষ লক্ষ সম্পত্তিচ্যুত কৃষককে (যাদের স্তালিন কুলাক নামে অভিহিত করতেন) গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হলো। এদের সরাসরি নির্বাসন পরিবহনের মাধ্যমে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হতো। এই বিশাল সংখ্যক জনগণকে গ্রেপ্তার করে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হতো অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে। স্তালিনের গোপন পুলিশবাহিনীর এই সচতুর কার্যকলাপ শহরের

লোকেরা জানতে পারত না। তারপর গোপনে বন্দীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও রক্ষা পেতো না স্তালিনের জল্লাদদের হাত থেকে।

হিটলারও ঠিক একই পদ্ধতিতে ইহুদী, শ্লাভ ও রুশবন্দীদের হত্যা করেছিলেন। হত্যা করেছিলেন তাঁর চোখে সন্দেহভাজন জার্মানদের। স্তালিনের মত হিটলার ক্ষমা জিনিসটা বুঝতেন না। স্তালিন তাঁর বিরোধী বা সন্দেহভাজন রুশজনগণকে এবং অন্যান্য জাতিকে সমূলে দেশ থেকে উৎপাটিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। দৃঢ়মত পোষণ ও স্বাধীনচেতা হওয়ার দরুন অনেক কৃষক যৌথ খামারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে বিপদজনক গণ্য হতে লাগল। স্তালিনের নির্দেশে এদের গ্রেপ্তার করা হতো। অনেককেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

সলঝেনিৎসন বলেছেন ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে কেবলমাত্র লেনিনগ্রাদেরই এক-চতুর্থাংশ মানুষ খতম হয়েছিল স্তালিনের জল্লাদবাহিনীর হাতে।

১৯৩৬-৩৮ সালে রাশিয়ায় নেমে এসেছিল ঘন অন্ধকারময় অধ্যায়। স্তালিন সন্দেহবশে লক্ষ লক্ষ লোককে অতর্কিতভাবে গ্রেপ্তার করলেন। খুন করলেন অগণিত লোককে। যাদের খুন করা হতো তাদের মৃত্যু সংবাদ তাদের আত্মীয়স্বজনরাও জানতে পারত না।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। ক্রুশ্চেভ তখন রাশিয়ার সর্বময় কর্তা। ক্রুশ্চেভ স্তালিনের কুকীর্তিগুলি বিংশ পার্টি কংগ্রেসে তুলে ধরলেন। ক্রুশ্চেভ দৃঢ়ভাবে বললেন ১৯৩৪ সালে পার্টি কংগ্রেসে ১৩৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্তালিনের বিরোধীতা করতে পারে এ সন্দেহে ৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো মিথ্যা অজুহাতে। ৯৮ জনকেই গুলি করে হত্যা করা হলো। ক্রুশ্চেভ ও আরও অনেক নেতা স্তালিনকে ব্যক্তিপুজোর জন্য দায়ী করেন।

এ সমস্ত কাজে হয়ত স্তালিন "বিবেচনা করতেন যে, শ্রমিক সাধারণের স্বার্থে…… বিপ্লবের বিজয়গুলো রক্ষা করার জন্য, এ সব না করলে চলবে না। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বা বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর দ্বারা 'উচ্ছেদ' হওয়ার ভয় সব সরকারেরই থাকে।" বিশেষ বিচার বিবেচনা করে সাধারণ আইনের মধ্যে এর প্রতিবিধান করা যায় না। ফলে শাসকরা চালান এলোপাথারী তল্লাসী। অত্যাচার চালান নির্বিচারে। তারা দেশী ও বিদেশী শত্রুর দ্বারা নিজের ও দেশের অনিষ্টভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষদিকে সমগ্র ইউরোপ এরকম একটি পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে বহুলোক হতাহত হলো। সেখান থেকে উদ্ভব হলো পঞ্চমবাহিনীর। পঞ্চমবাহিনী বলতে তখন বুঝাত ফ্রাঙ্কোর অনুগত গুপ্তচরদের, যারা ফ্রাঙ্কোকে মাদ্রিদ দখলে সাহায্য করেছিল।

নাৎসী নেতা হিটলার তাঁর পঞ্চমবাহিনীকে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হিটলার জার্মানীর ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন। সমগ্র বিশ্বের শাসকবর্গের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। পঙ্গু ও হৃতসর্বস্ব জার্মানীকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করলেন।

অন্যদিকে স্তালিন স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে রাশিয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিলেন। রাশিয়ার

অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটালেন। কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটলো রাশিয়ায়। সুকৌশলে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলালেন স্তালিন।

দুই বিপরীত মেরুর চিন্তাধারার একনায়কের মিলনে বিশ্ব উঠল কেঁপে। তবে হিটলার ভালোভাবেই জানতেন এ মিলন স্বল্পকালের। অচিরেই দুই রাষ্ট্রের সংঘাত অনিবার্য। তবুও লুটের সামগ্রীর মতো স্তালিন হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব ইউরোপ ভাগ বাঁটোয়ারা করার কথা চিন্তা করলেন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, রাশিয়ার প্রাক্তন রুশনেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বৈদেশিক শত্রুর দল—আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার ভেতর তাদের সৈন্যবাহিনী ঢুকিয়ে দিল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে তারা নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাতে লাগল। স্তালিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। স্তালিন নির্দ্বিধায় খুনের নেশায় মেতে উঠলেন। ফলে নিরীহ মানুষও প্রাণ হারালো অগণিত।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর। সার্জাই কিরভ আততায়ীর হাতে নিহত হন। কিরভ ছিলেন স্তালিনের দক্ষিণহস্ত। তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী। কিরভ ছিলেন লেনিনগ্রাদের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক। কিরভের হত্যাকারী ছিল একজন কম্যুনিস্ট যে পার্টির সদর দপ্তরে প্রবেশ করে কিরভকে হত্যা করে।

অনেকের অনুমান কিরভের হত্যার পেছনে রাজনৈতিক পুলিশের হাত ছিল। আর এর সঙ্গে যোগ ছিল জার্মানীসহ কয়েকটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করা হলো এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন স্তালিন বিরোধী উচ্চপদস্থ কম্যুনিস্ট নেতা। ১৯৩৬ সালের ১৬ই আগস্ট, লেনিনের এককালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ তাত্ত্বিক কম্যুনিস্ট নেতা জিনোভিয়েভ ও কামনেভকে কিরভ হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হলো। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯৩৮ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো আরও আটজন রুশসেনাপতি।

জিনেভিয়েভ, কামনেভ, বুখারিন এমনকি ট্রটস্কি—এঁদের হতে ধরেই স্তালিন তাঁর ক্ষমতা রক্ষা করেছিলেন। লেনিনের উইলকে চেপে দেওয়া হয়েছিল সুকৌশলে অত্যন্ত সন্তর্পণে এঁদের সাহায্যে। বিশ্বাস-ঘাতকতার চরম নিদর্শন রেখে গেলেন স্তালিন এঁদের সকলকেই একে একে হত্যা করে।

হিটলারও ঠিক একই পদ্ধতিতে রোয়েম, স্ট্রাচার, গ্রেগর প্রমুখ নেতাদের হত্যা করেছিলেন। এঁরাই ছিলেন হিটলারের ক্ষমতা দখলের অন্যতম সাহায্যকারী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ। স্তালিন ও হিটলার ভয় করতেন এঁদের, পাছে এঁরা তাঁকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন।

এরপর স্তালিন সৈন্যবাহিনীর বড় কয়েকজনকে জড়ালেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের বড়কর্তা গামারনিকের বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হলো। গামারনিক তা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না তিনি। ১৯৩৭ সালের ১লা জুন। গামারনিক আত্মহত্যা করে স্তালিনের মৃত্যুদণ্ড থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। ১১ই জুলাই, তুকাভেস্কী ও সামরিক বিভাগের

আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ অধিকর্তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন স্তালিন। ঘোষণা করলেন আসামীরা নাৎসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সব যেন সাজানো গল্প। স্তালিন ও তাঁর সঙ্গীরা বেপোরোয়া হয়ে উঠল।

এরপর ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেন রাজনৈতিক পুলিশের আর এক কর্তা যাগোদাকে। সোভিয়েত জনগণ চমকে উঠল। তারা মনে করল কে বিশ্বস্ত, আর কে বিশ্বস্ত নয় স্তালিন তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। কে দোষী, কে নির্দোষ ? কে কাকে গ্রেপ্তার করছে ? রুশ জনগণের মনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। রাশিয়ার যে প্রগতি দেখা গিয়েছিল তা তিরোহিত হলো। স্তালিন ঘোষণা করলেন দেশ যত সমাজতন্ত্রের নিকটবর্তী হবে ততই শত্রুর সংখ্যা বাড়বে।

১৯৩৭ সালটা সোভিয়েত জনগণের তীব্র মানসিক সংঘাতের বছর। বহু গ্রেপ্তারের কোন কারণ থাকতো না। ভুল লোককে যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য গ্রেপ্তার করা হতো ও নির্বাসনে পাঠাতো। লক্ষ লক্ষ লোক নির্বাসনে, অনাহারে ও অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা তুললেন। তিনি বললেন অত্যাচার আরম্ভ হয় সার্জাই কিরভের হত্যার পর থেকে। সৎ কম্যুনিস্টরাও এ অত্যাচারের হতে থেকে রেহাই পায়নি। পুলিশের সর্বময় কর্তা যাগোদাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। সোচিকে যাগোদার জায়গায় বসালেন। স্তালিন তাঁকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর তাঁর একান্ত অনুরাগী য়েঝভকে বসালেন যাগোদার জায়গায়। সোচিকে অপসারণ করলেন। য়েঝভকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করলেন।

১৯৩৭ সাল থেকে উৎপীড়নের বান ডাকলো। গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে যেতে আরম্ভ করল। এ সংখ্যা বেড়ে দশগুণ হলো। য়েঝভ এমন লোককে গ্রেপ্তারের তালিকায় রাখতেন যাদের শুনানীর আগেই দণ্ড ঠিক হয়ে থাকতো স্তালিনের নির্দেশেই। ক্রুশ্চেভ যথার্থই বলেছেন যে স্তালিনের মন ছিল অসম্ভব সন্দিগ্ধ। স্তালিন য়েঝভের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিলেন। সন্দেহবশে লোককে গ্রেপ্তার করতে এবং নির্বিচারে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করতে তিনি য়েঝভকে নির্দেশ দিলেন।

তাই য়েঝভের হুকুম মতো সন্দেহভাজন লোকদের উপর অত্যাচার চলতো। স্তালিনের যুক্তি আর য়েঝভের রিপোর্টের ওপর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্বাস জন্মাল। ক্রুশ্চেভ বলেছেন কলকাঠি আসলে ছিল নাৎসী দালালদের এবং নীতি বিবর্জিত চাকরিতে উন্নতিকামী উচ্চপদস্থ অফিসারদের হাতে।

সলঝেনিৎসন বলেছেন ১৯৩৭ সালের আগে-পিছে যেভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড রাশিয়াতে হয়েছে তার সূত্রপাত কিন্তু জারের আমলে। লেনিনের আমলে আতঙ্কের মধ্য দিয়ে তার পরিপুষ্টি ঘটেছিল। আর স্তালিনের আমলে তার নগ্নরূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

ভালো ভালো কম্যুনিস্টদের অভিমত হচ্ছে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বিপ্লবের আশুফল ধরে রাখার জন্য একটা রাজনৈতিক পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তবে একটা জবর-

দণ্ড পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করা সহজ কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তার ক্ষমতা খর্ব করা শক্ত। এই কথা তাদের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী বিক্রমন নায়ার তাঁর "দুই ইউরোপের দিনলিপি" বইতে স্তালিন সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন "মেদভিদেভ বলেছেন গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে মৃতদের সংখ্যা ৬০ লাখের বেশি হতে পারে না (ইউরোপে নাৎসী শাসনে নিহত ইহুদীদের দুই-তৃতীয়াংশ) আর সলঝেনিৎসন (যিনি পুরনো জেক শ্রমশিবিরবাসী বলে গর্বিত) বলেছেন গুরকুটা, নরিসিষ্ক ও কারাগাগুায় সমাধি ঘটেছে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষের। একদিকে হিটলারের ইহুদী নিধন যার উৎস জাতিবিদ্বেষ অন্যদিকে স্তালিনের প্রতিবিপ্লবীদের হত্যাকাণ্ড বছর ৫০ আগে পৃথিবীর চিন্তাশীল লোককে এর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয়েছিল। পথ নির্বাচন সহজ ছিল না নিশ্চয় কিন্তু পলায়নের রাস্তা কোথায়?"

রাশিয়ায় স্তালিনের আমলে অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীর সুস্পষ্টরূপ পরিলক্ষিত হয় সলঝেনিৎসনের লেখাতে। এ ছাড়াও রয়েছে মিলোভান জিলাস, রবার্ট কনকোয়েস্ট, আর্থার কোয়েসলার, বরিস পাস্তারনেক প্রমুখ প্রসিদ্ধ লেখকের লেখা। তাঁদের লেখার মধ্যে স্তালিনের শাসনকালের যে বীভৎস বর্ণনা রয়েছে তাও হৃদয় বিদারক। অবশ্য সলঝেনিৎসন গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে মোট ১১ বছর বন্দীদশায় ছিলেন। সেখানকার অত্যাচার কাহিনী তিনি লিখেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

মিলোভান জিলাস, আর্থার কোয়েসলার, আঁদ্রে জিদ প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকগণ কিন্তু কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। স্তালিনের শাসনকালে তাঁরা রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। স্তালিনের শাসনের যে অত্যাচারের কাহিনী তাঁরা লিখেছেন তাও তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা তবে সলঝেনিৎসনের মত তাঁদের ১১ বছর শ্রমশিবিরে থাকতে হয়নি।

আলেকজাণ্ডার আইসেভিক সলঝেনিৎসন ১৯১৩ সালে কিসলোভডস্কে (Kislo-vodsk) জন্মগ্রহণ করেন। রোস্তব (Rostov) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে স্নাতক হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যে করসপণ্ডেস কোর্সে ভর্তি হন এবং সাহিত্য বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন।

সামরিক বাহিনীতে তিনি ছিলেন আর্টিলারী অফিসার। সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে সীমান্ত এলাকায় তিনি বেশ কয়েক বছর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। পরে তিনি সামরিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন। সলঝেনিৎসন ১১ বছর গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের বন্দীশিবিরে ছিলেন। প্রথমে কিছুদিন তাঁকে রাখা হয় সাধারণ শ্রমশিবিরে 'আর্কেটিক অঞ্চলে'।

এরপর তাঁকে রাখা হয় বেরিয়ার বিশেষ শিবিরে। এখানে তাঁকে বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। এই শিবির জীবনের বর্ণনা রয়েছে তাঁর 'One day in the life of Ivan Denisovich' বইতে।

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পান। তারপরও তাঁকে তিনবছর প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়। যদিও এসময় স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে থাকার

অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি রিয়েজানের (Ryazan) কাছে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হন।

১৯৬০ সালে তিনি তাঁর 'One day in the life of Ivan Denisovich' বইখানি আলেকজাণ্ডার টিবারডভস্কিকে (Alexander Tvardovsky) পড়তে দেন। তিনি ছিলেন নভিমুর (Novy Mur) অর্থাৎ (নূতন পৃথিবী) বা New World নামক একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক।

ক্রুশ্চেভের অনুমতি নিয়ে ১৯৬২ সালে নভিমুরের বিভিন্ন সংখ্যায় তার লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই পুস্তক খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে রুশ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কিছু প্রভাবশালী লেখক তাঁকে জোর আক্রমণ করে দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। তারা অভিযোগ করেন যে তিনি রুশ শত্রুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। ১৯৭০ সালে রুশ লেখক সমাজ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন।

১৯৫৮ সালে তিনি তাঁর "The Gulag Archipelago" (মূল বইটির নাম "আর্থিপেলাগ গুলাগ") বইখানা লিখতে শুরু করেন। এই বইটি লিখতে গিয়ে তিনি শালামভের "কোলিমা কাহিনী", দিমিত্রি ভিৎকভ্স্কি, গিন্সবার্গ প্রমুখ সাহিত্যিকদের বিভিন্ন লেখার সঙ্গে পরিচিত হন। স্তালিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁদের বিভিন্ন চিঠিপত্র ও লেখা সলঝেনিৎসনকে তাঁর তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। তিনি এসব বিদগ্ধ লেখকের তথ্যগুলি তাঁর বইতে তুলে ধরেছেন।

সলঝেনিৎসনের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে ১৯৭৩-এর আগষ্টের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তিনি বইটি প্রকাশ করার স্থিরসিদ্ধান্ত নেন। বই-এর পাণ্ডুলিপির একটা অংশ তিনি লেনিনগ্রাদের এক মহিলার কাছে সুরক্ষিতভাবে রাখার জন্য দিয়েছিলেন। সোভিয়েত নিরাপত্তা বিভাগের কর্তারা তা টের পায় এবং মহিলাকে দীর্ঘ-জিজ্ঞাসাবাদ ও নিপীড়নের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির গোপন কথা তারা জানতে পারে। তারপর মহিলাকে দৈহিক অত্যাচার করে তারা মহিলার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে।

এই ঘটনা মহিলাকে ভীষণ আঘাত দেয়। সলঝেনিৎসনকে কিভাবে তিনি মুখ দেখাবেন এরপর সেই চিন্তায় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন। মনের দুঃখে বিবেকের তীব্র দংশনে মহিলা আত্মহত্যা করেন। এই ব্যাপারে সলঝেনিৎসন কি করবেন হঠাৎ ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না। পরে স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা ভাবনা করে তিনি বইটি ছাপাবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পারলেন বইটির একটা অংশ যখন রুশ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর হস্তগত হয়েছে তখন বইটি প্রকাশ না করে কোন উপায় নেই। প্যারিস থেকে বইটি প্রথম প্রকাশ লাভ করে।

১৯৭৪ সালে বইটি প্রকাশিত হলে তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। বইটির প্রতি পাতায় রয়েছে স্তালিন শাসনের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী। তাঁর লেখা অন্যান্য বই "Cancer Word", 'August 1914', "The Love Girl and the

Innocent" রুশ তথা বিশ্ববাসীর মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। বরিস পাস্তারনেকের পর সলঝেনিৎসনই রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও লেখক। ১৯৭০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

স্তালিন যে লক্ষ লক্ষ লোককে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে অসহনীয় অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে সলঝেনিৎসনের বিভিন্ন বইতে। তবে তাঁর 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ' বইতে তিনি স্তালিনের অত্যাচারের যে বীভৎস ও জীবন্ত বর্ণনা তুলে ধরেছেন তার কিছুটা উল্লেখ করলে পাঠক সাধারণ বুঝতে পারবেন হিটলারের বন্দী-শিবিরের অমানুষিক অত্যাচারের সঙ্গে এর বিশেষ কিছু তফাৎ নেই।

সলঝেনিৎসন বলেছেন যে, "গ্রেপ্তার এমনই চোখ ধাঁধানো বজ্রপাত যা বর্তমানকে অতীত করে অতীত-অসম্ভবকে করে সর্বশক্তিমান।" গ্রেপ্তার করে মানুষটিকে ধরে নিয়ে যাবার পর ঘরে চলত স্তালিনের বর্বর পুলিশবাহিনীর তাণ্ডব! ওদের তল্লাসিতে কেউ রেহাই পেতো না। ঘরের জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিন্ন করে, তন্ন তন্ন করে কি যেন তাঁরা খুঁজতো। লোকোমোটিভ ইন্‌জিনীয়ার ইলোশিন সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর ঘরে চলল তাণ্ডব। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল স্তালিনের জল্লাদবাহিনী। পাশে পড়েছিল তাঁর সদ্যমৃত সন্তানের মৃতদেহের কফিন।

বের্কষ্টাইনকে ১০৪° জ্বরের মধ্যে হাসপাতাল থেকে তুলে বন্দীশিবিরে নিয়ে গেল স্তালিনের গোপন পুলিশ। কারপুনিচের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৬ সালে ভরোবিয়েভ ছিলেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক। অত্যন্ত সৎ মানুষ। আলসার অপারেশনের জন্য তিনি তখন হাসপাতালে। অপারেশনের মাঝপথে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে অর্দ্ধমৃত অবস্থায়।

গ্রেপ্তারের ঘণ্টা যখন জোর বাজতে থাকতো তখন বাড়ি থেকে বের হবার সময় পুরুষরা স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেত। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। খুব কম লোকই আত্মহত্যা করত। স্তালিনের পুলিশী রাষ্ট্রে মানুষগুলো যেন মেষশাবকে পরিণত হয়েছিল। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর অত্যাচার নিরীহ জার্মান জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। জার্মান জনগণের মনে গেস্টাপোবাহিনীর এ অত্যাচার এত ভীতির সঞ্চার করেছিল যে তাদের সামনে কেউ খুন হলেও তাঁরা কিছু বলত না। নেহাৎ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ন্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে নীরবে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির আর্ত চিৎকার শুনতো।

স্তালিনের রাজত্বের শেষদিকে ইহুদী গ্রেপ্তারের ঢেউ উঠেছিল ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিচারে ৫২জন ডাক্তারকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। এঁরা সকলেই ছিলেন ইহুদী। এ থেকে বুঝা যায় স্তালিন তাঁর রাজত্বের শেষদিকে ইহুদী নিধনে মেতে উঠেছিলেন।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে বন্দীদের স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য তাদের গলায় লবন জলের ডুশ দিয়ে একদিন বাক্সবন্দী করে রাখা হতো। সারাদিন পিপাসা পেত। কিন্তু

জল মিলত না। যন্ত্র দিয়ে পিঠের চামড়া ক্ষতবিক্ষত করা হতো। তার উপর তারপিন তেল ঢেলে দেওয়া হতো।

ব্রিগেড কমাণ্ডার রুডলফ পিনৎসভের এ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। উপরন্তু নখের তলায় সূঁচ ফোটানো, পেট ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত জল খাওয়ানো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার বন্দীদের ওপর চালানো হতো।

বন্দীদের নিম্নাঙ্গ উলঙ্গ করে মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দু'পা ফাঁক করে রাখা হতো। তারপর ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গের ওপর চাপ দেওয়া হতো। এরকম অত্যাচার চলতো যতক্ষণ না বন্দীরা সব স্বীকার করতে রাজি হতো। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে অধিকাংশ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নিজের গ্রেপ্তারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নির্দয়ভাবে অপরের গ্রেপ্তারের সহায়ক হয়েছেন।

সলঝেনিৎসন লিখেছেন যে, বাচ্চা ছেলের মত চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে গিয়ে তিনি ও নিকোলাই গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। নিকোলাই ও সলঝেনিৎসন যুদ্ধের সময় যুদ্ধরেখার দুই প্রান্ত থেকে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতেন। তাতে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা দেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খোলাখুলি মন্তব্য করতেন। স্তালিনের নিষ্ঠুর শাসন সম্পর্কে বলতেও তাঁরা পিছপা হতেন না। শুধু সলঝেনিৎসন ও নিকোলাই নয় স্বয়ং লেনিনের বড় ভাই উইলিয়ানভও এরকম অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। উইলিয়ানভ চিঠিপত্রে সরাসরি স্তালিনের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেন।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের বন্দীদের থেকে কথা আদায় করার জন্য কারারক্ষী অফিসারের নির্দেশে তাদের ওপর প্রহার আরম্ভ করা হতো। পাশে থাকতো ডাক্তার। প্রহারে প্রহারে তারা অজ্ঞান হয়ে যেতো। তারপর তাদের জ্ঞানহীন দেহ বরফের মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো। কদাচিৎ জ্ঞান ফিরে এলে তার উপর আবার চলত প্রহার। ডাক্তার পরামর্শ দিতো প্রহার চালিয়ে যেতে। এভাবে প্রহারে প্রহারে মেরে ফেলা হয়েছে লক্ষ লক্ষ বন্দীকে।

ডাক্তার তারপর সার্টিফিকেট দিত হৃদরোগে বা সিরোসিস লিভারের দরুন মৃত্যু ঘটেছে। স্তালিনের অত্যাচার আর হিটলারের অত্যাচারের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে স্তালিন হিটলারের মত বন্দীদের খতম করার জন্য গ্যাস চেম্বারের সাহায্য নিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

স্তালিন সব সময় আততায়ীর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন। যেমন থাকতেন হিটলার। হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর কয়েকজন সেনাপ্রধান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। হিটলারকে তাঁরা মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে হিটলার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান অন্তত তিন তিনবার। স্তালিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু হিটলারের মত তাঁকে আততায়ীর বোমার আঘাতে আহত হতে হয়নি। তথাপি স্তালিন সবসময় আতঙ্কে থাকতেন।

সলঝেনিৎসন বলেছেন মার্ক্স ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন

তাঁর বইতে। সেই পুঁজিবাদী ইংলণ্ড যখন হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত তখন কিন্তু ইংলণ্ডে স্বদেশের শত্রুর কথা শোনা যায়নি। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় স্তালিন তাঁর বিরুদ্ধে স্বদেশের লক্ষ লক্ষ শত্রু আবিষ্কার করলেন। তাই তিনি সন্দেহবশে এমন কি বিনাবিচারে তাদের অনেককেই সংহার করলেন।

আবার যে সমস্ত রুশ জার্মানীর বন্দীশিবির থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরত তাদের স্তালিনের নির্দেশে স্বগ্রামে ফেরার সুযোগ দেওয়া হতো না। স্তালিন মনে করতেন এই সমস্ত রুশবন্দী স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ইউরোপের বিভিন্ন খবর পরিজ্ঞাত করবে। গ্রামবাসীরা এদের কথা শুনে পাছে স্তালিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এ ভয়ে এদের আবার গ্রেপ্তার করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হতো। একমাত্র রুশ সেনাদলের বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে মরা ছাড়া এই সমস্ত অসহায় রুশদের করার কিছুই থাকত না।

হিটলারের নির্দেশে নাৎসী বাহিনীর যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আত্মসমর্পণের অধিকার ছিল না। তদ্রুপ স্তালিনের নির্দেশে পরাজিত রুশ সেনাবাহিনীও আত্মসমর্পণ করতে পারত না। যুদ্ধ ও মৃত্যু দুই-ই পৃথিবীতে আছে। অথচ লালফৌজ ও নাৎসী বাহিনীর যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আত্মসমর্পণের অধিকার নেই। কি অদ্ভুত মিল দুই বিপরীত মেরুর দুজন চিন্তানায়কের মধ্যে।

সলঝেনিৎসন তাই যথার্থই বলেছেন হিটলারের একনায়ক ভ্রাতা হচ্ছেন স্তালিন। হিটলার ও স্তালিন দু'জনই সমানতালে পা মিলিয়ে চলছিলেন। দু'জনের সুরও ছিল প্রায় একই রকম। হিটলার ও স্তালিনের গুপ্তচর বাহিনীই ছিল তাঁদের বীভৎস পাগলামির অন্যতম নিদর্শন। হিটলারের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী আগের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

স্তালিন সব সময় ভাবতেন সারা দেশে যেন গুপ্তচর থিকথিক করছে। সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের অধিবাসী সব চীনাকে বন্দী করে উত্তরাঞ্চলে পাঠানো হলো। সেখানে অনাহারে ঠাণ্ডায় সকলেই করল মৃত্যুবরণ। গুপ্তচরবৃত্তির অপবাদ দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হলো। বিনা বিচারে বা বিচারের প্রহসন করে তাদের সকলকে কাজাকিস্তানে নির্বাসন দেওয়া হলো। এ সমস্ত অসহায় হতভাগ্য কোরিয়ানের মধ্যে কয়জন শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

বিদেশে পড়াশুনা করা সোভিয়েত নাগরিক, বিদেশীদের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলা সোভিয়েত নাগরিক সবই স্তালিনের চোখে ছিল গুপ্তচর। সন্দেহ বাতিক, নিষ্ঠুর, ব্যক্তি পূজার বিশ্বাসী স্তালিনের সন্দেহবশে মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচারের এরকম হাজার মর্মন্তুদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করা যায়। স্তালিন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন গুপ্তচর থাকলে তাকে ধরার জন্য ৯৯৯ জন নির্দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে যদি তারা আসল গুপ্তচরকে ধরিয়ে না দেয়।

রাশিয়ার অন্যতম মিত্র ইংলণ্ড স্তালিনের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য নানান উপায় অবলম্বন করেছিলেন যুদ্ধ শেষে জার্মানীর পরাজয়ের পর। তাঁর অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি

পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হলো। এতে পাঠকবর্গ ইংলণ্ডের মানসিকতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন। ইয়ালটা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্তালিন চার্চিলের কাছ থেকে এ সুযোগ নেন।

১৯৪৫ সালের মে মাস। ইংলণ্ড যুগোশ্লোভাকিয়ার যুদ্ধ প্রত্যাগত পঁয়তাল্লিশ হাজার কশাক সেনাকে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করল। সঙ্গে সৈন্যদের পরিবারবর্গও ছিল। ছিল শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও যুবক-যুবতী।

এ সমস্ত কশাক সৈন্যরা স্তালিনের চোখে ছিল দেশদ্রোহী। তারা যুদ্ধ শেষে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্তালিনের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে না। ইংলণ্ডে স্থান না হলে তারা দূরদেশে চলে যাবে। কশাক সৈন্যদের যে সমস্ত জেনারেল ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন দেশত্যাগী রুশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁরা ইংলণ্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের প্রবক্তা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনে এঁদের জন্য এতটুকু দয়া বা অনুকম্পা হলো না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এঁদের স্তালিনের হাতে তুলে দেবার আদেশ দিলেন। প্রমাণ করলেন কত বড় বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর তাঁরা হতে পারেন।

ইংরেজরা কশাক সৈন্যদের তাদের বাহিনীতে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলো। রেশন, পোষাক প্রভৃতি দেবার অঙ্গীকার করল। কশাক সৈন্যদের হাত থেকে সুকৌশলে অস্ত্রগুলি কেড়ে নিল উপযুক্ত মানের অস্ত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কশাক সৈন্যরা ইংরেজদের অবিশ্বাস করতে পারল না। প্রতারণা করে ইংরেজরা সাধারণ সৈন্যদের কাছ থেকে অফিসারদের সরিয়ে নিল। কশাক সৈন্যরা অস্ত্রহীন হলো। মেজর ডেভিসের ওপর এ সমস্ত কশাক সৈন্যকে স্তালিনের হাতে তুলে দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল।

মেজর ডেভিস কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে এক বিপুল সংখ্যক ইংরেজ সেনা নিয়ে নিরস্ত্র কশাক সেনাদের কাছে হাজির হলেন। অনেকটা ধূমকেতুর মত। হঠাৎ ঘোষণা করলেন কশাক সেনাদের সোভিয়েতের হাতে তুলে দেবার জন্য তাঁর ওপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এসেছে। ১লা জুন তাদের সোভিয়েতের হাতে তুলে দেবার যে সব ব্যবস্থা পাকা তাও ডেভিস কশাক সেনাদের জানিয়ে দিলেন।

কশাক সেনাদের তীব্র প্রতিবাদে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো "আমরা যাব না"। শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীরা যিশুর নাম স্মরণ করতে লাগল। স্তালিনের হাতে যে তাদের মৃত্যু অবধারিত সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। গণতন্ত্রের হোতা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মন তাতে এতটুকু বিচলিত হলো না।

অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যরা ডেভিসের নির্দেশে নির্বিচারে বিদ্রোহী কশাকদের ওপর লাঠি চালালো। বহু কশাক আহত হলো। রাইফেলের কুঁদো ও লাঠির ঘা মারতে মারতে ইংরেজ সৈন্যরা আহত কশাকদের গাড়িতে তুলতে লাগলো। অনেকেই পালাবার জন্য দ্রাভা নদীতে ঝাঁপ দিলো। চার্চিল বিদ্রোহী কশাক সেনাদের দমন করার জন্য ট্যাঙ্ক পাঠালেন ইংরেজ সৈন্যসহ। যে সমস্ত কশাক পালাবার চেষ্টা করল তাদের

ওপর নির্দয়ভাবে গুলি চালানো হলো। কশাকের রক্তে নদীর জল রক্তিম হয়ে উঠল। গুলির আঘাতে এবং ইংরেজ সৈন্যের বুটের তলায় পিস্ট হয়ে বহু কশাক সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। নীচে দ্রাভা নদীর তীরে কবরে কান পাতলে এখনো তাদের করুণ কান্নার ধ্বনি শোনা যাবে!

এ সময়ে যুগাবতার চার্চিল যুগশ্লাভ সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য হাজার হাজার যুগশ্লাভ সরকার বিরোধীকে যুগোশ্লাভ কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে তুলে দিলেন। এদের নৃশংসভাবে হত্যা করল যুগশ্লাভ সরকার। আর স্তালিন হত্যা করল যুগশ্লাভ প্রত্যাগত হাজার হাজার কশাকসৈন্যকে। এদেরই জোর করে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্তালিনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। নিরস্ত্র এ সমস্ত মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার ব্যাপারে গণতন্ত্রের পূজারী ইংলণ্ডের সুধীবৃন্দ কোন প্রতিবাদ করেননি! এখানেই রয়েছে ইংলণ্ডের জনগণের মানসিক দীনতার সুস্পষ্ট পরিচয়।

রুজভেল্ট ও চার্চিল স্বনামধন্য। তাঁদের মিলিত প্রয়াস স্তালিনকে খ্যাতির শীর্ষে তুলে নিয়ে গেছে। জার্মানী, বৃটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের লক্ষ লক্ষ স্তালিন বিরোধী আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক রুশনাগরিককে নির্মূল করার জন্য স্তালিনের হাতে তারাই তুলে দিয়েছেন জোর করে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে। মানবতাবাদের প্রবক্তা বলে গর্বিত দুই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানের বর্বর মানসিকতা সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করবে। বলা যেতে পারে স্তালিন শাসনের শেষদিনগুলিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া স্তালিন এত লোককে খুন করতে পারতেন না।

স্তালিনের নিষ্ঠুরতার অন্যতম নিদর্শন বন্ধু ট্রটস্কিকে হত্যা। জিনোভিয়েভ ও কামনেভের সাহায্যে স্তালিন ১৯২৯ সালে ট্রটস্কিকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেন। ট্রটস্কি চলে যান মেক্সিকোতে। সেখানে স্তালিনের ষড়যন্ত্রে সোভিয়েত আততায়ীর হাতে ট্রটস্কি নিষ্ঠুরভাবে খুন হন।

'বুখারিন হত্যা' স্তালিনের আর এক বৃহত্তম নিষ্ঠুরতার নিদর্শন। বুখারিন ছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ ও রুশ সংবিধানের প্রবক্তা। তবে সংকীর্ণমনা। বুখারিনকে হত্যার আগে স্তালিন জিনোভিয়েভ ও কামনেভকে হত্যা করেছেন। সেই সময় বুখারিন ছিলেন স্তালিনের পদলেহী। জিনেভিয়েভ ও কামনেভকে সার্জাই কিরভ হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে স্তালিন যখন মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন বুখারিন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তখন বুখারিন বুঝতে পারেননি এরপর তাঁর পালা।

তাই সলঝেনিৎসন যথার্থই বলেছেন, "বুখারিন আমাদের শ্রবণ-সুখকর বর্তমান সংবিধানের সবটুকু রচনা করেছিলেন। সেই খুশির আমেজে তিনি মেঘলোকে বিচরণ করতেন। ভাবটা যেন তিনি কোবাকে (স্তালিনের পার্টি প্রদত্ত নাম) খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন; তাঁর উপর এমন সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি একনায়কতন্ত্রের মুঠি শিথিল করতে বাধ্য হবেন। ঠিক এমন সময় বুখারিন যাঁতিকলে ধরা পড়লেন।"

বুখারিন গৃহবন্দী হলেন। প্রিয় কোবাকে বুখারিন প্রচুর চিঠি দিলেন। উত্তর পেলেন না। স্তালিন হয়ত ভুরু কুঁচকে নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন।

বুখারিন অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তিনি ট্রটস্কি পন্থীদের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন যে ওরা পার্টি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এখন তার ফল ভোগ করুক। সব পার্টি কর্মীর এক থাকা উচিত। ভুলভ্রান্তি যাই থাকুক না কেন। আবার জিনোভিয়েভ এবং কামনেভের মৃত্যুদণ্ড আইনসঙ্গত বলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। স্তালিনের এত পদলেহন করেও তিনি কিন্তু মুক্তি পেলেন না।

স্তালিন স্থির করে রেখেছিলেন তাঁর চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কাউকে তিনি তাঁর পলিটব্যুরোতে সদস্য হিসেবে রাখবেন না। মিথ্যা মামলা সাজানো হলো বুখারিনের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে মহাসমারোহে বুখারিন রচিত সংবিধান গৃহীত হলো। এই সংবিধানের নামকরণ করা হলো স্তালিন সংবিধান। তাঁর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা সাজানো হচ্ছে বুখারিন তার কিছুই টের পেলেন না।

পলিটব্যুরোর অন্যান্য নেতৃবর্গের সামনে বুখারিনকে নিয়ে আসা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে পিয়াতাকভ অতি জঘন্য ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। বুখারিন ছিলেন অতীব দুর্বলচিত্তের লোক। মৃত্যুভয়ে সদাসর্বদা ভীত হয়ে থাকতেন। অথচ সেই মৃত্যুদণ্ডই তার ওপর প্রয়োগ করল বন্ধু স্তালিন।

কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। অবশ্য কারও প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। বুখারিনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। এভাবে একজনের পেছনে আর একজনকে লাগিয়ে স্তালিন একে একে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করলেন। স্তালিন বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ রাশিয়ানরা তাঁর মেষশাবক আর বুদ্ধিজীবীরা তাঁর স্তাবক। আর তিনি ব্যাঘ্র। যাকে তাঁর সন্দেহ হবে তাকে তিনি খেয়ে ফেলবেন। নিজের উদরপূর্তি হবে। দেহে বল ও মনে সাহস পাবেন।

সলঝেনিৎসন বলেছেন যে, "যে কোন সমাজে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ হয়। কিন্তু যখন হয় কত সহজেই হয়ে যায়। ১৯২২, ১৯৩৪, ১৯৩৭ সালেও বিরোধীরা নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থির থেকে মাথা উঁচু করে সম্মোহিনী গীতির জবাবে চিৎকার করে বলতে পারেননি; "আমরা তোমাদের মত বিপ্লবী নই; আমরা তোমাদের মত রুশ নই; আমরা তোমাদের মত কম্যুনিস্ট নই।"

"যদি ঐরকম চিৎকার কেউ করত সব মঞ্চসজ্জা ধ্বসে পড়ত······প্রযোজক পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উধাও হতেন, নেপথ্য কথকের দল ইঁদুরের গর্তে লুকাত"। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়।

স্তালিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার লোক বিক্ষুব্ধ ছিল—তাঁর বিরুদ্ধে শ্বেত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিরোধী একলাখ সৈনিক নিয়ে জাতীয়তাবাদী সেনাদল গঠিত হয়েছিল। তুর্কিস্থানে রুশ বিরোধী ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল। এরকম ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল ক্রিমিয়ায় তাতারদের দ্বারা।

রুশ জেনারেল ভলাসভ, জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে স্তালিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হলেন। জার্মান অধিনায়ক কর্নেল বয়ারস্কির সঙ্গে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, "নব্য রাশিয়ার সমস্তের দাবী মানতে জার্মানী প্রস্তুত হলে অধিকাংশ সোভিয়েত সেনা এবং জনগণ সোভিয়েত সরকারের বিনাশ চাইবে।" তদুপরি প্রাক্তন সোভিয়েত নাগরিক দ্বারা স্তালিনের বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত দল পরিচালনার ভার ছিল জার্মান অফিসারদের উপর।

জার্মানরা দক্ষিণ রাশিয়া দখল করার পর স্বেচ্ছাসেবী ব্যাটালিয়ন বাড়ল। স্মোলেনস্ক এবং পেস্কভের প্রেক্ষাগৃহে মহতী সভার ব্যবস্থা করলেন ভলাসভ্। প্রেক্ষাগৃহে রুশজনগণের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না। ভলাসভ্ জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তিনি রাশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব ও লক্ষ্য বর্ণনা করলেন। তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন নাজিবাদ রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণীয় না হলেও হিটলারের সহায়তা ব্যতিরেকে স্তালিনের বলশেভিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধের শেষদিকে লক্ষ লক্ষ রুশ স্তালিনের আওতার বাইরে ছিল। তাদের তখন যথেষ্ট শারীরিক ক্ষমতা ছিল। সুযোগ পেলে তারা বলশেভিক দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারত। ভলাসভের মাধ্যমে তারা হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করল। ৮/৬/৪৩ তারিখে অর্থাৎ কুর্স্ক-ওরিয়েল যুদ্ধের ঠিক আগে হিটলার জানালেন স্বাধীন রুশবাহিনী কখনই গঠিত হবে না। তিনি আরও জানালেন যে জার্মানীর রুশদের প্রয়োজন শুধু শ্রমিকের কাজের জন্য।

আত্মম্ভরী হিটলারের বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে একমাত্র শোষিত, নিপীড়িত মানুষের জাগরণ ও আন্দোলন দ্বারাই স্তালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে বলশেভিক শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর হিটলারকে ককেশাসেও হার মানতে হলো। তারপর স্তালিন বিরোধী রুশজনগণের কাছ থেকে এরকম সাহায্যের আশ্বাস পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। স্তালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার অন্যতম সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন।

স্তালিন সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান গীর্জা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। রুশবাহিনীর অফিসারদের সম্মান চিহ্ন প্রদান করলেন। রুশ জনগণের কাছে পিতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের আহ্বান জানালেন। এভাবে তিনি পিতৃভূমির রক্ষকের মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। রুশ-জনগণ স্বদেশ রক্ষার্থে সাধারণভাবে স্তালিনের পাশে দাঁড়ালো তাঁর এত অত্যাচার সত্ত্বেও।

হিটলারের অপরিণামদর্শী চিন্তাধারা স্বাধীন রুশ বাহিনী গড়ার সব পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিলো। জার্মানীর রাশিয়া বিজয়ের ক্ষীণ আশাও তিরোহিত হলো। বলদর্পী হিটলারের পতনের পথ তৈরি হলো নিজের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। Alan Bullock বলেছেন যে, "The sin which Hitler committed was that which the ancient Greeks' called hybris, the sin of overweening pride of believing himself to be more than a man. No man was ever more surely destroyed by the image he had created than Adolf Hitler."

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে হিটলারের জীবনে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এত সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের মিথ্যে অহমিকার জন্য তিনি বহুক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই তৈরি করেছেন। এখানেই রয়েছে তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি।

জার পলের আমল থেকে সরকারিভাবে রাশিয়াতে প্রাণদণ্ড তুলে দেওয়া হয়। তবে গোপনে প্রাণ নাশ করা কোন সময় বন্ধ ছিল না। বরঞ্চ এ সংখ্যা জারের আমলে ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। দাসদের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার চলতো তা কারও অজানা নয়। অত্যাচারের ফলে মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতো।

১৯০৫ সালে রুশ বিদ্রোহ যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন এ বিদ্রোহ দমনের জন্য আবার সরকারিভাবে প্রাণদণ্ড চালু করা হয়। প্রাণদণ্ডের সংখ্যা বেড়েই যেতে লাগল। বেড়ে গিয়ে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। টলষ্টয়ের অনুভূতিপ্রবণ মন তাঁর অশ্রুধারা সম্বরণ করতে পারল না। রুশ বিদ্বৎসমাজ কেরেনস্কি সরকারকে ধিক্কার জানাতে লাগল। প্রাণদণ্ড মহামারীর আকার ধারণ করল।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করল। ক্ষমতা দখলের আগে বলশেভিকদের শ্লোগান ছিল, "কেরেনস্কি সরকারের চালু করা প্রাণদণ্ড নিপাত যাক।" লেনিন কিন্তু বিপ্লবের পর ক্ষমতায় এসে প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণরূপে তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহানায়ক লেনিন বুঝেছিলেন যে প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলে নূতন সমাজতন্ত্র গড়ার চেষ্টা ব্যাহত হবে। কিন্তু লেনিনের কমরেডদের মানসিকতা ছিল অন্যরকম। তারা প্রাণদণ্ড সরকারিভাবে বন্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাই লেনিন শতচেষ্টা করেও কমরেডদের তাঁর মতের স্বপক্ষে আনতে পারলেন না।

ফাঁসি দিয়ে সরকারিভাবে প্রাণদণ্ড তুলে দেওয়া হলো ১৯১৭ সালের ২৮শে অক্টোবর। কিন্তু অন্যভাবে প্রাণদণ্ড যেন ঝড়ের বেগে বয়ে চলল। ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে অ্যাডমিরাল অ্যালেক্সি শ্চাস্তনিকে বাল্টিক রণতরী ভেদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শ্চাস্তনি কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করলেন। ট্রটস্কি তখন লেনিনের দক্ষিণ হস্ত। ট্রটস্কির ওপর শ্চাস্তনির বিচারের ভার দেওয়া হলো। ট্রটস্কির নির্দেশে শ্চাস্তনির সামরিক আদালতে বিচার হলো। বিচারে শ্চাস্তনিকে ফাঁসি দেওয়া হলো না কিন্তু গুলি করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হলো। শ্চাস্তনিকে কেউ বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এলো না। গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হলো।

সলঝেনিৎসনের বই থেকে জানতে পারা যায় যে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রাণদণ্ড আবার চালু হয়। তবে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান সরকারিভাবে চালু হয়নি। গুলি করে বা অন্য উপায়ে সন্দেহভাজন লোকদের খতমের নতুন রীতি চালু করা হলো। তাই এটাকে প্রাণদণ্ডের নবরূপায়ণ বলা যেতে পারে। জুন ১৯১৮ থেকে অক্টোবর ১৯১৯ পর্যন্ত এই ষোল মাসে রাশিয়ার ২০টি প্রদেশে ষোল হাজারেরও বেশি লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এ ছাড়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বা প্রকৃত অপরাধীকে হত্যার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হলো। অসংখ্য, অ-নথিভুক্ত, সনাক্তকরণযোগ্য শত সহস্র বন্দীকে ফিনল্যাণ্ডের উপসাগরে, শ্বেতসাগরে, কাস্পিয়ান সাগরে গাদাবোটে করে নিয়ে গিয়ে গাদাবোটসহ ডুবিয়ে দেবার রীতি চালু হলো। প্রাণদণ্ডের নবরূপায়ণ হলো। নামকরণ করা হলো চরমব্যবস্থা। সে আর দণ্ড রইল না। নেতাদের মতে সমাজ সুরক্ষার নূতন উপায় প্রবর্তিত হলো।

সলঝেনিৎসন বলেছেন যে, "ইয়েজেবের লোকেরা বলত ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ এই দু'বছরে সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী এবং ৪,৮০,০০০ স্বভাব চোরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, উক্ত সময়ে গড়ে প্রতি মাসে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ২৮০০০ প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সলঝেনিৎসন তাঁর "The Gulag Archipelago" বইতে স্তালিনের আমলে রুশ বন্দীশিবিরগুলির বীভৎস বর্ণনা দিয়েছেন। স্তালিনের নির্দেশে রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত বন্দী চালান কারগার স্থাপিত হয়েছিল সেগুলোকে মৃত্যুশিবিরও বলা যেতে পারে। কয়েকটি বন্দীচালান কারাগার হলো আইভেনাভো, ভ্লাডিভোষ্টক, কোটলাস, কারাগাণ্ডা, নিয়াঝ-পোগস, ক্রাসনিয়া-প্রেসনিয়া ও সাইবেরিয়ার গোর্কি।

বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যানে করে বন্দীদের চালান দেওয়া হতো। স্টোলিপিন (স্টোলিপিনের নামানুসারে এ গাড়ির নামকরণ করা হয়—এটা বন্দী পরিবহনের রেলগাড়ি), লালগাড়ি (যে গাড়িতে করে গরু ও অন্যান্য পশু বহন করা হতো , গাদাবোট (নদীবক্ষে বন্দী পরিবহনের জন্য) আর ট্রেন। এগুলিকে বন্দী পরিবহনের পিতামহ বলা যায়। আদিকাল থেকেই বন্দীপরিবহনের জন্য এ সব যানকে ব্যবহার করা হচ্ছিল রাশিয়াতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। স্তালিনের আমলে বন্দীদের নিয়ে আসার ও নিয়ে যাওয়ার অবিরাম গতিবিধি লেগেই থাকত। বন্দীদের পরিবহন যানে অন্তিম গন্তব্যস্থল লেখা থাকত। যে সমস্ত বন্দীদের কাগজপত্রে অন্তিম গন্তব্যস্থল লেখা থাকত না তাদের নিয়ে হতো বিপদ। তখন যারা বন্দী চালানের দায়িত্বে থাকত তারাই বন্দী বা বন্দিনীদের ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে দিত। তার জন্য ক্রীতদাসের হাট বসত।

ক্রীতদাসীদের কেনার জন্য বেশ মোটা অর্থ নিয়ে লোক আসত হাটে। লোভী ও ক্ষমতাবানরাই আসত বেশি সংখ্যায়। বুদ্ধিমান ক্রেতা দাবী করত "জ্যান্ত বিবস্ত্র সওদা হাজির করো; নিজের চোখে দেখবো।" বন্দিনীদের বিবস্ত্র হয়ে ক্রেতাদের সামনে হাজির হতে হতো। তবে "যে বন্দিনীরা যুগাতীত ভাস্কর্যের আত্মরক্ষার ভঙ্গী অবলম্বন করত তাদের ওপর হুকুম হতো হাত নামাও।" কথার অবাধ্য হওয়ার উপায় ছিল না। কেননা কথার অবাধ্য হলে তার পরিণতি কি হতে পারে তা তারা জানত। কিন্তু লজ্জার ভূষণ বস্ত্র। তা ত থাকত না। হাত দিয়ে যেটুকু লজ্জা নিবারণ করা যেতো তাও তাদের করতে দেওয়া হতো না। তাই সলঝেনিৎসন কটাক্ষ করে বলেছেন, "হাজার হোক ঐ উচ্চ পদাধিকারীরা নিজেদের এবং সতীর্থদের শয্যাসঙ্গিনী নির্বাচনের মত এক গুরুদায়িত্ব সম্পাদন ত করতো।"

"মানুষ আশা আর অধৈর্যে ভরা জীব।" স্তালিন ও হিটলার মানুষ। তবে তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মাত্রাটা ছিল অত্যধিক। তাই তাঁরা তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহভাজন লোককে রেহাই দেননি তাঁদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য। দোষী খুঁজে বের করার অদ্ভুত নিয়ম ছিল। বেশির ভাগ সময় গ্রেপ্তার করা হতো রাতে। কেননা পরিবহন গাড়িতে বা গাদাবোটে অন্তত এক হাজার বন্দিনী বা বন্দীর জায়গা হতো। এতগুলি লোককে একসঙ্গে বন্দী করতে গেলে গ্রামে-শহরে সাড়া পড়ে যাবে। তাই রাতে সুকৌশলে সন্দেহভাজন লোকদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ ছিল গোপন পুলিশবাহিনীর ওপর।

১৯৩৮ সাল। ওরিয়েল শহরের প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে একজন না একজন পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হলো। স্ত্রীলোকরা ঠেলাগাড়িতে করে ওরিয়েল শহরের কারাগারের কাছে এসে অঝোরে কাঁদল। পুলিশবাহিনীর হাতে পায়ে ধরে মিনতি করল। কিন্তু নিষ্ঠুর ঘাতকের পাষাণ হৃদয়ে এতটুকু ক্ষত সৃষ্টি হলো না। যথানিয়মে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো অজানা দেশের বন্দী কারাগারে। শ্মশানের লেলিহান শিখা যেখানে প্রতিনিয়ত জ্বলছে সেখানে বন্দীদের নিয়ে আসা হলো। তাঁদের কপালে কি ঘটেছিল কেউ তা জানে না।

বন্দীদের সঙ্গে দামী জিনিসপত্র থাকলে স্তালিনের পুলিশবাহিনী হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর মতন আত্মসাৎ করত। কারও সোনা বাঁধানো দাঁত থাকলে তাকে মাটিতে ফেলে যেভাবে হোক সেই দাঁত তুলে নিত। লোকটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাত। নিষ্ঠুর ঘাতকবাহিনী পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠত। স্তালিনের ঘাতকবাহিনী আর হিটলারের ঘাতকবাহিনী যেন একই পথে চলেছে কপট ও নিষ্ঠুর দোসর হয়ে।

সলঝেনিৎসনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ১৯৪২ সালে লেনিনগ্রাদের বন্দী বোঝাই ট্রেনগুলি সোলিকাস্কে খালি করা হতো নিয়মিতভাবে। আর ট্রেনের দুপাশে পড়ে থাকত অসংখ্য মৃতবন্দীর দেহ। মনে হতো হাজার হাজার মানুষ সুখনিদ্রায় শায়িত। সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বিশ্রামরত।

১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের শীতে পোল্যাণ্ড, জার্মানী এবং বাল্টিক অঞ্চলগুলি থেকে বন্দী বোঝাই পরিবহন যান আসত বিভিন্ন বন্দীচালান কারাগারে। প্রতিটি পরিবহন যানের সঙ্গে অন্তত চারটি মৃতদেহ বোঝাই বগি জুড়ে দেওয়া হত। স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে কিভাবে অধিকসংখ্যক বন্দীকে খতম করা যায় স্তালিনের ঘাতকবাহিনীর সেই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, যেমন ছিল হিটলারের গেস্টাপো নেতাদের।

আর্কেটিকের তুষারাবৃত অঞ্চলে জল বরফ জমে যাওয়ার মতন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতের পোষাক-আশাক ছাড়াই নিয়মিতভাবে খোলাগাড়িতে করে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হতো। বন্দীচালান কারাগারে। এসব গাড়িকে অতিক্রম করতে হত ৫০/৬০ মাইল কিংবা তারও বেশিদূর পর্যন্ত রাস্তা। অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত বন্দী বা বন্দিনীরা বেশির ভাগই পথে ভবলীলা সাঙ্গ করত। যারা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনভাবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছত তারাও কিছুদিনের মধ্যে তুষারের কোলে শয্যা নিতো।

বরফের রাজ্যে তাদের নশ্বর দেহ পচে যাবার সম্ভাবনা থাকত না। কোন অশুভ মুহূর্তে ভুলক্রমে কেউ এ সমস্ত বন্দীর লাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে বন্দীদের অবিকৃত দেহ দেখতে পেত। তাদের মনে হতো বরফের শয্যায় হাজার হাজার বন্দী যেন শান্তিতে বরফের লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই লেপ কেউ কোনদিন সরাবে না। স্তালিনের ঘাতকবাহিনী যদি প্রয়োজন মনে করত তাহলে কাউকে কাউকে হয়ত সরিয়ে নিতো এবং বরফ খুঁড়ে কবর দিতো। এখনো হয়ত তুন্দ্রা বা আর্কেটিক বা সাইবেরিয়ার নিচে এ সমস্ত বন্দীদের অবিকৃত মৃতদেহ দেখা যাবে। কোন অভাগা যদি এ সমস্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌছতে পারে সে অসহায় বন্দীদের এরকম পরিণতিতে চোখের জল ফেলবে। বন্দীদের কবরের উপর তার অশ্রু হয়ত সর্ষবত বরফ হয়ে জমা হবে।

গুলাগদ্বীপপুঞ্জের জেক বন্দীদের হাজারে হাজারে গাদাবোটে করে নদীপথে বন্দী-শিবিরে পাঠানো হতো। কুলাকদের খতম করার সময় থেকে উত্তর দ্বিনা, ওব ও ইয়েনিসি নদীপথে গাদাবোটে করে বন্দী পাঠানো শুরু হয়েছিল। নদীগুলিতে পেটফোলা সুপরির মতো গাদাবোটগুলি চলাচল করত বন্দী নিয়ে। এ সমস্ত গাদাবোট অবিরাম গতিতে চলত। গাদা বোটগুলি যেত উত্তরাঞ্চলে।

গাদাবোটের খোলে জায়গা থাকত প্রচুর। প্রচুর বন্দী বা বন্দিনীকে গাদা করে রাখার মতন জায়গা থাকত খোলে। নির্দয় ঘাতকবাহিনী ছেলে বুড়ো যুবক-যুবতীদের হাত বাঁধা অবস্থায় ছুঁড়ে গাদাবোটের খোলের মধ্যে ফেলত একের পর এক। মনে হতো যেন কোন সামগ্রী বোঝাই করা হচ্ছে গাদাবোটে। তার মধ্যে গাদাগাদি করে অনেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ত। কেউ কেউ জীবিত থাকত।

মৃত ও জীবিত বন্দী নিয়ে গাদাবোট তুন্দ্রাঞ্চলে পৌছালে জীবিত বন্দীরা করুণ স্বরে তাদের প্রভুদের কাছে জীবনভিক্ষা করত। প্রভুরা ত বধির! তাই তাদের কর্ণকুহরে বন্দীদের করুণ আর্তনাদের শব্দ প্রবিষ্ট হবার সুযোগ কোথায়? তুন্দ্রাঞ্চলে বন্দীচালান কারাগারে বন্দীদের অযত্নে অবহেলায় উপবাসে মৃতবৎ পড়ে থাকতে হতো। বেশ কিছুদিন অসহনীয় কষ্টে কাটিয়ে তারা প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিতো।

এভাবে সাইবেরিয়ার উন্মুক্ত বরফাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তরে রেল বোঝাই করে বন্দী বা বন্দিনীদের রেখে দিয়ে আসা হতো। সাইবেরিয়াতে ছিল গোর্কি বন্দীচালান কারাগার। খাদ্য পানীয় সব কিছুর অভাব এখানে লেগে থাকত। কিন্তু বন্দীদের নিয়ে আসার স্রোতের কমতি ছিল না। লক্ষ লক্ষ বন্দীকে সাইবেরিয়ার বরফে ঢাকা প্রান্তরে চিরশান্তিতে শুয়ে থাকতে হয়েছে নিয়তির অমোঘ বিধানে।

উত্তর দ্বিনা, ওব ও ইয়েনিসি নদীপথে বন্দীচালান চলেছে গাদাবোটে করে। চলেছে অবাধগতিতে। অবিরাম গতিতে চলেছে স্টোলিপিন গাড়ি। শোনা যেত চাকার তাণ্ডব। নদী বয়ে চলেছে গাদাবোট পেটভর্তি জীবিত ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত এই দু প্রকার বন্দী নিয়ে। অবিরাম গতিতে চলেছে লালগাই। চলেছে রেলগাড়ি। এ সমস্ত বন্দী পরিবহনযানের ভেতর থেকে বাতাসে ভেসে আসত করুণ আর্তনাদের শব্দ।

ভেসে আসত লুণ্ঠিত, লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা, প্রহারে প্রহারে মৃতপ্রায় বন্দী ও বন্দিনীদের গোঙানির শব্দ।

স্তালিনের কানে বন্দীদের গোঙানির শব্দ পৌঁছাত কিনা জানি না তবে এ সমস্ত মৃত্যুর হিসেব উনি রাখতেন। আর উন্মত্ত উল্লাসে তিনি হয়ত ভাবতেন আমি প্রথম এবং অদ্বিতীয়ম। সত্যি তিনি তাঁর যুগে অদ্বিতীয়মই ছিলেন। রাশিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী যারা ছিল তাদের মধ্যে শ্বেত রুশরা (অর্থাৎ প্রাচীন জার শাসকদের বশংবদ লোকজন) ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা চেয়েছিল হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তালিনকে উৎখাত করতে। শ্বেত রুশদের প্রায় এক লাখ মানুষ স্তালিনের বিরুদ্ধে যে কোন সময় বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত। তারা চেয়েছিল হিটলারের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্বাধীন রুশ সেনাবাহিনী গঠন করতে। হিটলার এই সুযোগ গ্রহণ করলেন না। তাদের জানিয়ে দিলেন স্বাধীন রুশ সেনাদল গঠন করতে তিনি আদৌ ইচ্ছুক নন। তিনি সব রুশদের অত্যন্ত নীচজাতের মানুষ বলে মনে করেন। বুদ্ধি ও অদূরদর্শীতা বশত হিটলার নিজের সর্বনাশ ডাকলেন। ডাকলেন সমগ্র জার্মানীর সর্বনাশ। রাশিয়া জয়ের এ রকম সুবর্ণ সুযোগ হিটলার নষ্ট করলেন। একেই বলেই নিয়তি।

আঁদ্রেজিদ, মিলোভান জিলাস, ইগনজিও সিলোন (Ignazio Silone), রিচার্ড রাইট (Richard Wright), ষ্টিফেন স্পেন্ডার (Stephen Spender), আর্থার কোয়েসলার (Arther Kostler) প্রমুখ জ্ঞানীগুণীজন স্তালিন সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। এঁরা সকলেই একসময়ে কম্যুনিজমে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্তালিনের আমলে রাশিয়ায় গেছেন। স্তালিনের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছেন। স্তালিনের নৃশংস অত্যাচার কাহিনী যখন তাঁদের কাছে এসে পৌছত—সেই বীভৎস কাহিনী তাঁদের দেহের লোমকূপ খাঁড়া করে দিতো। কিন্তু করার কিছুই থাকত না। স্তালিনই এঁদের রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে।

মিলোভান জিলাস তাঁর 'Conversation with Stalin' গ্রন্থে বলেছেন যে, সম্প্রতি স্তালিন সম্পর্কে যে সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বুঝা যাচ্ছে 'কিরভ' হত্যার মূল নায়ক ছিলেন স্তালিন নিজেই। কিরভকে গোপনে হত্যা করে স্তালিন রুশ জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁকেও রুশ জনগণের এক অংশ হত্যা করতে প্রস্তুত। কিরভ ছিলেন স্তালিনের সুহৃদ এবং স্তালিনের পরই কিরভের স্থান ছিল রুশ পলিট-ব্যুরোতে। আর কিরভ ছিলেন লেনিনগ্রাদের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক। হত্যার পর স্তালিন সন্দেহবশে শত্রুনিধনে মেতে উঠেছিলেন। ট্রটস্কি সন্দেহ করতেন যে লেনিনের মৃত্যুর পেছনেও রয়েছে স্তালিনের হাত। কেন না লেনিন শেষদিকে স্তালিনকে সহ্য করতে পারতেন না। লেনিন আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে স্তালিনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদকের পদে টিকে থাকা সম্ভব হতো না।

কেউ কেউ অনুমান করেন গোর্কির রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনেও রয়েছে স্তালিন। গোর্কির সঙ্গেও স্তালিনের সদ্‌ভাব ছিল না। রুশ জনগণের ওপর স্তালিন নির্দয়ভাবে যে

অত্যাচার চালাচ্ছিলেন তা গোর্কির কোমল মনে ক্ষত সৃষ্টি করল। গোর্কি তাতে প্রতিবাদ জানালেন। স্তালিন ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে গোর্কিকে নজরে নজরে রাখতে আরম্ভ করলেন। ১৯২১-১৯২৮ পর্যন্ত গোর্কিকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছিল। লেনিনের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংঘাত তাঁকে দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছিল। ১৯২৮-এর শেষ দিকে তিনি দেশে ফিরলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো। এমনও সন্দেহ করা হয় যে স্তালিন তাঁর নিজের স্ত্রীকেও হত্যা করেছিলেন।

মিলোভান জিলাস বলেছেন, **"The romantic legend spread by Stalin's agents, and which I, too had heard, is really too naive—that she was poisoned while tasting food before her good husband ate it."**

তাই মিলোভান জিলাস সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে স্তালিন সম্পর্কে অতি কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, **"Every crime was possible for Stalin, and there was not one he had not committed, whatever standards we used to take his measure, he has the story of being the greatest criminal in history and, let us hope, for all time to come. For in him was joined the criminal senselessness of a caligula with the refinement of Borgia and the brutality of a Tsar Ivan the terrible."**

ক্যালিগুলা ছিলেন রোমান সম্রাট। ৩৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। প্রচণ্ডরকমের হিংস্রতা তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। নৃশংসভাবে খুনের নেশায় তিনি মেতে উঠেন। রোম সাম্রাজ্যে অরাজকতার সূত্রপাত হয়। ৪১ খ্রীস্টাব্দে ট্রিবুইনের হাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। **Cesare Borgia** ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইতালীয়ান সৈনিক। ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার। **Cesare Borgia** আর্কবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে তিনি কার্ডিন্যাল নিযুক্ত হন। তাঁকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্যাপেল সৈন্যবাহিনীর জেনারেল হিসেবে তিনি চার্চের বিভিন্ন সংগঠনকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন এবং তাদের পরিচালন ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু তিনি তাঁর নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত সুচতুরতার সঙ্গে এবং সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করতেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর এ নিষ্ঠুরতা অনুধাবন করা সহজসাধ্য ছিল না। বাহ্যিক চাকচিক্যে তাঁর আসল স্বরূপ বোঝা যেত না অথচ তিনি ছিলেন একজন শয়তানের প্রতিমূর্তী। এক সময়ে তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছে। কিছুদিন তিনি ইতালী ছেড়ে চলে যান। স্পেনে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

মিলোভান জিলাস তাই স্তালিনকে যথার্থই ক্যালিগুলা ও বর্জিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। চরিত্রগত দিক থেকে এঁদের সঙ্গে স্তালিনের প্রভূত সাদৃশ্য বর্তমান। আর নিষ্ঠুরতার দিক থেকে তিনি জার ইভানের সমগোত্রীয় ছিলেন।

সত্যি স্তালিন নিঃসন্দেহে নৃশংস শাসক ছিলেন। মানবতাবোধ তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের ক্ষমতালোভী। খুনের রক্তে তাঁর হাত রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। আঁদ্রে জিদ্ (Andre Gide) ছিলেন একজন ফরাসী মনীষী। ১৮৬৯ সালে প্যারিসে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭ সাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৪৭ সালেই তিনি নোবেল পুরস্কার পান সাহিত্যের ওপর তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য। তিনি রাশিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে আন্তরিক-ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি রাশিয়ায় গিয়ে বেশ হতাশ হয়েই দেশে ফিরলেন। স্তালিনের আমন্ত্রণেই তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। স্তালিনের বীভৎস অত্যাচার তিনি চাক্ষুষ পরিদর্শন করে এতই হতাশ হয়েছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিস্ট মতবাদে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। "The God that Failed" গ্রন্থে তাঁর একটি article প্রকাশলাভ করে। তাতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, "I doubt whether any country in the world—not even in Hitler's Germany—have the mind and spirit ever been less free, more bent, more terrorized over and indeed vassalized—than in the Soviet Union.······The Soviet Union has deceived our fondest hopes and shown us tragically in what treacherous quick sand an honest revolution can founder"—pp. 197.

আঁদ্রে জিদের ছোট্ট মন্তব্যের মধ্যে স্তালিনের আমলে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের একটা বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্তালিনের আমলে রুশ জনগণের স্বাধীন সত্তা বলতে কিছুই ছিল না। ভয়ে সকলেই ছিল থরহরি কম্পমান। আঁদ্রে জিদ অদ্ভুত কথা বলেছেন যে সমগ্র বিশ্বে এমনকি হিটলারের জার্মানীতেও জনগণকে এতখানি অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি যতখানি অত্যাচার স্তালিনের আমলে রুশ জনগণকে সহ্য করতে হয়েছে।

তবে মিলোভান জিলাস এর জন্য রাশিয়ার পলিটব্যুরোর সদস্যদের এবং পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন পার্টি যদি তাঁকে সংযত করার চেষ্টা করত তাহলে স্তালিন নির্দ্বিধায় দু'কোটি লোককে হত্যা করতে পারতেন না। তাই মিলোভান জিলাস তাঁর 'Conversation with Stalin' গ্রন্থে বলেছেন, "The ruling party followed him doggedly and obediently and he (Stalin) led it from victory to victory, until carried away by power, he began to sin against it, as well.······He (Stalin) was one of those rare and terrible dogmatists capable of destroying nine-tenths of the human race to 'make-happy' the remainning tenth."

রাশিয়ার তৎকালীন শাসকদল অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি স্তালিনের কার্যকলাপকে সমর্থন করে গেছে। সেই সমর্থন স্তালিনকে শক্তি যুগিয়েছে। সেই শক্তি স্তালিনকে

নৃশংস হতে সাহায্য করেছে। মিলোভান জিলাস যথার্থই বলেছেন যে স্তালিন এক দশমাংশ লোককে সুখী ও সুন্দর রাখার জন্য নয় দশমাংশ লোককে খুন করতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

স্তালিনের এত অত্যাচার, এত নৃশংসতা, এত খুন রুশ জনগণ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না তাদের। হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর জেনারেলরা ষড়যন্ত্র করেছেন। তিনবার হিটলার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। স্তালিনকে কিন্তু এরকম কোন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল এ রকম কোন ঘটনাও জানা যায় না। স্তালিন ত্রিশ বছর জনগণকে শাসন করেছেন। তাঁর মতবাদকে কেউ challenge জানাতে সাহস পায়নি। তার পেছনে আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর শাসক, অন্যদিকে তিনি দেশের কৃষি, শিক্ষা ও যন্ত্রের উন্নতিসাধনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। স্তালিনই একমাত্র শাসক যিনি এক অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

তাঁর সময়েই রাশিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সময়েই রাশিয়ায় নারীদের স্বাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে স্তালিনের অসামান্য ভূমিকার কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে।

মধ্য এশিয়ার রুশ অঞ্চলে নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের থাকতে হতো পর্দার আড়ালে। বিপ্লবের পর থেকে তারা ক্রমশ জনসমাজে বের হতে লাগল। মেয়েরা কারখানায় সমান মজুরিতে কাজ পেতে লাগল। পর্দাপ্রথা রহিত হলো। মেয়েদের ভোটে দাঁড়াবার অধিকার স্বীকৃত হলো।

মধ্য এশিয়াতে বাস ছিল মুসলিম জনগণের। বিয়ের বাজারে মেয়েদের বিক্রি করে দেওয়া হতো। কথা বলার সামর্থ তাদের ছিল না। বিয়ের পর তাদের 'পারাঞ্জা' নামক এক প্রকার ঘোড়ার লোমের কালো বোরখা পড়তে হতো। বোরখা খুলে জনসমক্ষে বেরনো নিষিদ্ধ ছিল। স্বামীর নির্দেশের অবাধ্য হলে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো। স্তালিনের নির্দেশেই পর্দাপ্রথা মুসলিম সমাজ থেকে তিরোহিত হলো। মেয়েরা পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করল। কম্যুনিস্ট পার্টিতে এ ব্যাপারে আলোচনা চলল। স্বামীরা স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হলো। নারীদের সার্বিক উন্নতিকল্পে নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হলো।

আনা ল্যুইস স্ট্রং ১৯২৮ সালে তাসখন্দে নারী নির্যাতনের একটি ঘটনার কথা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। এই নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সেখানকার নারী আন্দোলনের বিষয়েও তিনি তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। তাসখন্দের বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী গ্রামে গিয়ে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে মুসলিম নারীদের সম্মুখে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তব্য রাখে। বিপ্লবের পর রাশিয়ায় প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পর্কেও গ্রামের নারীদের সামনে সে তার মতামত প্রকাশ করে। গ্রামের নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভূত হতে লাগল। তারা বুঝতে পারল খাঁচার বন্দী পাখীর মতন জীবন কাটানোর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

ফলে মুসলিম পুরুষদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হলো। মেয়েটির ওপর প্রতিশোধ নেবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল গ্রামের গোঁড়া মুসলিম পুরুষসমাজ। সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে তারা জোর করে ধরে গ্রামের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। মেয়েটির ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে বাক্সবন্দী করে সে যে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল সেই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার কাছে পাঠিয়ে দিল গাড়ি করে। বাক্সের ওপর লেখা ছিল "এই হচ্ছে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতিদান"।

একবার এক মেয়ে গ্রামের জমিদারকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে একটি কম্যুনিস্ট চাষীকে বিয়ে করে। জমিদার রুষ্ট হয়ে মেয়েটির ইজ্জৎ হনন করার জন্য বলিষ্ঠ কয়েকজন যুবাপুরুষকে প্রেরণ করে। এ সমস্ত যুবাপুরুষের পাশবিক অত্যাচারে মেয়েটি মারা যায়। তখন সে ছিল আট মাসের গর্ভবতী। স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করায় মুসলিম মৌলভীরা "জুলফিয়া খাঁ" নাম্নী একজন মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে।

এতদ্‌সত্ত্বেও নারী আন্দোলন মধ্য এশিয়ায় বিশেষত তাসখন্দে থেমে থাকেনি। মেয়েরা লড়াই চালিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করল। ৮ই মার্চ, ১৯২৮। আন্তর্জাতিক মহিলাদিবস 'বোরখা প্রথা' বিলোপের জন্য মেয়েরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টি মেয়েদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। আইনের বিচারে পুরুষ ঘাতকবাহিনী অভিযুক্ত হলো। অনেকের প্রাণদণ্ড হলো। এরপর থেকে মুসলিম সমাজ থেকে পর্দাপ্রথা কিছুটা শিথিল হলো। আইন, প্রচার ও শিক্ষা—এই তিনের সমন্বয়ে থেকে এ সমস্ত কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে রহিত হতে লাগল।

সার্বজনীন শিক্ষাকে স্তালিন গুরুত্ব দিয়েছিলেন সর্বাধিক। রাশিয়ার প্রায় ৫৮টি জাতি ও উপজাতির কোন অক্ষরমালা পর্যন্ত ছিল না। বই ত দূরের কথা। সরকারের নির্দেশে ভাষা-বিজ্ঞানীরা তাদের জন্য অক্ষরমালা তৈরি করলেন। তৈরি হলো লিখিত ভাষা। এর ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল—জার্মানী, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি বই প্রকাশিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। বই ছাড়া তৈরি হলো নতুন আইন, বিজ্ঞান গবেষণাগার। তৈরি হতে লাগল শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি মানসে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র। আরম্ভ হলো মানুষ গড়ার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে বলছেন, "আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।" তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "ডিকটেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঞর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ; কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হলো শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো।" রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। রাশিয়ার ভালো এবং মন্দ দুটি দিকই তিনি দেখেছিলেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। তবে ভালো দিকটাই তিনি বেশি নজর দিয়ে দেখেছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে যে ভাবে হত্যাকাণ্ড রাশিয়ায় সংগঠিত হয়েছে তার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ

শুনেছেন। কিন্তু সেই সময় তিনি রাশিয়ায় থাকতে পারেননি। উক্ত সময়ের মধ্যেই রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। সে নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী সংক্ষেপে লেখার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

হিটলারের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী আগের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোয়জন। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন, হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিভঙ্গ করলেন। স্তালিন বিশ্বাসই করতে পারেননি হিটলার হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করবেন। চার্চিল, রুজভেল্টের সতর্কবাণী স্তালিনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়নি। তিন মিলিয়ন জার্মান সৈন্য হঠাৎ যখন রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখনই স্তালিনের সম্বিত ফিরে এলো। নিগেল নিকোলসন (Nigel Nicolson) বলেছেন যে, **"Unable to defeat Britain immediately, Hitler decided to fulfill his dream of crushing what he called the "Jewish-Bolshevik world conspiracy, Lebensraum ("living space") for the German master race, the destruction of the "inferior" Slavic race, and the wealth of the Ukraine had tempted Hitler for some time."**

১৯৪০ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সময়টা ঠিক করেছিলেন এপ্রিলের শেষে বা মে-এর প্রথমে। রাশিয়ার শীত সম্পর্কে হিটলার ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু বল্কান ও ভূমিধ্যসাগরীয় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় হিটলার রাশিয়া আক্রমণের দিন পিছিয়ে দিলেন। এর জন্য বন্ধু মুসোলিনীও অনেকাংশে দায়ী। হিটলার জানতেন নেপোলিয়ানের পতনের অন্যতম কারণ তাঁর রুশ অভিযান। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত নেপোলিয়ানের অগ্রগতিকে থমকে দিয়েছিল। অসংখ্য ফরাসী সৈন্যের প্রাণের বিনিময়েও নেপোলিয়ন রাশিয়া দখল করতে পারেননি। তাই হিটলার ভেবেছিলেন যে শীত পড়ার আগেই তিনি রাশিয়াকে অতর্কিত আক্রমণ করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন। জার্মান সৈন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরে বীরগতিতে প্রবেশ করল। জার্মান ঝটিকাহিনী রাশিয়ার প্রায় ⅓ অংশ দখল করে নিল। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। **"Russia's Great weapons the fierce winter, the vast spaces and the huge resources of man power—were soon to decimate Germany's military might"**—রুশ সাম্রাজ্যের বিশালতা, প্রচণ্ড শীত আর বিপুল জনসংখ্যা রাশিয়াকে রক্ষা করল।

চার্চিল ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাবার চেষ্টার কসুর করলেন না। রাশিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন চার্চিল। রাশিয়ার প্রতি চার্চিলের বিদ্বেষভাব প্রশমিত হলো। রাশিয়ার বিপদ বৃটেনের বিপদ বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, **"If Hitler invaded Hell, I would make at least a fovourable reference to the Devil in the House Of Commons."**

জার্মান সৈন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাশিয়ার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করল। তিন

দিক থেকে বাঁড়াশী-আক্রমণে রাশিয়ার ভিত কাঁপিয়ে দিল। একদিকে লেনিনগ্রাদ, মস্কো আর একদিকে কিয়েভ—এ তিনদিক থেকেই জার্মান সৈন্য বিদ্যুৎ গতিতে রাশিয়া আক্রমণ করল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল না রুশ সৈন্যবাহিনী, তাদের জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত রণকৌশলও জানা ছিল না। তবে ১২০০ মাইল বিস্তৃত বিশাল রুশ সীমান্ত পাহারা দিচ্ছিল বিশাল রুশবাহিনী। তাদের মনোবল ছিল দৃঢ়। কিন্তু তারা এ রকমের অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিগেল নিকোলসন বলেছেন যে, **"But the technique of blitzkrieg was misplaced in Russia ; a vast country that could not be knocked out by a single blow."**

হিটলার আশা করেছিলেন যে ফ্রান্সের ন্যায় অতি অল্পসময়ের মধ্যে তিনি রাশিয়া দখল করে নেবেন। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে তা হিটলার বুঝতে পারলেন। হিটলার প্রমাদ গুণলেন। ১৯৪২-এ যুদ্ধের সবচেয়ে অন্ধকারময় দিক। জার্মান বাহিনী ককেশাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ১৯৪২-এর জুলাই মাসে সেবাস্তোপোল দখল করল। স্তালিনগ্রাদ দখলের জন্য প্রবলবেগে জার্মান সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। জার্মান সৈন্যরা মস্কো পর্যন্ত গিয়েও প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আর এগোতে পারল না।

তিন মিলিয়ন জার্মান সৈন্য শীতে কাবু হয়ে গেল। বিশাল রুশ সৈন্যবাহিনী অর্ধাহারে, অনাহারে এমন কি গাছের পাতা খেয়েও হিটলারী সৈন্যের সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। হিটলার প্রথম আক্রমণ করেই বীর বিক্রমে রাশিয়ার ⅓ অংশ দখল করে নিয়েছিল। জার্মান সাবমেরিন আতলান্তিক মহাসাগরে এমন কি মেক্সিকো উপসাগরেও মিত্রশক্তির বহু রণতরী ডুবিয়ে দিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না।

একদিকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যদিকে রুশ বাহিনীর অদমনীয় মনোবল হিটলারের বাহিনীকে রুখে দিল। হিটলার চিন্তিত। সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে দুনিয়ার ইতিহাসে এতবড় সামরিক অভিযান আর হয়নি। হিটলার দম্ভসহকারে বলেছিলেন ৯০ লক্ষ লোক যুদ্ধে নেমেছে, আরও কয়েক লক্ষ রণক্ষেত্রে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

অবস্থা শোচনীয় দেখে হিটলার ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন। পোপের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করেছিলেন। পোপ হিটলারের কথাই কর্ণপাত করলেন না। পোপ রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলালেন। কম্যুনিস্ট থেকে রাজতন্ত্রী পর্যন্ত সব নাৎসী বিরোধী শিবিরে যোগ দিল। যুদ্ধ বিশারদ ম্যাক্সওয়ার্নার রুশ বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে লিখলেন যে, "রুশ সৈন্য-বাহিনী গঠনে আধুনিক, রণকৌশলের দিক থেকে দক্ষ, রাজনীতির দিক থেকে বাস্তববাদী।"

পশ্চিমের সামরিক বিশেষজ্ঞরা রাশিয়ার শক্তি দেখে বিস্মিত হলেন। স্বীকার করলেন স্তালিনের কৃতিত্বের কথা। স্বীকার করলেন রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের কথা। রাশিয়ার কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিমানসে স্তালিনের অনন্যসাধারণ

ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। প্রথম ছয় সপ্তাহের যুদ্ধে রাশিয়া হারিয়েছিল ৭৫০০ কামান, ৪৫০০ বিমান ৫০০০ ট্যাঙ্ক। বিশ্বের জনগণের মনে চমক লাগল। তারা চিন্তাই করতে পারেনি এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রুশরা জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি চার্চিল ও রুজভেল্ট পর্যন্ত চিন্তা করতে পারেননি যে রুশরা জার্মান ঝটিকাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে।

একজন মার্কিন যুদ্ধ বিশারদ মন্তব্য করেছিলেন যে, রক্তমাংসের মানুষ জার্মান ঝটিকাবাহিনীর আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। রাশিয়ার জলবায়ু, বিশাল ভূখণ্ড, রুশ জনগণের অদমনীয় মনোবল আর স্তালিনের নেতৃত্ব হিটলারকে রুখে দিল। তদুপরি রয়েছে হিটলারের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত। হিটলার প্রথমে বুঝতে পারেননি যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। দ্বিতীয়ত হিটলার জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুরোধ করলেন। হিটলার ভেবেছিলেন জাপান ও জার্মানের সমবেত শক্তি রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করবে। শত চেষ্টা করেও হিটলার জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাতে পারলেন না। জাপান ১৯৪১, ৭ই ডিসেম্বর অতর্কিতে পার্ল হারবার (প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন-নৌঘাঁটি) আক্রমণ করে আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলল। হিটলার হতচকিত হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে কি সর্বনাশ করল। তবে হিটলার দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারতেন রাশিয়ায় বিশাল স্তালিন বিরোধী শক্তির সাহায্যে একটা স্বাধীন রুশ সেনাবাহিনী গঠন করে দিয়ে। স্তালিন বিরোধী রুশরা হিটলারকে তা বলেছিলেন অনেক অনুনয় করে।

হিটলার যদি স্তালিন বিরোধী রুশদের নিয়ে রাশিয়ায় একটা বাহিনী গঠন করতেন তাহলে স্তালিনের ভিত কেঁপে উঠত। কিন্তু হিটলার সেই পথে গেলেন না। ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১। জার্মানী ত্রিপাক্ষিক চুক্তির সর্ত হিসেবে ইতালী ও জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়া অভিযান এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা জার্মানীর পতনের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

১৯৪২ সাল। গ্রীষ্মকাল। হিটলার জার্মান সৈন্যবাহিনীকে শত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্তালিনগ্রাদ দখলের নির্দেশ দিলেন। জেনারেল পলাশকে তিনি ফিল্ড মার্শালের পদে উন্নীত করলেন। অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। স্তালিনগ্রাদ দুদিক থেকে বিধ্বস্ত হলো। খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো। হিটলারী সৈন্যরা স্তালিনগ্রাদ প্রায় দখল করে নিয়েছিল কিন্তু দখলে আনতে পারেনি এখানকার বিশাল জনতাকে। ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি হিটলার যেভাবে দখল করে নিয়েছিলেন— হিটলার ভেবেছিলেন সেইভাবেই তিনি রাশিয়া জয় করে নেবেন। অপরিণামদর্শী হিটলারের রাশিয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তদুপরি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি আমেরিকা রাশিয়া ও ব্রিটেনকে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগ করে দিলেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, আর্থিক দিক থেকে বলীয়ান আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা ব্রিটেন ও রাশিয়ার শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দিল।

১৯৪০ সাল। ইতালীয় বাহিনী লিবিয়া থেকে মিশর আক্রমণ করে অনেক জায়গা

দখল করে নেয়। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষ দিকে সোমালিল্যাণ্ড ও ইথোপিয়া ইতালীর হস্তচ্যুত হয়। এর মধ্যে জার্মান জেনারেল রোমেল সমগ্র মিশর দখল করে তব্রুক পর্যন্ত অগ্রসর হন। অক্টোবর ১৯৪২। মিশরে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর আলমাইল-এর যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি মণ্টোগমারী রোমেলের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস। আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে আমেরিকার সৈন্য আলজেরিয়ায় অবতীর্ণ হলো। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দ্যগলের ফরাসীবাহিনী। ১৯৪৩ সাল। সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা অক্ষশক্তির দখল মুক্ত হলো।

১০ই জুলাই মিত্রশক্তি আফ্রিকা থেকে সিসিলি আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে ইতালীর রাজা আদেশ দিলেন মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করার জন্য। মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর স্থলাভিসিক্ত হলেন বাদোলিও। বাদোলিও মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন। ১৯৪৪। জুন মাস। মিত্রশক্তি রোম দখল করল। ১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে ইতালীতে জার্মান প্রতিরোধের অবসান হলো।

জুলাই ১৯৪২ থেকে জানুয়ারী ১৯৪৩ পর্যন্ত স্তালিনগ্রাদে ছয়মাসব্যাপী যুদ্ধ চলল। জার্মান সৈন্য প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হলো শুধু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য। ফিল্ড মার্শাল পলাশ তিন লক্ষ জার্মান সৈন্যসহ রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর কুরস্কে জার্মান বাহিনী মরণপণ যুদ্ধ চালাল। কিন্তু পরাজিত হলো। পর্যুদস্ত জার্মানী পিছু হটতে বাধ্য হলো।

১৯৪৪ সাল। জুন মাস। ফ্রান্সে অবতরণ করল আমেরিকা ও ব্রিটেন। ইতিহাসে যা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট নামে খ্যাত। ১৯৪৪। জুলাই মাস। মূল ভূখণ্ড মুক্ত করে লালফৌজ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রীয়াতে অভিযান চালায়। পর্যুদস্ত নাৎসী বাহিনীর রুশ সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ছিল না। অতি সহজেই এ সমস্ত এলাকা নাৎসী কবল থেকে মুক্ত হলো। নরওয়ে, ডেনমার্ক ও গ্রীস মুক্ত হলো এরপর নাৎসীদের হাত থেকে। ১৯৪৫ খ্রীঃ মার্শাল জুকভের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ ওডার নদীর পূর্বতীরস্থ জার্মানী দখল করে বার্লিনে উপস্থিত হয়। তার আগে আগস্ট, ১৯৪৪ ফরাসী মুক্তিবাহিনী প্যারিতে প্রবেশ করল।

বেলজিয়াম ও ফ্রান্স মুক্ত হলো ১৯৪৪ সালের শেষভাগে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম মুক্ত করল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী। তারপর তারা উপনীত হলো জার্মানীর পশ্চিম প্রান্তে। ১৯৪৪ সাল। মার্চ মাস। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী রাইন নদী অতিক্রম করে বার্লিন এসে উপস্থিত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে রুশ সেনাবাহিনীও জুকভের নেতৃত্বে বার্লিনে এসে উপস্থিত হলো। ৩০শে এপ্রিল হিটলার বাংকারে আত্মহত্যা করলেন। ৮ই মে, ১৯৪৫ মিত্রশক্তির কাছে জার্মানী আত্মসমর্পণ করল। সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেল। ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু জাপান তখনো আত্মসমর্পণ করেনি।

দূরপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থার ও ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনস জাপ কবল মুক্ত হলো। মিত্রশক্তির কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৮ই জুলাই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৩ দিনের

মধ্যে জাপানের কোয়াণ্টুং সেনাবাহিনী রুশসেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়। রুশবাহিনী চীনের উত্তর পূর্বাংশ, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ-শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। জাপানের আত্মসমর্পণের দিন সমাগত। মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত। ঠিক সেই সময় জাপানকে আত্মসমর্পণের কোন সুযোগ না দিয়ে নিষ্ঠুর ট্রুম্যান অ্যাটম বোমার experiment-এর জন্য ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ জাপানের হিরোসিমা শহরের ওপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করল। ৯ই আগস্ট করল নাগাসিকি শহরের ওপর।

বিশ্ব উঠল কেঁপে। বিশ্বের সুধীবৃন্দ ট্রুম্যানকে ধিক্কার জানালো। আইনেষ্টাইন ক্ষুব্ধ, হতচকিত। বাকশক্তি রহিত তাঁর। নরঘাতক ট্রুম্যানের জঘন্যতম কাজের জন্য ধিক্কার জানালেন। ট্রুম্যানকে ধিক্কার জানালেন ম্যানহাটন প্রোজেক্টের অনেক বৈজ্ঞানিক ও এ প্রোজেক্টের ডাইরেক্টর ডঃ ওপেনহাইমার। তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন। অ্যাটম বোমা তৈরির অন্যতম বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকায় তিনি অনুশোচনায় পলে পলে দগ্ধ হতে লাগলেন। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল ট্রুম্যানের বর্বর সিদ্ধান্তে। প্রায় সব অ্যাটমিক বৈজ্ঞানিকের মনে একই ভাবের উদয় হলো। কিন্তু ঘাতক ট্রুম্যান, চার্চিল হয়ত অ্যাটম বোমার সফল experiment-এর জন্য উল্লসিত। ট্রুম্যানের পৈশাচিক উল্লাস বিশ্ব অবলোকন করল।

হিরোসিমা ও নাগাসিকি শহর বিধ্বস্ত হলো। লক্ষ লক্ষ লোক কয়েক-সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পচে গলে গেল হাজার হাজার মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মৃত্যুর বিভীষিকা এখনো জাপানের জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আর খুনী ট্রুম্যান অ্যাটম বোমার সফল প্রয়োগে উৎফুল্ল। জার্মানীর সত্যিকারের পতন আরম্ভ হয় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর। স্তালিনগ্রাদের পরাজয় জার্মানীর মৃত্যুর সঙ্কেত দিল। বিশ্বযুদ্ধের গতি গেল ঘুরে।

Antony Brett James যথার্থই বলেছেন যে, "Defeat at Stalingrad irrevocably shattered the myth of German invincibility.........Stalingrad immortal example of German fighting."

হিটলার তাঁর জেনারেল জডলকে বলেছিলেন যে, রাশিয়ার দরজায় জোর পদাঘাত করলে রাশিয়া ধ্বসে পড়বে। হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল স্তালিনের অত্যাচার, তাঁর বিরুদ্ধে রুশ জনগণের অসন্তোষ, রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতা আর জার্মানীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দক্ষ সেনাবাহিনী হিটলারকে অল্পসময়ের মধ্যেই ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়া জয়ের সুযোগ করে দেবে। কার্যত অপরিণামদর্শী হিটলারের এ চিন্তাধারা বিফলতায় পর্যবসিত হলো। হিটলার আরও আশা করতেন যে, ভারতবর্ষের সম্পদে যেমন ইংলণ্ড সমৃদ্ধ হয়েছে সেইরূপ রাশিয়ার ভূখণ্ড দখল করে রাশিয়ার বিপুল সম্পদে হিটলারও জার্মানীর সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন। তিনি রাশিয়ার কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ইউক্রেন ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চল দখল করে সমগ্র ইউরোপে গম, কয়লা, ইস্পাত ও কাঠ সরবরাহ করবেন এবং পাশ্চাত্যে শান্তি স্থাপন করবেন। এটা ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে পার্থক্য অনেক। Alan Bullock তাঁর Study

in Tyrrany গ্রন্থে বলেছেন যে, "What India is for England (Hitler declared at after dinner session early in August), the territories of Russia will be for us……we must attract the Norwegians, the Swedes, the Danes and the Dutch into our Eastern Territories. They will become members of the German Reich ……Nobody will ever snatch the East form us. We shall supply the wheat for all Europe, the coal, the steel, the wood. To exploit the Ukraine properly—the new Indian Empire…… we need only peace in the west."

হিটলারের অদ্ভুত আশা ছিল যে, সমগ্র পূর্ব ইউরোপ দখল করে সেখানে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং হল্যাণ্ড থেকে লোক এনে নতুন বসতি স্থাপন করাবেন। তারা হবে জার্মান রাইখের সদস্য।

হিটলারের এত আশা, বিশ্বজয়ের এরকম আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় মিশে গেল। স্তালিনের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা হিটলারকে শুধু রুখে দিল না, পৃথিবী থেকেও সরিয়ে দিল। স্তালিন নিঃসন্দেহে হিটলার অপেক্ষা অধিক লোক খুন করেছেন। তথাপি বলতে হবে স্তালিন অনেক দিক থেকে হিটলার অপেক্ষা বাস্তববাদী ছিলেন।

স্তালিনের বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি শিক্ষায়, শিল্পে, কৃষিসম্পদে, অর্থনীতিতে অনুন্নত এক সামন্ততান্ত্রিক দেশের শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, শিল্পের উন্নতি বিধান করে, কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করে এবং আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে তাকে পৃথিবীর অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করেন। হিটলারের আক্রমণের জবাব দেবার মত ক্ষমতা অর্জন করে দেশের জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশলের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে রাশিয়া পরাক্রমশালী জার্মান সেনাদের রুখে দিতে পারত না এটা নিশ্চিত। এদিক থেকে চিন্তা করলে স্তালিনকে রাশিয়ার বিংশ শতাব্দীর রূপকার বলা চলে। তিনিই রাশিয়ায় তাঁর যুগের বিশ্বকর্মা। তিনি যেন সমগ্র বিশ্বকে হিটলারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২৯—১৯৩৯ সাল এই দশ বছরের মধ্যে যেখানে জার্মানীর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ২৭ ভাগ, গ্রেট ব্রিটেনের ছিল শতকরা ১৭ ভাগ সেখানে রাশিয়ার শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪০০% অর্থাৎ শতকরা ৪০০ ভাগ। ১৯৩৮ সালের মধ্যে রাশিয়া আমেরিকার পরই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়।

স্তালিন হিটলারের ন্যায় প্রথম জীবনে চিত্রশিল্পী হতে চাননি। ছোটবেলা থেকে স্তালিনের চিত্রশিল্পের প্রতি সে রকম কোন আকর্ষণ ছিল না। তবে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিদ্যালয়ের গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশ তিনি মেনে নিতে পারেননি। যার জন্য ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার আগেই তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়।

হিটলার তাঁর মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য। তা

সম্ভব হয়নি শুধু বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট না থাকার দরুন। বাঁচার তাগিদে রাজনীতিকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হিটলারের চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল কিন্তু আধুনিক চিত্রশিল্পকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আধুনিক ভাস্কর্য, আধুনিক স্থাপত্য, আধুনিক চিত্রকলা এমনকি আধুনিক গানবাজনা তাঁর কাছে অসম্ভব ঠেকতো। তিনি ছিলেন প্রাচীন গ্রীস ও রোমান সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি অনুরক্ত। গথিক ও রেনেসাঁ আমলের শিল্পকলার প্রতি তাঁর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। এ সমস্ত শিল্পকলাকে তিনি অধিক খ্রীষ্টধর্মীয় বলে মনে করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর ঘৃণার ভাব ছিল। প্রখ্যাত শিল্পী পিকাসো (Picasso) ও কাণ্ডিনাস্কিকে (Kandinsky) তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। আর আধুনিক শিল্পকলাকে তিনি Pig-art বা শূয়রদের শিল্প বলে অভিহিত করতেন।

হিটলার নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি রাজনীতিবিদ হতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হতে। **"In Hitler's eyes it was part of artist nature he should have been a great painter or artist, he complained, and not a statesman at all"—Alan Bullock.**

১৯৩৭ সাল। বার্লিনে এক বিশাল চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হলো হিটলারের নির্দেশে। এই প্রদর্শনীতে চিত্রকলা নির্বাচন করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হলো। সেই বোর্ডের সদস্য ছিলেন জার্মানীর সেরা চিত্রশিল্পীরা। বোর্ডের সদস্যরা গথিক ও রেনেসাঁ আমলের অপূর্ব সব চিত্র সমাবেশ করলেন। সঙ্গে রাখা হলো বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্রকলা।

হিটলার বোর্ড সদস্যদের প্রদর্শনীর জন্য চিত্র নির্বাচনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন না। তিনি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত চিত্র দেখতে স্বয়ং বার্লিনে এলেন। তিনি গথিক ও রেনেসাঁ এবং বিংশ শতাব্দীর চিত্রাবলী দেখে ক্রোধে জলে উঠলেন, হফম্যানকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে পাঠালেন নির্বাচন কমিটির সদস্যদের। হফম্যানকে ইঙ্গিতে বললেন এ সমস্ত চিত্র নির্বাচনের জন্য তাঁর সম্মতি নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। হফম্যানকে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত অনেক ছবিই সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রসম্ভার নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন স্বয়ং ফুয়েরার। বলে দিলেন এর সঙ্গে থাকবে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার। ফুয়েরারের নির্দেশে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পছন্দসই সব চিত্র নিয়ে আসা হলো। প্রদর্শনী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলো। লোকসমাগম হলো প্রচুর। হিটলার উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানিয়ে দিলেন তিনি এ সমস্ত চিত্রসম্ভার দিয়ে তাঁর প্রিয় শহর লীঞ্জের মিউজিয়াম সাজাবেন।

হিটলারের বিশেষ নজর থাকত স্থাপত্য শিল্পের ওপর। তিনি বার্লিন শহরকে অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ করতে এবং জার্মানীর বড় বড় শহরকে শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের দ্বারা নব নব স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের (Classical Art) শিল্প ছিল তাঁর প্রাণের সম্পদ। তাই জার্মানীর বড় বড় শহরের অট্টালিকাদি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন গ্রীস-রোমের স্থাপত্যশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণে।

হিটলারের সবচেয়ে প্রিয় স্থপতি ছিলেন ট্রুষ্ট (Troost)। ট্রুষ্ট থাকতেন ম্যুনিকে। হিটলার সুযোগ পেলে তাঁর কাছে চলে যেতেন এবং জার্মানীর বড় বড় শহরগুলির অট্টালিকা কিভাবে গ্রীকো-রোমান স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে তৈরি করা যায় সেই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতেন। ট্রুষ্ট মারা যাবার পর তিনি জার্মানীর অন্যতম স্থপতি অ্যালবার্ট স্পায়ারের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। হিটলার তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি সবসময় ভাবতেন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর জার্মানীর বড় বড় শহরগুলিকে তাঁর মনমতো স্থাপত্য শিল্পের দ্বারা সাজাবেন। অবশ্য তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি।

হিটলারের গান বাজনার প্রতিও প্রবল আকর্ষণ ছিল। ওয়াগনার ওপেরার যাত্রা তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তবে আধুনিক গান-বাজনার ওপর তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। বিটোফেন ও ব্রাকনারকে তিনি পছন্দ করতেন। সময় সময় তিনি গোয়েবলসের সঙ্গে সিনেমাও দেখতেন। গোয়েবলস তাঁকে গ্যাটাকার্বো (Geta-Carbo) অভিনীত বই দেখাতে নিয়ে যেতেন। বেরস্টেসগ্যাডনে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে সিনেমার বড় হলঘর ছিল। সময় সময় সেখানে তাঁর প্রিয়তমাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতেন। যে সমস্ত ছবি জার্মানীর প্রেক্ষাগৃহে দেখানো নিষিদ্ধ ছিল সেই সমস্ত ছবি তিনি বেরস্টেসগ্যাডনের নিজস্ব বাসভবনের সিনেমাহলে বসে দেখতেন।

হিটলার চশমা পরতেন অফিসে কাজ করার সময়। তিনি হয়ত কোন কোন সময় চশমা পরে জনসমক্ষে বের হতেন। এ্যালেন বুলক বলেছেন, "Hitler wore spectacles in his office, but refused to be seen wearing them in public."

হিটলারের ন্যায় স্তালিনেরও চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর সময়ে রাশিয়ায় নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অঙ্কন-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ম্যুজিয়মকে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিচিত্র সব চিত্রের সমাবেশ ঘটত ম্যুজিয়মে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিক্ষা ব্যাপারকে বিভিন্ন প্রকার প্রণালী দিয়ে সবাইয়ের মধ্যে এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানা প্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা গ্রাম ও শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active);

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন যে, "মস্কো শহরে ট্রেটৈয়াকভ গ্যালারী (Tretyakov Gallery) নামে বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে।" ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর প্রথম প্রথম যারা আসত তারা ছিল শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক। ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত গ্যালারীতে আসতে আরম্ভ করল কৃষি ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের লোক। এদের ছবির মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তাই এদের ছবিগুলির মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য থাকত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচায়কের দল। যারা জানতে চায়, শিখতে চায়,

তাদের যাতে ভুল না জানানো হয় বা ভুল না শিখানো হয় তার জন্য কঠোর নজর রাখা হতো। "ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটিই বুঝিয়ে দেবার বিষয়: ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার।" তার জন্যই রাখা হয়েছে পরিচায়ক। পরিচায়কদের আলাদা কোন পয়সা দিতে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তারা দেশজুড়ে কারখানা চালাতে যেসব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায় তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্য এত প্রস্তুতি। "এরা জানে রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর, যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ার নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটেনি।"

স্তালিনের আমলে চিত্রশিল্পের প্রতি রুশজনগণের, ছাত্রছাত্রীদের যে অসামান্য আকর্ষণ ছিল তার বিশদ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখে বিস্মিত হয়েছেন তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে মস্কো শহরে সাড়ম্বরে। যদিওবা কবিগুরুর মতে তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি ছিল সৃষ্টিছাড়া তবুও তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখতে লোকসমাগম কম হয়নি। অল্প কয়েকদিনে লোকের ভিড় হয়েছিল যথেষ্ট। যা কবিকে বিস্মিত করেছিল।

কবিগুরু তাই রুশদের রুচির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন তাদের কৌতূহলের। কবিগুরু বলেছেন কৌতূহল হচ্ছে মানুষের জাগ্রত চিত্তের পরিচায়ক। কবিগুরু রাশিয়ার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত ছবিগুলি রীতিমত ছবি, সেগুলিতে মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট—কারো নকল নয়। নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ। সেখানে রয়েছে নির্মাণ ও সৃষ্টির প্রতি প্রখর দৃষ্টি। কবিগুরু সেখানকার শিক্ষা, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি দেখে অভিভূত হয়েছেন। আর তাঁর স্বদেশের শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। কবিগুরু বলেছেন যে তাঁর সামান্য শক্তি দিয়ে এর কিছু আহরণ ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন স্বদেশের স্বার্থে। কবিগুরু স্বীকার করেছেন যে শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে তিনি এমন করে দেখেননি। তিনি দেখেছেন যে রুশ ছাত্রছাত্রীরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। "তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়।" স্তালিনের আমলের চিত্রশিল্পে রাশিয়ার সমৃদ্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে দেখেছেন এবং তুলির টানে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। রাশিয়ায় কবিগুরু যা দেখেছেন তা ১৯৩০ সালের জিনিস। তারপর স্তালিনের রাজত্ব চলেছে আরও ২৩ বছর। এই ২৩ বছরে স্তালিন রাশিয়াকে প্রচুর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ স্তালিনের অত্যাচারের

সমালোচনা করেছেন কিন্তু স্তালিনের আমলের রাশিয়ার সার্বিক অগ্রগতিকে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। খেলাধূলা, শরীরচর্চা, কৃষি, শিল্প, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা ও শক্তিতে রাশিয়াকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করার কৃতিত্ব স্তালিনের।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে কলাসাধনার অসামান্য বিকাশ কবি দেখেছেন। তার মধ্যে তিনি ক্রমাগত নতুন সৃষ্টির সাহস লক্ষ্য করেছেন। যা বহুদিন ধরে চলেছে এখনো থেমে যায়নি। কবির মতে রুশরা সমাজে, রাষ্ট্রে, কলাতত্ত্বে নূতনকে ভয় করেনি।

কবি আরও বলেছেন রাশিয়ার শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সবকিছুরই আয়োজন আছে। রুশরা চেয়েছে মানুষের পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। স্তালিনের অসামান্য কর্মোদ্দীপনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাশিয়া আলোর সন্ধান পেলো। হিটলার বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। গ্রীকো-রোমান শিল্পের অনুকরণ করার জন্য তিনি দেশের শিল্পীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর স্তালিন প্রাচীন ও নবীন শিল্পকলার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। প্রত্যেক যুগের শিল্পের ভালো দিকটাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

স্তালিন হিটলারের মতো চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন কিনা সেটা বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে চিত্রশিল্প, গানবাজনা, নাটক, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিমানসে তাঁর কতখানি প্রচেষ্টা ছিল। সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা নিশ্চিতরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে যে স্তালিন শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় রাশিয়ার শিল্পের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে হিটলার ও স্তালিন ছিলেন একান্তভাবে জাতীয়তা-বাদের প্রবক্তা। একদেশে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা স্তালিনের মনে অতি বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর শাসনকালের প্রথমদিকে নিজের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন।

রাশিয়াকে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে তিনিই গড়েছিলেন। অবশ্য তা করতে গিয়ে তিনি এশিয়ার ও আফ্রিকার উদীয়মান রাষ্ট্রগুলিকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রলুব্ধ করেছিলেন। তাঁর জন্যই চীনের কম্যুনিস্ট আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়েছিল। হাওয়ার্ড কে. স্মিথ বলেছেন যে শ্রমিকের দুঃখদুর্দশার অবস্থা সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্রমিকের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাবকে পাল্টিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

হাওয়ার্ড কে. স্মিথ আরো বলেছেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্তালিন বিশ্বের অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন। যা আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি।

হিটলার ও স্তালিন যতই বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছিলেন ততই ভীষণভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন। ততই তাঁরা হয়ে উঠছিলেন একনায়কত্ববাদী। ততই তাঁরা বিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকেন যে তাঁদের কথার বিন্দুমাত্র বিরোধিতা হচ্ছে প্রতিবিপ্লব বা তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

তাই তাঁরা ক্রমাগত সন্দেহভাজন মানুষজনকে খুন করার নেশায় মেতে উঠেছিলেন। অনেকেই এটাকে তাঁদের একধরনের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ বলে মনে করেন।

এটা সত্যি যে মানুষ হাতে ক্ষমতা পেলে বিগড়ে যায়। স্তালিন দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ আর হিটলার প্রায় ১২ বছর ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে একটা অহমিকা আসা স্বাভাবিক। স্তালিন হিটলার অপেক্ষা অনেক বেশি নৃশংস ছিলেন। সন্দেহবশে খুনও করেছেন অনেক বেশি। তথাপি হিটলারকে যেমন তাঁর জেনারেলদের মধ্যে কয়েকজন হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন সেইরূপ ষড়যন্ত্র স্তালিনের বিরুদ্ধে হয়েছিল বলে জানা যায়নি। হিটলার তো একবার অতর্কিত আক্রমণে মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন।

স্তালিনের শত্রুসংখ্যা কম ছিল না কিন্তু সুকৌশলে এবং কঠোরহস্তে তাঁদের অবদমিত করেছিলেন। Alan Bullock বলেছেন, "On several occasions Hitler expressed envy of Stalin, who had been able by his pre-war purge of the Red-Army to secure a High command completely loyal to communism. The German generals, Hitler complained, had no such faith in the Nationalist Socialist idea. They have scruples, they make objections and are not sufficiently with him. The German officer corps was the last strong hold of the old conservative tradition, and Hitler never forgot this."

হিটলারের জেনারেলরা হিটলারকে অপসারিত করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি হিটলারের একনিষ্ঠ ভক্ত এলবার্ট স্পীয়ারও শেষ দিকে হিটলারকে তাঁর বাঙ্কারে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে দিয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। হিটলার তাঁর জেনারেলদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি এটা বুঝতে পারতেন যে তাঁর জেনারেলরা তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠেছেন গোপনে। যদিওবা জেনারেলরা তাঁর সামনে এসে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। হিটলার যথার্থ ই বলেছেন যে স্তালিনের জেনারেলরা স্তালিনের বিরুদ্ধে এরকম গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে সাহস পাননি। তাঁরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

স্ট্রেসম্যান মারা যাবার পর ভাইমার প্রজাতন্ত্র পরিচালনা করার মতো কোন শক্তিশালী নেতা জার্মানীতে ছিলেন না। হিণ্ডেনবার্গ তখন বৃদ্ধ। বয়সের ভারে জর্জরিত ও অসুস্থ। ১৯৩০ সাল। ব্রুয়েনিং ভাইমারের চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন। ভন প্যাপেন, শ্লীচার প্রমুখ প্রথম সারির নেতা ব্রুয়েনিং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হলো না।

হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকেই জার্মানীর নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করলেন। ভাইমার

রিপাব্লিকের দুর্বলতা হিটলারকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করল। এ্যালেন বুলক তাই যথার্থ ই বলেছেন যে, "If there had been a strong democratic sentiment in Germany, Hitler would never have come to power or ever to prominence."

সেই একই কথা স্তালিনের ব্যাপারেও বলা চলে। লেনিনের মৃত্যুর পর জিনোভিয়েভ, কামেনভ, ট্রটস্কি ও বুখারিন এঁরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। স্তালিন এঁদের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করেছেন। জিনোভিয়েভ ও কামনেভকে হাত করে স্তালিন লেনিনের উইলটাকে চাপা দিয়েছিলেন। লেনিনের স্তালিনের বিরুদ্ধে বক্তব্য সর্বসাধারণের জানার সুযোগ হলো না। বুখারিনকে দিয়ে নতুন সংবিধান রচনা করালেন। ট্রটস্কিকে মাথা তুলতে দিলেন না অন্য তিনজনকে হাতে রেখে। তারপর একে একে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে চারজনকেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিলেন। নিজে এককভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন। হিটলারও প্যাপেন, শ্লীচার, রোয়েম, গ্রেগর এঁদের হাত ধরে জার্মানীর ক্ষমতা দখল করে তাঁদের প্রত্যেককেই রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে হত্যা করেন। এদিক থেকে দু'জনই ছিলেন একই পথের পথিক। এ্যালেন বুলক (Alan Bullok) Hitler and Stalin : Parallel Lives নামক একটি বই লিখেছেন। বইখানা গবেষণামূলক। তিনি উক্ত বইতে স্তালিন ও হিটলারকে বিশ্বের অন্যতম নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বইতে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে হিটলার ও স্তালিন দু'জনই তাঁদের শাসনকালে বিশ্ব ধ্বংসের গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্ভাগ্য সূচিত হয়েছিল তাঁদের দু'জনের আবির্ভাবের ফলে।

হিটলার ও স্তালিনের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন সময় সাক্ষাতকার হয়নি। দু'জনে দু'জনের ছবি দেখেছেন আর দু'দেশের কূটনীতিবিদরা দু'জন নেতার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে দেখা করেছেন। এ পর্যন্তই। দু'জনই ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী। বুলক বলেছেন নৃশংস অত্যাচার চালাতেই যেন ভগবান তাঁদের ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন।

দু'জনই ছিলেন ইহুদী বিদ্বেষী। দু'জনই ছিলেন ভিনদেশী স্বদেশেই। তাঁরা বিশ্বে এসেছিলেন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে যা সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে ছিল। Alan Bullock বলেছেন, "Both were renentful outsiders who began their long-shot careers as loners on the farthest, fringes of society. Both were visceral anti-semites, ...Ruthlessness in Stalin's eyes, as in Hitler's, was a supreme virtue, to be curbed only for the sake of expediency."

এ্যালেন বুলক স্বীকার করেছেন দু'জনই কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসে তাঁরা নিজমূর্তি ধারণ করেন। তাঁরা নিজেদের মনে করতেন বিশ্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা সুপারম্যান। এসেছিলেন বিশ্বকে

পরিচালনা করতে নিজেদের মনোমতো করে। যেখানে সাধারণ নৈতিকতার কোন ছোঁয়া ছিল না। "They considered themselves to be what Hegel called 'World-Historical individuals', superman destined to carry out the will of providence and unfettered by ordinary morality." এ্যালেন বুলক সময় সময় স্তালিনের সম্পর্কে ভালো ভালো মন্তব্য করেছেন। তাঁর সংগঠনমূলক কাজের প্রশংসা করেছেন। রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধিমানসে স্তালিনের অনবদ্য অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। যদিওবা তিনি বলেছেন যে যুদ্ধকালীন নিহতের সংখ্যা বাদ দিলে স্তালিন হিটলারের চেয়ে দ্বিগুণ লোককে খুন করেছেন সন্দেহবশে। স্তালিনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাঁর কোন মাথার গণ্ডগোলের জন্য হয়নি রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার মতো। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় নিজের দেশের লোককে খুন করেছেন নিজের ও দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। "Stalin's purges and atrocites, in which millions of his own people died, were not a expression of his madness, but the persuit of objectives, "with a logic that was consistent both politically and psychologically."

১৯৪১ সালের ২২শে জুন। হিটলার স্তালিনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করলেন। হিটলার যে রাশিয়া আক্রমণ করবেন তা চিন্তাই করতে পারেননি স্তালিন। ঘটনাচক্রে স্তালিনের রুশ সৈন্যরা হিটলারকে যুদ্ধে পরাস্ত করল। সমগ্র বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েক'শ লোক করল মৃত্যুবরণ। হিটলার বিশ্বাসঘাতকতা করায় স্তালিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার যে রাশিয়া আক্রমণ করবেন তা স্তালিনের চিন্তার বাইরে ছিল। যুদ্ধশেষে হিটলারের পরাজয়ের পরও ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে স্তালিন চিন্তা করতেন জার্মানী ও রাশিয়ার সম্মিলিত শক্তিকে অবদমিত করার ক্ষমতা সমগ্র বিশ্বে কারও নেই। "Even after war ended, he (Stalin) was still complaining that together with Germans we would have been invincible."—Alan Bullock's Hitler and Stalin : Parallel Lives.

হিটলার ও স্তালিন মিলিতভাবে পূর্ব ইউরোপ ভাগ বাঁটোয়ারা করে সেখানে তাঁদের প্রভুত্ব কায়েম করবেন এ ছিল স্তালিনের মনের সুপ্ত অভিপ্রায়। তাই হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। স্তালিনকে হতাশ করলেন হিটলার আর বিশ্বের মানুষ গেল বেঁচে।

হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি পেল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার চোখে স্তালিন হয়ে গেলেন বীর। হিটলারের হাত থেকে স্তালিন কেবল রাশিয়াকে বাঁচালেন না বাঁচালেন সমগ্র বিশ্বকে।

১৯৪৫ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। তখন বার্লিন দখলের লড়াই চলছে। ইয়ালটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ইয়ালটা ক্রিমিয়ার উপকূলে অবস্থিত পর্যটন স্থান। রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন বিশ্বের তিন মহানায়ক মিলিত হলেন ইয়ালটাতে। স্তালিন ছিলেন

ইয়ালটা সম্মেলনের মধ্যমণি। সমগ্র বিশ্বকে হিটলারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যেন তাঁর আগমন এ ধরাধামে।

রুজভেল্ট ইয়ালটা সম্মেলনে অনেক নরমসুরে স্তালিনের সঙ্গে কথা বললেন। রুজভেল্ট বিভিন্ন সর্তে স্তালিনকে হাত করতে চাইলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামানো। হিটলারের পরাজয় তখন অবধারিত। কিন্তু জাপান তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম এবং যুদ্ধ চালিয়েও যাচ্ছিল বীরবিক্রমে। আমেরিকা জাপানের ওপর অ্যাটম বোম ফেলার কথাও চিন্তা করে রেখেছে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে, যাতে হাজার হাজার আমেরিকান সেনার জীবন বাঁচে। অবশ্য অ্যাটম বোম ব্যবহারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গোপন সিদ্ধান্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান সেনানায়ক জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারকেও জানানো হয়নি তখনও। ম্যাক আর্থারকে এ খবর জানানো হয়েছিল জাপানের ওপর বোমা ফেলার ৫ দিন আগে অর্থাৎ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৫।

রুজভেল্ট স্তালিনকে পোল্যাণ্ডের ওপর রুশ অধিকার কায়েম করার জন্য সম্মতি দিলেন। ইউরোপকে তিন প্রধানের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার একটা পরিকল্পনাও রচিত হলো। তৃতীয়ত জার্মানীকে ভাগ করে একভাগ রাশিয়াকে দিতেও সম্মতি জানালেন রুজভেল্ট। যদিওবা রুজভেল্টের উপদেষ্টামণ্ডলী রুজভেল্টকে রাশিয়ার সঙ্গে অত বেশি নরমসুরে কথা না বলতে অনুরোধ করলেন। রুজভেল্ট তাদের কথাতে কর্ণপাত করলেন না। তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

কিন্তু এর মধ্যে ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫ রুজভেল্টের মৃত্যু হলো। রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্বের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন হ্যারি এস ট্রুম্যান। সেই সময় রাশিয়ায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন এভারেল হ্যারিম্যান (Averell Harriman)। তিনি রাশিয়া সম্পর্কে ট্রুম্যানকে কঠোর হতে অনুরোধ করলেন। ট্রুম্যান নিজেও রুজভেল্টের মতন রাশিয়াকে অত বেশি সুযোগ সুবিধে দিতে সম্মত ছিলেন না। ট্রুম্যান প্রথমেই রাশিয়ার Land Lease Aid বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি জার্মানীর যে অংশ রাশিয়াকে দেবার জন্য রুজভেল্ট ঘোষণা করেছিলেন সেই অংশ পুরোপুরি দিতে অস্বীকার করলেন।

স্তালিন ক্ষুব্ধ। ট্রুম্যানের মনোভাব দেখে স্তালিন বিস্মিত। অবশ্য দূরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পোটসডমে আবার তিন দেশের সম্মেলন হলো। পোটসডম প্রাশিয়ার এক সমৃদ্ধ শহর। ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রদেশের রাজধানী। বার্লিন থেকে মাত্র ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৯৪৫-এর জুলাই মাসে পোটসডম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। স্তালিনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অনেকগুলি দাবী আদায় করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন ট্রুম্যান ও চার্চিল। স্তালিন বুঝতে পারলেন রুজভেল্টের সঙ্গে চুক্তির কোন সর্ত মানতে ট্রুম্যান রাজী নয়। ফলে পোটসডম সম্মেলনে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো।

১৯৪৫-র ৬ই আগষ্ট ট্রুম্যানের নিষ্ঠুর গোপন নির্দেশে জাপানের হিরোসিমা শহর বিধ্বস্ত হলো অ্যাটম বোমার আঘাতে। বিশ্ব উঠল কেঁপে। বোমা পড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্ববাসী জানতো না কি সর্বনাশ ট্রুম্যান করতে যাচ্ছে! বোমা ফেলার ৪৩ সেকেণ্ড পরেই সমগ্র শহরের নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেহ ঝলসে গেল। অনেকের দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। দ্বিতীয় বোমা পড়ল নাগাসিকি শহরে ৯ই আগষ্ট। জাপানের দুটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর বিধ্বস্ত হলো। দুটি শহরের ½ অংশ ধ্বংস হলো। ১০ই আগষ্ট জাপান বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করল। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ জাপানের প্রতিনিধিরা আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করল। যুদ্ধ গেল থেমে।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ হিটলার বাংকারে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার আট দিন পর জার্মানী আত্মসমর্পন করেছিল বিনা সর্তে।

জার্মানী দ্বিধা বিভক্ত হলো। পূর্ব জার্মানীর দখল নিলো রাশিয়া। আর পশ্চিম জার্মানী রইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার হাতে। বার্লিনও পূর্ব এবং পশ্চিমে ভাগ হয়ে গেল। পূর্ব বার্লিন গেল রাশিয়ার হাতে আর পশ্চিম বার্লিন থাকল আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দখলে। মূলত আমেরিকার আধিপত্যই রইল বেশি। বলতে গেলে জার্মানীর একদিক রইল রাশিয়ার হাতে আর একদিক রইল আমেরিকার দখলে। যে জার্মানীকে হিটলার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন তাঁরই ভুল পদক্ষেপের ফলে সেই জার্মানী বিধ্বস্ত হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের কথা মনে পড়লে শরীরে শিহরণ জাগে। রাশিয়ার প্রায় দু'কোটি শক্তসমর্থ লোক নিহত হলো। অগণিত লোক আহত হলো। বেশিরভাগই হলো পঙ্গু। ফ্রান্সের লোকক্ষয় হলো ছয় লক্ষ, ব্রিটেনের প্রায় ৪ লাখ আর আমেরিকার ,৩,২৫০০০। এ ছাড়া মিত্রপক্ষের আরও প্রায় ২ কোটি লোক বিভিন্নভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

অক্ষশক্তির ক্ষয়ক্ষতিও কম নয়। জার্মানী প্রায় ৩৫ লক্ষ শক্ত-সমর্থ লোককে হারালো। অগণিত লোক পঙ্গু-অর্দ্ধপঙ্গু-অবস্থায় কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেল। আর জাপানের লোকক্ষয় ঘটলো প্রায় ২১ লক্ষ। শুধু নাগাসিকি-হিরোসিমাতেই তো প্রায় ,তিন লাখ লোক প্রাণ হারালো। আর পঙ্গু হয়ে রইলো অনেক। ইতালির ক্ষয়ক্ষতিও প্রায় একইরকম। আর সমগ্র বিশ্বে সম্পদনাশের পরিমাণ প্রায় চারশ কোটি ডলারের ওপর।

রাশিয়ার কোন কোন জায়গায় একটি বাড়িও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। জার্মানীর অবস্থাও তথৈবচ। বিশেষত বার্লিনের। স্তালিন ৮ বছর সময়ের মধ্যে বিধ্বস্ত রাশিয়াকে গড়লেন নতুনভাবে। রাশিয়াকে স্তালিন ধ্বংসস্তূপ থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করেন। সামরিক অস্ত্র-শস্ত্রে, অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে, মহাকাশ অভিযানে, শিল্প ইত্যাদিতে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে আরম্ভ করল। আমেরিকা রাশিয়ার মধ্যে শুরু হলো ঠাণ্ডা লড়াই। বিশ্বের Balance of Power রক্ষার্থে রাশিয়ার বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হলো।

অবশ্য পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশকে রাশিয়ার পুনর্গঠনের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হলো প্রচুর। Louis Fischer যথার্থই বলেছেন যে, "Between 1945 and 1950, Russia achieved a near-miraculous economic recovery by subordinating the economy of Eastern Europe to Russian needs."

জার্মানীকে ধ্বংসস্তূপের হাত থেকে পরিত্রাণ করতে হিটলারের পক্ষে তো আর আবির্ভাব হওয়া সম্ভব ছিল না। হিটলার তো আত্মহত্যা করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। হিটলারের হাজার বছরের স্বপ্নের রাইখ তাসের ঘরের মতন ধ্বসে পড়ল।

হিটলারের বিরুদ্ধে সমস্ত মিত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়েছিল। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং স্তালিন স্বাক্ষরিত আতলান্তিক সনদে মিত্রশক্তিবর্গের উদ্দেশ্যগুলি ঘোষিত হলো। ১লা জানুয়ারী, ১৯৪২ আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীনসহ ২৬টি মিত্রশক্তি-বর্গের দেশ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নিলো একযোগে।

১৯৪৩ সাল। ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিলিত হলেন রুজভেল্ট, চার্চিল আর ফ্রান্সের দুই প্রতিনিধি দ্যগল ও গিরো। অক্টোবরে হলো মস্কো সম্মেলন। আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা মিলিত হলেন। ঘোষণা করলেন ভবিষ্যতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা। নভেম্বর ২২-২৬, ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত হলো কায়রো সম্মেলন। রুজভেল্ট, চার্চিল, চিয়াং কাইসেক মিলিত হলেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করলেন সম্মিলিতভাবে। ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো তেহরান সম্মেলন। রুজভেল্ট, স্তালিন ও চার্চিল এ তিন মহানায়ক মিলিত হয়ে মিত্রশক্তির পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে একমত হলেন।

দেখা যাচ্ছে হিটলারের শক্তিকে খর্ব করার ক্ষমতা বিশ্বের কোন একক দেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্রিটিশ মেজর ট্রেভর রোপার (Trevor Roper) যথার্থই বলেছেন যে, "Hitler was not one who was prepared to allow history to follow any predetermined political or economic course. In a megalomania fired by almost hypnotic personality he set himself to determine the pattern of the history of Europe for a thousand years. Here was a man who by ordinary standard would be judged insane, yet it took the combined might of the British Commonwealth, of the United States, and of the Soviet Republic to pull Hitler's lunatic Structure to the ground."

ট্রেভর রোপারের মতে হিটলার ইতিহাসের কোন পূর্বনির্দ্ধারিত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক রীতিনীতি মেনে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনেকটা অস্থির চিত্ত কিন্তু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যে কোন লোককে সম্মোহিত করার ক্ষমতা রাখত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর স্পষ্ট তৃতীয় রাইখের শাসন জার্মানীতে হাজার বছর স্থায়ীত্ব লাভ করবে। ট্রেভর রোপার বলেছেন সাধারণভাবে বিচার

করলে হিটলারকে বিকৃতমস্তিষ্কের রাজনীতিবিদ্ বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করা বিশ্বের কোন একক শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়া—এই তিন বৃহৎ শক্তি সম্মিলিত-ভাবে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। সঙ্গে ছিল ফ্রান্স, চীনসহ আরও প্রায় ২১টি দেশের সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র।

হিটলার পঙ্গু ও হৃতসর্বস্ব জার্মানীকে তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। জার্মানরা তাঁকে তাদের অবিসংবাদিত নেতার আসনে বসিয়েছিল। হিটলার একদিকে জার্মানীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন, সারা বিশ্ব তাঁর দাপটে কেঁপেছে, আবার তাঁর অনেক ভুল পদক্ষেপের ফলে তাঁর হাজার বছরের স্বপ্নের রাইখ ১২ বছরের মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেল।

হিটলারের নিষ্ঠুর ও বর্বর অত্যাচারের জন্য বর্বর হূণ সম্রাট এটিলার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। এটিলা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসক। নিজের ভাইকে হত্যা করে তিনি হূণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। আশেপাশের বর্বর জাতিসমূহকে একত্র করে এক বিশাল দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরি করেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে এটিলা দানিয়ুব নদী পার হয়ে জার্মানী প্রবেশ করেন। লুণ্ঠন চালান অবলীলাক্রমে। সেখান থেকে বিশাল বাহিনীসহ ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন এটিলা। ফ্রান্স ও অরলিয়েন্স তাঁর অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটিলার জন্ম ৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি হূণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর অত্যাচারে ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল।

রোমান এইটিস (Aeties the Roman) এবং ভ্যাণ্ডাল থিওডরিও (Theodorio the Vandal) এটিলাকে এক বিশাল শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। কিন্তু পর বছরই এটিলা আবার নববিক্রমে ইতালী আক্রমণ করেন। অগণিত ইতালীয় সৈন্য এবং নিরীহ লোক এটিলার হাতে প্রাণত্যাগ করে। ইতালী বিধ্বস্ত হয়। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। এটিলার মৃত্যুতে হূণ সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। এটিলাকে Attila the Great না বলে 'Attila, the Scourge of God' নামে অভিহিত করা হয়। চাবুক হাতেই যেন তাঁকে ভগবান এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর চাবুকের কষাঘাতে ইউরোপের দেশগুলির দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে বুদাপেষ্টের সন্নিকটে তাঁর সমাধি আবিষ্কৃত হয়। এটিলার হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিল না। হিংস্র পশুর হৃদয় নিয়েই তার জন্ম হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন যে এটিলার অশ্ব যেখানে পা ফেলত সেখানে ঘাস পর্যন্ত গজাতো না।

অনেক ঐতিহাসিক হিটলারকে বর্তমান যুগের এটিলা বলে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর এই কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন যে হিটলার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি হিটলারকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা বলে

স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Hitler was an extraordinary man; and they may well be true. But his policy is capable of rational explanation; and it is on this that the history is built." তিনি আরও বলেছেন যে, "Hitler was intending to succeed without war, or at any rate with a war so nominal or hardly to be distinguished from diplomacy. He was not projecting for major war......Under Hitler's direction, Germany was equipped to win the war of nerves......he was not equipped to conquer Europe."

এ জে. পি. টেলর যথার্থই বলেছেন যে ১৯৩৯ সালে হিটলার বড় ধরনের কোন যুদ্ধে নামতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন কূটনৈতিক চালে এবং স্নায়বিক যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে পরাজিত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর দখলীকৃত জায়গাগুলি পুনরায় দখল করে নিতে। টেলরের মতে হিটলার নিদেনপক্ষে সামান্য যুদ্ধের মহড়া দিয়ে মিত্রশক্তিকে কাবু করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ তখনো তিনি অর্জন করেননি। ঘটনাচক্রে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। তবে হিটলারের নেতৃত্বে মৃতপ্রায় জার্মানী প্রায় সব দিক থেকেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। অর্থ, শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সব বিষয়ে জার্মানী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠল। "Germany was a Greater power economically than either Great Britain or France—slightly Greater than both put together."

হিটলার নিজেই মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্বীকার করেছেন তিনি এরকম সামগ্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। ঘটনাচক্রে এবং ইহুদীদের চক্রান্তে তিনি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং স্নায়বিক যুদ্ধের মহড়া দিয়ে তিনি তাঁর ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তা না হয়ে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন এবং একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ তাঁর মনোবল বৃদ্ধি করল। জেনারেলদের কোন কথায় তিনি কর্ণপাত না করে যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া আক্রমণ করে নিজের ও জার্মানীর ধ্বংসের পথ ত্বরান্বিত করলেন। Kurt G. W. Ludeke যথার্থই বলেছেন, "Never in history had any great nation surrendered to its leader so completely as the German people to the Fuehrer; never in history did any Greatman—Mussolini and Stalin included—rule with so much emotional and physical power behind him."

সত্যি জার্মানরা হিটলারকে তাদের পয়গম্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেছে। তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছে বিনা দ্বিধায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। মুসোলিনী ছিলেন হিটলারের অন্যতম সুহৃদ। স্তালিনও প্রথমদিকে হিটলারের একান্ত অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে স্তালিনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন যা

স্তালিনের চিন্তার বাইরে ছিল। স্তালিন ও হিটলারের মধ্যে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া ও জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা হিটলারের চরম ক্ষমতা লাভের খুবই সহায়ক হয়েছিল। তবে হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নিয়ে এলেন। তা না হলে রাশিয়া ও জার্মানীর সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তখন কারও ছিল না।

তবে এ. জে পি টেলর যা বলেছেন হিটলার ১৯৩৯ সালে কোন বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি তা যে সর্বৈব সত্য সেকথা হিটলার তাঁর Political Testament-এ মৃত্যুর আগে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, "It is untrue that I, or anybody else in Germany, wanted war in 1939. It was wanted and provided exclusively by those international politicians who either came of Jewish stock, or worked for Jewish interests. After all my offers of disarmament, posterity cannot place responsibility for this war on me."

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানীকে পুনর্গঠনের জন্য আরও একজন হিটলারের আবির্ভাব ঘটেনি জার্মানীতে। সংযুক্ত জার্মানী এখন দেশ গড়ার কাজে নিযুক্ত। তবে তাদের মধ্যে যে জাতিগত সংঘাত চলছে তা খুব শুভলক্ষণ নয় জার্মানীর পক্ষে। হিটলারের নাৎসীবাদ এখন জার্মানীতে আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। বহিরাগতদের তারা এখন সহ্য করতে পারছে না। ইহুদীবিদ্বেষও আবার প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। তাই জার্মান সরকার সন্ত্রস্ত। এখন ঐক্যবদ্ধ জার্মানী বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে ভয়ঙ্কর। জার্মানী আবার কখন কাকে ছোবল মারবে সেই ভয়ে কেবল আমেরিকা নয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই চিন্তিত। আর রাশিয়া তো এখন খণ্ডিত। রাশিয়া এখন কারও পক্ষে প্রয়োজনবোধে অস্ত্রধারণ করবে সেটা কোন সুস্থ মানুষ ভাবতে পারে না। রাশিয়া বাস্তবিকপক্ষে এখন আমেরিকার বংশবদ।

এখন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, কাজাকস্থান, তাজিকিস্থান, জর্জিয়া, মল্ডেভিয়ায় চলছে জাতিতে জাতিতে দাঙ্গা। গত পাঁচ বছরে এ সমস্ত দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যাও নেহাত কম হয়নি। চলছে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ। সংঘর্ষে ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। বরিস ইয়েলতসিন কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থাকে একটা ভ্রান্ত ধারণা বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদের সুর ও সঙ্কটের বীজ।

তাতারস্থান রাশিয়ার অন্যতম সম্পদশালী অঞ্চল। রাশিয়ার প্রায় ৩০% তৈল সম্পদ এখানে অবস্থিত। তাতারস্থান এখন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনে বদ্ধপরিকর। তাতারস্থানের প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে রাশিয়ার এখন কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রাশিয়ার এখন ১৭টি অঞ্চল রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে চেচেন, চোনিয়া, ইয়াকুতিয়া ও তুভা

প্রভৃতি। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সাইবেরিয়া এখন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উদ্‌গ্রীব। সাইবেরিয়া ইতিমধ্যে নিজেদের সংবিধান রচনার জন্য কমিটি গঠন করেছে।

অনেকের মতে এখন রাশিয়ার কোন সমর্থ সরকার নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এখন চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। রাশিয়ায় চলছে চরম অর্থ নৈতিক সংকট। ইয়েলতসিনের বিরুদ্ধে এখন রুশ জনগণের এক বিশাল অংশ সোচ্চার। প্রায় ২৫ হাজার শিল্প কারখানা এখন অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে ধুঁকছে। উৎপাদন হচ্ছে ব্যাহত, অর্থ সংকট চরমে, কাঁচামালের অভাব সুস্পষ্ট। রাশিয়ার প্রাচীন কম্যুনিস্টরা এবং সিভিক ইউনিয়ন স্যালভেশন ফ্রন্ট গঠন করেছে। বিরোধীরা জোর প্রচার চালাচ্ছে রাশিয়ায় এখন কোন সরকার নেই। সরকার চালাচ্ছে আই. এম এফ.-এর নেতৃত্বে কালোবাজীরা। স্যালভেশন ফ্রন্ট ইয়েলতশিনের পদত্যাগের জন্য জোর আন্দোলন চালাচ্ছে। ইয়েলতসিন কিন্তু অনড়, অটল। তিনি বলেছেন যে তিনি ইস্তফা দিলে দেশের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। তিনি আরও বলছেন যে দেশে এখন নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই। তিনি স্যালভেশন ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। স্যালভেশন ফ্রন্টও কোন নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ দিতে পারছে না কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে রাশিয়ার মুক্তি ঘটবে। ইয়েলতসিনও কতোদিন এভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

স্যালভেশন ফ্রন্ট সমালোচনায় মুখর। কিন্তু সমাধানের কোন পথ দেখাতে পারছে না। সব মিলে রাশিয়া এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। রাশিয়ার এই সংকট নেতৃত্বের সংকট, অর্থনীতির সংকট ও সংকট রাজনীতির। রাশিয়ার অবস্থা তো এরকম ছিল না। রাশিয়া ছিল নিষ্পেষিত দেশের বন্ধু। বৃহৎশক্তিবর্গের হাত থেকে নিষ্পেষিত দেশের ত্রাণকর্তা। রাশিয়া ছিল ভারতের অন্যতম সুহৃদ। ভারতকে কাশ্মীর প্রশ্নে, বাংলাদেশ যুদ্ধে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যেভাবে সাহায্য করেছে তা তো সর্বজনবিদিত। নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো (Veto) প্রয়োগ করে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে অনেকবার বাঁচিয়েছে রাশিয়া। আজ রাশিয়ার এই পরিণতিতে বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য বিপন্ন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে স্তালিনের আমন্ত্রণে রাশিয়া গিয়েছিলেন। রাশিয়াতে তখন স্তালিন প্রবল বিক্রমে একনায়ক হিসেবে দেশ শাসন করছেন। কবি রাশিয়ায় গিয়ে স্তালিনের শাসনের ভালোমন্দ দুটো দিকই অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে দেখেছেন। তার কিছু বিবরণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

কবি স্তালিনের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সমালোচনা করেছেন 'রাশিয়ার চিঠিতে'। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা রুশ নেতারা ধরতে পেরেছিলেন বলে কবি মনে করেননি। সেইদিক থেকে কবি রুশ নেতাদের ফ্যাসিস্টদের সমগোত্রীয় বলে মনে করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমষ্টিকে সবল করা যায় না।

ব্যষ্টিকে শৃঙ্খলিত করে সমষ্টিকে স্বাধীন করা যায় না। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় "এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে ; কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।" কবির এই উক্তি যে কতখানি সত্য তা বর্তমানে খণ্ডিত ও বিবদমান রাশিয়ার দিকে তাকালে তা অনুধাবন করা যায়।

স্তালিন ছিলেন রাশিয়ার জবরদস্ত শাসক। তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর নিষ্ঠুর নির্দেশে অগণিত লোক নিহত হয়েছে রাশিয়ায়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনিই রাশিয়াকে তাঁর বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়ে গড়েছিলেন। একবার রুশ বিপ্লবের পর আর একবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। লেনিনের পর তিনি রাশিয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেন। নিঃস্ব, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাশিয়াকে আলোকবর্তিকা হাতে পথ নির্দেশ দেন। দেশকে অর্থ, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেন। বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিবর্গের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে থাকেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ার আলোর দিশারী একনায়ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত রাশিয়াকে তিনি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে আমেরিকার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকেন। তিনিই রাশিয়াকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করেন। স্তালিনের অনেক অত্যাচার রুশজনগণ সহ্য করেছে। ক্রুশ্চেভ স্তালিনের অত্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর আমলে রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধিকে ক্রুশ্চেভ ছোট করে দেখেননি। স্তালিনের সমকক্ষ শাসক রাশিয়ায় না থাকায় রাশিয়া আজ খণ্ডিত, সর্বদিক থেকেই দুর্বল।

রবীন্দ্রনাথের কথা সত্যদ্রষ্টা ঋষির কথা। তাঁর প্রতিটি কথা আজ প্রণিধানযোগ্য। স্তালিনের মতো জবরদস্ত একনায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। আজ যার ফল রাশিয়াকে ভোগ করতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্তালিনের শাসনের কুফল সম্পর্কে আর একটা কথা বলেছেন—যা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।" শিক্ষিত মন আজ তাদের চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করার ফল রাশিয়াকে করেছে খণ্ডিত। এই খণ্ডিত রাশিয়াকে একত্রে রাখার মতো ক্ষমতা বর্তমানে রাশিয়ার কোন নেতার নেই। যা ছিল স্তালিনের মধ্যে। রাশিয়ার এই পরিণতি বিশ্বের নিষ্পেষিত দেশগুলিকে বিপন্ন করে তুলেছে। প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা এখন রাশিয়ার নেই। Paul Preston যথার্থই বলেছেন যে, "The positive achivement of Stalinism was that it tore primitive, rural Russia out of its feudal backwardness, hurling it

almost fully industrialized, into the twentieth century. When Hitler attacked Russia, it would be his undoing." This was so because Stalin had prepared Russia for modern warfare. এদিক থেকে চিন্তা করলে বলতে হয় স্তালিন ছিলেন সত্যি অনবদ্য, রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ণধার। আর হিটলার ইচ্ছে করলে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস করতে পারতেন অ্যাটম বোমার আঘাতে। তাঁর কাছেই ছিল ইউরেনিয়ামের খনি। তখন অন্য কোন দেশে ইউরেনিয়মের সন্ধান মিলেনি। একমাত্র হিটলার অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়াতে ছিল এ সম্পদ। যা দিয়ে অ্যাটম বোমা তৈরি করে তিনি বিশ্বকে বিধ্বস্ত করতে পারতেন, আর লাভ করতে পারতেন বিশ্বজয়ের সম্মান ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে। তাঁর কাছেই ছিলেন তদানীন্তন যুগের প্রায় সব অ্যাটমিক বিজ্ঞানী।

কিন্তু অপরিণামদর্শী হিটলার গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ইহুদী অ্যাটমিক বিজ্ঞানীদের তাড়িয়ে দিলেন দেশ থেকে। আর তাঁরা আইনষ্টাইনের শরণাপন্ন হলেন। আইনষ্টাইনের অনুরোধে রুজভেল্ট আমেরিকায় অ্যাটম বোম তৈরিতে স্বীকৃতি দিলেন। স্থাপিত হলো ম্যানহাটন প্রোজেক্ট। তৈরি হলো অ্যাটম বোমা। এই বোমা তৈরির মূল কৃতিত্ব জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত অ্যাটমিক বিজ্ঞানীদের। তাই বলা যায় হিটলার বড় সংগঠক ছিলেন ঠিক কিন্তু বড় কূটনীতিবিদ্ ছিলেন না। যার জন্য নিজের ও জার্মানীর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তাঁর যুগের অবসান ঘটল। এখানেই রয়েছে স্তালিন ও হিটলারের মধ্যে মূলগত তফাৎ।

নেতাজী ও হিটলার

নেতাজী ও হিটলার দু'জনই বিশ্বের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। দু'জনই ছিলেন বিরাট মাপের নেতা। একজন ভারতের অন্যজন জার্মানীর। মানসিক দিক থেকে দু'জনের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও তফাৎ অনেক। দু'জনই স্বদেশের সার্বিক মঙ্গল-বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। দু'জনই ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা। হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত, পঙ্গু ও হৃতসর্বস্ব জার্মানীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়ে জার্মানীকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তাঁর মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা ছিল প্রবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা এবং নৃশংস একনায়ক হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। ইহুদীদের ওপর তিনি যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিলেন তার বর্ণনা পড়লে গায়ে শিহরণ জাগে। নেতাজীর মধ্যে এরকম নিষ্ঠুর মানসিকতার লেশমাত্র ছিল না তবে ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য তিনি মরণ-পণ-সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নীতির দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা

অর্জন করা সহজে সম্ভব হবে না। তাই অহিংস আন্দোলনের পূজারী সুভাষ বিদেশী শক্তির সাহায্যে বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তির ওপর কঠোর আঘাত হানার সংকল্প গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সেই সুযোগ করে দিল। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাহায্যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিকল্পনামতো কাজ করতে। কিন্তু স্তালিন তাঁর অনুরোধে সাড়া দেননি। বাধ্য হয়ে তাঁকে হিটলারের স্মরণাপন্ন হতে হয় এবং ১৯৪১ সালে তিনি বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হন ব্রিটিশসিংহের অতন্দ্র প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে।

নেতাজী ছিলেন ইতিহাসে সুপণ্ডিত। বাস্তব রাজনীতিবিদ্। গ্রীস, ইতালি ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। এ সমস্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয়েছিল-তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন।

গান্ধীর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে নেতাজী কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এলেন। গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। ফরওয়ার্ড ব্লকে অনেক পণ্ডিত রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা জানতেন সুভাষের মধ্যে যে শক্তি আছে তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নেতাজী ভারত থেকে কিভাবে অন্তর্ধান করে হিটলারের দেশে গেলেন ইতিহাসের পাতায় তার এক রোমহর্ষকর কাহিনী রয়েছে।

১৯৪০ সাল। জুলাই মাস। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হলো। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তিনি অনশন শুরু করলেন। সমস্ত ভারতবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ল। তাঁর মুক্তির জন্য শুরু হলো গণ-আন্দোলন। সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন। তবে তাঁর ওপর ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী কড়া নজর রাখল। তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হলো। তাঁর ভারত থেকে পলায়নের নিখুঁত পরিকল্পনা ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের বোঝার অগম্য ছিল।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে নেতাজী গোপনে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা 'নিরঞ্জন সিং তালিব'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। নিরঞ্জন সিং ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক। নেতাজীর পরিকল্পনার কথা নিরঞ্জন সিং আগেই জানতে পেরেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে কম্যুনিস্ট নেতা অচ্ছর সিং চীনা চলে গেলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে সেখানে নেতাজীর থাকার সব ব্যবস্থা পাকা করতে। অচ্ছর সিং ছিলেন পার্টির একজন আত্মগোপনকারী নেতা। তিনি আমেরিকায় সদর পার্টির সদস্য ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি অনেকবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছেন। নিরঞ্জন সিং নেতাজীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তাঁর রাশিয়া যাবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।

এই সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। নেতাজী নানান চিন্তাভাবনা করে ২২শে এবং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের

কার্যকরী সমিতির এক সভা আহ্বান করলেন দিল্লীতে। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরিকল্পনা ছিল মাথায়। এই সমস্ত ব্যাপারে গোপন কিছু আলোচনার জন্য সম্ভবত এ সভা আহ্বান করলেন তিনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা আকবর শাহ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। দেখা করলেন নেতাজীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে। আকবর শাহকে নেতাজী তাঁর রাশিয়া যাবার পরিকল্পনার কথা জানালেন। ভাইপো শিশির বোসকেও এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। শিশির বোসের সঙ্গে আকবর শাহর পরিচয় করিয়ে দিলেন নেতাজী। অচ্ছর সিং চীনা যে সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছেন তাঁর থাকার ও থাবার সব ব্যবস্থা পাকা করতে জানিয়ে দিলেন আকবর শাহ ও শিশির বোসকে।

মিঞা আকবর শাহ ছিলেন একজন অ্যাডভোকেট। আফগানিস্তানের হিজরত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সেখান থেকে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যান। মস্কোতে শ্রমজীবীদের জন্য স্থাপিত প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেকদিন পড়াশুনা করেন। দেশে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। তিন বছর জেলে কাটান। জেল থেকে মুক্তিলাভ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নেতাজীর ডাকে।

আকবর শাহ নেতাজীর কাছে সব কথা শুনলেন। কাবুল হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার নেতাজীর পরিকল্পনার কথা অবগত হলেন। আকবর শাহ নেতাজীকে জানালেন যে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁকে একজন বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট সদস্যর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি একজন পাখতুন। ঘাল্লাদেহে তাঁর বাড়ি। নাম ভগতরাম তলোয়ার। তিনি একজন বিপ্লবী। খান আব্দুল গফুর খানের এক সময়ের সুযোগ্য শিষ্য। ঘাল্লাদেহের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা। পাখতুন নেতা হরিকিষণের সহোদর ভাই। হরিকিষণ পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার জিওফ্রি দ্য মণ্ট মোরেন্সিকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। পাঞ্জাবের গভর্ণর লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানও উপস্থিত ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে।

ভগতরাম আবদুল গফুর খানের লালকুর্তা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মর্দানের হালকা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও ছিলেন। আবদুল গফুর খান ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু। নেতাজী ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে ভারত ভ্রমণে বের হন ভারতবাসীকে তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি পেশোয়ারে উপস্থিত হন। এখানেই তাঁর সঙ্গে ভগতরামের পরিচয় ঘটে। পেশোয়ারবাসী তাঁকে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল।

আকবর শাহর কথায় নেতাজী সম্মতি জানালেন। স্থির হলো নেতাজী প্রথমে যাবেন পেশোয়ারে। সেখান থেকে যাবেন কাবুলে। পেশোয়ার থেকে তাঁর কাবুল যাবার সঙ্গী হিসেবে থাকবেন ভগতরাম তলোয়ার ও তাঁর আরও দু-একজন ঘনিষ্ঠ

বন্ধু। আকবর শাহ ছিলেন অত্যন্ত দরদী মানুষ। তাঁর ওপর নেতাজীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। শিশির বোস, নেতাজী ও আকবর শাহ এক সন্ধ্যায় গোপন মিটিং-এ মিলিত হলেন। গোপন ঠিকানা, গোপন কোড ওয়ার্ডসে কথাবার্তা বলা, নেতাজীর ছদ্মবেশের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিয়ে কথা হলো। স্থির হলো কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নেতাজী ধানবাদ যাবেন তাঁর ভাইপো অশোক বোসের বাসায়। সেখান থেকে তিনি ট্রেনযোগে পেশোয়ার যাবেন। পেশোয়ার থেকে যাবেন কাবুলে।

আকবর শাহ পেশোয়ারে চলে যাবেন আগেই। সেখানে নেতাজীর জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। যাতে তিনি গিয়ে আর কোন অসুবিধের সম্মুখীন না হন। আকবর শাহ নেতাজীর জন্য ওয়াচেল মোল্লার দোকান থেকে প্রয়োজনীয় মুসলমানের পোষাক কিনলেন। কেননা স্থির হলো যে নেতাজী মুসলমানের ছদ্মবেশেই কাবুল যাবেন। কেনা হলো ফ্লানেলের শার্ট, বালিশ, লেপ, কাবুলি চটি ইত্যাদি।

আকবর শাহ এর মধ্যেই পেশোয়ারে চলে যাবার দিন স্থির করলেন। শিশির বোস জানুয়ারী ১৯৪১-এর প্রথম সপ্তাহে তাঁকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে পেশোয়ার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আকবর শাহ পেশোয়ারে গিয়ে বন্ধু আবাদ খানের সঙ্গেও আলোচনা করলেন। স্থির হলো আবাদ খান ও ভগতরাম তলোয়ার নেতাজীকে কাবুলে নিয়ে যাবেন। নেতাজী আকবর শাহকে জানিয়ে দিলেন ১৯শে জানুয়ারী তিনি পেশোয়ার গিয়ে পৌঁছাবেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর গুরু বেণীমাধব দাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান এবং মা প্রভাবতী দেবী যেন এ খবর জানতে না পারেন সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে গুরুকে অনুরোধ করেন। তিনি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১-এ তাঁর বাড়ি থেকে অন্তর্ধানের দিন স্থির হলো। নেতাজীর আত্মীয়-স্বজনরা জানত না তার পরিকল্পনার বিষয়। তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি বেশ কিছুদিন নির্জনে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাধনায় নিমগ্ন হবেন। যথাসময়ে ঘরে ফিরবেন। তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁর অন্তর্ধানের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ভাইঝি ইলা, ভাইপো অরবিন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং শিশির। স্থির হলো শিশির বোস গাড়ি করে তাঁকে ধানবাদে পৌঁছে দেবেন। সেখানে অশোক বোসের কোয়ার্টারে উঠবেন। অশোক বোস তাঁকে গোমো স্টেশনে পৌঁছে দেবেন। সেখান থেকে ট্রেনযোগে পেশোয়ার যাবেন। অশোক বোস শিশির বোসের ছোট ভাই। সুভাষ ১৬ই জানুয়ারী রাতে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কেউ যাতে আসল উদ্দেশ্য জানতে না পারে তার জন্য তিনি সিল্কের ধুতি পরলেন, গায়ে জড়ালেন সিল্কের চাদর। আত্মীয়-স্বজনরা ঘর থেকে চলে গেলে তিনি তাঁর ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। রাত ১-৩০ মিঃ। বাড়ির সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যথারীতি সংকেত দিলেন সব ঠিক আছে। যাত্রার সময় নেতাজীর পরণে ছিল উত্তরভারতীয় এক অভিজাত মুসলমানের পোষাক।

ইলা, অরবিন্দ ও শিশির এলো। এলো দ্বিজেন্দ্রনাথ। ইলাকে আশীর্বাদ করে সুভাষ গাড়িতে উঠলেন। শিশির ও অরবিন্দ উঠলেন পরে। শিশিরই গাড়ির চালক। অরবিন্দ গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। শিশির ষ্টীয়ারিং হাতে বসেছিলেন। সুভাষ বিদায় নিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও ইলার কাছ থেকে। গাড়ি ছুটলো ধানবাদের উদ্দেশে। খুব ভোরে গিয়ে পৌছলো ধানবাদে। শিশির অশোকের কোয়ার্টারের চারশ গজ আগে সুভাষকে নামিয়ে দিলেন।

সুভাষ মহম্মদ জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে পরিচিত হলেন। অশোক আলাদা একটা ঘরে সুভাষের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন হলেন এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানির ট্র্যাভেলিং ইনস্পেক্টর। অভিনয়টা অপূর্ব হলো। অশোক জিয়াউদ্দিনের জন্য আলাদা মুসলমান চাকর ঠিক করে রেখেছিলেন। সারাদিনে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারল না জিয়াউদ্দিন নামধারী ব্যক্তিটি যে সুভাষ।

দিন ফুরিয়ে রাত এলো। জিয়াউদ্দিন রাতের খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। যথাসময়ে অশোক ও তাঁর স্ত্রী গাড়ি নিয়ে এলেন। তখন মধ্যরাত্রি। অশোক, তাঁর স্ত্রী ও সুভাষ গোমো স্টেশনের একটু দূরে এসে নামলেন গাড়ি থেকে। সুভাষ অশোক ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে চট্‌পট্ একটা কুলি নিয়ে ট্রেন ধরার জন্য চললেন।

জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে সুভাষকে অপূর্ব লাগছিল। গায়ে শেরওয়ানি, মাথায় ফেজটুপি আর পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী। গালে ছোট ছোট দাড়ি। দেখে কারও চেনার উপায় নেই যে তিনি সুভাষ। দেখে মনে হচ্ছিল যেন খাঁটি অভিজাত পেশোয়ারি মুসলমান। দিল্লী কালকা মেইলে তিনি এলেন দিল্লীতে। দিল্লী থেকে ফ্রন্টিয়ার ট্রেনে তিনি ১৯শে জানুয়ারী পৌছলেন পেশোয়ারে। তখন সন্ধে। আকবরশাহ ইতিমধ্যে তাজমহল হোটেলে (পেশোয়ারে) জিয়াউদ্দিনের নামে একটা ঘর বুক করে রেখেছেন। আকবর শাহ ফ্রন্টিয়ার ট্রেনের জিয়াউদ্দিনের কম্‌পার্টমেণ্টের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সুভাষকে চিনতে পারলেন। কিন্তু কথা বললেন না। শুধু ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন সুভাষ যেন 'আকবর শাহ'র ঘোড়ায় গাড়িখানা অনুসরণ করেন। তাজমহল হোটেলে সুভাষ গেলেন। আকবর শাহ গেলেন না। সুভাষ হোটেলের ৬নং ঘরে চলে গেলেন।

আকবর শাহ নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। গিয়েই তিনি একজনকে সুভাষের কাছে পাঠালেন হোটেলে। তাঁর নাম আব্দুল মজিদ খান। আকবর শাহ-এর সহপাঠি। আব্দুল কোয়ায়ুম খানের ছোট ভাই। আব্দুল কোয়ায়ুম পরে মুসলিম লীগের একজন জবরদস্ত নেতা হয়েছিলেন।

আকবর শাহ সুভাষকে বেশি সময় তাজমহল হোটেলে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তাঁকে নিয়ে আসা হলো আবাদ খানের ঠিক করা একটি বাড়িতে। সেই রাত্রিতেই আকবর শাহ ভগতরাম তলোয়ারকে সেখানে নিয়ে আসেন। ভগতরামের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় হলো। পরিচয় হলো খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে।

এদিকে সুভাষের কলকাতার কোর্টে হাজিরা দেবার দিন স্থির ছিল ২৭শে জানুয়ারী। তাই সুভাষ খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাঁকে যেভাবেই হোক তার আগে কাবুলে গিয়ে পৌঁছতে হবে। পাছে তাঁর অন্তর্ধানের খবর ফাঁস হয়ে যায় সেই ভয়ে আকবর শাহ, ভগতরাম, আবাদ খান ও সুভাষ স্বয়ং তটস্থ হয়ে ছিলেন। আকবর শাহ সুভাষকে অতি সত্বর কাবুলে পাঠাতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ভগতরাম ব্যতিরেকে আর কোন গাইড পাচ্ছেন না সুভাষের সঙ্গে কাবুল যাবার। একমাত্র আবাদ খান ছাড়া।

যে পথ দিয়ে সুভাষকে তাঁরা কাবুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথ ছিল খুবই নির্জন ও বিপদসঙ্কুল। অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে যেতে হবে যা নেতাজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এর মধ্যে নেতাজীর পোষাক, আফগান মুদ্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হলো। ডক্টর চারুচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি। সুভাষের জন্য ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভূত সাহায্য করলেন।

উপজাতীয় লোকেরা ভয়ঙ্কর হয়। তাই একজন আফ্রিদি গাইডের প্রয়োজন ছিল। আবাদ খান তার ব্যবস্থা করলেন। আবাদ খান, আফ্রিদি গাইড, ভগতরাম, সুভাষ (জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে) রওনা দিলেন কাবুলের উদ্দেশে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪১ খুব ভোরে একটা নির্দিষ্ট গাড়িতে করে। জিয়াউদ্দিন সাজলেন কালা ও বোবা একজন পাঠান। পরলেন শালোয়ার কামিজ, জ্যাকেট, পায়জামা, মাথায় ছিল ফেজটুপি, পায়ে ছিল পেশোয়ারী চপ্পল। এর মধ্যে তাঁর দাড়িও গজিয়েছে অনেক। সুভাষকে চেনার সাধ্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তিনি ছিলেন নীরব, নির্বাক। যেন পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যত কিছুই বোঝেন না। শারীরিক গঠন, গাত্রবর্ণ, অপূর্ব মুখশ্রী সব মিলে মনে হচ্ছিল সত্যিকারের একজন বীর পাঠান। বোবা ও কালার ছদ্মবেশে তিনি ছিলেন হাসিখুশি। ভগতরাম নিজের নাম নিলেন রহমৎ খাঁ।

অনেক চড়াই উতরাই অতিক্রম করে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন আফগান সীমান্তে। ব্রিটিশ সীমান্ত পার হবার সময় তাদের সব পরীক্ষা করল ব্রিটিশ ফৌজ। সেখানে ছিল ব্রিটিশ ফৌজী ক্যাম্প। কিন্তু কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করল না। সীমান্ত পার হয়ে গেলে আবাদ খান পেশোয়ারে ফিরে গেলেন। সীমান্ত পার হয়ে তাঁরা ধরলেন হাঁটা পথ। কিছুদূর গিয়ে হাজির হলেন একটা ছোট মসজিদে। অনেক হাঁটতে হলো। সুভাষ হাঁফিয়ে পড়েছেন। তারপর কিছুদূরে গিয়ে পেলেন এক বিশাল মসজিদ। গাইড তাঁদের বললেন তাঁরা এখন ব্রিটিশ সীমান্ত পার হয়ে উপস্থিত হয়েছেন স্বাধীন পাঠান রাজ্যে। সুভাষ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর ধরা পড়ার ভয় কেটে গেছে। তিনি চীৎকার করে নির্জন স্থানে বলতে লাগলেন, "Here I Kick George VI. Here I spit on the face of Viceroy." আনন্দে সুভাষ আত্মহারা হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁদের যাত্রাপথ ছিল অনেক সুগম। নানান পথ অতিক্রম করে ২৪শে জানুয়ারী তাঁরা আফগানিস্তানের একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিল অনেক গুপ্তচরের আনাগোনা। কোনরকমে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে ২৭শে জানুয়ারী বিকেলে তাঁরা লাখোরী গেটে এসে উপস্থিত হলেন। শিশির বোস ফিরে এলেন কলকাতায়।

২৭শে জানুয়ারী ছিল সুভাষের পুলিশের কাছে হাজিরা দেবার দিন। শরৎ বোস প্রচার করে দিলেন সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ন্যাসীর বেশে সে নিশ্চিত কোথাও চলে গেছে। শিশির বোস ছুটলেন কালিঘাটে। দেখা করলেন এক জ্যোতিষীর সঙ্গে। জ্যোতিষী বলে দিলেন তিনি জানতেন সুভাষ সন্ন্যাস নেবেন।

খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক তল্লাসী চালানো হলো। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বায়ুবেগে খবর ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হলো পুলিশি তৎপরতা। গান্ধীজী শরৎ বোসের কাছে সুভাষের খবর জানতে চাইলেন। শরৎ বোস গান্ধীজীকে জানালেন, "Circumstances indicate renunciation." এরপর থেকে সাধুদের ওপর পুলিশ তল্লাসী চালাতে আরম্ভ করল। বেনারস, এলাহাবাদ, হিমালয়, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থানে সাধুদের ধরপাকড় আরম্ভ হলো। আবার গুজব রটে গেল সুভাষ ব্যাঙ্কক হয়ে জাপানে যাবার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়েছে। জানা গেল যে সুভাষ জাহাজযোগে জাপান যাত্রা করেছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ব্যাঙ্কক পর্যন্ত গোয়েন্দা বাহিনী পাঠালো। কিন্তু কোন খোঁজ মিলল না।

১৯৪১ সালে কাবুলকে আফগানিস্তানের বড় একটি গ্রাম ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা যেতো না। তখন খুবই অল্পসংখ্যক পাকা বাড়ি ছিল কাবুলে। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেশের দূতাবাস। ভগতরাম কাবুলে সুভাষের জন্য একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। কাবুলের লোকের ধারণার মধ্যে ছিল না সুভাষ ওখানে যাবেন। সুভাষ এক বছর ধরেই রাশিয়া যাবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু স্তালিনের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অচ্ছর সিং চীনা কম্যুনিস্ট ছিলেন সত্যি কিন্তু রাশিয়াতে শত চেষ্টা করেও সুভাষের যাবার ব্যবস্থা করতে পারেননি। সুভাষ হতাশ হলেন। ভগতরামও প্রভূত চেষ্টা করেন। স্তালিনের সম্মতি কিন্তু পাওয়া গেল না।

অন্য কোন উপায় না দেখে সুভাষ বার্লিন যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন হিটলার জার্মানীর একচ্ছত্র অধিপতি। জার্মান দূতাবাসে যাবার জন্য ভগতরাম ও সুভাষ রওনা দিলেন। জার্মান দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূত পিলগারের (Pilger) সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষ চিন্তামগ্ন। সুভাষের অন্তর্ধানের খবর বিভিন্ন কাগজে বড় বড় হরফে বের হচ্ছে। সুভাষ তো রয়েছে কালা ও বোবার ছদ্মবেশে। পিলগার অতি গোপনে সুভাষের মনের কথা বুঝে নিলেন। সুভাষের ছদ্মবেশ এতই নিখুঁত ছিল যে তাঁকে কেউ চিনতে পারল না। পিলগার বার্লিনে খবর পাঠালেন এবং উত্তরের আশায়

রইলেন। সুভাষকে পিলগার জার্মান দূতাবাসে বেশি না যেতে বলে দিলেন। সুভাষকে হ্যার টমাস সিমেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যেতে বললেন। এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। কোন উত্তর এলো না। চিন্তিত সুভাষ। পিলগার সুভাষের আগমন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইতালি ও সোভিয়েত দূতাবাসকে জানালেন

পরদিন ভগতরাম ও সুভাষ সিমেন্সের সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষ ও ভগতরাম জানতে পারলেন যে সুভাষের অন্তর্ধানে বার্লিন সরকার সন্তুষ্ট। সুভাষের মনে আশার আলো দেখা গেল। সিমেন্স সুভাষকে জানালেন হিটলার নিশ্চিত তাঁকে জার্মানীতে যাবার অনুমতি দেবেন। এর মধ্যে ভগতরাম তাঁর একজন পুরনো সহকর্মী ও বন্ধু উত্তমচাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। উত্তমচাঁদ তখন কাবুলের একজন ক্ষমতাবান লোক। ব্যবসায়ী। আফগান সরকারের ওপর তাঁর প্রভাবও যথেষ্ট। হ্যার সিমেন্সের সঙ্গেও উত্তমচাঁদের গভীর হৃদ্যতা আছে। ভগতরাম উত্তমচাঁদের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সব খুলে বললেন। উত্তমচাঁদ তাঁর বাড়িতেই সুভাষের জন্য একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। সুভাষের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর জন্য ঔষধ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করলেন উত্তমচাঁদ। সুভাষ কিছুটা সুস্থবোধ করলেন। এদিকে ইতালি সুভাষকে বার্লিনে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা করতে হিটলারকে চাপ দিতে লাগল। অনেক অনুরোধ উপরোধে হিটলার সুভাষকে জার্মানীতে যাবার অনুমতি দিলেন। আর ইতালি ও জার্মানী সোভিয়েত সরকারকে সুভাষকে 'ট্রানসিট ভিসা' দেবার জন্য চাপ দিল। জাপানও সুভাষকে জার্মানীতে নিয়ে যাবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে সোভিয়েতের ওপর চাপ দিতে লাগল। হ্যার টমাস সিমেন্স জানালেন যে, "Japan had pitched in as well, and described the issue as important as Lenin's crossing over to Russia with the help of the German Government."

স্তালিন কিন্তু তখনো সুভাষকে মস্কো হয়ে জার্মানীতে যেতে দেবার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তাই সুভাষের বার্লিন যাবার পরিকল্পনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। সুভাষ কিন্তু তখনো রাশিয়ার ওপর বিশ্বাস হারাননি। তাই তিনি ভাবলেন একবার রাশিয়ায় গিয়ে পৌছতে পারলে তিনি স্তালিনের সম্মতি আদায় করতে পারবেন ওখানে থাকার এবং ওখান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালাবার সুযোগ পাবেন। রুশ সাহায্যের কোন অসুবিধে হবে না। এটা ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। তাই যেভাবেই হোক সুভাষ অক্সাস নদী পার হয়ে রাশিয়াতে প্রবেশের পরিকল্পনা পাকা করতে চান।

ভগতরাম ও উত্তমচাঁদ এ ব্যাপারে সুভাষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। উত্তমচাঁদ ইয়াকুব নামক একজন স্মাগলারের স্মরণাপন্ন হলেন। ইয়াকুব একজনকে খুন করে দেশ থেকে পালিয়ে এসে রুশ সীমান্তে বাস করছে। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। ইয়াকুব অর্থের বিনিময়ে যে কোন কাজ করতে রাজী। সে সুভাষকে

রাশিয়ায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল। সুভাষকে রাশিয়ায় পৌঁছে দেবার জন্য একটা নির্দিষ্ট দিনও ধার্য করা হলো। সেই দিনটা ছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারী।

সুভাষ পিলগারকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। আর ভগতরাম গেলেন স্যার টমাস সিমেন্সের কাছে। সিমেন্সের কাছে সুভাষের রাশিয়া যাবার পরিকল্পনা ভালো লাগলো না। সিমেন্স ভগতরামকে আর একবার ইতালির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে অনেক করে অনুরোধ করলেন এবং অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী ডিপ্লোম্যাট Pietro Quaroni-র সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ভগতরাম Quaroni-কে সব কিছু বিস্তারিতভাবে বললেন। Quaroni ভগতরামের কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। ভগতরামকে কথা দিলেন সুভাষের জার্মানীতে যাবার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। Quaroni সুভাষের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য দেখা করতে চাইলেন। পরে Quaroni ভাগতরামকে জানালেন যে তিনি ইতালিয় দূতাবাসের মন্ত্রী।

সুভাষ, Quaroni, ভগতরাম ও উত্তমচাঁদ এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সুভাষকে Quaroni বললেন একাকী সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া সুভাষের পক্ষে ঠিক হবে না। বিপদের ঝুঁকি আছে। অক্ষশক্তির সাহায্য নেওয়া তাঁর উচিত। ভগতরাম ও উত্তমচাঁদ একই কথা বললেন সুভাষকে। সুভাষ কিন্তু তাঁদের বললেন, "I want you, Bose told them, to drive any such ideas out of their heads. My absolute preference is for Moscow."

শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্তালিনের অনীহার জন্য সুভাষের সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী। রাত ১০ টা। কুয়ারোনি, সুভাষ, ভগতরাম ও উত্তমচাঁদ আবার এক বৈঠকে মিলিত হলেন। অনেক কথা হলো। বোস তাঁর পরিকল্পনার কথা স্পষ্টভাবে তাঁদের জানালেন। বোস বললেন, "A Government of Free India should be set up in Europe. Having obtained a guarantee of freedom, integrity and independence of India from the Axis Power, it would immediately begin a special radio compaign beamed exclusively to India and it would try and foment revolution there. The help given to them would be of course in the form of a repayable loan, and Bose for his part would broadcast only once he was convinced of the Axis good faith."

কুয়ারোনি বোসের সঙ্গে একমত হলেন। বোসের পরিকল্পনার কথা ইতালির বিদেশমন্ত্রীকে জানালেন। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সুভাষই ভারতের বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি অক্ষশক্তিকে সুভাষকে অতি সত্বর বার্লিনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। তখন ইংলণ্ডের পতন অবধারিত হয়ে উঠেছে। হিটলার ঘোষণা করেছিলেন যে ইংলণ্ডের পতন আসন্ন। সুভাষেরও একই ধারণা

হলো। কুয়ারোনি জানিয়ে দিলেন যে সুভাষের সাংগঠনিক শক্তি, ব্যক্তিত্ব, বাস্তব রাজনীতি অক্ষশক্তিকে বিশেষভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। সুভাষকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলে অক্ষশক্তি বিশেষভাবে লাভবান হবে। "Bose is a type that we all know from his works and actions. Intelligent, able, full of passion ; and without doubt the most realist among the Indian national leaders."

অক্ষশক্তির কাছে সুভাষ সম্পর্কে কুয়ারোনির মন্তব্য কাজ দিল। হিটলার সুভাষকে বার্লিনে যাবার অনুমতি দিলেন। অক্ষশক্তি এবার সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জোর চাপ সৃষ্টি করল। সুভাষকে বার্লিন যাবার ট্রানসিট ভিসা দিতে স্তালিনকে অনুরোধ করল। স্থির হলো মস্কো থেকে উড়োজাহাজে সুভাষকে বার্লিনে নিয়ে যাওয়া হবে। অনেক সময় এর মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুভাষ অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সুভাষ জানতে পারলেন স্তালিন সুভাষকে বার্লিন যাবার ট্রানসিট ভিসা দিতে সম্মত হয়েছেন। ৩রা মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন এই শুভ সংবাদ জার্মান সরকারকে জানাল।

সুভাষকে তৈরি থাকার জন্য বলা হলো ১৫ই মার্চ। ১৮ই মার্চ কাবুল থেকে মস্কো যাবার ব্যবস্থা হলো। সুভাষ যাবতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ তৈরি হয়ে রইলেন। সুভাষের হৃদয় ছিল কুসুমের মতো কোমল। অবশ্য বাস্তববাদী সুভাষ প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোরও হয়ে যেতেন। আজ বিদায় বেলায় সুভাষ উত্তমচাঁদ, তাঁর ছেলেপুলে ও ভগতরামের জন্য বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছেন। উত্তমচাঁদের স্ত্রী অসামান্যা। সুভাষের আদর আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম সব কিছুই তিনি ব্যবস্থা করেছেন এ যাবৎ অতীব সুন্দরভাবে।

১৭ই মার্চ ছিল সুভাষের কাবুলে থাকার শেষ দিন। সেদিন বেলা ৩টায় সুভাষ ও ভগতরাম উত্তমচাঁদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ইতালীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারি ক্রিশ্‌নিনির বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। ঠিক ওখান থেকেই ১৮ই মার্চ অতি প্রত্যুষে সুভাষকে গাড়ি করে মস্কো নিয়ে যাওয়া হবে। ১৭ই মার্চ ভগতরাম ও সুভাষের রাত কাটলো ক্রিশংনিনির অতিথিকক্ষে।

১৮ই মার্চ। খুব ভোর। তখনো অন্ধকার ছিল। রাস্তাঘাট ছিল ফাঁকা। ক্রিশংনিনির বাড়ির সামনে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়িতে ছিলেন জার্মানীর ডঃ ওয়েগনার, জার্মান দূতাবাসের আরেকজন, একজন ইতালীয় দূত ও গাড়ির চালক। গাড়ির চালকটি ছিল ইউরোপীয়।

নেতাজী রওনা হবার আগে ক্রিশংনিনিকে জানিয়ে দিলেন যে ভগতরাম হবেন কাবুল ও ভারতের মধ্যে সংযোগসূত্র। সুতরাং অক্ষশক্তির কাবুলের দূতাবাসগুলি যেন ভগতরাম ও কাবুলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করে।

১৯৪১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। জার্মান দূতবাসে যাবার সময় সুভাষ ভগতরামকে একটা প্রবন্ধ আর দু'খানা চিঠি দিলেন। চিঠিগুলো শরৎচন্দ্র বোসের হাতে দেবার

গুজ বলে দিলেন ভগতরামকে। দু'খানা চিঠির একখানা শরৎচন্দ্র বোসের অন্যটা ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শার্দুল সিং কবীশরের।

সুভাষের শারীরিক গঠন, চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদি অনেকটাই ছিল সিসিলির অধিবাসীর মতো। তাই সুভাষের ইতালীয় পাশপোর্টে নাম দেওয়া হলো অর্ল্যাণ্ডো মাসসোত্তা। যেন একজন ইতালীয়ান ডিপ্লোম্যাট। সুভাষ চলেছেন বার্লিনে মস্কো হয়ে। গাড়ি করে রাশিয়ার সীমান্তে নিয়ে আসা হলো। সেখান থেকে তিনি ট্রেনযোগে বোগারা ও সমরকন্দ হয়ে মস্কো এসে পৌছালেন।

সুভাষ কয়েকদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে কাটালেন। সুভাষ ভাবলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকার জন্য আর একবার চেষ্টা করবেন। চেষ্টা করেও কিন্তু কোন ফললাভ হলো না। স্তালিন রাজি হলেন না। সুভাষকে বাধ্য হয়ে বার্লিনে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সুভাষ যথেষ্ট অভ্যর্থনা পেলেন। তাঁর যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার জন্য সোভিয়েত সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

পরে মস্কো হয়ে সুভাষ বার্লিনের পথে রওনা হলেন। ইতালীয়ান দূতাবাসের মন্ত্রী কুয়ারোনি ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সুভাষ ইতালী হয়ে ২রা এপ্রিল, ১৯৪১ বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উগ্র সমর্থক। হিটলার ক্ষমতা দখল করার পর ভারত সম্পর্কে জার্মানীর নীতিরও পরিবর্তন হলো।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করুক তা হিটলার চিন্তা করতে পারতেন না। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম্ফে' তিনি এই কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। সুভাষ যখন বার্লিনে যান তখন জার্মানীতে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯।

১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, জার্মানী, জাপান ও ইতালীর মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কুড়ি বছরের অনাক্রমণ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতবর্ষ রইল রাশিয়ার দিকে। জাপানের কিছু জঙ্গীনেতা রাশিয়ার বিপক্ষে কথা বললেও জাপ সরকার ছিল রাশিয়ার সমর্থক।

কিন্তু নভেম্বর, ১৯৪০ সালে মলোটভের জার্মানী পরিদর্শন ঘটনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটালো। হিটলার তাঁর জেনারেলদের গোপনে জানালেন যে তিনি রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। স্তালিন হিটলারের এই মনোভাব ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলেন না। পরে অবশ্য তিনি মলোটভকে রুশ-জার্মান সম্পর্কে চিড় ধরবার জন্য দায়ী করেছেন। সুভাষ বার্লিনে এসে তার পরের দিনই দেখা করলেন ডঃ ওয়েরম্যানের (Dr. Woermann) সঙ্গে। ডঃ ওয়েরম্যান ছিলেন জার্মানীর রাজনৈতিক বিভাগের অধিকর্তা। সুভাষ তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তাঁকে সুভাষ জানালেন যে বার্লিনে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করার জন্য মনস্থির করেছেন। সুভাষ এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে

এবং প্রচার চালাতে চান। দরকার অক্ষশক্তির কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য ও সমর্থন।

সুভাষ প্রচারের মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরে ভারতবাসীর মনে বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে দিতে চান। স্থির করেছেন সুযোগমতো তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করবেন। ঘরে বাইরে দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে ব্রিটিশশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে।

সুভাষ জানতে পারলেন যে, প্রায় এক লাখ ব্রিটিশ সেনা (ভারতীয়) জার্মানীর হাতে বন্দী অবস্থায় আছে। সুভাষ এই বন্দীদের নিয়ে একটি ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করার কথা চিন্তা করছেন। এ সমস্ত সেনা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। ডঃ ওয়েরম্যান সুভাষকে এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন হিটলার ভিন্ন অন্য কারও ক্ষমতা নেই যে এ ব্যাপারে সম্মতি দেবেন।

জাপান মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার দশ মাস পূর্বের কথা। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন জাপান দূরপ্রাচ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করুক। জাপান যদি দূরপ্রাচ্যের দক্ষিণ-দিকে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায় তা হলে ব্রিটিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। নৌশক্তিতে জাপান পরাক্রান্ত। এমনকি আমেরিকা ও ব্রিটিশের সম্মিলিত শক্তি জাপানকে হার মানাতে পারবে না। তবে দূরপ্রাচ্যের দক্ষিণে জাপানের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন রুশ সহযোগিতা। তাই সুভাষচন্দ্র চান জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে এ ব্যাপারে একটা মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। যা ভারতের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে এবং জাপানের দক্ষিণ-দিকে গতিবিধি বজায় রাখা সহজ হবে।

সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাব জার্মানীকে চিন্তিত করে তুলল। জার্মানী সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বার্লিনে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করার সম্মতি দেবার ব্যাপারে জার্মানী ছিল সংশয়াচ্ছন্ন।

ওয়েরম্যান সুভাষচন্দ্রকে জানালেন যে তাঁদের যুদ্ধ জয়ের পর মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সময় অন্যতম সর্ত থাকবে ভারতকে স্বাধীনতা দান। অবশ্য তখন পর্যন্ত এরকম কোন কথা ঘোষণা করার সময় এসেছে বলে ওয়েরম্যান মনে করেন না।

ওয়েরম্যান সুভাষচন্দ্রকে আরও জানালেন যে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জার্মানীতে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হলে তা হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী কাজ। ফলে গান্ধীজী ও জওহরলাল এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হবেন। ফলে বার্লিনে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেও সুভাষচন্দ্র তাঁর ইপ্সিত ফলের আশা করতে পারবেন না। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪১-এ ভিয়েনার ইম্পিরিয়েল হোটেলের এক নির্জন কক্ষে মিলিত হলেন সুভাষচন্দ্র ও রিবেনট্রপ। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হলো। রিবেনট্রপ সুভাষচন্দ্রকে জানালেন যে ইংলণ্ডকে অবিলম্বে পরাজয় বরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে হিটলারও সুনিশ্চিত। তিনি সুভাষচন্দ্রকে আরও বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের অভ্যন্তরে গণআন্দোলনের জন্য

সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন থেকে প্রচার চালাবার অনুমতি দিতে হিটলারের আপত্তি নেই। তবে বার্লিনে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের পরিকল্পনা হিটলার অনুমোদন করতে নারাজ। আফ্রিকার ভারতীয় বন্দী সেনাদের নিয়ে বাহিনী গঠন করে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানার পরিকল্পনাও হিটলার অনুমোদন করবেন না। তদুপরি "Hitler was keen to warn Bose not to antagonise Gandhiji." সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনা যে সঠিক তা যুক্তি দিয়ে রিবেনট্রপকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রিবেনট্রপ ওয়েরম্যানের ন্যায় সুভাষচন্দ্রের মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না।

তবে রিবেনট্রপ ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সুভাষচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হিটলারের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে দশ লক্ষ রাইখ মার্ক সুভাষচন্দ্রকে দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন রিবেনট্রপ। সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব খরচের জন্য মাসিক বার হাজার রাইখ মার্ক বরাদ্দ করা হলো। আর তাঁর বার্লিনে থাকার জন্য দেওয়া হলো এক বিশাল ভবন।

সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন বার্লিনে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করা অসম্ভব। তাই তিনি রিবেনট্রপের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে হিটলারকে প্রকাশ্যে একটি বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হিটলার সুসম্পর্ক বজায় রাখুক তা সুভাষচন্দ্র মনেপ্রাণে চাইতেন। সেই ব্যাপারে তিনি রিবেনট্রপকে বহুবার বলেছেন। হিটলারও তাঁর এই মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু হিটলার কারও মতামত গ্রহণ করার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজে যা ভালো মনে করতেন তা কাজে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করতেন।

মুসোলিনীও হিটলারকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট একটি বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানালেন। হিটলার কিন্তু অনড়, অটল। ইংলণ্ডের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা সুবিদিত। "David Irving তাঁর 'Hitler War' বইতে মন্তব্য করেছেন যে, "For Hitler the British and their empire were the epitome of all that was noble and glorious in the Nordic races." David Irving তাঁর বইতে ব্রিটিশরাজের ওপর হিটলারের দুর্বলতার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। হিটলারের ব্রিটিশের উপর এরকম দুর্বলতা তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম একটি কারণ। তা না হলে ফ্রান্সের ন্যায় ইংলণ্ডকেও তিনি অল্পদিনের মধ্যে ধরাশায়ী করে দিতে পারতেন। সে যাই হোক, হিটলার নানান চিন্তাভাবনা করে জানালেন যে তিনি বার্লিনে সম্ভাব্য স্বাধীন ভারতের কাজকর্মের জন্য একটি অফিস খোলার অনুমতি দিতে পারেন, যা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে।

ওয়েরম্যান ২৪শে মে, ১৯৪১ সুভাষচন্দ্রকে একথা জানিয়ে দিলেন। "...But Woermann added, the Germans would help him set up a Free India office to be centrally operated from Berlin."

সুভাষচন্দ্র হতাশ হলেন। ভারতবর্ষ ও রাশিয়া সম্পর্কে হিটলারের মনোভাব তিনি বুঝতে পারলেন। পূর্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থে বিশেষত ভারতবর্ষের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে হিটলার সুসম্পর্ক বজায় রাখুক এটা সুভাষচন্দ্র একান্তভাবে কামনা করতেন। কেন না সুভাষচন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন যে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। "The Soviet-German pact was till the linchpin of Bose's strategy. For the success of the task of exterminating British Power and the influence from the countries of the Near and the Middle East, it is desirable that the statusquo between Germany and Soviet Union should be maintained."—The Lost Hero by Mihir Bose.

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের জীবনযাত্রা সুস্থির ছিল না। ছিল কণ্টকিত। এর মধ্যে তাঁর পরিচয় ঘটেছে তিনজন জার্মানীর ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে। তাঁরা হলেন এডাম ভনট্রট (Adam Vontrott), ডঃ আলেক্সাণ্ডার ওয়ার্থ (Dr. Alexander Werth) ও ফ্রাঞ্জ যোসেফ ফুর্টওয়াঙ্গলার (Franz Josef Furtwangler)। এঁরা তিনজনই ছিলেন একসময়ে ঘোর নাৎসী বিরোধী। চেয়েছিলেন হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। তবে এঁরা নাৎসীবিরোধী হলেও ভনট্রট ছিলেন আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোক। একসময়ে এঁদের বেশ কিছুদিন Concentration Camp-এ কাটাতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে ভনট্রটই বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। ভনট্রট পরে নাৎসীদের সঙ্গে মানিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র এতদিন জার্মানীতে থেকে দেখতে পেলেন যে তিনি ভারতের জন্য কিছুই করতে পারছেন না। তিনি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এমন সময় সুভাষচন্দ্রকে মুসোলিনী ইতালিতে আমন্ত্রণ জানালেন। সুভাষচন্দ্র ইতালি যেতে সম্মত হলেন কিন্তু রিবেনট্রপ বাধা দিলেন। তিনি বললেন হিটলারের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে সুভাষচন্দ্রের মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা হোক তা তিনি চান না। অবশ্য পরে হিটলারের সম্মতি নিয়ে সুভাষচন্দ্র জুনের প্রথম সপ্তাহে (জুন, ১৯৪১) ইতালিতে গিয়ে পৌঁছলেন। ২৯শে মে হিটলারের সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। হিটলার তখন রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন ২২শে জুন, ১৯৪১।

ইতালিতে সুভাষচন্দ্র ভালো সম্বর্ধনা পেলেন। মুসোলিনীর কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়াও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসোলিনীর হস্তক্ষেপে অক্ষশক্তি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বক্তব্য রাখবেন। হিটলারের অনীহার ফলে অক্ষশক্তির পক্ষে ভারত সম্পর্কে কোনরকম বক্তব্য রাখা সম্ভব হলো না। এখানেও সুভাষচন্দ্র হতাশ হলেন। ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়ানো (Ciano) ছিলেন ঘোর সুভাষচন্দ্র বিদ্বেষী। সিয়ানো সুভাষচন্দ্রকে সহ্য করতে পারতেন না। "Ciano kept him (Bose) virtually under house arrest and Bose found that,

as with many of his colleagues back home, it was mostly talk and no actioı

প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র রোমে গৃহবন্দী হয়েছিলেন সিয়ানোর নির্দেশে। তবুও সুভাষচন্দ্রের রোম ভ্রমণ দু'টি কারণে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। সে সময় রোমের জার্মান রাষ্ট্রদূত ছিলেন বিসমার্ক। বিসমার্ক হিটলারকে বোসের পেছনে একজন গোয়েন্দা লাগাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিসমার্ক জার্মান রাইখের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে জার্মান রাইখ যেন সুভাষের পেছনে এমিলি শেঙ্কেলকে (Emilie Schenkl) গোয়েন্দার কাজে ব্যবহার করে। এমিলি ছিলেন অস্ট্রীয়ার অধিবাসিনী। অস্ট্রীয়া তখন হিটলারের করতলগত। মিহির বোসের লেখা 'দি লস্ট হিরো' (The Lost Hero) বই থেকে জানা যায় যে তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এমিলিও রোমে গিয়েছিলেন। তবে রোমে জার্মান রাষ্ট্রদূত বিসমার্কের এই প্রস্তাব গৃহীত হলো না। কেন না জার্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানতেন এমিলি ও সুভাষচন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসেন এবং তাঁরা দু'জনে শীঘ্রই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এমিলির প্রথম পরিচয় ঘটে ভিয়েনাতে। সেই থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এমিলির এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গেলে এমিলির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। এমিলি ও সুভাষচন্দ্রের এই মধুর সম্পর্ক অনেকের মতে কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বোস পরিবারেও এ ব্যাপারে মতদ্বৈত আছে। তবুও শরৎবোসের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্রের কন্যা অনীতা ১৯৬১ সালে কলকাতা এসেছিলেন। যতদূর জানা যায় সুভাষচন্দ্র এমিলিকে ১৯৪১ সালে জার্মানীতে বিয়ে করেছিলেন এবং ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে অনীতার জন্ম হয়। মিহির বোস তাঁর 'দি লস্ট হিরো' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "There can be little doubt that Subhas and Emilie lived as husband and wife (having probably first done so in Vienna in 1933) or that Subhas fathered a child. Just before he left Germany for the East he wrote to Mejdada informing him of the maraiage and pleading, when I shall be no more, please offer a little of your affection to my wife and daughter—as you have shown me all along."

এমিলিকে সুভাষচন্দ্র যে বিয়ে করেছিলেন এবং অনীতা যে তাঁরই কন্যা এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু শরৎ বোস যাঁকে সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে বলে মনে করা যায় কি? সে যাই হোক, নেতাজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গী আবিদ হাসান বলেছেন এমিলি ও সুভাষচন্দ্র গান্ধর্বমতে বিয়ে করেছিলেন। আবার জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গিরিজা মুখার্জী বলেছেন যে তিনি সুভাষচন্দ্র ও এমিলির বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখেছেন। এই সার্টিফিকেটে সই আছে ভনট্রটের।

সে যাই হোক, এমিলিকে যে সুভাষ গভীরভাবে ভালবাসতেন সেটা সকলে জানে। As he (Subhas) prepared to leave Germany (the trip was later postponed) he wrote asking his friend Kommerzialrat Otto Faltis to look after her and the child she was carrying."—The Lost Hero by Mihir Bose.

সুভাষচন্দ্র ও এমিলির এই মিলন খুবই সংক্ষিপ্ত। এপ্রিল ১৯৪১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ ছিল তাঁদের জীবনের অত্যন্ত সুন্দরতম সময়। ১৯৪২ সালের জুন মাসে এমিলিকে ভিয়েনা চলে যেতে হয়। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে অনীতার জন্ম হয় ভিয়েনাতে।

এমিলির ভিয়েনা জীবন খুবই দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠল। অবশ্য অনেক কষ্টে ফল্টিস কোম্পানীর ভিয়েনা আফিসে একটি চাকরি পান। ভিয়েনাতে থেকে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছেন। তাতে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে শরৎ বোস দেখা করেন। অনীতা ১৯৬১ সালে কলকাতা এসেছিলেন এবং বোস পরিবারে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে যান। "Sarat met her and was said to have impressed by Subhas's choice. Efforts were made to organise financial help but she has never visited India, though Anita did make a brief visit in 1961."

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, হিটলার ২২শে জুন রাশিয়া আক্রমণ করেন। তখন সুভাষচন্দ্র রোমে। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সংবাদ সুভাষচন্দ্রকে কঠোর আঘাত করল। হিটলারের সঙ্গে তখনো সুভাষচন্দ্রের দেখা হয়নি। তবু সুভাষচন্দ্র রিবেনট্রপের মাধ্যমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতে হিটলারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু যে হিটলারকে বিপদে ফেলবে সুভাষচন্দ্র তাও হিটলারকে জানিয়েছিলেন। এতে দূর প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক ছিন্ন হবে তাও হিটলারকে জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিরুপায়। মনের দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি রোম থেকে ভিয়েনা চলে গেলেন। তখন এমিলি ভিয়েনাতে। ১৭ই জুলাই সুভাষ ফিরে এলেন বার্লিনে, দেখা করলেন ওয়েরম্যানের (জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের অধিকর্তা) সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র ওয়েরম্যানকে জানালেন যে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ ভারতে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কেননা ভারতবাসীর কাছে রাশিয়ার এক বিরাট ভূমিকা আছে।

ভারতবাসী জানে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নয়। সুতরাং রাশিয়া ভারতের বন্ধু। ভারতের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাশিয়াকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সুভাষ নিজেই এই যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল।

এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। ডঃ গীসেলহার ওয়ারসিং (Dr. Giselher Wirsing) বার্লিন হোটেলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি গিয়ে দেখেন সুভাষচন্দ্র একখানা পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে চিন্তাক্লিষ্টভাবে পা দু'খানা আড়াআড়ি

করে বসে আছেন। ওয়ারসিং তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। সুভাষ চুপচাপ। বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টিতে মানচিত্রের দিকে চেয়ে আছেন। হৃদয়ের কোমলস্থানে তিনি দংশনজ্বালা অনুভব করছেন। ওয়ারসিং হঠাৎ তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করলেন। তিনি তাঁকে জানালেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র হঠাৎ বলে উঠলেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে ভালো কাজ করেননি। তিনি ওয়ারসিংকে জোর দিয়ে বললেন এই যুদ্ধের পরিণতি জার্মানীর পক্ষে মারাত্মক হতে বাধ্য। সুভাষ আরও বললেন ভারতবাসী এর পর থেকে হিটলারকে ঘৃণার চোখে দেখবে।

ভগতরাম তলোয়ার ছিলেন ভারতের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগসূত্র। এরপর আরও দু'জন সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোককে তলোয়ার কাবুলে নিয়ে এলেন। একজন শান্তিময় গাঙ্গুলি অন্যজন সৌদি মহিন্দর। জার্মানীর তরফ থেকে ভারতবর্ষের জন্য কাজ করার ব্যাপারে হিটলারের নির্দেশে কাবুলে রাখা হয়েছিল Rasmuss নামক এক বিশেষ জার্মান কূটনীতিবিদকে। এঁদের মাধ্যমেই সুভাষের ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র রইল।

এতদিন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছে। হিটলারের রুশ অভিযান ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কম্যুনিস্টরা জার্মানীর ওপর ক্ষুব্ধ হলো। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এ যুদ্ধের নাম দিল জনযুদ্ধ। এতদিন ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ সরকার কম্যুনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। ব্রিটিশরাজকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের নূতন নাম দিল 'কুইসিলিং : একজন ফ্যাসিস্ট হায়েনা ও নাৎসীদের ধূর্ত শৃগাল বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করল। আবার কেউ কেউ প্রচার করতে লাগল হিটলারের হাত ধরে সুভাষ দিল্লীর মসনদে বসার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। ভগতরামের কীর্তিকিষাণ পার্টি মূল কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে গেল। অবশ্য ভগতরাম তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি সুভাষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

সুভাষকে গাধা সাজিয়ে একজন জাপানী জেনারেল দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এরকম ব্যঙ্গচিত্র এঁকে কম্যুনিস্টরা দেখাতে লাগল জনসাধারণকে। কোন কোন ব্যঙ্গচিত্রে গোয়েবলসের ইঁদুর, কোন কোনটাতে তোজোর কুকুররূপেও সুভাষচন্দ্রকে দেখানো হলো।

তলোয়ার আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে কাবুলে এলেন। ডিসেম্বরে দেখা করলেন রসমুসের সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন জার্মান ও ইতালীয়ান দূতাবাসের কূটনীতিবিদগণ। আফগানিস্তানের উপজাতিদের মধ্যে কিভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপন করা যায় সে ব্যাপারে তাঁরা চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। রসমুসের মারফতে ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন চালাবার জন্য ব্যবস্থা নিতে তলোয়ারকে নির্দেশ দিলেন সুভাষ।

১৯৪২-এর জুন মাস। তলোয়ার ভারতে ফিরে এলেন। আলোচনা করলেন কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে। কম্যুনিস্ট নেতা তেজসিং স্বতন্ত্র-এর সঙ্গে তলোয়ারের কথা হলো। তলোয়ার ও স্বতন্ত্র দিল্লী ছুটলেন সুভাষের ব্যাপারে উচ্চপদস্থ পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশে।

অনেক বাকবিতণ্ডা হলো। পরে স্থির হলো যে তলোয়ার, রসমুস এবং অন্যান্য জার্মান নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। আর স্বতন্ত্র থাকবেন দিল্লীতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই খারাপের দিকে। কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ডঃ অধিকারী তখন ছিলেন বোম্বেতে। সুভাষ বার্লিন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর ভারতের খবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। কি কি ব্যাপারে ভারত সম্পর্কে খবর পাঠালেন তাও সুভাষ তলোয়ারকে প্রশ্নের আকারে জানিয়ে দিতেন। সুভাষ সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলি কি মনোভাব পোষণ করেন তা জানার জন্য সুভাষ উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

কম্যুনিস্টদের সুভাষ সম্পর্কে এই দু-মুখো নীতি খুব ভাল ফল দিল না। শান্তিময় গাঙ্গুলি, সৌদি ও উত্তমচাঁদ সকলকেই জেলে পাঠানো হলো। ভগতরাম রইলেন বাইরে। সরকার সব জেনেশুনেই ভগতরামকে জেলে পাঠালেন না। ভগতরাম ব্রিটিশ সরকারের চোখে সন্দেহজনক লোক ছিলেন না। অনেকের ধারণা ভগতরাম ব্রিটিশের হয়ে সুভাষের বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কাজ করছে।

সোলি বাটলিভালা (Soli Batlivala) নামক অন্য একজন ক্ষমতাবান কম্যুনিস্ট নেতারা ছিলেন সুভাষের পরমভক্ত।

১৯৪৩ সাল। কম্যুনিস্ট নেতা পি. সি. যোশী সোলি বাটলিভালাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে দিল্লী যেতে বললেন। সেখানে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে কম্যুনিস্ট স্পনসর্ড আর্ট প্রোগ্রামের ফাইলটা নিয়ে দেখা করতে বললেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের সকলকে এ প্রোগ্রামটি দেখাবার ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দিলেন। বাটলিভালা সম্পূর্ণ ফাইলটা ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর দিল্লী যাবেন স্থির করলেন। সেইদিন পার্টি অফিসের ফাইল ক্লার্কের সিনেমা যাবার তাগাদা ছিল। তাই সে ফাইলটা খুঁজে বার করার জন্য চাবিটা বাটলিভালাকে দিয়ে গেল। বাটলিভালা ফাইল খুঁজতে গিয়ে এক মারাত্মক জিনিস আবিষ্কার করলেন। তিনি ফাইলের মধ্যে অনেক গোপনীয় কাগজপত্র দেখতে পেলেন। ফাইলে রয়েছে যোশীর চিঠির কপি। যে চিঠিতে ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারী স্যার রেগিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে (Reginald Maxwell) যোশী লিখেছেন যে বিশ্বাসঘাতক বোস এবং তাঁর দালালদের খুঁজে বের করার জন্য যোশী ব্রিটিশরাজকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রস্তুত। "In it Joshi promised all help to the Raj in hunting the 'traitor' Bose and his fifth-column agents."

বাটলিভালা চিঠিটি পেয়ে ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। ছুটলেন যোশীর ঘরে। তিনি যোশীকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করতে বললেন। যোশীর সঙ্গে

বাটলিভালার অনেক বাকবিতণ্ডা হলো। বাটলিভালার সঙ্গে যোশী ও অনেক কম্যুনিস্ট নেতার বনিবনা হচ্ছিল না। বাটলিভালা পার্টির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন, কিন্তু ফাইলটা গেল হারিয়ে।

অনেকেই মনে করেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তলোয়ারকে দিয়ে ব্রিটিশরাজের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করিয়েছেন বোসের বিরুদ্ধে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে কম্যুনিস্টরা সমর্থন জানায়নি, ভারতের সহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। সেই সময় সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করাই ছিল তাদের ধ্যানজ্ঞান। যার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে ভারতের জনগণ পিছপা হয়নি। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি অবশ্য পরে ভুল স্বীকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এ ব্যাপারে তাঁদের ভুল স্বীকার করেছেন। "Struggling to explain the colossal failure of their movement in India, some are now prepared to admit they were wrong about Subhas. During Bose's 1978 birthday celebrations Mr. Jyoti Basu, Chief Minister of Marxist Bengal, called for a new communist appraisal of Bose, and the Russians and the East Germans now allow that Bose far from being fascist hyena was basically a nationalist."—The Lost Hero by Mihir Bose.

সুভাষচন্দ্রের ইতালী ভ্রমণ জার্মানীতে তাঁর গুরুত্ব খর্ব করল। তাঁকে অনেক অপমান সহ্য করতে হলো। ভনট্রট সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি চেয়েছিলেন বার্লিনে যেন 'ফ্রি ইণ্ডিয়া' সেণ্টার তাড়াতাড়ি খোলার ব্যবস্থা হয়। হিটলারের সম্মতি মিলল না। ভনট্রট হতাশ হলেন। সুভাষচন্দ্র ওয়েরম্যানের সঙ্গে আবার দেখা করলেন। সুফল পাওয়া গেল না। ওয়েরম্যান তাঁকে স্বাধীন নিরপেক্ষ দেশে চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। এতে সুভাষচন্দ্র সম্মত হলেন না। বার্লিন হোটেলেই তিনি থাকতে আরম্ভ করলেন। হিটলারের পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় ছিল না। ভনট্রট সুভাষচন্দ্রকে এ সময়ে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতে লাগলেন। তবে অনেক সময় সুভাষচন্দ্রের কাছে হিটলারের ভয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে পারতেন না।

এই সময় মহম্মদ ইকবাল শেদাই (Mohammad Iqbal Schedai) নামে এক ভারতীয় মুসলিমের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। তিনি প্রথম জীবনে কম্যুনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। ছিলেন ফ্রান্সে, সেখান থেকে চলে যান রোমে। হিটলার ও মুসোলিনীর অনুগত ভক্তে পরিণত হন। কম্যুনিজমের চিন্তা তাঁর মাথা থেকে চলে গেল। কাজ করতে লাগলেন মৌলবাদী মুসলিম নেতা হিসেবে। জিন্নার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারত ভাগের পরিকল্পনাও তাঁর মাথায় ছিল। হিটলার ও মুসোলিনী তাঁকে দিয়ে ভারতে তাঁদের পরিকল্পনা মতো কাজ চালাবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শেদাই-এর সংঘাত আরম্ভ হলো।

কিছুদিনের মধ্যেই শেদাই হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল তা কেউ টের পেল না। সুভাষচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

৩০শে অক্টোবর ১৯৪১। 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' খোলার ব্যাপারে হিটলারের সম্মতি পাওয়া গেল। এই সেণ্টারের কাজ শুরু হলো বার্লিনের লিখটেনস্টেইনয়েল-এর (Lichtensteinallee) বিশাল ভবনে। পরে হিটলারের নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের জন্য আরও একটি জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল ভবনের ব্যবস্থা করা হলো। এটা বার্লিনের ৬-৭ সোফিয়েন স্ট্রাসেতে অবস্থিত। এখানে আগে থাকতেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারী অ্যাটাশে। সুভাষচন্দ্র জাপান যাত্রার আগে পর্যন্ত এই বাসভবনেই কাটিয়েছেন।

ইউরোপ প্রবাসী প্রতিটি ভারতীয়ের দৃষ্টি পড়ল এখন বার্লিনের দিকে। প্যারিস থেকে ছুটে এলেন বিন্নু মুখার্জী ও প্রমোদ সেন। বোম্বের অধিবাসী এন. জি. গণপুলেও এলেন। এলেন জার্মানীতে অবস্থানরত অনেক ভারতীয়। নীতিগতভাবে নাৎসীদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত হবে কি না এই নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁদের সামনে তেজস্বী ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

ইতালি, গ্রীস, আয়ারল্যাণ্ড ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বিস্তারিত-ভাবে তাঁদের বোঝালেন। এই সমস্ত দেশ কি তাদের স্বাধীনতার জন্য বিদেশীদের সাহায্য নেয়নি? কাভুর, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কথা তাদের সামনে তুলে ধরলেন। উপস্থিত সকলেই নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মীতায় মুগ্ধ হলেন। তাঁর কথা তারা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক ভারতের স্বাধীনতা চাই-ই।

এখানেই উপস্থিত ভারতীয়দের নিয়ে আলাপ আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষচন্দ্র। জয় হিন্দ (অর্থাৎ Hail to India) শব্দটি সুভাষচন্দ্রই চালু করলেন তাঁর বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের সম্বোধনের জন্য। নমস্কার নয়, নমস্তে নয়, 'জয় হিন্দ'-এর নিহিত অর্থ অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। কবিগুরুর 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হলো, আর গান্ধীজীকে 'জাতির জনক' হিসেবে সুভাষচন্দ্রই স্বীকৃতি দিলেন। সুভাষচন্দ্র এখানেই নেতাজী নামে সকলের কাছে পরিচিত হলেন। "Later Sivram, a member of Bose's propaganda team in South-East Asia said that he deliberately cultivated this title."

এখানেই নেতাজীর সঙ্গে আবিদ হাসানের পরিচয় ঘটে। আবিদ হাসান ছিলেন একজন ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ার। নেতাজীর সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আবিদ হাসানই ছিলেন নেতাজীর অন্যতম সঙ্গী। "Hasan thinks he was the Second Indian Bose recruited and his experiences illustrated Bose's technique."

হাসান ছিলেন হায়দ্রাবাদের নবাব পরিবারের ছেলে। ভারতে তিনি গান্ধীজীর

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বার্লিনে তিনি নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। মুগ্ধ হন ভারতের প্রতি নেতাজীর অকৃত্রিম, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন দেখে। সাবমেরিনে করে জাপানে যাবার সময় হাসান ছিলেন তাঁর সঙ্গী।

'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে' বা আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার চালাবার কাজ আরম্ভ হলো। নেতাজীর মন আনন্দে ভরে উঠল। এন. জি গনপুলে লিখলেন এদিনটি ছিল সুভাষের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন। আনন্দের জোয়ারে তখন তিনি ভেসে চলেছেন। মনে হচ্ছিল জার্মানীতে এসে এই শুভ লগ্নের জন্যই তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন। "The first day of broadcasting to India was an eventful day both for Netaji and India. It was the day for which Netaji was waiting fervently. Although by temperament a very patient man, he looked that day unusually enthusiastic and even a little excited—N. G. Ganpuley.

প্রথমে এ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল ৪৫ মিনিট। নেতাজীর ভাষণ দিয়েই বেতার কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হলো। তখনো নেতাজী অর্ল্যাণ্ডো মাসসোত্তা নামেই পরিচিত ছিলেন। শীঘ্রই এ সেণ্টারে যোগ দিলেন ৩৫ জন ভারতীয় যুবক। নেতাজী এর মধ্যেই তাদের জানিয়ে দিলেন শীঘ্রই তিনি স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করবেন। তার নাম হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ। হিটলারের সম্মতির জন্য নেতাজী রিবেনট্রপকে অনুরোধ করলেন। হিটলার সম্মতি দিতে ইতস্তত করছিলেন।

একটা আলাদা স্বাধীন দেশে ভারতের জন্য স্বাধীন বাহিনী গড়তে দিতে সেই দেশের সরকার কি সম্মত হতে পারে? আর যেখানে রয়েছে হিটলার স্বয়ং সর্বেসর্বা হয়ে জার্মান রাষ্ট্রের! বিশেষত সামরিক বাহিনী গড়ার অনুমতি দেবে সামরিক বিভাগ। তাই নেতাজী ছুটলেন সামরিক বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে। অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। হিটলার স্বয়ং এ ব্যাপারে অসম্মতি জানালেন। পরে রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি যতই জার্মানীর বিরুদ্ধে যাচ্ছিল, ততই হিটলার নেতাজীর এ সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সম্মতি দিচ্ছিলেন। অবশেষে হিটলারের নির্দেশে জার্মান সামরিক বিভাগ নেতাজীকে স্বাধীন বাহিনী গড়ার অনুমতি দিল।

নেতাজী এই বাহিনী পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি সর্ত আরোপ করলেন। নেতাজী পরিষ্কার বলে দিলেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া এ বাহিনীকে অন্য কোন কাজে লাগানো যাবে না। 'কোথাও আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বৈকি।' নেতাজী বললেন পোশাক-পরিচ্ছেদ, বেতন, ছুটি, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে জার্মান সেনাবাহিনীর মতো এদেরও সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে। জার্মানী সম্মতি দিল। জার্মানী অবশ্য এ দায়িত্ব শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পালন করেছিল।

প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হলো। তবে এই সাহায্য নেওয়া হবে ঋণ হিসেবে এবং এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সুভাষের একার। "It was a gentleman's agreement made in good faith. It was a personal debt of honour to Bose and Indian Nation was not made responsible for its re-embursement."

এন. জি. স্বামী ও আবিদ হাসান ছুটলেন বন্দীশিবিরে নেতাজীর নির্দেশে সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য। বন্দীরা প্রথমে আপত্তি করল। বেশির ভাগ শিক্ষিত সেপাই আপত্তি করল। স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে ৪০/৫০ জন নেতাজীর ডাকে সাড়া দিল। আবিদ হাসান প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে নেতাজী জার্মানীতে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করতে সফল হবেন। হিটলারের নির্দেশে রিবেনট্রপ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনাদের মধ্যে প্রচার চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অক্টোবরের শেষ দিকে হিটলার তখন ককেশাস আক্রমণ করেছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস। নেতাজী স্বয়ং মেক্সনির ড্রেসডেনের কাছে আন্নাবার্গ বন্দীশিবির পরিদর্শনে গেলেন। সেখানে ১৫০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনা ছিল। নেতাজী তাদের সামনে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ৪০০০ সেনা নেতাজীর বাহিনীতে যোগ দিতে সম্মত হলেন। নেতাজী বুঝতে পারছিলেন বন্দী ব্রিটিশ এন. সি. ও.-দের প্ররোচনায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনারা এগিয়ে আসতে ইতস্তত করছে। নেতাজী ব্রিটিশ এন. সি. ও.-দের সরিয়ে দিলেন। এবার কাজ হলো।

ড্রেসডেনের রৌদ্রক্লান্ত পথে দাঁড়িয়ে নেতাজী কথা বললেন ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে। বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল সেখানে। নেতাজী ১½ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন তাদের সামনে। শ্রোতারা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হলেন। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে শ্রোতাদের শিরা উপশিরায় যেন উত্তেজনার ঢেউ-এর ঝাপটা লাগল।

এর মধ্যে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নেতাজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মেতে উঠল। 'Daily Express' এবং 'Evening News' পত্রিকা নেতাজীর নামে কুৎসায় ভরে গেল। নেতাজীকে বিভিন্ন প্রকার জঘন্য কার্টুনের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরতে লাগল। নেতাজী ক্ষুব্ধ হয়ে রিবেনট্রপের কাছে গেলেন। রিবেনট্রপকে অনুরোধ করলেন তাঁর বিরুদ্ধে কাগজে যা বের হচ্ছে তার প্রতিবাদ করতে। রিবেনট্রপ হিটলারের সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই করতে পারেন না।

হিটলার তখন মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত। জার্মান সৈন্যরা তখন পিছু হটছে। হিটলার ক্লান্ত, চিন্তামগ্ন। রিবেনট্রপ নেতাজীকে জানালেন তিনি হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। হিটলার এর মধ্যে জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতির সঙ্গেও দেখা করেছেন। এমন সময় হিটলার খবর পেলেন জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে। এ যেন হিটলারের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

হিটলার বুঝতেও পারেননি জাপান এ কাণ্ড করবে। আমেরিকা যুদ্ধে নামল। চুক্তি অনুযায়ী হিটলারকেও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলো।

জাপান নেতাজীর সাহায্য চাইল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে জাপান চিন্তা-ভাবনা শুরু করল। কারণ জাপান জানে নেতাজীর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ভারতের স্বাধীনতা। জাপান নেতাজী সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। কর্নেল ইয়ামামোতো বিন (Colonel Yamamoto Bin) বার্লিনে জাপানের সামরিক সহদূত (Japanese Military attachee) নেতাজীর সঙ্গে দেখা করলেন। নেতাজী তাঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য জাপানের সাহায্য চাইলেন। এর পর নেতাজী দেখা করলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওশিমার সঙ্গে।

নেতাজী ওশিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ১৯০৫ সালে রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে জাপান বীরের সম্মান লাভ করেছে। ছোট্ট জাপানের অসাধারণ বীরত্বগাথা এশিয়াবাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। জাপান শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এর পর থেকে নেতাজী ঘন ঘন ওশিমা সমীপে যেতে আরম্ভ করলেন। ইয়ামামোতো ও ওশিমা নেতাজীর পাণ্ডিত্য, বীরত্ব, স্বদেশপ্রীতি ও ব্যক্তিত্ব দেখে বিস্মিত হলেন।

জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর থেকে একের পর এক দেশ জয় করতে আরম্ভ করল। নেতাজী বেতারে জাপানের দেশ জয়কে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। তখন নেতাজীর একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা লাভ। তিনি ওশিমা ও ইয়ামামোতোকে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তাঁর জাপানে যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এবং তার পরে বেশ কিছু ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা জাপানে আশ্রয় নিয়েছিল। তার মধ্যে রাসবিহারী বোস ছিলেন অন্যতম। কিন্তু ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতের জাপানের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। রাসবিহারীর অবশ্য সব সময় চিন্তা ছিল কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য পরিকল্পনামত কাজ করা যায়।

১৯৪০ সালে জাপান এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা ঘোষণা করল। তারা তার নাম দিল 'দি গ্রেটার ইষ্ট এশিয়া' বা কো-প্রসপারিটি স্ফিয়ার' (Co-Prosperity Sphere) বা সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল নীতি। তবে ভারতকে তাদের পরিকল্পনা থেকে বাদ রাখা হলো। জাপান ভারতকে দাবার ঘুঁটির ন্যায় ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ভারতকে হাতে রেখে জাপান রাশিয়ার মিত্রতা কামনা করেছিল। কিন্তু হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ জাপানের সেই আশা বিলীন হয়ে গেল। জাপান চেয়েছিল আর্কটিক থেকে আনটার্কটিক, ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্বে ক্যারেবিয়ান সাগর পর্যন্ত তাদের দখলে আনতে। পরে অবশ্য জাপান তার এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিল। কেন না জাপান বুঝতে পেরেছিল এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব।

জাপান যুদ্ধে প্রবেশ করার পর থেকে সাম্রাজের স্বার্থে হংকং, ইন্দো-চায়না, দি ফিলিপাইনস, মালয়, সিঙ্গাপুর, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, বার্মা, নিরপেক্ষ থাইল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে তার আধিপত্য বিস্তারের কথা চিন্তা করতে লাগল। অবশ্য তার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যাবার অর্থ হচ্ছে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া। তবে এর জন্য প্রয়োজন ভারতীয় সৈন্য আর জাপানে বসবাসকারী ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাহায্য। রাসবিহারী বোস তখন জাপানের কাছে ভারতের জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় নেতা। জাপানীদের বিশ্বস্ত। তবে যুদ্ধের সময় আরও একজন বিকল্প নেতার প্রয়োজন। ১৯৪২ সালে ব্যাংককে রাসবিহারী বোসের সভাপতিত্বে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হলো ভারতের মাটিতে যুদ্ধ আসন্ন। ভারতবাসীর ব্রিটেনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত। জাপানীরা রাসবিহারীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ নেতা বলে স্বীকার করে। টোকিও সিদ্ধান্ত নিল রাসবিহারীর সহযোগী নেতা হিসেবে নেতাজীকে জাপানে নিয়ে আসা হোক। সেই সময় বার্লিনে ওশিমা, ইয়ামামোতো ও নেতাজীর ঘন ঘন মিটিং চলছে। নেতাজীও জাপানে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

টোকিও ওশিমা ও ইয়ামামোতোকে সুভাষকে জাপানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিল। ভন রিবেনট্রপের সঙ্গে ওশিমোর কথা হলো। রিবেনট্রপ সম্মত হলেন না। ব্রিটেন জাপানের মনোভাব বুঝতে পারল। সুভাষের ভয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর চোখের ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। ব্রিটেন আরও ভীত হলো জাপানের ক্রমাগত যুদ্ধজয়ে।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিতপ্রায়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আজাদ জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয়। দক্ষিণপন্থী নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্‌গ্রীব। বরদোলিতে রাজাগোপালাচারী ও আজাদ মিলিত হলেন। তাঁরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বুঝালেন যে জাপান ভারত আক্রমণ করলে ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তা রুখতে হবে। কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশভক্ত নেতা চার্চিলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। চার্চিল তখন আমেরিকায়। চার্চিলকে তাঁরা অনুরোধ জানালেন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে।

চার্চিল ও আমেরি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় লিনলিথগো তাঁদের চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিলেন। কেন না তাঁর ভয় ছিল সুভাষের কার্যকলাপ। **"Linlithgow gave them his usual advice. Sit tight, do nothing—we are rulers, we must rule. But Linlithgow's main reason for coming to this characterstic conclusion was his fear of Subhas Bose's activities**

এমন সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জানান যে

ভারত জাপান কর্তৃক অধিকৃত হতে চলেছে। চার্চিল ষষ্ঠ জর্জকে জানালেন যে, বার্মা, সিংহল, অস্ট্রেলিয়ার অংশবিশেষ জাপানের হস্তগত হতে চলেছে। ইংলণ্ডের ওয়ার ক্যাবিনেট এ্যাটলির কথা শুনতে আগ্রহী হলেন। তিনি বললেন লিনলিথগোর চিন্তাধারা ব্রিটেনের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হতে বাধ্য। ভারতের জন্য কিছু করা একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। নচেৎ ভারত জাপান ও বোসের হাতে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। জাপানের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল। ক্রিপস রাশিয়া থেকে ফিরে এলেন। ক্রিপস ছিলেন রাশিয়ায় ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত। তিনি ব্রিটেনের ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য মনোনীত হলেন। এ্যাটলি ক্রিপসকে ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুভাষ তাঁর ছদ্মনাম পরিত্যাগ করলেন। স্বনামে তিনি আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালাতে লাগলেন। তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশে বললেন যে ভারতের স্বাধীনতা আগতপ্রায়। জাপানের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ব্রিটেনের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। ভারত নবযুগে পদার্পণ করতে চলেছে। অক্ষশক্তির বেতার কেন্দ্র থেকেও বোস বার বার ভারতবাসীর উদ্দেশে জাপান ও জার্মানীর হাতে ব্রিটেনের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্পে ধীরে চলার নীতি গ্রহণের জন্যও তিনি ভারতবাসীর কাছে নির্দেশ পাঠালেন। চট্টগ্রাম থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত জার্মান ও জাপানী সৈন্যদের অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। তা হলে ভারতবাসী যেন তাদের স্বাগত জানায়। ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন সংগঠিত করার জন্যও তিনি ভারতীয়দের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এরকম আরও বহু নির্দেশ সুভাষ ভারতবাসীর উদ্দেশে পাঠালেন।

গোয়েবলস তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন যে বোসের এ প্রচার ভারত সম্পর্কে বিশ্ব-জনমত গঠনের এক বিরাট সুযোগ করে দিল। Goebbels recorded in his diary—"Bose's appeal has made a deep impression on world public opinion. The crisis in India can no longer be denied."

বোস এরপর ভারতের স্বার্থে এগার দফা দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব পাঠালেন অক্ষশক্তির কাছে। ভনট্রটের মাধ্যমেই প্রস্তাবটা পাঠানো হলো। জাপানের অসম্মতির জন্য এ প্রস্তাব কার্যকরী হলো না।

বোস বুঝতে পারলেন যে জার্মানীতে থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তবুও বোসের এ সমস্ত কাজ ব্রিটেনের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। চার্চিলের মতো সুস্থির ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ্যাটলি ছিলেন তখন ইংলণ্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী। ১১ই মার্চ ১৯৪২, চার্চিল স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠাবার কথা ঘোষণা করলেন। এ্যাটলি এতে সম্মতি জানালেন।

এ্যাটলি যাচ্ছেন ইংলণ্ড থেকে ভারতে, আর বোস যাচ্ছেন বার্লিন থেকে

Gastein-এ, অস্ট্রিয়াতে। বোস হতাশাগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ। কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হিটলার বোসকে অনেক আশার কথা শোনালেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই করলেন না। বোস হিটলার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে হিটলারের কোন মাথাব্যথা নেই। কেন না এর ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক আরো তিক্ত হবে। বোসকে 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' গড়ার জন্য পুরোপুরি সাহায্য করতেও হিটলার কুণ্ঠিত। হিটলার চেয়েছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে বোস একটা আপষরফা করুন। মিহির বোস তাঁর 'দি লস্ট হিরো' বইতে বলেছেন যে, "After all Bose had heard the Japanese speculating that the Nazis would never let Bose go in case he became useful bargaining counter in any negotiations with the British."

হিটলার যদি মনে করেন বোসকে দিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন কিছু আলোচনার সুবিধা হবে বা বোসকে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করতে পারবেন ইংলণ্ডের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য তাহলে হিটলার বোসকে জাপানে যেতে দেবেন না। এটা অনেকেরই ধারণা।

এর মধ্যে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বোসকে অস্ট্রিয়া থেকে নিয়ে আসা হলো বার্লিনে। ক্রিপস এলেন ভারতে কিন্তু তাঁর দৌত্যকার্য বিফলতায় পর্যবসিত হলো। ক্রিপস গান্ধীজীকে তাঁর মিশন বিফলতার জন্য দায়ী করলেন। নেহরুর জীবনী লেখক গোপাল বলেছেন ক্রিপস মিশন বিফলতার জন্য ক্রিপসই দায়ী।

আজাদ বলেছেন গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতে বোসের অনেক ব্যাপারে মতদ্বৈত ঘটেছে। কিন্তু বোসের পালিয়ে জার্মানীতে যাওয়া এবং সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার মানসিকতা গান্ধীজীকে মুগ্ধ করেছিল। বোসের ভারত থেকে অন্তর্ধান কাহিনী রূপকথার গল্পের মতো। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বোসের বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গান্ধীজীকে মোহিত করল। গান্ধীজী নিজেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেবার আগে বোসের বীরত্বপূর্ণ বেতার ভাষণের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বোসের প্রতিটি বেতার ভাষণ গান্ধীজী নিবিষ্টমনে শ্রবণ করতেন। গান্ধীজীর মনে বোসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগল।

ক্রিপস দৌত্যের মাঝামাঝি সময়, ১৮ই মার্চ ১৯৪২-এ হঠাৎ রয়টারে ঘোষণা করা হলো সুভাষ বোস, রাসবিহারী বোস ও অন্যান্য সঙ্গীসহ প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। প্রচার করা হলো সুভাষ তাঁর সঙ্গীসাথীসহ স্বাধীন এশিয়া কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য ব্যাংকক যাচ্ছিলেন।

এই সংবাদ গান্ধীজীকে গভীর আঘাত দিল। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। বোসের মা প্রভাবতী দেবীকে তারযোগে সান্ত্বনা দিয়ে বার্তা পাঠালেন। দুই তিন দিন পর আসল ঘটনা প্রকাশিত হলো। জানা গেল সুভাষের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা রটনামাত্র। গান্ধীজী ও আজাদ প্রভাবতী দেবীকে আর একটা তার করলেন। জানালেন "ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, যা সত্য বলে শোনা গিয়েছিল, তা মিথ্যে

প্রমাণিত হয়েছে। আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সুভাষ ভারত থেকে পালিয়ে যাবার পর গান্ধীজীর মনে এক দারুণ ভাবের উদয় হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সুভাষের আন্তরিক প্রচেষ্টা গান্ধীজীকে মোহিত করেছিল। সুভাষ যে শেষদিকে গান্ধীজীর কতখানি হৃদয়ের সম্পদ হয়ে উঠেছিলেন গান্ধীজীর পরবর্তী সময়ের ব্যবহার তা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

ক্রিপস মিশন বিফল হলো। গান্ধীজী বুঝতে পারলেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রিটিশের সঙ্গে আর কোন আপষমূলক আলোচনা চলতে পারে না। The failure of the Cripps Mission marked the Watershed for both the Congress and Bose and led to a parting of the ways The Congress, and Gandhi in particular, were now convinced that there could be no future in negotiations with the British, while Bose increasingly turned to Japan.

ক্রিপস নিজের মুখরক্ষার জন্য বেতার ভাষণে বললেন যে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে তাঁর দৌত্য বিফলতার জন্য দায়ী। স্বাধীনতা ও গণপরিষদ দিতে তো তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তো কংগ্রেসকে তুষ্ট করা অসম্ভব শত্রু যখন দোর-গোড়ায়। ক্রিপস বললেন কংগ্রেস চাইছে জাতীয় সরকার। ভারতের সংখ্যালঘুরা এ প্রস্তাব মেনে নেবে না। নেহরু ও আজাদ ক্ষুব্ধ। তাঁরা ক্রিপসকে দায়ী করে বললেন তিনিই তো উল্লেখ করলেন "absolute dictatorship of the majority". আজাদ আরও বললেন কংগ্রেস যেখানে চাইছে নিরাপত্তা ক্রিপস সেখানে বলছে কংগ্রেস হিন্দু রাজত্ব কায়েম করতে চায়। ক্রিপসের অদ্ভুত মানসিকতা গান্ধীজী, নেহরু ও আজাদকে বিস্মিত করল। সুভাষ তো জার্মানী থেকেই ঘোষণা করলেন ক্রিপসের ভারত আগমন কোন শুভ ফল দিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁর এই আগমন ভারতের পক্ষে হবে মারাত্মক। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে ঘটাবে বিঘ্ন। সুভাষের কথাই সত্যে পরিণত হলো। এমরি লিনলিথগোকে জানালেন যে ক্রিপস যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছে তাতে মুসলমানরা বিদ্রোহ করবে।

১৯৪২-এর ১৯শে এপ্রিল। গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন "That ill fated Proposal" এই শিরোনামে। গান্ধীজী ক্রিপসের প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে মন্তব্য করলেন। ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনাই ছিল ক্রিপসের। গান্ধীজী বললেন স্বাধীনতা যদি ভারতীয়রা চায় তাহলে আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। গান্ধীজী আরও বললেন, "যদি মুসলমানদের অধিকাংশ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে মনে করে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের অন্যরকম ভাবতে বাধ্য করতে পারবে না। যদি তারা সেই ভিত্তিতে দেশ ভাগ চায়, তারা পাবে—যদি না হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে মনে হচ্ছিল উভয় পক্ষে সেরকম গৃহযুদ্ধের আয়োজন চলছে। কিন্তু তা হবে আত্মহত্যা।" কিন্তু

গান্ধীজীর সাবধানবাণী কেউ প্রণিধান করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের কূটনৈতিক ও নেহরুসহ অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের অবিমৃশ্যকারিতার ফল হলো ভারত ভাগ। যার জের এখনো চলছে।

জাপান এখন বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে চায় ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। জাপানীরা এ ব্যাপারে অনেক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জাপানে হাজার হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী রয়েছে। আর আছে অনেক ভারতীয় নেতা। অবশ্য তারা কেউ সুভাষের মতো এত শক্তিশালী নন।

রাসবিহারী বোস ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের নিয়ে একটা বৃহৎ সভা ডাকা হলো। সেখানে তোজো গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভাষণ দিলেন। সেখানে তিনি বললেন অক্ষশক্তির মধ্যে জাপানই সুভাষকে সবচেয়ে সফলভাবে সাহায্য করতে পারে। তবে এর জন্য সুভাষকে তাদের প্রস্তাব মেনে নিতে হবে।

এরই মধ্যে ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ বার্লিনে একটি জরুরি মিটিং হলো। সুভাষ, ভনট্রট, ডঃ জিজউইজ, কর্ণেল ইয়ামামোতো, মেজর মারওয়েড ও ডঃ ভার্গনার মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতনে মিত্রপক্ষের রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে গেলো। সুভাষ বললেন এই সুযোগ নিতে হবে জাপানকে ভারত আক্রমণ করে। রাশিয়ান ফ্রন্টেও তখন আক্রমণ চলছে হিটলারের নির্দেশে। সুভাষ বললেন তাঁর বিশ্বস্ত লোকজনের সঙ্গে জাপানের কথা হওয়া দরকার। সুভাষ আরও বললেন জাপানের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে চালাতে হবে নাশকতামূলক কার্যকলাপ।

এর মধ্যে সুভাষ চাইলেন জাপানী সেনাপতির সঙ্গে ভারতীয় সেনাপতি যেন একযোগে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুভাষের আশা পুরণ হলো। মুক্ত ভারতীয় বাহিনীর সেনাপতি মোহন সিং জাপানের সেনাপতির সঙ্গে ব্যাংককে এলেন। সেখান থেকে গেলেন সিঙ্গাপুরে, আবার ফিরে গেলেন টোকিওতে। মোহন সিং-এর সঙ্গে ছিলেন জাপানী সেনাপতি ফুজিয়ারা ও ইয়ামাগুচি। এঁদের আলোচনা হলো দূর প্রচ্যে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে কিভাবে সংহতি আনা যায় এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাদের যোগদানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় এ নিয়ে। অনেকদিন পর্যন্ত ভারতীয় অনেক সেনাপতি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যের ক্রমাগত পশ্চাদপসারণে হতাশ হয়ে তারা জাপানের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। তারা সুভাষের রাজনীতিতেও বিশ্বাসী এবং সুভাষের পুর্ন সমর্থক। তারা সুভাষের নেতৃত্বে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দিল।

এদিকে স্বনামধন্য নেহরু ১১ই এপ্রিল জনসনকে জানালেন যে এই অবস্থায় তিনি ইংলণ্ডকে বিব্রত করবেন না। সমর-সম্ভার উৎপাদন যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই চেষ্টাই তিনি করবেন। সমর-সম্ভার উৎপাদন শিল্পে যাতে কোন ধর্মঘট বা ধীরে চলার নীতি অনুসৃত না হয় সেই ব্যাপারেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। এদিকে চলছে গান্ধীজীর

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি। এটা অনস্বীকার্য গান্ধীজী এ সময়ে সুভাষের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

নেহরু গান্ধীজীকে সমর্থন করলেও তিনি একমুখে ভিন্ন কথাও বলতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। তিনি বললেন জাপানীরা ভারত আক্রমণ করলে তিনি তা অহিংস বা অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে প্রতিরোধ করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি আরম্ভ করবেন গেরিলা যুদ্ধ। সমর্থন করবেন পোড়ামাটি নীতির। দিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১২ই এপ্রিল। নেহরু সম্মেলনে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুভাষ বসু সসৈন্যে ভারতে এলে তার বিরোধিতা তিনি প্রচণ্ডভাবে করবেন। কারণ তিনি মনে করেন সুভাষের বাহিনী "a dummy force under Japanese control" ভিন্ন আর কিছু নয়। গান্ধীজী নেহরুর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি নেহরুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, "তোমার নীতি যদি গৃহীত হয় তবে ওয়ার্কিং কমিটি এখন যা তা থাকা উচিত নয়।" সুভাষের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাহার করতে গান্ধীজী নেহরুকে বাধ্য করলেন। গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে না এবং জাপানের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে ভারতের।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই পূর্ব এশিয়ায় যাবার পরিকল্পনা করছেন। এ সময় ব্যাংককে স্থাপিত হলো 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। লীগ রাসবিহারীকে অনুরোধ জানাল বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সুভাষকে নেতার আসনে বসাতে। রাসবিহারী বোস ছিলেন অমায়িক, দেশের স্বাধীনতাই তাঁর কাম্য। অতএব তিনি সুভাষকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করবেন না। তবে জাপানীদের কাছে রাসবিহারীই ছিলেন গ্রহণযোগ্য ভারতীয় নেতা। অনেক ভারতীয়ের মতে সুভাষ জাপানীদের পছন্দের লোক নন। আর সুভাষ তখন প্রাচ্যে অনুপস্থিত। রাসবিহারীর স্বাস্থ্যও তখন ভালো যাচ্ছিল না। তখন স্থির হলো সুভাষকে ভারতে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

জাপান সরকারও তখন সুভাষকে ভারতে আনতে ইচ্ছুক। একদিকে ব্যাংককে রাসবিহারীর স্থাপিত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' অন্যদিকে বার্লিনে সুভাষের প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' দুটোই সমানতালে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, গোপনে এবং সক্রিয়ভবে।

জাপান সরকারের মনে ভয় ছিল সুভাষকে আমন্ত্রণ জানালে হয়ত রাসবিহারী মনক্ষুণ্ণ হবেন। তাই নানান চিন্তাভাবনা করে জাপান সরকার একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের ওপর রাসবিহারীর সঙ্গে কথা বলার ভার দিলেন। তিনি রাসবিহারীকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি রাসবিহারীকে সব খুলে বললেন এবং জানালেন যে সুভাষ জাপানে এসে এখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে চান। ব্যাংককের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগেরও তাই ইচ্ছে।

মিহির বোস তাঁর 'দি লস্ট হিরো' গ্রন্থে লিখেছেন যে, Finally a Japanese official invited Rashbehari to his office and put the question. 'In that case', replied Rashbehari, I would step down."

রাসবিহারীর মত পেয়ে ১৭ই এপ্রিল ১৯৪২ সালে জাপানের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিল সুভাষকে জাপানে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাঁকে জাপানে আনতে হবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। জাপ সরকারও সুভাষকে জানাবার সিদ্ধান্ত নিল যে জাপান ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবরকম চেষ্টা করবেন। আর জাপানীরা এ ব্যাপারে যে আগ্রহী তাও সুভাষকে জানাবার ব্যবস্থা করলো জাপ সরকার।

প্রায় একই সঙ্গে জাপান অক্ষশক্তির কাছে প্রস্তাব দিল যে অক্ষশক্তি যেন সমবেত-ভাবে ঘোষণা করে তারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ১১ই এপ্রিল এই প্রথম জাপান অক্ষশক্তির হয়ে ভারত ও আরবদেশ সম্পর্কে একটা ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করে বার্লিনে পাঠালেন। এই ঘোষণাপত্রের খসড়াটি হিটলার ও মুসোলিনীর মনঃপুত হলো না। মুসোলিনী আরবদেশ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গোপন করলেন না। কেন না আরবে রয়েছে মুসোলিনীর স্বার্থ। তবে হিটলার ও মুসোলিনী ভারত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। সুভাষকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাও তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন। জার্মানীর বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ও একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করলেন।

দুটি ঘোষণাপত্রই রিবেনট্রপ ১৬ই এপ্রিল হিটলারের সম্মতির জন্য পাঠালেন। তিনি আশা করেছিলেন হিটলার নিশ্চয় ঘোষণাপত্রে তাঁর সম্মতি জানাবেন। হিটলার দুটো ঘোষণাপত্রই পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনটাই মনঃপুত হলো না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে পাঠিয়ে দিলেন রিবেনট্রপের কাছে। হিটলার আরও বললেন জাপান চাইলেই যে তিনি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন এইরকম ভাবার কোন কারণ নেই। তদুপরি ভারতের ওপর জাপানের আগ্রাসী নীতিতে হিটলার ভীত। হিটলার জানতেন সুভাষ জাপানী সৈন্যদের সাহায্যে ভারত আক্রমণ করবে। সুভাষ এ মনোভাব জার্মানীতে থাকতেও প্রকাশ করেছেন।

পরে জাপানে গিয়ে সুভাষ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, "I hereby declare that we will fight side by side with Japanese and other friendly powers until we win independence by crushing our own enemies."

সুভাষের মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা India for the Indians. আর তিনি চান ত্রিশক্তিবর্গের ঘোষণা। মুসোলিনী সুভাষের এ দাবী মেনে নিয়েছিলেন। মুসোলিনী প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন সুভাষের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হোক ইতালীতে। কিন্তু সুভাষ জানতেন মুসোলিনীর ক্ষমতা কতটুকু। আসল মালিক হলো জার্মানীর ফুয়েরার অমিত বিক্রমশালী হিটলার।

তোজো ভারত সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণার খসড়া তৈরি করে হিটলারের কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি বার বার জোর গলায় ঘোষণা করেছেন 'India for the Indians'.

২৯শে এপ্রিল মুসোলিনী ওবেরসালসবুর্গে হিটলারের সঙ্গে মিলিত হলেন। আলোচনা করলেন ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা নিয়ে ভারত সম্পর্কে। হিটলার তাঁর অসম্মতি জানিয়ে বললেন ভারত সম্পর্কে এরূপ কোন কিছু ঘোষণার সময় এখনো হয়নি।

মুসোলিনী ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন। সুভাষ ছুটলেন রোমে। ৫ই মে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। সুভাষ স্পষ্টতই মুসোলিনীকে বললেন ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা তাদের করতেই হবে। মুসোলিনী সুভাষের অনমনীয় মনোভাবের কাছে নতিস্বীকার করলেন। হিটলারকে তারযোগে জানালেন সুভাষের মনোভাব। "Mussolini allowed himself to be persuaded by argument produced by Bose to obtain a tripartite declaration in favour of Indian Independence He has telegraphed the Germans proposing—contrary to the Salzburg decisions—proceeding at once with the declaration [The Springing Tiger ; p-66.]

'ভারতের স্বাধীনতার জন্য ত্রিপক্ষীয় ঘোষণার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী সুভাষচন্দ্রের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। শালজবুর্গ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে জার্মানী যাতে তখনই ঐ ঘোষণার ব্যাপারে অগ্রসর হয়, সেজন্য তাদের কাছে তার পাঠালেন তিনি।' তিনি জার্মান সরকারকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে সুভাষকে তিনি পাল্টা সরকার গঠন করতে বলেছেন।

হিটলার মুসোলিনীর এ মনোভাব সুস্থভাবে মেনে নিলেন না। তিনি এবারও মন্তব্য করলেন এরূপ কোন ঘোষণায় সময় এখনো আসেনি। যদিও জাপানীরা তার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। সে যাই হোক হিটলার এবার সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে স্বীকৃত হলেন।

সুভাষ ফিরে এলেন বার্লিনে। হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ধার্য হলো ২৭শে মে। সুভাষ যথারীতি উক্তদিনে হিটলারের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে হিটলার সকাশে এলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুর্দিনের সঙ্গী ভনট্রট। ডঃ আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ বলেছেন, "Trott was designated head of the Special India Division, and I. his deputy assistant. It was great luck for Netaji and his cause that Adam Von Trott Zu Solz happened to be the head of the office in charge of all matters concerning Netaji's activities in Germany......without Trott, his circle of friends and his devoted working team, Netaji probably would not have remained in Berlin."

ভনট্রটই দোভাষীর কাজ করেছিলেন দু'জনের মধ্যে। হিটলারের ইংরেজী জ্ঞান

ছিল না বললেই চলে। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, হিমলার, কেপলার প্রভৃতি নাৎসী নায়কবৃন্দ। আর ছিলেন স্কীমিডেট (Schimidt), হিটলারের ব্যক্তিগত দোভাষী। স্কীমিডেটের লেখা থেকে দু'দেশের দু'জন বীর নেতার কথপোকথন সম্পর্কে সুন্দর একটা ধারণা পাওয়া যায়।

হিটলার সুভাষকে ভারতের এক মহান বিপ্লবী এবং বীর সন্তান বলেই সম্বোধন করলেন। স্কীমিডেট বলেছেন যে তাঁদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল যেন দু'জনই অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বা অভিনেতা হিসেবে তাঁরা কোন নাটকের মহড়া দিচ্ছেন।

সুভাষ হিটলারকে পুরনো বিপ্লবী 'আখ্যা দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। সুভাষ বললেন হিটলারের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাতের দিনটি তাঁর জীবনের একটি ঐতিহাসিক দিন হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি আরও বললেন জাপান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মুসোলিনীও জাপানের ন্যায় মতপোষণ করেন। তবে তিনি চান এ ব্যাপারে অক্ষশক্তির একটা ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা।

হিটলার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সুভাষের সঙ্গে কথা বললেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণায় সম্মত নন বলে জানালেন সুভাষকে। সুভাষকে তিনি তাঁর এ মতের সপক্ষে যুক্তি দেখালেন যুদ্ধ পরিস্থিতি। এর মধ্যে হিটলারের নাৎসীবাহিনী স্তালিনগ্রাদ ও ককেসাসের দিকে ছুটে চলেছে। চলছে লড়াই জোর কদমে। এ সময়ে তাঁদের অন্য কিছু চিন্তা করার সময় কোথায়?

হিটলার তারপর নিজেকে সৈনিকরূপ বর্ণনা করে বললেন যে, যা তিনি করতে পারবেন না সেই ব্যাপারে তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ। হিটলার সুভাষকে বললেন জার্মানী থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় ছয়'হাজার মাইল। অতএব এতখানি দূর থেকে জার্মান বাহিনীর ভারতের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে যাওয়া কি করে সম্ভব? ভারতের স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে অর্জন করতে হবে।

তিনি আরও বললেন স্বাধীনতা কেউ কাউকে পাইয়ে দিতে পারে না। সুভাষকে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে উল্লেখ করে বললেন সুভাষ হচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত। ভারত সম্পর্কে ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা মানেই হচ্ছে দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া। বর্তমান অবস্থায় তাঁর পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।

মিশরের ব্যাপারে এ ঘোষণা সম্ভব। কারণ রোমেল ইতিমধ্যে মিশরে পৌঁছে গেছেন। মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত বলে হিটলার সুভাষকে জানালেন। ভারতের ব্যাপারে সেরকম কোন সম্ভাবনা এখনো নেই।

হিটলার এবার সুভাষকে ব্রিটিশের হয়ে ওকালতি করার সুরে বললেন যে, পুরনো ও অভিজ্ঞ বিপ্লবী হিসেবে তিনি বলতে পারেন ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা এত সহজে লাভ করা সম্ভব নয়। এই স্বাধীনতা লাভ করতে ভারতের অন্তত একশ বছর এমনকি দু'শ বছরও লাগতে পারে। যা জার্মানীর ক্ষেত্রে হয়েছিল।

"And the old revolutionary's instincts convinced him that it would take India 'one hundred to two hundred years to become a nation— as it had done Germany."

কথাটা সুভাষ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নানান যুক্তি দিয়ে তিনি হিটলারকে তাঁর বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সুভাষ হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ভারতবর্ষের সমর্থন পেতে হলে হিটলারের ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা করা উচিত। তিনি আরও বললেন যে হিটলারের বক্তব্য হচ্ছে কিছুটা ইতিহাস আশ্রিত, কিছুটা লোকগাথা সম্বলিত আর কিছুটা ভয়ঙ্কর অবাস্তব। "Hitler's monologues—part history, part folklore, much dangerous nonsense."

অপরপক্ষে হিটলারেরও রয়েছে অন্তহীন যুক্তি। পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক। তিনি সুভাষকে বললেন, "হিজ এক্সেলেন্সী মামসোত্তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশা করি।"

সুভাষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির ছাপ। তিনি হিটলারকে সাফ জবাব দিলেন, "সারা জন্ম আমার রাজনীতি করেই কেটেছে আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।"

মহাপরাক্রমশালী হিটলারের মুখের উপর এরকম জবাবে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। তাঁদের বাকশক্তি রহিত হলো।

পরিস্থিতি হালকা করে দিলেন ভনট্রট। তিনি কথাটা হিটলারকে একটু নরম-ভাবে বুঝিয়ে বললেন, যাতে উভয় পক্ষের কথোপোকথনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

"When the Chancellor in this connection asked what kind of political concept Netaji actually had in mind, Netaji became impatient and asked Trott to give the Chancellor (who neither spoke nor understand English) the following reply : "Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side."

Trott translated this reply in a more diplomatic form.

(Dr. Werth ; p-36).

সুভাষ হিটলারকে ব্রিটিশের একজন পরমভক্ত এবং চাটুকার হিসেবে মনে করলেন। হিটলারকে সুভাষ বুঝিয়ে দিতে চান যে তিনি জার্মানীর অধীশ্বর হতে পারেন তাঁর চেয়ে সুভাষ রাজনীতি কম বোঝেন না। হিটলারের কাছ থেকে অন্তত রাজনীতি শিখতে হবে না।

সুভাষ হিটলারকে বললেন যে তিনি 'মেইন ক্যাম্ফে' ভারত সম্পর্কে সে সমস্ত উক্তি করেছেন তাও খুবই দুঃখজনক এবং তার জন্য ভারতবাসী তাঁর উপর ক্ষুব্ধ। সুভাষ মেইন ক্যাম্ফের বক্তব্যগুলি হিটলারের সামনে তুলে ধরলেন। মেইন ক্যাম্ফে হিটলার বলেছেন—

"We Germans have had sufficient experience to know how hard it is to 'coerce England. And, apart from all this, I as a German would for rather see India under British domination than that of any other nation. To me, as a nationalist who appreciates the worth of the racial basis of humanity, I must recognise the racial inferiority of the so-called "Opressed Nations" and that is enough to prevent me from linking the destiny of my people with the destiny of those inferior races".........হিটলার আরও বলেছেন যে, The loss of British rule in India would be the greatest misfortune to the rest of the world including that of Germany."

সুভাষ হিটলারকে তাঁর এ সমস্ত মন্তব্যের জন্য ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভারত সম্পর্কে এরকম হীনভাব কেন মনে পোষণ করেন? ইংলণ্ড ভারত শাসন করুক এ যখন তাঁর ইচ্ছে তাহলে সুভাষ তাঁর কাছ থেকে ইংলণ্ডকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য কোন সাহায্য আশা করতে পারেন না। আর হিটলার নির্যাতীত জাতিদের জাতিগত দিক থেকে হীন বলে মনে করেন। তাদের হয়ে তিনি জার্মান সৈন্যের রক্ত ঝরাতে রাজি নন।

সুভাষ হিটলারকে স্পষ্টতই বলে দিলেন তাঁর এ সমস্ত উক্তি ভারতবাসীকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাঁর মতো একজন দেশপ্রেমিকের কাছ থেকে ভারতের বিপ্লবী বীরেরা এরকম উক্তি আশা করতে পারেন না। হিটলার ব্রিটেনের চাটুকারিতা করতে পারেন তাতে তিনি কিছু বলতে নারাজ। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে সুভাষ যে ব্রিটেনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন তা হিটলারকে বুঝিয়ে দিলেন। সুভাষ একথা অনেকবার বলেছেন এবং হিটলারকে আবার বললেন যে, "The crow is the most cunning and cruel among the birds, the fox among the animals and the British imperialist among the human beings." পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খ্যাকশিয়াল, মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই হলো সব চেয়ে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর।

হিটলার সুভাষের তীব্র প্রতিবাদে খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেলেন। খানিকটা আমতা আমতা করে বললেন যে শোষিত দেশগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না এবং প্রয়োজনবোধে তাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও স্বদেশের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিঃশেষ করতে পারে না। "A coalition of cripples cannot attack a powerful state which is determined, if necessary, to shed the last drop of its blood to maintain its existence."

ফলে শোষিত কোন দেশ এককভাবে তাঁর অত্যাচারী শাসককে পরাভূত করতে পারে না। তাই পদে পদে তাদের বিদ্রোহ বা বিপ্লব হতাশায় পর্যবসিত হয়।

The Lost Hero গ্রন্থে মিহির বোস বলেছেন যে, "When Bose boldly interrupted to question the racial slurs on the Indians in Mein Kampf, Hitler lost some of his fluency and justified his utterances by saying that weak subject nations could not build up a united front against the oppressors. In any case, he had had to say those things, in order to discourage passive resistence in Germany from along the Indian pattern, which in any case was a completely wrong doctrine."

হিটলারের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি জার্মানীতে তাঁর বিরুদ্ধে জার্মানবাসীর বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাঁর সমর্থন ছিল না। তিনি ভাবতেন ভারতবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী গণ-বিদ্রোহ বা বিপ্লব জার্মান জনগণকেও তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলুব্ধ করবে।

হিটলারের মনোভাব সুভাষ বুঝতে পারলেন। আর হিটলার সুভাষের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর যুক্তির পক্ষে সঠিক কিছুই বলতে পারলেন না। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। সুভাষকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে প্রাচ্যে যাবার পরামর্শ দিলেন। তবে হিটলার সুভাষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁর প্রাচ্য সফর বা জাপানের সহযোগিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ সহায়ক হবে না, বরঞ্চ ক্ষতিকারক হবে।

সুভাষ পরে তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন যে, জার্মান নেতা হিটলার কি অদ্ভুত ধরনের লোক, তাঁকে বোঝা মুস্কিল। তাঁকে সুভাষ আফগানিস্তানের Fakir of IPI-র সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কয়েক মিনিটও যুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। সুভাষ ১৯৩৩-৩৪ সালে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা গিয়েছিলেন। সেই সময় সুভাষের সঙ্গে জার্মান নেতাদের যোগাযোগ হয়েছিল। হিটলার, গোয়েরিঙ বা রিবেনট্রপ প্রমুখ নাৎসী নেতাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। তখন জার্মানীতে নাৎসী শাসনের প্রথম দিক। হিটলার সবে হিণ্ডেনবার্গের কাছ থেকে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন। সুভাষ তখন ইউরোপে নির্বাসিত। সুভাষ নাৎসী সমর্থক না হয়েও নাৎসী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

সুভাষ ছিলেন দূরদর্শী নেতা। সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধারিত। এই বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে তা সুভাষ মনে করতেন। এই যুদ্ধের সুযোগে সর্বস্ব পণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানতে হবে। এ ব্যাপারে, সুভাষের মতে ব্রিটিশের শত্রুপক্ষই হবে ভারতের মিত্র। নেপোলিয়নের নীতি ছিল 'শত্রুর শত্রুই আমার মিত্র'। সুভাষ এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

সুভাষ সেই সময় বার্লিনে নাৎসী নেতাদের খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন কবে তাঁরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। কোন স্পষ্ট উত্তর সুভাষ তাঁদের কাছ থেকে পাননি। তাঁরা বলেছিলেন ওসব তাঁরা এখন ভাবছেন না। নির্ভিক সুভাষ কিন্তু তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা কিছু করুক আর নাই করুক ভারত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবেই। "Britain, is our traditional enemy. We will fight her, whether you support or not."

১৯৩৫ সাল। সুভাষ তখন ভিয়েনাতে। সুপণ্ডিত ইহুদী লেখক অটো জারেক-এর সঙ্গে সুভাষের পরিচিতি ঘটে। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে। অটো জারেক বলেছেন ইউরোপ সম্পর্কে সুভাষের অগাধ জ্ঞানের কথা। সমগ্র ইউরোপের রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যেন তাঁর নখদর্পণে। তবে অটো জারেক বলেছেন সুভাষের একমাত্র দোষ তিনি ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ বিদ্বেষী।

এই সময় সুভাষ দু' সপ্তাহের জন্য ভিয়েনা ছেড়ে বার্লিনে চলে যান। তখন বার্লিনে চলছে হিটলারের একাধিপত্য। সুভাষ বার্লিনে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। নাৎসীদের কার্যকলাপ ভালোভাবেই অনুধাবন করলেন বার্লিনে থেকে। হিটলারের সঙ্গে দেখা করে সুভাষ খুব উৎফুল্ল। ভিয়েনায় ফিরে এসে তিনি অটো জারেককে বললেন, 'জার্মান রাইখের সব কিছুই যেন তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। হিটলার যেভাবে জার্মানীর পুনরুত্থানের জন্য কাজ করে চলেছেন, তাই ছিল তাঁর কাছে সব চাইতে বড় বিস্ময়।'

অটো জারেক সুভাষকে প্রশ্ন করলেন হিটলার ত অন্য জাতিকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে চলেছেন। সুভাষ নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন ঠিক কিন্তু এমন একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসককে তিনি কেন সমর্থন করছেন? সুভাষ প্রথমে অটো জারেকের কথার সঠিক উত্তর দিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। পরে বললেন, "Any how, Hitler is our natural ally. And he knows it. I put before him detailed plans for an agreement between Germany and the Indian Free State which is to come into force when we gain our freedom. He is studying the project. We shall get his support when we revolt." [German Odyssey : Otto Zarek]

যুদ্ধ আরম্ভ হবার ৫/৬ বছর আগে থেকেই সুভাষ বার্লিনে গিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা হিটলারকে ব্যক্ত করে এসেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসারত সুভাষের তখনো কিন্তু ধ্যান জ্ঞান ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য বিশেষত হিটলারের। সুভাষ তাঁর 'মুক্তি সংগ্রাম' বইতে লিখেছেন যে, 'ইউরোপে একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে হবে।...প্রতিটি মিত্ররাষ্ট্রে স্বাধীন ভারত সরকারের কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপন করতে হবে।...বিদ্রোহে সহায়তার জন্য ভারতকে আফগানিস্তানের পথে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাতে হবে। ব্রিটিশ প্রভাব

ও প্রতিপত্তি দূর করতে হলে বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে বন্ধুত্বপূর্ণ স্থিতাবস্থা রয়েছে, তা রক্ষা করতে হবে।'

সুভাষ যখন ভিয়েনাতে সেই সময় আরও কয়েকটি ঘটনা সুভাষের নজরে এসেছিল এবং তার বিরুদ্ধে সুভাষ তীব্র প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। ভারতবাসীকে বিশ্বের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কতকগুলো কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ ছবি ভিয়েনার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি ইংলিশ ছবি ছিল "Everybody Loves Music"। এ ছবির একটি দৃশ্যে গান্ধীজীকে দেখানো হয়েছে নেংটি পরিধানরত অবস্থায় এক মহিলার কণ্ঠ ধরে বলড্যান্স করছেন। সেই সময় অনেক ভারতীয় হোমরাচোমড়া ছিলেন ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়। কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৎসাহস দেখালেন না। সুভাষ চুপচাপ থাকতে পারলেন না। খবর শুনে অসুস্থ সুভাষ ছুটে গেলেন আর্কবিশপ কার্ডিনাল ইন্‌তিজার-এর কাছে। সুভাষকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ক্ষুব্ধ বাঘ। সেই ক্ষুব্ধ বাঘের থাবা যেন আর্কবিশপকে খতম করতে উদ্যত। ক্ষুব্ধ সুভাষের প্রতিবাদে কাজ হলো। এ সমস্ত ছবি দেখানো বন্ধ হলো ভিয়েনাতে। বন্ধ হলো গোটা জার্মানীতে।

১৯৩৪ সালের আর একটি ঘটনা। সুভাষ তখন মিউনিকে। ১৯৩৪ সাল। হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার। নাৎসী পার্টি সুভাষকে পৌর সম্বর্ধনা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। সুভাষ যথারীতি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। গণ্ডগোল বাধলো হিটলারের এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। হিটলার সেদিনই বেতারে ব্রিটিশের সুখ্যাতি করে বক্তৃতা দিলেন। সুভাষ সেই বক্তৃতা শুনে ঘৃণাভরে নাৎসী পার্টির পৌর সম্বর্ধনা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তা জানিয়ে দিলেন পৌরপ্রধানকে প্রতিবাদ পত্রসহ। তিনি প্রতিবাদ পত্রে বললেন, "Hitler is at liberty to lick British boots" (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে)। তাঁর দেওয়া সম্বর্ধনা তিনি গ্রহণ করতে নারাজ।

হিটলার ভাবতে পারেননি তাঁর মুখের ওপর এরকম জবাব সুভাষ দেবেন। সমগ্র ইউরোপ স্তব্ধ। হিটলারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এরকম জবাব দেওয়া যে দুঃসাহসিকতার ব্যাপার তা ইউরোপবাসী বুঝতে পারল। তারা আরও বুঝতে পারল সুভাষ ব্যতিরেকে আর কেউ হিটলারের মুখের ওপর এরকম জবাব দেবার সাহস দেখাতে পারতেন না।

হিটলার চিনলেন সুভাষকে। তাঁর সাহসের কাছে হিটলার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। পরদিনই ভুল স্বীকার করে নিলেন। সুভাষের ব্যক্তিত্বের কাছে হিটলারকেও মাথা নত করতে হলো।

সুভাষ গান্ধীজী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, 'রাশিয়ায় লেনিন, ইতালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলার যেমনটি করেছেন, ঠিক সেইভাবে মহাত্মাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্রজাতির মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।' সুভাষের গান্ধীজী সম্পর্কে এই মন্তব্য থেকে একটা কথা

স্পষ্ট হয়ে আসে যে সুভাষ মনে করতেন হিটলারের, লেনিনের বা মুসোলিনীর মানুষের মনস্তত্বকে বোঝার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। এদিক থেকে সুভাষ হিটলারকে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই অপরিসীম ক্ষমতা হিটলারের ছিল বলেই ভিনদেশী হয়েও তিনি সুসভ্য জার্মানজাতিকে তাঁর অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন। এই ভিনদেশী হিটলারকে একসময়ে জার্মানীর অধিকাংশ মানুষ দেবতাজ্ঞানে তাদের নেতার আসনে বসিয়েছিল।

১৯৩১ সাল। গান্ধীজী একাই গেছেন লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। কিন্তু ফিরে এলেন রিক্ত হাতে, হতাশ হয়ে। তাই সুভাষ দুঃখ করে বললেন, 'গান্ধীজীর উদারতা, স্পষ্টবাদিতা, বিনীত আচরণ, শত্রুপক্ষের প্রতি তাঁর সুগভীর দরদ, জন বুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে তো পারেইনি বরং দুর্বলতা হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে।......মহাত্মা যদি স্তালিন, ডুচে, মুসোলিনী অথবা ফুয়েরার হিটলারের ভাষায় কথা বলতেন জন বুল তবে কথাটি বুঝত ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করত।'

এই উক্তি থেকেও হিটলার, স্তালিন বা মুসোলিনীর প্রতি সুভাষের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ব্যক্তিত্ব, বজ্রকঠিন সংকল্প, দেশের স্বার্থে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাজকে সুভাষ স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

সুভাষ হিটলারের ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বীকৃতি দিয়েছেন হিটলারের ন্যাশানেল সোস্যালিজিমের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে। তিনি ন্যাশানেল সোস্যালিজম ও কম্যুনিজমের ভালো দিকগুলির সমন্বয় সাধন করে ভারতের স্বার্থে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। সুভাষের ভাষায় বলা যায় "If you take the conflict between Fascism (or what you might call National Socialism) on the one side and commiunism on the other, I see no reason why we cannot work out a synthesis of the two systems that will embody the good points of both."

ফ্যাসিজিম এবং কম্যুনিজিম-এর ভালো দিকগুলির প্রতি সুভাষের আকর্ষণ ছিল। দেশের সার্বিক মঙ্গল বিধানের স্বার্থে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সুভাষ গণতন্ত্রের চেয়ে হিটলারের বা মুসোলিনীর মতো ভারতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন অন্তত কিছুদিনের জন্য।

১৯৩১ সালের গোল টেবিল বৈঠকের পর ভারতে ফেরার আগে মহাত্মা গান্ধী সুইজারল্যাণ্ড হয়ে ইতালীতে গিয়েছিলেন। দেখা করেছিলেন মুসোলিনীর সঙ্গে। সেখানে গান্ধীজী ফ্যাসিস্ট বালকদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতালীর একচ্ছত্র নায়ক মুসোলিনী ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেছিলেন। গান্ধীজী এর জন্য বিশ্বে বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছেন।

কিন্তু সুভাষ বলেছেন 'ভারতের স্বার্থের দিক থেকে ইতালী ভ্রমণের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী ভারতের অনেক উপকার করে দিলেন।' বিভিন্ন কার্য-কারণ-দ্বারা সুভাষ

ভারতবাসীকে বুঝাতে চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিটলার, মুসোলিনীর সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল।

সুভাষ বার্লিনে ছিলেন মাত্র দু'বছর। হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে মাত্র একবার। এর আগে ১৯৩৩-১৯৩৫ সালে যখন তিনি চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় ছিলেন সেই সময় হিটলারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন সেই কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সুভাষ বার্লিনে ছিলেন।

বৈদেশিক দপ্তরের অফিসারের মাধ্যমেই হিটলারের সঙ্গে বার্তা বিনিময় হতো সুভাষের। রিবেনট্রপ, ভনট্রটই ছিলেন সুভাষের অধিক সময়ের সঙ্গী। সুভাষ জার্মানীতে থেকে বিশেষ কিছুই ভারতের স্বাধীনতার জন্য করতে পারছেন না। কেবলমাত্র বেতারে তিনি তাঁর নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন ভারতবাসীকে। ভারতবাসীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন গড়ে তুলতে। এতে যে কিছু ফল লাভ হয়নি তা নয়, আগষ্ট আন্দোলনের জন্য প্রকৃতপক্ষে সুভাষই গান্ধীজীর মনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন ছয় হাজার মাইল দূর থেকে। গান্ধীজী তাই সুভাষকে জানিয়েছেন তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

জার্মানী থেকে প্রত্যক্ষভাবে সুভাষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারছিলেন না। প্রায় ছয় হাজার মাইল দূর থেকে আজাদী সৈন্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করা যে অসম্ভব ব্যাপার সুভাষ তা ভালোভাবে বুঝতে পারলেন। দ্বিতীয়ত, হিটলার তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রথম দিকে হিটলার-বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাস আক্রমণের পর থেকে হিটলারের পতনের পালা শুরু হয়।

এদিকে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হিটলার ও মুসোলিনী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে হিটলারের পক্ষে সুভাষকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করা সম্ভব ছিল কি-না বলা মুস্কিল?

সে যাই হোক হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাত নেতাজীকে বার্লিনে পদ-মর্যাদায় ভূষিত করল। জার্মান কাগজের শিরোনামায় নেতাজীর নাম। জার্মানীতে আসার পর থেকে হিটলারের নির্দেশে গেস্টাপো বাহিনী নেতাজীর ওপর কড়া নজর রাখতো। ইয়ামামোতো নেতাজীকে বলতেন তিনি যেন হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর 'টাইগার ক্লাব' দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাঘের বেড়াজাল ভেদ করে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছায় ঘুরে ফিরে বেড়ানো সম্ভব নয়। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশাও অসম্ভব হয়ে উঠল।

অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় যেখানে Special India Division-এর নিয়ন্ত্রণ বেশি সে সমস্ত জায়গায় নেতাজী অবাধভাবে বক্তৃতা দিতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, সে সমস্ত জায়গার কর্তৃত্বভার ছিল ভনট্রটের উপর। ভনট্রটের সাহায্য ও সহযোগিতা

ব্যতিরেকে নেতাজীর বার্লিনে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। Werth বলেছেন নেতাজীর বেতার ভাষণের কোন কিছুই ছাঁটকাট করা হতো না। ১৯৪২-র মে-জুন মাস থেকে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রচার তুঙ্গে উঠে। তিনটি বেতার কেন্দ্র থেকে নেতাজী তাঁর প্রচারাভিযান চালাতেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ভারতবাসীকে করত উদ্বুদ্ধ। ভারতের কর্ণধার গান্ধীজী নেতাজীর বক্তৃতায় হতেন আপ্লুত। যার প্রকাশ ঘটল ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২-র ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

এখানেই রয়েছে সুভাষের জার্মানীতে গমনের একমাত্র সার্থকতা। নেতাজী ও হিটলারের সাক্ষাতকার নেতাজীকে ভারত সম্পর্কে অবাধ প্রচারের সুযোগ করে দিল। সাধারণ ভারতবাসী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নেতাজীর উদাত্ত ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল। আগে যেখানে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে বেতার প্রচারের সময়সীমা ছিল ৪৫ মিনিট, এখন সেটা হলো ৩ ঘণ্টা।

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতকারের পরই নেতাজী ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে একটি পরিকল্পনা সেল (Planning cell) খুললেন। নেতাজী তাঁর জার্মান বন্ধুদের কাছে স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা কিভাবে চলবে সে ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেন। তিনি হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলার কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জার্মান বন্ধুদের বলতেন, "He had studied many forms of Governments but there was only one that was suitable—dictatorship with firm state control and centralised planning."

ভনট্রট নেতাজীকে বলেছিলেন সম্ভবত ইংলণ্ডের ন্যায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভারতের পক্ষে উপযোগী হবে। নেতাজী অত্যন্ত রুষ্টভাবে উত্তর দিলেন না তা হবে না। তিনি চান ভারতের রক্ষী-বাহিনীর কলেবর হবে বিশাল এবং তাঁর কথায় মনে হচ্ছিল যেন হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর দ্বারা ভারতের রক্ষী বাহিনী প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হবে।

নেতাজী উত্তরে বললেন, "India needed iron control - and, as if to further this aim, he envisaged a 'protection force' to be trained by the Gestapo"—The Lost Hero by Mihir Bose—P-200.

তাহলে দেখা যাচ্ছে নেতাজী ভারতবাসীর সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর ভালো দিকগুলির দিকে নেতাজী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গেস্টাপো বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, দলের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, হিটলারের উপর তাদের অকৃত্রিম আনুগত্য নেতাজীকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রথম দিকে ভারতের শাসনব্যবস্থা কড়া হাতে (একচ্ছত্র একনায়কের মতো) পরিচালিত হলে আজ ভারতের সম্ভবত এ দুর্দিন ঘনিয়ে আসত না! একনায়কতন্ত্র খারাপ যদি বেশিদিন চলে। কিন্তু দু'শ বছরের পরাধীনতার পর কমপক্ষে ১৫ বছর ভারতে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করা উচিত ছিল। মনে হয় এতে

দেশবাসীকে সুশৃঙ্খল পথে চালিত করা সম্ভব হতো। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সেই ধরনের নেতৃত্ব যার কথায় ও কাজে কোন ফারাক নেই। যার মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে একচ্ছত্র একনায়ক হিসেবে। এটাই ছিল নেতাজীর মনোবাসনা।

জার্মানীতে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য নেতাজী আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ভগৎরাম তলোয়ার ও জার্মান এজেণ্টরা চেয়েছিল আফগানিস্তানের উপজাতিদের নিয়ে একটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে। জার্মানী থেকে যার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সেখানে পাঠাবার পরিকল্পনা ছিল। এ সমস্ত পরিকল্পনা কার্যত স্থগিত রইল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাস। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্থির করল আফ্রিকায় রোমেলের বাহিনীতে ভারতীয় বন্দী-সৈন্যদের কাজে লাগাতে হবে। নেতাজীর আফ্রিকার ভারতীয় বন্দীসেনাদের ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে ছিল। হিটলার নেতাজীর ইণ্ডিয়ান লিজিয়নকে একটি তামাশা বলে মন্তব্য করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন নেতাজী জার্মানীতে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন তৈরী করে ভারতের স্বাধানতা আন্দোলনে কোন ইতিবাচক ফল প্রদান করতে পারবেন না। "Hitler thought the Indian Legion was a joke"—The Lost Hero by Mihir Bose. হিটলার নেতাজীকে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের সেনাবাহিনীকে গ্রীসে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেবার পরামর্শ দিলেন।

নেতাজী হিটলারের এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। ১৯৪২-এর জুলাই-আগষ্ট মাসে উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া আর্মির ৪৭ জন বন্দী ব্রিটিশ বিরোধী সেনা নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে কাজ করতে স্বীকৃত হলো। এভাবে ধীরে ধীরে নেতাজী তাঁর বাহিনী গড়ে তুলতে লাগলেন। নেতাজী আবার গেলেন ইতালীতে। সেখানে বন্দী ভারতীয় সেনাদের সামনে নেতাজী উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিলেন। সেখান থেকে তাঁর লিবিয়া যাবার কথা ছিল। কিন্তু হিটলারের বা মুসোলিনীর অনুমতি মিলল না।

গিরিজা মুখার্জী বলেছেন নেতাজী যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই ভারতীয় বন্দী সেনারা ও ভারতীয়গণ কোন্ এক যাদুমন্ত্রবলে যেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। তাঁরা দলে দলে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে যোগ দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। নেতাজীর ভাষণ, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, চোখের অপূর্ব চাহনি যেন বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও অন্যান্যদের সম্মোহিত করে রাখতে আরম্ভ করল।

কোন কোন সময় খালিমাঠে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতীয় বন্দীদের সামনে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন যুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হিটলারও একই কথা বার বার জনগণকে বলতে লাগলেন। নেতাজী বন্দী সেনাদের বলতেন ইংরেজ হচ্ছে বর্তমানে মৃত সাপ। এই সাপকে মৃত অবস্থায় দেখেও মানুষ ভয় পায়। সন্দেহ নেই ইংলণ্ডের পরাজয় সুনিশ্চিত। সমস্যা হচ্ছে কিভাবে দেশের

দায়িত্বভার গ্রহণ করা যাবে? নেতাজী বলতেন, 'আমরা যুবক, শক্তি আমাদের আছে, আছে আমাদের সম্ভ্রমবোধ। স্বাধীনতা কেউ কাউকেও দিতে পারে না। স্বাধীনতা ব্রিটিশের হাত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে।' তিনি বলতেন, "অনেকেই বলেন আমি স্বপ্ন দেখি। আমি চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি এমনকি শৈশবেও। আমার জীবনের সেরা স্বপ্ন, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন।"

নেতাজীর বক্তৃতা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করত। তাঁর ডাকে ভারতীয় বন্দী সেনারা মুক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে যোগ দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠত। ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের সকলকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো। সকলকে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হতো।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাস। এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যের কুজকাওয়াজে নেতাজীকে অংশগ্রহণ করতে হলো। সঙ্গে ছিলেন ইয়ামামোতো। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা হিটলারের নামেই আনুগত্যের শপথ বাক্য পাঠ করবে বলে স্থির করল নেতাজীর নির্দেশে। পাঁচশত ভারতীয় লিজিয়নের সৈনিক Lt- Col. Krappe-এর নেতৃত্বে শপথ বাক্য পাঠ করল—

"I swear by God the holy oath that I will obey the leader of the German State and Hitler as Commander of the German Armed Forces in the fight for freedom of India in which fight the leader Subhas Chandra Bose and that as a brave soldier I am willing to lay down my life for this oath."—The Lost Hero by Mihir Bose.

নেতাজী ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনাবাহিনীর সামনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে গেলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের আত্মবলিদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নেতাজী সেনাবাহিনীকে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উপহার দিলেন। তাদের বললেন যে, "আমারই নেতৃত্বে তোমরা কুজকাওয়াজ করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।" নেতাজী সেনাবাহিনীকে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বার্থে অনুপ্রাণিত করার জন্য এসব উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন ছয় হাজার মাইল দূর থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা অসম্ভব। কারণ হিটলারের অবস্থা তখন শোচনীয়। অতএব তাঁর কাছ থেকে সাহায্যের আশা বৃথা।

জাপান এরই মধ্যে নেতাজীকে নিয়ে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সব কথবার্তা হয়ে গেছে। রাসবিহারী বোসই জাপানে নেতাজীর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছেন। 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ' ও 'আই. এন. এ.' সবই রাসবিহারীর গড়া। যাদের ওপর ভিত্তি করে নেতাজী জাপানে এসে তাঁর কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সুযোগ পেলেন। রাসবিহারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা।

নেতাজীও জাপানে যাবার জন্য প্রস্তুত। এমতাবস্থায় জার্মানীতে বন্দী ভারতীয়

সৈন্যদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাহিনী অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়তে দেখে অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক এ বাহিনী যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ লেখার "ফুটনোট"।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস। জার্মানীতে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের সেনাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলো। জার্মানরা অবশেষে হিটলারের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের হয়ে প্রচারেও নামল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতাজীর গড়া এই বাহিনীর ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ ঘটল না। নেতাজী জাপানে পাড়ি দেবার পর ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন ভেঙ্গে গেল। এখানকার ভারতীয় সেনাদের মনে নেতাজী সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হলো। নেতাজী জাপানে চলে যাবার সময় কেউ তাঁকে চোখেও দেখলো না।

তারা বেশ কিছুদিন জানতেও পারল না নেতাজী কোথায়? সম্পূর্ণ বাহিনী সক্রিয় কাজে অনীহা প্রকাশ করতে লাগল। নেতাজীর জাপান যাত্রার পরের মাসেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেল। "In April 1943—two months after Bose had gone—there was a mutiny, with a whole battalion refusing to go on active service. That was dealt with but in the next month the legion virtually ceased to exist as such."

ভারতীয় লিজিয়নের প্রতি ব্যাটালিয়নের এক হাজার করে তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য জার্মান সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিল। নাম দেওয়া হলো ইনফ্যানট্রি রেজিমেণ্ট অফ 950 (Infantry Regiment of 950)। এই বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে গেল না, তাদের যেত হলো পশ্চিম রণাঙ্গনে। এতে ভারতীয় লিজিয়নের সমস্ত সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। আত্মবলিদানের স্পৃহাও তাদের আর রইল না। যুদ্ধ শেষে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর এদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল মিত্রশক্তি দিল্লীর লালকেল্লায় তাদের বিচার করেছিল। নেতাজী জাপানে যাবার প্রাক্কালে জার্মানীতে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার ও ভারতীয় বাহিনীর কাজকর্মের সব দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন এ সি. এন. নাম্বিয়ারের হাতে।

১৯৪২-এর জুন মাস। ভন রিবেনট্রপের সঙ্গে নেতাজীকে জাপানে পাঠাবার জন্য একটি চুক্তিও হয়ে গেছে। নেতাজীকে জাপানের পাঠাবার জন্য হিটলারের সম্মতিও মিলেছে। ২৩ জুলাই নেতাজী রিবেনট্রপকে লিখলেন ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে অবিলম্বে জাপানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। রিবেনট্রপ সম্মত ছিলেন। সম্মত ছিলেন হিটলারও। কিন্তু জাপানের তরফ থেকে এ সময় একটু অসুবিধে দেখা দিল। জাপানের যুদ্ধ পরিস্থিতিও খারাপের দিকে। শত্রুর আক্রমণে জাপান বিব্রত। তাই নেতাজীর জাপান যাবার পরিকল্পনা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল।

এদিকে ভারতের আগষ্ট আন্দোলনের জোর প্রস্তুতি চলছে। ভারতের

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম উপায় বলে বর্ণনা করেছেন। এই আন্দোলনে ভারতের জনগণের সমর্থন ছিল অপরিসীম। কিন্তু এই আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হলো মূলত নেতৃত্ব দেবার অভাবে। সব নেতাকে আন্দোলনের পূর্বে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। নেতৃত্ব দেবার মতো কোন নেতাই বাইরে ছিল না। তবুও আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য গান্ধীজীর শেষ গণবিদ্রোহ। 'করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই ছিল ভারতের জনগণের প্রতি গান্ধীজীর আহ্বান। গান্ধীজী নেতাজীর দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ সময়ে তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪২-র মধ্যে গান্ধীজীও নেতাজীর মতো এই আশা পোষণ করতে লাগলেন যে ইংলণ্ড ভারত ছেড়ে চলে গেলে জাপান ভারতের দিকে এগোবে না। অতএব গান্ধীজীর জাপানী-ভীতি ছিল না।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে এ ব্যাপারে গান্ধাজীর সঙ্গে নেহরুর দারুণ মতবিরোধ ঘটেছে। জাপানের সাহায্য ও সহযোগিতায় নেতাজী ভারত প্রবেশ করুক তা নেহরু কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই নেহরু ঘোষণা করলেন নেতাজী জাপানের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজসহ ভারতের দিকে এগিয়ে এলে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নেতাজীকে প্রতিহত করবেন। নেহরু তখন হয়ে উঠলেন পুরোপুরি ব্রিটেনের স্তাবক। গান্ধীজী বিরক্ত হয়ে ঘোষণা করলেন, "I am so sick of slavery that I am even prepared to take the risk of anarchy was echoed by many."

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী গান্ধীজীর এ মনোভাব দেখে মন্তব্য করেছেন, "সুভাষ কি দূর থেকে গান্ধীর মনে যাদু বিস্তার করেছিল।" বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় নেতাজী বাস্তবিকই সহিংস আন্দোলনে সামিল হতে গান্ধীজীর মনে যাদুই বিস্তার করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা আগষ্ট আন্দোলন।

৫-১৪ জুলাই-র মধ্যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজাদ ও নেহেরুর আপত্তি সত্ত্বেও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল। ইংলণ্ডের ওয়ার ক্যাবিনেট লিনলিথগোকে নির্দেশ দিল গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ইডেনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ন্যায়সাল্যাণ্ডে পাঠাতে। লিনলিথগো এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ৯ই আগষ্ট শুরু হলো ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রমুখ সব বড় বড় নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো। ভারতবর্ষ বাস্তবিক পক্ষে এসে গেল সামরিক শাসনের আওতায়। আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলো। স্থাপিত হলো গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হলো উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। গেরিলা আক্রমণ শুরু করল বিদ্রোহীরা। এর ফলে ৩১৮ খানা থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, ৯৪৫টি পোষ্ট অফিস আক্রান্ত হলো ও ৫৯টি ট্রেন লাইনচ্যুত করা হলো।

ব্রিটিশের বৃহৎ শক্তি বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এলো। সারা ভারতে প্রায় ৬০০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। ক্ষেত্রবিশেষে আকাশ থেকেও বোমা বর্ষিত হতে লাগল। অমানুষিক বর্বরতার নিদর্শন রাখল ব্রিটিশ শক্তি। ১৯৪৩ সালের শরৎ কালের মধ্যে বিদ্রোহ অবদমিত হলো। আগষ্ট আন্দোলনের বিফলতা গান্ধীজীর জীবনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরাট ব্যক্তিগত পরাজয়। এরপর গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনে ঘটল বিরাট বিপর্যয়।

আগষ্ট আন্দোলনের দাবানল যখন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো নেতাজী তখন বার্লিন থেকে এ আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে বেতারে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নেতাজী প্রাচ্যে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

কিন্তু অবস্থার বিপাকে এবং অক্ষশক্তির সমূহ বিপদ দেখে হিটলার নেতাজীকে জাপানে পাঠাবার সম্মতি দিলেন না। কিছুদিন অপেক্ষা করে তাঁকে প্লেনে করে ১৫ই অক্টোবর জাপানে পাঠাবার কথা হলো। স্থির হলো রোম থেকেই নেতাজী প্লেনে করে জাপানে যাবেন। হিটলার রিবেনট্রপের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন প্লেনে নেতাজীকে পাঠানো ঠিক হবে না। ফ্লাইট বাতিল করা হলো।

হতাশায় নেতাজীর শরীর মন ভেঙ্গে গেলো। তিনি অস্থিরচিত্তে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর কাজের স্পৃহা গেল কমে। কয়েক মাস এভাবে কাটলো।

জানুয়ারী, ১৯৪৩। টোকিও হিটলারকে তারযোগে জানাল নেতাজীকে অতি সত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। অক্ষশক্তির প্রয়োজনেই নেতাজীর অবিলম্বে দক্ষিণ-পূব এশিয়ার যাবার প্রয়োজন একথাও জাপান হিটলারকে জানাল। ভারতীয় নেতাদের ও জাপানীদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে জাপানে গঠিত প্রথম ভারতীয় বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হলো। টোকিও ভেবেছিল এ বাহিনী নেতাজীর পক্ষে শুভদায়ক হবে না। "It was in January 1943 that Tokyo finally decided to accept Bose. The first Indian Army, assisted by the Japanese, had been dissolved as a result of differences between Indians and Japanese, Tokyo decided it could risk Bose."

হিটলারের নির্দেশে নেতাজীকে সাবমেরিনে করে জাপানে পাঠাবার কথা স্থির হলো। এর আগে জাপান সরকারের সঙ্গে নেতাজীকে জাপানে পাঠাবার পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে হিটলারের দু-তিন মাস ধরে কথাবার্তা হয়েছে। আলোচনা চলেছিল যৌথভাবে বার্লিনে—জাপানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওশিমা ও জার্মান যুদ্ধ বিশারদদের মধ্যে।

বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হলো জার্মান নেভির (Navy) একটা সাবমেরিনে করে নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হবে ভারত মহাসাগরের কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় (মাদাগাস্কার উপকূল থেকে ৪০০ মাইল দূরবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে)। সেখান থেকে জাপান সরকারের দায়িত্ব থাকবে নেতাজীকে জাপানে নিয়ে আসার।

এটা ছিল ভয়ঙ্কর এক ঐতিহাসিক যাত্রা। জার্মান নৌবাহিনী ও জাপান নৌবাহিনীর সমন্বয়ের এক বিরাট ও চাঞ্চল্যকর পরিকল্পনা। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে সেই সময় জাপান ও জার্মানীর সমূহ বিপদ মিত্রশক্তির হাতে। চারদিকে মিত্রশক্তির অতন্দ্রপ্রহরী। সমুদ্রে রয়েছে ভাসমান মাইন ও টর্পেডো। আকাশে বিচরণ করছে ফাইটার প্লেন। নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক মিত্রশক্তি কাজ করে চলেছে। হিটলারের নাৎসীবাহিনী স্তালিনগ্রাদে বিধ্বস্ত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে নেতাজীকে সাবমেরিনে করে জাপানে নিয়ে আসার ঝুঁকিও প্রচুর। চরম এক বিপজ্জনক অবস্থা। তদুপরি নেতাজীর শরীরও সুস্থ ছিল না খুব একটা। নেতাজীর দিক থেকে তাঁর সাহসিকতার এক অপূর্ব নিদর্শন এই দুঃসাহসিক যাত্রা।

১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী। সুভাষ বিদায় নিচ্ছেন হিটলারের দেশ থেকে। জার্মানীর কর্মক্ষেত্র থেকে চিরবিদায়ের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী। সুভাষের সঙ্গে আবিদ হাসান, আর নাম্বিয়ার। হিটলারের পক্ষে সুভাষকে বিদায় জানতে এসেছেন ষ্টেট সেক্রেটারী কেপলার আর বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ। সুভাষের যাত্রার খবর খুবই গোপন রাখা হয়েছিল হিটলারের নির্দেশে।

নেতাজী ও আবিদ হাসান কিয়েল বন্দর থেকে জার্মান সাবমেরিন U-Boat-এ উঠলেন। সাবমেরিনে করে জাপান যাত্রায় সুভাষের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান। নাম্বিয়ারকে জার্মানীতে নেতাজীর সব কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। নাম্বিয়ার, কেপলার ও ওয়ার্থ নেতাজীকে বিদায় জানালেন কিয়েল বন্দরের তীরে দাঁড়িয়ে। নেতাজী তাঁর রুদ্ধ আবেগকে কোন রকমে চেপে রাখলেন। চোখ দুটি তাঁর ছলছল করছে। হৃদয়ে তাঁর বেদনার কম্পন অনুভূত হচ্ছে। দু'বছরের বার্লিনের স্মৃতি তাঁর মনকে আকুল করে তুলেছে।

নেতাজী ও আবিদ হাসানকে নিয়ে সাবমেরিন ডুব দিল জলে। অকূল সমুদ্রের উদ্দাম, উচ্ছল জলরাশি উপরে ঢেউ খেলে বয়ে চলেছে। জলের নিচে U-Boat ঘণ্টায় দশ নট বেগে ছুটে চলেছে।

প্রতিপদে ভয়। বলতে গেলে সমস্ত জলপথটাই মিত্রশক্তির দখলে, যে কোন মুহূর্তে টর্পেডো চার্জ করে সব তছনছ করে দিতে পারে।

"Netaji and Hassan were huddled in a corner of the submarine not wanting to be in the way of the crew who had to be alert night and day to avoid being torpedoed under water or being rammed to extinction on the surface by enemy naval craft that were scouring the seas for German submarines." [Unto Him a Witness : S. A. Ayer. p-263]

জার্মান U-Boat চলল ইংলিশ চ্যানেল ও বে অফ বিসকে উপসাগর হয়ে। তারপর তাদের গতিপথ হলো পশ্চিম আফ্রিকা বরাবর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য

দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে ভারত মহাসাগরের পথে মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ দিকের একটা কেন্দ্রে।

হাসান আশা করেছিলেন দীর্ঘ তিন মাসের এ যাত্রাপথে তিনি একটু বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। নেতাজী সাবমেরিনে উঠেই প্রথমে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন। তারপর তাঁর অস্বস্তি গেল কেটে। তিনি ভারত সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এক নাগাড়ে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। "For the ninety three days the journey lasted, Bose sketched out his plans for India."

শত্রুর জাহাজ, টর্পেডো আক্রমণ, শত্রুর ভাসমান মাইন, আকাশে শত্রুর প্লেন সব উপেক্ষা করে সুভাষকে নিয়ে চলেছে জার্মান সাবমেরিন U-Boat। উত্তাল জলরাশির অপরূপ সৌন্দর্যে নেতাজী ও হাসান বিমোহিত, স্তব্ধ ও বিস্মিত। আবিদ হাসান লাভ করেছেন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। নেতাজীর মনের মধ্যে তখন তোলপাড় করছে কিভাবে নির্বিঘ্নে জাপানে গিয়ে পৌঁছবেন। সাবমেরিনে নেতাজী কর্মব্যস্ত। সময় সময় আবিদ হাসানকে dictation দিয়ে যাচ্ছেন। নেতাজীর কলকাতা থেকে বার্লিনে অন্তর্ধান, বার্লিন থেকে সাবমেরিনে করে জাপানে আগমন সবই যেন রূপকথার মত বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর কাহিনী।

২০শে এপ্রিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পেনাং বন্দর থেকে নেতাজীকে আনবার জন্য মাদাগাস্কারের উদ্দেশে রওনা হলো এক জাপানী সাবমেরিন। ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৩ জাপানের সাবমেরিন 1-29 নির্দিষ্ট জায়গায় এসে উপস্থিত হলো। "On 26th April 1943, the Japanese Submarine 1-29, commanded by Captain Mesao Teroka, arrived in the Mozambique Channel, near that haven of neutral Portuguese territory."—The Lost Hero by Mihir Bose.

মোজাম্বিক জায়গাটা নিরপেক্ষ পর্তুগালের কাছাকাছি। জাপানী সাবমেরিন এখানে পৌঁছবার আগে পেনাং-এর চারদিকে রটে গেল যে জাপানী সাবমেরিন পাহারা দিয়ে নেতাজীকে নিয়ে আসছে জাপানে। সৌভাগ্য এই যে ব্রিটিশের নজরে আসেনি এ সংবাদ। তবে এ পথটা ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কেন না প্রশান্ত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে তখনও জাপানের আধিপত্য রয়েছে।

জাপানী সাবমেরিনখানা নির্দিষ্ট সময়ের ১০ ঘণ্টা আগে পৌঁছেছিল মাদাগাস্কার-এর কাছে। জার্মান সাবমেরিন যখন সেখানে এসে উপস্থিত হলো তখন ঘন অন্ধকার। নেতাজীকে জাপানী সাবমেরিনে তোলা সম্ভব হলো না। ঘন অন্ধকার ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দুটো সাবমেরিনের নাবিকদের কথা বলারও সুযোগ ছিল না।

২৭শে এপ্রিল। প্রত্যুষে সূর্যের আলোর ছটায় দুটো সাবমেরিনের লোকদের মধ্যে বার্তাবিনিময়ের সুযোগ হলো। কিন্তু সমুদ্র ছিল উত্তাল। তাই দুটো

সাবমেরিনের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। উত্তাল সমুদ্র শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। কিছুতেই সমুদ্র শান্ত হচ্ছে না দেখে ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে দু'জন জার্মান জলে ঝাঁপ দিলেন নিজেদের প্রাণের মায়াকে উপেক্ষা করে। চেষ্টা করলেন সাঁতার কেটে এগিয়ে এসে জাপানী সাবমেরিনে উঠে কোনরকমে দড়ি বেঁধে দুটো সাবমেরিনকে কাছাকাছি করার। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর দুটো সাবমেরিনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা সম্ভব হলো। কিন্তু আসল কাজ হলো না।

উত্তাল সমুদ্রের ঝড়ের ঝাপটায় নেতাজীকে জাপানী সাবমেরিনে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ২৮শে এপ্রিল। তখনো আবহাওয়া ভয়ঙ্কর। জার্মান ও জাপানের অফিসাররা মিলে একটা রাবারের ভেলা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল জার্মান সাবমেরিনের কাছে। নেতাজী ও আবিদ হাসানকে ভেলাতে তোলা হলো। কিন্তু দেখা দিল আর এক বিপদ। ভেলা দেখে ছুটে এলো হাঙ্গরের দল। একদিকে ঝড়ের ঝাপটা আর একদিকে হাঙ্গরের লেজের ঝাপটায় নেতাজী ও আবিদ হাসানের জামা কাপড় ভিজে গেল। অতি কষ্টে দড়ি ধরে টেনে রাবারের ভেলাটিকে জাপানী সাবমেরিনের কাছে নিয়ে আসা হলো। নেতাজী ও আবিদ হাসান উঠলেন জাপানী সাবমেরিনে।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। তার মধ্যে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল এই অভাবনীয় অভিযান সফল হবে! তাই সুদূর বার্লিন থেকে নেতাজীর এই দুঃসাহসিক অভিযান সৃষ্টি করেছে এক অভাবনীয় ইতিহাস!

কলকাতা থেকে কাবুল যাত্রার সময় নেতাজীর ছদ্মনাম ছিল 'মৌলবী জিয়াউদ্দিন', কাবুল থেকে বার্লিন পর্যন্ত 'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাসোট্টা' আর জাপানী সাবমেরিনে তাঁর নাম হলো 'কম্যাণ্ডার মাৎসুদা'। অবশ্য জাপানীদের কাছে তিনি বরাবরই ছিলেন চন্দ্র বোস। আর আমাদের কাছে তিনি এক ও অদ্বিতীয় নেতাজী।

এরপর নেতাজী ও আবিদ হাসান সাবমেরিনে করে এলেন সুমাত্রায়। ১৬ই মে বিমানযোগে এলেন টোকিওতে। তখন জাপানের অবস্থাও শোচনীয়। আমেরিকার সঙ্গে জলযুদ্ধে জাপান আর সামাল দিতে পারছে না। বিধ্বস্ত জাপান। বিধ্বস্ত জার্মানী ও ইতালী। জাপানে তখন চলছে খাদ্যাভাব, প্রচণ্ড রকমের আর্থিক সঙ্কট।

তোজোর অনেক সমস্যা। এমন এক দুঃসময়ে নেতাজী এসেছেন জাপানে। তবুও নেতাজীর আতিথেয়তায় ত্রুটি হলো না। টোকিওর ইম্পিরিয়েল হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। জাপানের যুদ্ধবিশারদগণ নেতাজীর সঙ্গে দেখা করলেন, দেখা করলেন বিদেশমন্ত্রী ও নৌ-মন্ত্রী। কিন্তু তোজো তিন সপ্তাহের মধ্যে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না।

পরে নেতাজীর সঙ্গে তোজোর দেখা হলো। সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন নেতাজী ১৯শে জুন। ২৭শে জুন নেতাজী রওনা হলেন সিঙ্গাপুরের পথে। ২রা জুলাই এলেন সিঙ্গাপুরে। এখানকার ভারতীয়রা নেতাজীকে গভীর শ্রদ্ধা জানাল।

নেতাজীর প্রাচ্যে আগমনে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন তিনি হলেন বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক রাসবিহারী বোস। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নেতাজীকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে টোকিও গিয়েছিলেন।

জাপানে আসার পর হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেল। নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ভারত আক্রমণের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তিনি নিয়ে নিলেন রাসবিহারীর কাছ থেকে। আজন্ম বিপ্লবী রাসবিহারী ভারত থেকে জাপানে চলে গিয়েছিলেন। সেই ১৯১৫ সালের কথা। কত ত্যাগ, কত কষ্ট, কত পরিশ্রম তিনি করেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য তার স্বীকৃতি কে দেবে এখন? বিয়ে করেছিলেন জাপানী মেয়ে তোসিকা-কে, কিন্তু বিয়ের ৮ বছরের মধ্যেই তোসিকা চলে গেলেন সব মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে দুটো শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে। রাসবিহারী প্রবাসে ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যেই কাটিয়েছেন। তোসিকার মৃত্যুর কয়েকবছর পর তাঁর বড় ছেলেও মারা যায়।

নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার মধ্যে। গঠন করলেন আই. এন এ., গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ। হয়ত নেতাজীর জন্যই তিনি সব তৈরি করে রেখেছিলেন জাপানে। নেতাজীর নেতৃত্বে এ সমস্ত সংস্থার যোদ্ধাদের দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে যাতে উৎখাত করা যায়। সত্যিই তাই হলো। 'ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস প্রসঙ্গে মিঃ মাইকেল এডোয়ার্ড মন্তব্য করেছেন যে, 'লালকেল্লার প্রাকারে সুভাষচন্দ্র-এর ছায়ামূর্তি কল্পনা না করলে ব্রিটেন ভারত-এর স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি দিতেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন-এর নেতাদের মনে যখন আপোষমূলক মনোভাব দানা বাঁধছিল তখন সুভাষচন্দ্র-এর মত এক মহান নেতা সাহসের সঙ্গে এক ভিন্ন ও সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেই ভারতের স্বাধীনতা এত ত্বরান্বিত হয়েছিল।'

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী রাসবিহারী টোকিও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকেই টি. বি. রোগে ভুগছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছে ছিল ভারতের মাটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না।

মৃত্যুর আগে জাপ-সম্রাট হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দি সেকেণ্ড অর্ডার অফ দি মেরিট' পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন। তাঁর শবাধার বহন করেছিল জাপানের রাজশকট। 'একমাত্র রাসবিহারী ছাড়া এরকম সম্মান প্রদর্শনের আর দ্বিতীয় কোন নজির নেই জাপানের ইতিহাসে।'

নেতাজী রাসবিহারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পতাকা অর্ধনমিত করার আদেশ দিলেন মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে। বার্মার বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকিনহু রাসবিহারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী যদি গ্যারিবল্ডির সমকক্ষ

হন, তবে রাসবিহারীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ম্যাটসিনির'। তবে নেতাজীর মধ্যে শুধু গ্যারিবল্ডির সাহসই ছিল না, তাঁর মধ্যে ম্যাটসিনির প্রজ্ঞাও ছিল। গ্যারিবল্ডির ছিল Lion's heart and ox's brain. নেতাজীকে কি কেউ তা ভাবতে পারে? নেতাজীর মধ্যে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির বিবিধগুণের সমন্বয় ঘটেছিল একই সঙ্গে। রাসবিহারীকে অবশ্য নিঃসন্দেহ ম্যাটসিনির সমকক্ষ বলা যায়। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজ রাসবিহারীর স্থান খুবই নগণ্য। দেশের কয়জন ছেলে-মেয়ে জানে রাসবিহারীর এই নিরলস সংগ্রামের কাহিনী!

নেতাজীর কর্মপদ্ধতি, তাঁর দর্শন, বিদেশী শক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতির জন্য সমালোচিতও হয়েছেন বিভিন্নভাবে। নেতাজীর কর্মময় জীবন ছিল দুর্গম। বিপদসঙ্কুল পথে এগোবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর মাথায় যৌবনকাল থেকেই।

তিনি মনে করতেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। নেপোলিয়নের ন্যায় তিনিও মনে করতেন 'শত্রুর শত্রুই আমার মিত্র'। তাই তিনি অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন হিটলার, মুসোলিনী ও তোজোর সঙ্গে। নেতাজী ছিলেন বিদগ্ধজন। বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্বের ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে। জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, ডি. ভ্যালেরা, দ্য গ্যল, লেনিন, মাও-সে-তুং প্রমুখ বীর যোদ্ধা ও সংগ্রামী নেতাদের পথ অনুসরণ করেছিলেন তিনি। এ সমস্ত নেতা স্বদেশের স্বার্থে বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। তাতে তাঁরা সুফলও পেয়েছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। নেতাজীও তাই করলেন। এতে যারা একসময়ে নেতাজীকে বিশ্বাসঘাতক বা কুইসলিং আখ্যা দিয়েছিলেন তারা আজ তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের কণ্ঠে আজ নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে।

বীরত্বের দিক থেকে নেতাজী ও হিটলার ছিলেন অনবদ্য। নেতাজী ছিলেন ভারতীয়। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী ছিল তাঁর প্রাণের সম্পদ। আর হিটলার ছিলেন জার্মানীতে ভিনদেশী। তিনি জাতিতে ছিলেন অস্ট্রীয়ান। অথচ জার্মানী ছিল তাঁর প্রাণের সম্পদ। পঙ্গু ও হৃতসর্বস্ব জার্মানীকে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। মিত্রশক্তির জার্মানীর প্রতি (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর) ঘৃণিত আচরণের যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি বিভ্রাটের জন্য তাঁর পরাজয় ঘটল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবর্তিত হয়েছিল হিটলারকে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধের হোতাও তিনি। এই যুদ্ধ একদিকে যেমন ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত, অন্যদিকে হিটলারের এই যুদ্ধ বহু দেশকে তাদের বন্ধন মুক্তির সুযোগ করে দিয়েছিল। বলা যায় হিটলারের এই যুদ্ধই পরোক্ষভাবে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার বহু-দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল ব্রিটিশ শক্তিকে পঙ্গু করে। হিটলারের যুদ্ধই

নেতাজীকে সুযোগ এনে দিয়েছিল বাইরে গিয়ে অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের উপর কঠোর আঘাত হানার।

হিটলারের হাতিয়ার ছিল জার্মানীর যুবসম্প্রদায়, নেতাজীরও গভীর বিশ্বাস ছিল ভারতের যুবসম্প্রদায়ের ওপর। মনের দিক থেকে দু'জনে ছিলেন অসীম সাহসী। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে দু'জনই ছিলেন দুর্বল, দু'জনের অসামান্য মনোবল দু'জনকে বিশ্বের অন্যতম জননায়কের পদে অধিষ্ঠিত করেছে। নেতাজী জার্মানীতে গিয়ে নাৎসী-বাহিনীর শৃঙ্খলাবোধ ও দেশের সার্বিক উন্নতিবিধানে তাদের প্রচেষ্টা এবং হিটলারের প্রতি দেশের জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই ১৯৩৫ সালের কথা। ভিয়েনায় তখন নেতাজী চিকিৎসারত। কিন্তু তাঁর ধ্যানজ্ঞান ভারতের স্বাধীনতা। সেই সময় ভিয়েনাতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সুপণ্ডিত ইহুদী অটো জারেকের (Otto Zarek)। নেতাজীর সঙ্গে জারেকের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়।

আগেও উল্লেখিত হয়েছে যে, নেতাজী একদিন জারেককে কিছু না বলে বার্লিনের পথে রওনা হন। ফিরে এলে অটো জারেক জিজ্ঞেস করলেন উনি কোথায় গিয়েছিলেন। নেতাজী উত্তরে বললেন হিটলারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। অটো জারেক বললেন, খবরের মতো খবর বটে। ভেবেছিলাম, ভারতের যুবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানী ও নাৎসীদের সম্বন্ধে তিনি খুব খারাপ কিছু বলবেন কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল। জার্মান রাইখের সবকিছুই যেন তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। হিটলার যে জার্মানীর পুনরুত্থানের জন্য কিভাবে কাজ করে চলেছেন, তাই ছিল তাঁর কাছে বড় বিস্ময়। হয়ত তাই নেতাজী বলতেন, "Our political philosophy should be a synthesis between National Socialism and Communism. The conflict between thesis and antithesis has to be resolved in a higher synthesis."

নেতাজী হিটলারের সময়কার জার্মানদের শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-দলের শৃঙ্খলাবোধের তুলনা করেছেন। নেতাজী বলেছেন যে, রাজনীতির মঞ্চ থেকে ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অন্তর্ধান ছিল ভারতবাসীর পক্ষে এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল অন্তর্দলীয় কলহে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অথচ দেশবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ দল ছিল একটি গর্ব করার মতন প্রতিষ্ঠান। নেতাজী বলেছেন "ব্রিটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় মুখপত্র কলকাতার ক্যাপিটাল পত্রিকা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর লিখতে গিয়ে স্বরাজ্য দলকে আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন ফিন দলের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং বলেছিল যে, পত্রিকার চল্লিশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে এই দলের মতন আর কিছু দেখা যায় নি। পত্রিকাটির মতে দলের শৃঙ্খলার ধরন ছিল জার্মানদের মত।"

নেতাজীর মতে স্বরাজ্য দল দুর্বল হওয়ায় ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ ও ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বন্যা ছুটল। তাই নেতাজী বলেছেন দেশবন্ধু আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবত অন্যরকম

হতো। "জাতীয় ইতিহাসে কখনও কখনও দেখা যায় যে কোন বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব কিংবা মৃত্যুর দ্বারা প্রায়শই ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পৃথিবীর সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে রাশিয়ায় লেনিন, ইতালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের এইরকম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।"—নেতাজীর সমগ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ-৬৫।

জার্মানদের পুনরুত্থানের জন্য হিটলারের কর্মপ্রচেষ্টাকে নেতাজী যে প্রশংসা করেছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে প্রমাণ মিলে।

অনেকেই মনে করেন নেতাজী হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। নেতাজীর নিজের বক্তব্যই এর যথার্থ উত্তর বলে ধরা যায়। "If by Fascist is indicated those who call themselves Hitlers, Super Hitlers or budding Hitlers, than one may say that these specimens of humanity are to be found in the Rightist Camp." (19-8-39).

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজীকে জার্মানীর হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে ফ্যাসিস্ত বলে ঘোষণা করার জন্য এক পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। পরিকল্পনামতে নেতাজীকে ফ্যাসিস্ত ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল স্তালিনকে। কিন্তু স্তালিন সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্তব্য করেন নেতাজীকে কোন যুক্তিতেই ফ্যাসিস্ত বলা যায় না। তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জার্মানীর সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাহায্যও কিন্তু স্তালিন নেতাজীর অনুরোধে সাড়া দিতে পারেননি তখন রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল বলে।

ভিনদেশী হিটলার অসীম সাহসে ভর করে, অনেক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সঙ্গীহীন অবস্থায় মিউনিক থেকে জার্মানীর বার্লিন শহরে চলে যান। সদস্য হয়েছিলেন সাতজনের (হিটলারকে নিয়ে) একটা ছোট রাজনৈতিক সংস্থার। সেখান থেকে একক প্রচেষ্টায় তিনি জার্মানীর মতো এক সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত দেশের অবিসংবাদিত নেতার আসনে বসেছিলেন। সমস্ত ঝুঁকি একাই মাথায় নিয়েছিলেন।

নেতাজীও সঙ্গীহীন অবস্থায় দেশের স্বার্থে দুর্গম পথ অতিক্রম করে জার্মানীর বার্লিন শহরে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে সাবমেরিনে করে গেলেন জাপানে। ভারত থেকে বার্লিন এবং বার্লিন থেকে তাঁর জাপানে যাবার দুঃসাহসিক কাহিনী মানুষের মনে এখনো শিহরণ জাগায়। তাঁরই পরিচালনায় আজাদী সৈন্যদের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর 'লাস্ট ইয়ারস অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, "Bose, the only one with a clear cut view of the world, was far away in Europe nurturing his plans to liberate India from outside." আর জার্মানীতে নেতাজীর অন্যতম সঙ্গী গিরিজাকুমার বলেছেন যে, "Subhas's one great desire in life was to face all

consequences of his action as far as possible without involving others."

নেতাজী ও হিটলার দু'জনই ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। এই বাগ্মীতাগুণে তাঁরা দু'জনেই সাধারণ মানুষের খুবই কাছে যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের বক্তৃতা ও স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত মানুষের মনে স্বদেশিকতার বীজ বপন করেছিল।

নেতাজী ছিলেন প্রথাগত, রাজনৈতিক ও বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত। আই. সি এস. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন আর উক্ত পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি হয়েছিলেন প্রথম। আই. সি. এস. পরীক্ষায় এরকম কৃতিত্ব তাঁর অসামান্য মেধার পরিচয় বহন করে। আই সি. এস -এর চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একনিষ্ঠ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অসাধারণ বাগ্মীতাগুণে বিদেশের মাটিতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ডঃ গিরিজা মুখার্জীর 'দিস ইউরোপ' গ্রন্থের ভাষায় বলা যায়—"I saw how the whole audience was coming under his spell and how they were listening......when he had finished they had acquired new life, new animation, new excitement."

আর হিটলারের বাগ্মীতার পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি। এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে লাজি ল' সোসাইটির (বার্লিনে অনুষ্ঠিত) এক সভায় হিটলারের দু ঘণ্টা ধরে এক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা শুনে টয়েনবি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। টয়েনবি মন্তব্য করেছেন তিনি এরকম সুন্দর বক্তৃতা বিশ্বের কোন বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছেও শুনেননি। টয়েনবির ভাষায় বলা যায়—"I cannot think of any academic lecturer to whom I have ever listened who could have spoken so continuously for that length of time without ever loosing the thread of his argument." হিটলার যে কত উঁচুদরের বাগ্মী ছিলেন এবং তাঁর কি অসাধারণ পড়াশুনা ছিল টয়েনবির মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। টয়েনবির মত একজন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকের হিটলার সম্পর্কে এরকম মন্তব্য সত্যি প্রণিধানযোগ্য।

হিটলার নেতাজীকে জার্মানীতে স্থান না দিলে নেতাজীর পক্ষে বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইত্যাদি গঠন করা সম্ভব হতো কি? নেতাজীর উদগ্র বাসনা ছিল রাশিয়াতে যাবার। স্তালিন যদি নেতাজীকে রাশিয়ায় স্থান দিতেন তাহলে নেতাজী কি রাশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে পারতেন বা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন? সেখানে তো আজন্ম-বিপ্লবী রাসবিহারী বোস তাঁর জন্য 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়ে দিতে পারতেন না। আর হিটলার যে রাশিয়া আক্রমণ করবেন তাতো ছিল

নিশ্চিত। বিশ্বের কেউ না জানলেও হিটলারত স্বয়ং তা স্থির করে রেখেছিলেন। নেতাজী রাশিয়াতে থাকলেও হিটলার তো তাঁর রাশিয়া আক্রমণ স্থগিত রাখতেন না। নেতাজী এপ্রিল মাসে বার্লিনে গিয়ে পৌছালেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন ২২শে জুন। রাশিয়া আক্রমণ করার কথা ছিল মে মাসে। নানান কারণে হয়ে উঠেনি। নেতাজী তখন ছিলেন রোমে।

নেতাজী সে সময় যদি রাশিয়াতে থাকতেন তাহলে মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তিবর্গের বিশেষত ইংলণ্ডের চাপে রাশিয়ার তো নেতাজীকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। নেতাজীকে হয়ত রাশিয়া তখন বন্দী করে কারাগারেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। জার্মানী থেকে সাবমেরিনে করে জাপানে যাবার সুযোগ তো তাঁর হতো না। আর দক্ষিণ-পূব এশিয়ার অবিসংবাদিত নেতৃত্বপদও লাভ করতে পারতেন না। রাসবিহারী তাঁর অসুস্থ শরীরে যোগ্য উত্তরাধিকারীর সন্ধানও পেতেন না। নেতাজী বিশ্ব তথা ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন বিশেষত তাঁর 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' নিয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারত উদ্ধারের অসীম সাহসী কার্যকলাপের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার গতিপ্রকৃতি থেকে এটা অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে নেতাজী রাশিয়ায় গেলে বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম সমুজ্জল হয়ে থাকত না। তাঁর হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

কাবুলে যখন নেতাজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছেন রাশিয়া ইতালী ও জার্মানীর রাষ্ট্রদূতদের দ্বারে দ্বারে, তখন হিটলারই জার্মানীতে স্থান দিয়ে নেতাজীকে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ জায়গা করে নেবার সুযোগ করে দিলেন। আর নেতাজীর মূল পরিকল্পনাসমূহ জার্মানীর মাটিতে বসেই রচনা করলেন। 'নেতাজী' নামও গ্রহণ করলেন জার্মানীতে বসে। যদি বলা যায় হিটলারই সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজীর' আসনে বসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তা হলে কি কিছু অন্যায় হবে? আর নেতাজীকে নিয়ে হিটলারের নিজের তো কোন কার্যসিদ্ধি হয়নি। যুদ্ধ পরিস্থিতি যতই খারাপের দিকে যাচ্ছিল ততই নেতাজীর জন্য জাপান উদ্গ্রীব হয়ে উঠছিল। কেননা জাপানের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের মোকাবিলা করানো। তাই বলতে দ্বিধা নেই যে নেতাজী বিরুদ্ধমতালম্বী হলেও কাবুলে নেতাজীকে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার করে বার্লিনে নিয়ে আসার পুরো কৃতিত্ব হিটলারের। কারণ হিটলারের অমতে নেতাজীর বার্লিনে আগমন অসম্ভব ছিল।

নেতাজী ও হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন দুই বিপরীতমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। হিটলার ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের সন্তান। আর্থিক অনটন তাঁকে পদে পদে দলিত করেছে। অন্যদিকে নেতাজী ছিলেন এক বিরাট ধনীর সন্তান। শিক্ষা-দীক্ষায় ও রুচিতে হিটলার অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ। তবু ভারতের সার্বিক কল্যাণের জন্য তিনি দুর্গম পথে একাকীই কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন।

হিটলারের জীবনে নারীর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বহু নারীর সান্নিধ্যে তিনি

এসেছিলেন। তবে একমাত্র ইভা ব্রাউন ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালোবাসতে পারেননি। জীবনের শেষ দিকে ইভাই ছিলেন তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গিনী। দ্বিতীয় বিশ্বস্ত প্রাণী ছিল তাঁর কুকুর ব্লণ্ডী। বহু সুখ দুঃখের সঙ্গী। আত্মহত্যা করার পূর্বে ইভাকে বিয়ে করে তিনি বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে বৈধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা আগেই দেওয়া আছে।

হিটলারের শেষ পরিণতি দেখে ইভা পাগলিনীপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন। হিটলারের বান্ধবী হিসেবে জীবন কেটেছে নিভৃতে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ১২টি বছর এভাবে তিনি কাটিয়ে গেছেন। কাউকেও তিনি এর জন্য দায়ী করেননি। হিটলারের বহু অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন তবুও হিটলারের মধ্যেই তিনি তাঁর শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। হিটলারকেই তিনি তাঁর দেহ মন উজাড় করে দিয়েছিলেন। এখানেই ছিল ইভার মহত্ত্ব। হিটলারের অন্তিম সময়ে ইভা যাঁকে কাছে পেতেন তাঁকেই ডেকে বলতেন "হায় বেচারা, বেচারা অ্যাডলফ সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরে মরুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু জার্মানী যেন অ্যাডলফকে না হারায়।" এই সমস্ত কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

অনেক লেখক মন্তব্য করেছেন যে হিটলার তাঁর যৌবনে ১৯/২০ বছর বয়সে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি ভিয়েনায় অতিকষ্টে দিনযাপন করেছেন। বাবা-মা দু'জনেই গত হয়েছেন। এই ভিয়েনাতে সেই সময় হান্না (Hannah) নাম্নী এক ইহুদী পতিতার সান্নিধ্যে আসেন এবং মারাত্মক সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের শেষদিকে তাঁর যে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা প্রকট হয়ে উঠেছিল অনেক ডাক্তারের মতে এর কারণ তাঁর প্রথম জীবনের সিফিলিস রোগ। Allan Wykes তাঁর হিটলার গ্রন্থে বলেছেন যে, "Hitler left Vienna in the spring of 1913. He had by then developed gastric troubles that doubtless were early manifestation of his untreated syphilis." Allan Wykes-এর মতে ইহুদী মহিলা হান্নার (Hannah) সান্নিধ্যে আসার ফলে তাঁর শরীরে সিফিলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইহুদী বিদ্বেষের এটাও অন্যতম কারণ। Allan Wykes-এর ভাষায় বলা যায় "It would be stretching a point to draw the conclusion that Hitler's anti-semitism was solely the outcome of the bitterness he felt toward Hannah the Jewish Whore for infecting him".

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মেইন ক্যাম্ফের ১৫ পাতা শুধু যুদ্ধপূর্ব জার্মানীতে সিফিলিস রোগের প্রাদুর্ভাব এবং জার্মানদের এ সমস্ত রোগ থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন গণিকাবৃত্তি সম্পর্কেও। গণিকাবৃত্তির সমাজ জীবনের ওপর ভয়াবহ প্রভাব সম্বন্ধে তিনি জার্মান যুব সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "To wage war against syphilis

means fighting against prostitution, against prejudice......against false prudery in certain circles."

হিটলার সিফিলিস রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম চালাবার জন্য যুব সমাজকে বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। গণিকাবৃত্তি যে সিফিলিস রোগ সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ তা উল্লেখ করে তিনি কঠোর নির্মমপথেই এ সমস্যার মোকাবিলা করার কথা বলেছেন। এ সমস্ত রোগ ও তার জীবাণু বাহিকা গণিকাদের সম্পর্কে রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পোষ্টার, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে জোর প্রচার চালাবার ওপর জোর দিয়েছেন যাতে সমগ্র জাতির দৃষ্টি এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে নিবদ্ধ হতে পারে এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই সমস্ত বিপদের হাত থেকে যাতে জার্মানীকে মুক্ত করা যায়। প্রয়োজনবোধে তিনি আইনের আশ্রয় নেবার কথাও বলেছেন।

হিটলার এ সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির হাত থেকে জার্মান যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য তাদের অল্পবয়সে বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন অল্পবয়সে বিয়ে দিলে যুবসম্প্রদায় বিপথগামী হবে না বরঞ্চ তারা জার্মানীতে সুস্থ-সুন্দর সন্তান-সন্ততি আগমনের সুযোগ পাবে। তাঁর ধারণা ইহুদীরা সিফিলিস রোগের উৎস। তাই তিনি ইহুদীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হতে জার্মানদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন যে ইহুদীরা হচ্ছে "The Great Master of Lies." হিটলার একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

সিফিলিস রোগ সম্পর্কে মেইন ক্যাম্ফে হিটলারের বিস্তারিত আলোচনা থেকে অনেকেই অনুমান করেন হিটলার নিশ্চিত এই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নচেৎ তিনি এ রোগ সম্পর্কে এতখানি আগ্রহী হতেন না। হিটলার সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন কিনা তার সঠিক উত্তর দেওয়া কষ্টকর বলে মনে হয়। যদিও তাঁর শরীর ও মনে যে সমস্ত রোগের লক্ষণ পরবর্তী জীবনে ফুটে উঠেছিল তাতে অনেক ডাক্তারেরও অভিমত হচ্ছে এগুলো তাঁর যৌবন বয়সের সিফিলিস রোগের পরিণতি।

তবে হিটলার সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হলেও সুচিকিৎসায় তিনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে তিনি এত বড় একজন রাজনীতিবিদ হতে পারতেন না। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মানুষকে পরিচালনা করার অদ্ভুত ক্ষমতা, কঠোর পরিশ্রম করার মতো শারীরিক শক্তি, অদম্য মনোবল ইত্যাদি শারীরিক দিক থেকে এরকম রোগে আক্রান্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। তিনি ইভাকে নিয়ে ১২ বছর একসঙ্গে ছিলেন। সিফিলিস রোগের স্বীকার হলে ইভা কি তাঁর সঙ্গে এত বছর থাকতে পারতেন ?

নেতাজীর জীবনেও নারী আসেনি বলা যাবে না। নারী আসাই তো স্বাভাবিক। এরকম ব্যক্তিত্ব, দেবোপম চেহারা, এরকম একজন রাজনীতিবিদ যে কোন রূপসীর যে কামনা বাসনার বস্তু হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে তাঁর দেবোপম চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য তাঁকে নারীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। একমাত্র এমিলি শেঙ্কলকেই তিনি দূরে ঠেলে দিতে পারেননি। এমিলির অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেতাজীকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪১ সালে বার্লিনে গেলে এমিলি ভিয়েনা থেকে বার্লিনে চলে আসেন। তখন নেতাজী তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বৈধ-স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

নেতাজী বার্লিনে থাকাকালীন অন্য যে বিদেশিনী মহিলা কুহকিনীরূপে তাঁর হৃদয়ে স্থান লাভের জন্য এসেছিলেন তিনি হলেন মিস হেলেন ওয়াগনার। এক রহস্যময়ী নারী। ফুটফুটে চেহারা। যৌবনরসে ভরপুর। এর মধ্যেই অনেক জার্মান যুবকের হৃদয় মনে দাগ কেটেছেন তিনি।

বার্লিনে নেতাজী তখন থাকতেন 'সোফিয়ান স্ট্রাসের' বাড়িতে। নেতাজী একদিন বাগানে পায়চারি করছেন। বাড়ির চাকর-বাকর সব গেছে সিনেমায়। হঠাৎ বাগানে এক গাছের আড়াল থেকে এক অস্পষ্ট নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি। যেন তাঁকে বলছে তিনি নেতাজীর সাক্ষাত প্রার্থিনী। নেতাজী দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন নারীটির দিকে।

নেতাজীকে নানান ছলনায় ভোলাতে চেষ্টা করলেন ছলনাময়ী নারী। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা বললেন। তিনি ভারত ও ভারতবাসীর পরম হিতৈষিণী হিসেবে নেতাজীর বন্ধুত্ব কামনা করেন। এ সমস্ত কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ মাটিতে লুঠিয়ে পড়েন। যেন তার জ্ঞানহীন দেহ কোন আঘাতে হঠাৎ ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে! নেতাজী তাঁকে হাত ধরে তুললেন। চোখেমুখে জল দিলেন। ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। নেতাজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডাক্তার আনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরুতে যাবেন এমন সময় মহিলা চোখ মেললেন। নেতাজীকে সোহাগের ডোরে বাঁধতে চাইলেন। নেতাজীর সম্বিত ফিরে এলো। ছলনাময়ী নারীর এই অভিনয় নেতাজী এতটুকুই বুঝতে পারেননি প্রথমে।

কঠোর ও গম্ভীর কণ্ঠে তিনি মহিলাকে তাঁর ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। সাবধান করে দিলেন ভবিষ্যতে যেন তিনি নেতাজীর কাছে না আসেন। ছলে বলে কৌশলে মিস ওয়াগনার অনেক যুবাপুরুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। ভেবেছিল নেতাজীও তাঁর ফাঁদে পা দেবেন। পারলেন না। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নেতাজীর ঘর ছেড়ে পালালেন। বেঁচে গেলেন প্রাণে। এখানেই রয়েছে হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর তফাৎ। হিটলার রূপসী নারীকে জোর করে কাছে টেনেছেন। তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য গেলী, রেনেট মুলার প্রমুখ রূপসীরা করেছে আত্মহত্যা। তবে ইভা ব্রাউন তাঁকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কোন পঙ্কিলতা ছিল না। এদিক থেকে ইভা ব্রাউনকে নেতাজীর সহধর্মিণী এমিলি শেঙ্কেলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইভা ব্রাউনই ছিলেন হিটলারের সঙ্গে তাঁর অন্তিম পরিণতি পর্যন্ত। সহধর্মিণীর পবিত্র মর্যাদা যখন তাঁর কপালে জুটল তখনই হিটলারের সঙ্গে আত্মহনন করে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন।

আর হতভাগিনী এমিলি এখনো জীবিতা! ভিয়েনায় আছেন। বয়স তাঁর এখন আশির কোঠায়। নেতাজীর চিন্তাতেই মগ্ন। নেতাজীর স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁর দিন কাটছে। একাকীত্বই তাঁর বর্তমান জীবনের সঙ্গী। প্রথমে তিনি ভিয়েনার Faltis Company-তে কাজ করতেন তাঁর পরে পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের ভিয়েনা অফিসে কাজ নেন। বর্তমানে তাঁর অবসর জীবন। কন্যা অনীতা বিবাহিতা, থাকেন বার্লিনে। অনীতা ও তাঁর স্বামী দু'জনই অধ্যাপনার কাজ করেন। সময় সময় তাঁরা আসেন ভিয়েনাতে। মায়ের কাছে। নাতি নাতনীর মুখ দেখে এমিলি কিছুদিন আনন্দেই কাটান। তারপর আবার একা। 'ভিয়েনার নির্জন বিশাল অ্যাপার্টমেণ্টের একদিকে নিঃসঙ্গ এমিলি অন্যদিকে পাহাড়প্রমাণ সময়। মধ্যিখানে নেতাজীর স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ, অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন আর এমিলিকে লেখা সুভাষের প্রায় একশোখানি ব্যক্তিগত চিঠির গুচ্ছ।'

সুভাষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দেশনায়ক, যিনি দেশের দুঃখকে আপন দুঃখ বলে মনে করতেন। সেই সুভাষের সহধর্মিনী আজ দুঃখিনী, উপেক্ষিতা সকলের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিতা।

ইভা যেমন হিটলারের অন্তিম পরিণতিতে পাগলিনীপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, সুভাষের শেষ পরিণতি এমিলিকেও মর্মান্তিক আঘাত করল। শেখর বসুর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর কল্পিত মৃত্যু সংবাদ এমিলি জানতে পারেন এক সন্ধেবেলায়। এমিলি বলেছেন, 'সন্ধেবেলা কিচেনে বসে একটা উলের গোছা জড়িয়ে জড়িয়ে বল বানাচ্ছিলাম। কিচেনের এক পাশে রোজকার মতো রেডিওয় সান্ধ্যখবর বলে চলেছে। ঘরের অন্য কোণে মা আর আমার বোন কী যেন করছে। হঠাৎ শুনি রেডিওতে বলছে—"ইণ্ডিয়ান কুইসলিঙ সুভাষচন্দ্র বোস তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।" মা আর আমার বোন আমার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। 'আমি আস্তে আস্তে কিচেন থেকে বেরিয়ে পাশে শোবার ঘরে উঠে গেলাম। সেখানে অনীতা, তখন নিতান্ত শিশু, অঘোরে ঘুমিয়ে আছে, ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম—অ্যাণ্ড আই ওয়েপট, আমি কাঁদলাম'। সত্যি তখন এমিলির কান্না ছাড়া এখন আর কি আছে?

ইভা ছিলেন এক বিশাল দুর্দান্ত ঐতিহাসিক পুরুষের প্রেমিকা বা সহধর্মিনী। হিটলারের নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িয়ে আছে স্বামীর সঙ্গে আত্মত্যাগের এক জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে না। যতদিন হিটলার ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত থাকবেন ততদিন ইভাও থাকবেন ইতিহাসের পাতায়। আর এমিলি তো এক বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের প্রেমিকা বা সহধর্মিনী শুধু নন তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের এক বিশেষ সময়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ও প্রেরণাদাত্রী। নিজের হৃদয়ের উদারতা, নেতাজীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁকে বিশ্বইতিহাসে অমর করে রাখবে। নেতাজী জীবনের মাত্র দু'বছর এমিলিকে তাঁর সহধর্মিনী হিসেবে পেয়েছিলেন। এমিলি জানতেন নেতাজীকে বিয়ে

করে তিনি সুখের ঘর বাঁধতে পারবেন না। তবুও তিনি অন্য পুরুষে অনুরক্তা হননি। নিঃস্বার্থভাবে নেতাজীর জীবনে তিনি এসেছিলেন, নেতাজীর অবর্তমানে এখনো নিঃস্বার্থভাবেই নেতাজীর স্মৃতি রোমন্থন করে নীরবে দিন কাটাচ্ছেন। নেতাজীর বিশাল কর্মময় ঐতিহাসিক জীবন থেকে তিনি হারিয়ে যাবেন এটা কল্পনা করা যায় না। ইভা ও এমিলির মুখমণ্ডল ও চাহনীর মধ্যে রয়েছে মাতৃমূর্তির প্রতিচ্ছবি। উভয়ের শান্ত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল যে কোন লোককে স্নেহের টানে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

এমিলি শেঙ্কেল একসময়ে ভি. জি. প্যাটেলের সেক্রেটারী ছিলেন। ভালো স্টেনোগ্রাফার এমিলি। ১৯৩৩-৩৪ সালে নেতাজী যখন তাঁর চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যান প্যাটেলই সেই সময় এমিলিকে নেতাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমিলি ছিলেন ভিয়েনার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাদস্ট্যাসগ্যাডনে চিকিৎসারত নেতাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে এমিলি কাজ করতেন। সেই সময় নেতাজী "The Indian Struggle" বইখানা লেখেন। বইখানা লেখার সময় এমিলি নেতাজীকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। সময় সময় ডিকটেশন নিয়েছেন। সম্পূর্ণ লেখাটা টাইপও করেছেন এমিলি। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের ১৭ জানুয়ারী লণ্ডন থেকে। প্রকাশক ছিলেন লরেন্স ও উইশার্ট সংস্থা। বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অনেক বিদগ্ধজন গভীর মনোযোগ সহকারে বইটি পড়েন। সকলের কাছে বইটি বিপুলভাবে প্রশংসালাভ করে।

বইটি ১৪ বছর ভারতে আসতে পারেনি। নিষেধাজ্ঞা ছিল সরকারের। যেহেতু বইটিতে 'সন্ত্রাসবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধ' এর সমর্থন আছে, সেই জন্যই ঐ নিষেধাজ্ঞা। বইটি পড়ে ১৯৩৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রেঁামা রেঁালা সুভাষকে একখানা চিঠি দেন। তাতে তিনি লেখেন যে,

'......বইটি আমার কাছে এতই আকর্ষণীয় লাগল যে আমি আরও একটি কপি অর্ডার দিয়ে দিলাম যাতে আমার স্ত্রী ও বোন একটি করে কপি পান। ভারত বিপ্লবের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।............আপনার সব ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত না হলেও আমি স্বীকার করছি আপনার যুক্তি আছে এবং অনেক কিছু পুনর্মূল্যায়ন করলে আমরা লাভবান হবো।.........আমি আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করি।'

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড নেতাজী লিখেছিলেন বার্লিনে বসে। এই অংশটিতে আছে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী। শিশির বসু লিখেছেন যে নেতাজীর সহধর্মিনী এমিলির কাছ থেকে এই অংশটির পাণ্ডুলিপি যুদ্ধের পর তিনি হাতে পান।

১৯৩৪ সালে ভিয়েনাতে হোটেলে বসে তিনি বইটির প্রথম খণ্ডের Preface লিখেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, "In conclusion, I have to express my thanks to Fraulein Emily Schenkl, who assisted me in writing

this book and to all those friends who have been of help to me in many ways."

১৯৩৪ সালে এমিলির সঙ্গে যখন সুভাষের প্রথম পরিচয় হয় তখন এমিলি ২৪ বছরের যুবতী। যৌবনরসে ভরপুর। শান্ত স্নিগ্ধ মুখাবয়ব। নেতাজীর বয়স তখন ৩৭। অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনায় চিকিৎসারত। সম্ভবত নেতাজীর সঙ্গে এমিলির শেষ দেখা ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে।

১৯৩৪ সালে এমিলির সঙ্গে নেতাজীর প্রথম পরিচয়ের পর থেকে ১৯৩৬-এর মার্চ পর্যন্ত নেতাজী ভিয়েনাতে কাটান। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ১৯৩৬-র এপ্রিল মাসে জাহাজে করে তিনি ভারতে পাড়ি দেন। বোম্বে বন্দরে এসে পৌছলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। তারপর ১৯৪১-এ গৃহবন্দী হয়ে থাকার সময় ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে বার্লিনে চলে যান। এমিলি ভিয়েনা থেকে ছুটে যান বার্লিনে। নেতাজী ও এমিলি এ সময় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪২-র নভেম্বরে অনীতার জন্ম হয়। অনীতার জন্মের পর সুভাষ বেশ কয়েকবার ভিয়েনায় গেছেন।

হিটলার ও ইভা ১২ বছর একসঙ্গে কাটিয়েছেন প্রেমিকারূপে। আর নেতাজী ও এমিলি বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন মাত্র দু বছর। তার আগে এমিলি ছিলেন নেতাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। নেতাজী তখন তাঁকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করতে পারেননি। এমিলি বলেছেন যে, "মেয়েদের প্রতি নেতাজীর অসম্ভব শ্রদ্ধাবোধ ছিল। অবশ্য একথা সর্বজনবিদিত যে নেতাজী মেয়েদের সম্মান দিতেন, শ্রদ্ধা করতেন। হিটলার মেয়েদের এতখানি সম্মান বা শ্রদ্ধা জানাবার কথা চিন্তাই করেননি। তাদের হিটলার চেয়েছেন তাঁর কামনা বাসনা চরিতার্থ করার উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে।

নেতাজী বলেছেন মেয়েরা হবেন প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ীর মতো। যে ঐতিহ্যের পথ ধরে এসেছেন মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাঈ, বাংলার রানী ভবাণী, রাজেয়া বেগম, নুরজাহান প্রমুখ নারীরা। নেতাজী ভারতের মাটির উর্বরতায় গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তো তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত আবার 'দ্য বেস্ট ফ্লাওয়ার্স অব ওম্যানহুড"-এর জন্ম দেবে।

এমিলি নেতাজীকে 'The Indian Struggle' বইখানা লেখার সময় প্রভূত সাহায্য করেছেন। ইভা কিন্তু হিটলারকে তাঁর 'মেইন ক্যাম্ফ' লেখার সময় এরূপ কোন সাহায্য করতে পারেননি। অবশ্য তখন হিটলারের সঙ্গে ইভার পরিচয় ঘটেনি। তখন একমাত্র ভগ্নী এঞ্জেলা এবং তাঁর মেয়ে গেলীই ছিলেন হিটলারের আপনজন। এঁরা ছাড়া হিটলারের আপনজন বলতে আর কেউ ছিলেন না। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এমিলির মতো ইভা শিক্ষিতা ছিলেন না। সুতরাং ইভার সঙ্গে হিটলারের পরিচিতি থাকলেও ইভা হিটলারকে কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারতেন এই বিশাল বই লেখার ব্যাপারে!

নেতাজীর যেমন "The Indian Struggle" বইখানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা, হিটলারের 'Mein Kampf'ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা। Mein Kampf-এ

হিটলার তৎকালীন জার্মানীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখলেও বইটিতে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহুদীদের সম্পর্কে যে বিদ্বেষভাব পোষণ করেছেন তাতে বইটির গুরুত্ব খর্ব হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নেতাজী প্রথাগত বিদ্যায় অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন : হিটলারের তো তার কণামাত্রও ছিল না। অতএব নেতাজীর পক্ষে যা লেখা সম্ভব স্বল্পশিক্ষিত হিটলারের পক্ষে কি তা সম্ভব ? কিন্তু হিটলারের 'মেইন ক্যাম্ফ' তো তা বলে না। স্বল্পশিক্ষিত হিটলারের লেখা 'মেইন ক্যাম্ফ' হচ্ছে জার্মানবাসীদের সেই সময়ের জীবন বেদ। ভারতে বা ইউরোপে বইটির এখনো যথেষ্ট কদর আছে। বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন একদিনেই নাকি তার চল্লিশ হাজার কপি জার্মানাতে বিক্রী হয়। কিছু সঙ্কীর্ণতা ও ভুলত্রুটি সত্বেও নানান দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে ১৯২৩ পর্যন্ত জার্মানীর ইতিহাসের ধারাবাহিক বর্ণনা এই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বইটিকে হিটলারের জীবনদর্শনও বলা যেতে পারে। যেমন 'The Indian Struggle' বইখানা হচ্ছে নেতাজীর জীবন দর্শন। তবে, যুক্তিতেও তথ্যে বইখানা সমৃদ্ধ। আর মেইন ক্যাম্ফেও হিটলার জার্মানীর অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা করে ক্ষান্ত হয়নি এ সমস্ত নীতির ভালমন্দ দুটো দিক তুলে ধরে সেগুলোর সমাধানের সম্ভাব্য পথও বলে দিয়েছেন। 'মেইন ক্যাম্ফ' সম্পর্কে বলা হয় "Mein Kampf is an historical document which bears the imprints of its own time .....He (Hitler) wrote under the emotional stress caused by the historical happennings of the time."

১৯২৩ সালে তিনি জার্মান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিফল হন। ধরা পড়ে বন্দী অবস্থায় ব্যাভেরিয়ার ল্যাণ্ডসবার্গ দুর্গে কারারুদ্ধ হন। সেই সময় এক বছর তিনি কারাগারে কাটান। কারাগারে বন্দীজীবনের ফসল হচ্ছে তাঁর মেইন ক্যাম্ফের প্রথম খণ্ড। যেমন নেতাজী 'The Indian Struggle' বইখানার প্রথম খণ্ড লিখেছিলেন ভিয়েনায় বসে ১৯৩৪ সালে অসুস্থ ও চিকিৎসারত অবস্থায়। এক বছরের মধ্যে নেতাজীও তাঁর বই লেখা সমাপ্ত করেন। মেইন ক্যাম্ফের দ্বিতীয় খণ্ড হিটলার লেখেন কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর। "...The second volume of Mein Kampf was written after Hitler's release from prison and was published after the French had left the Ruhr..." আর নেতাজী তাঁর 'The Indian Struggle' বইখানার দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন ১৯৪২ সালে বার্লিনে বসে, তখন এমিলি ছিলেন তাঁর সাথী, একান্ত আপনজন মনের মানুষ।

এমিলি ও নেতাজী যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন একথা অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু বর্তমানে যে সমস্ত প্রামাণ্য দলিলপত্র পাওয়া যাচ্ছে

তাতে এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। ১৯৪৮ সালে শরৎ বসুর হাতে এমিলি নেতাজীর যে চিঠিখানা তুলে দিয়েছিলেন তা শেখর বসু তাঁর 'নেতাজীর সহধর্মিনী' বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। চিঠির ফটোকপিটি বইতে ছাপানো আছে। ফটোকপি দেখলে বোঝা যায় যে এটা নেতাজীরই হাতের লেখা। এখানে জালিয়াতির কিছু আছে একথা মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। আর এমিলির কি স্বার্থ আছে যে উনি এরকম একটা ব্যাপারে জালিয়াতি করবেন। বসু পরিবার থেকে বা ভারতবর্ষ থেকে উনি তো কিছু প্রত্যাশা করেননি বা করেন না।

১৯৪৯ সালে শরৎচন্দ্র বসু সুইজারল্যাণ্ডের ভ্যালমর্ ক্লিনিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসারত ছিলেন। সেই সময় তিনি এমিলি ও অনীতার কাছ থেকে দু'খানা চিঠি পান। শরৎ বসু তাঁর উত্তরও দেন। সেই চিঠিখানার ফটোকপি দেখেছি। তাতে শরৎ বসু এমিলিকে 'মিমি' বলে সম্বোধন করেছেন। এমিলির ডাক নাম মিমি। এমিলিকে আর অনীতাকে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য লিখেছিলেন। তার কয়েকমাস পর শরৎ বসু মারা যান।

এমিলির অত্যন্ত দুঃসময়ে জওহরলাল অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নেহেরুকে সম্ভবত জানিয়েছিলেন "I cannot accept this offer because I feel, Subhas would not have liked this" —Sekhar Basu. শেখর বসুর লেখা থেকে আরও জানা যায় যে নেহরু প্রায় দু'লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। অসময়ে এ টাকাটা খুবই প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু বিবেকের কাছে তিনি ছোট হতে চাননি। তাই তিনি সেই টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন।

তাই বলি এমিলি কি স্বার্থে নেতাজীকে তাঁর সহধর্মিনী হিসেবে মিথ্যে পরিচয় দিতে যাবেন? এবার টি. ভি.-র পর্দায় এমিলি ও অনীতাকে বেশ ভালোভাবেই দেখিয়েছে। আমার ধারণা এরপর কোন মানুষের এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে এমিলি ও অনীতাকে ছোট করবেন না। এতে আমাদের দেশের গৌরব বৃদ্ধি হবে না।

এমিলি সুভাষের মরমী সহধর্মিনী শুধু নন তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণাদাত্রী। ভারতের ইতিহাসে এমিলির স্থান হলো না এটাই মর্মান্তিক!

এমিলি ভারতে আসেননি। নেহরু তাঁকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিভাবতী বসু (শরৎচন্দ্র বসুর স্ত্রী) বলেছেন যে যতদিন না তিনি নেতাজীর সঙ্গে ভারতে আসতে পারছেন ততদিন তিনি ভারতে আসার বাসনা পোষণ করা স্থগিত রেখেছেন। শরৎচন্দ্র বসু জীবিত থাকলে হয়ত এমিলিকে একবার ভারতে আনার চেষ্টা করতেন। এখন তো আর এমিলির ভারতে আসার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

চেক রমণী কিট্রিকুর্তী নেতাজীকে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে নেতাজীর সঙ্গে কুর্তীর পরিচয় ঘটে। ভিয়েনাতে ছিলেন তখন নেতাজী। তিনি একদিন হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য জার্মানীতে গিয়েছিলেন। কুর্তী নেতাজীকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'Subhas as I knew Him'.

কুর্তী এক জায়গায় লিখেছেন যে ১৯৩৪ সালে একদিন সুভাষ ভিয়েনা থেকে বার্লিনে গিয়েছিলেন গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন কুর্তী সুভাষকে তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সুভাষ গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বাড়িতে এলেন। মিসেস কুর্তী ছিলেন ভয়ানক নাৎসী বিদ্বেষী। হিটলারকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন।

অনেকক্ষণ আলোচনার পর কুর্তী জানতে চাইলেন সুভাষ কেন হিটলারের মত একজন ঘৃণ্য মানুষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে চাইছেন। দু'জনের মধ্যে মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে ফারাক তো অনেক। কুর্তী সুভাষকে বললেন যে দেশের স্বার্থে কুর্তী সব কিছু করতে পারেন তবে নাৎসীদের সঙ্গে তিনি হাত মেলাতে নারাজ। মিসেস কুর্তী সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন দেশ উদ্ধারের স্বার্থে তিনি কি হিটলারের মতো শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন? সুভাষ উত্তরে বললেন, "It is our only way out. India must gain independence, cost what it may.

Have you an idea Mrs. Kurti, of the despair, the misery, the humiliation of India?···British imperialism there can be just as intolerable as your Nazism here, I assure you. But it is perhaps difficult for you to understand it all." কুর্তীকে সুভাষ বুঝিয়ে দিলেন দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে যে কোন জিনিস তিনি করতে রাজী।

২৩. ২. ৩৪ সালে জেনিভা থেকে তিনি কুর্তীকে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, The Japanese in my opinion the British of the East." জাপানকে তিনি ব্রিটিশের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। তবুও তিনি জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন অনন্যোপায় হয়ে। চিঠির আরেক জায়গায় বলছেন, "The individual must die, so that the nation may live. Today I must die, so that India may live and may win freedom and glory." সুভাষের এ সমস্ত লেখা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর হৃদয়ের ব্যথা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। একেই বলে স্বদেশপ্রেম। জানা যায় এমিলি নেতাজীর "The Indian Struggle" বইখানার জার্মান অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি।

শরৎচন্দ্র বসু বেঁচে থাকলে সম্ভবত এমিলিকে একবার অন্তত ভারতে আনা সম্ভব হতো। এমিলি নাকি তাঁকে একবার কথাও দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যু এমিলির সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। জার্মানী থেকে জাপান যাত্রার পূর্বে শরৎচন্দ্র বসুকে নেতাজী তাঁর সহধর্মিনী সম্পর্কে লেখা চিঠিটা নিচে দেওয়া হলো—

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি।…হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি। যথাসময়ে এ সংবাদ তোমার কাছে পৌছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করুক—সফল ও পূর্ণ করুক—ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।…

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে। মা, মেজবৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম দিবে।

ইতি—

তোমার স্নেহের ভ্রাতা,

সুভাষ

বার্লিন, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

(শেখর বসুর লেখা 'নেতাজীর সহধর্মিনী' বই থেকে চিঠিটা নেওয়া হয়েছে)

এমিলির জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় ভালোই জ্ঞান আছে। আর হিটলার পত্নী ইভা ব্রাউন ছিলেন একজন অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। ফটোগ্রাফার হফম্যানের দোকানে কাজ করতেন। নেতাজী জাপান যাত্রার আগে এমিলিকে বার্লিনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতে দু'জনে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। মেয়েটিকে অবশ্য তখন ভিয়েনাতে মায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন এমিলি। তবে কিয়েল বন্দর থেকে জাপান যাত্রার সময় এমিলি নেতাজীকে বিদায় জানাতে আসেননি। সম্ভবত গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এমিলিকে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল।

নেতাজী ও হিটলারের মৃত্যু রহস্যাবৃত রয়েছে এখনো। নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আসল তত্ত্ব নির্ণয় করার জন্য অনেক লোক দেখানো তদন্ত ইত্যাদি হয়েছে নেহরুর নির্দেশে। রাধাবিনোদ পাল, ভুলাভাই দেশাই, জে. বি. কৃপালনী, পুরুষোত্তম দাস, ট্যাণ্ডন এমনকি গান্ধীজীও বিশ্বাস করতেন না প্লেন দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে। এমন কি বিশ্বের বড় বড় দেশের নেতৃবর্গ রাশিয়া বাদে নেতাজীর রহস্যজনক মৃত্যুকে স্বীকার করে না। কিন্তু নেহরু নেতাজী অধ্যায়ের যবনিকা টানার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কর্নেল হবিবুর রহমান আর শাহনওয়াজ খানের সাহায্যে তিনি নেতাজীর যে প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে তা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টার কসুর করেননি। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীও এ ব্যাপারে কিছুটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত কিম্বা বিশ্ববাসী কি নেহরুর কথা মেনে নিয়েছেন ?

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন একবার ভারতে এসে এক অদ্ভুত সংবাদ ভারতবাসীকে শোনাতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত নেতাজী সম্পর্কে। কোন অজ্ঞাত কারণে সেই সংবাদ পরিবেশন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেকের ধারণা নেতাজী রাশিয়াতেই ছিলেন বন্দী অবস্থায়। তারপর হয়ত সেখান থেকেই হারিয়ে গেছেন। তবে তিনি যে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাননি এ ব্যাপারে বিশ্বের সকলেই সম্ভবত একমত।

"রেঙ্কোজির মন্দিরে রাখা নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্ম দু'জন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তর যে রিপোর্ট পেয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল: এই চিতাভস্ম কোন মানুষের নয়, পশুর। সম্ভবত কোন কুকুরের।" এ খবর কোলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯৬২ সালের ১৫ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর কর্নেল হবিবুর রহমান পাকিস্তানে চলে যান। উনপঞ্চাশের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকায় কর্নেল রহমানের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবৃতিতে কর্নেল রহমান বলেছিলেন যে, "নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এতদিন ধরে তিনি যা বলে এসেছেন তা ঠিক নয়। তিনি একজন সৈনিক, সৈনিককে কম্যাণ্ডারের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। সুতরাং তাঁকে যেভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেভাবেই কাজ করেছেন।"

মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থার তো প্লেন দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যুর খবর বিশ্বাসই করেননি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "সুভাষ বোস এবারও পালিয়েছে। আবার যদি কোনদিন তিনি ফিরে আসেন তাহলে গোটা এশিয়াই সেদিন আমাদের হারাতে হবে।"—"He has again escaped, if Subhas Chandra Bose comes again we will loose whole of Asia."

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাশনাল রিপাব্লিক পত্রিকায় লিখেছিল, "মার্কিন সরকার বা ওখানকার জনসাধারণ কেউ বিশ্বাস করে না যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় চন্দ্র বোসের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীকালে জনৈক ফিল্ড নার্স এবং আরো কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে দেখেছেন। সম্ভবতঃ তিনি বেঁচে আছেন।"

নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাবার পর নেহরু এক জনসভায় বলেছিলেন, "সুভাষবাবুর মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছে ঠিকই কিন্তু এটা আমাকে স্বস্তিও দিয়েছে।"

প্লেন দুর্ঘটনায় যে নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি তা প্রমাণ করার জন্য এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তবে প্লেনে করে তাইহোকু থেকে অন্তর্ধানের পর তাঁর জীবনে কি পরিণতি ঘটলো সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য কোনকালে উদ্‌ঘাটিত হবে কি? নেতাজী বেঁচে থাকলে তাঁর বর্তমান বয়স ৯৭। এ জরাজীর্ণ দেহে বেঁচে থাকলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে কি? তবে এটা নির্ভেজাল সত্য যে নেতাজী অদৃশ্য অবস্থায় ভারতবাসীর কাছে যে ভক্তিশ্রদ্ধা পাচ্ছেন সশরীরে ভারতে এসে এতদিন জীবিত থাকলে বা

জওহরলালের মতন বয়সে মারা গেলে—এ রকম শ্রদ্ধাভক্তি পেতেন কি? শ্যামাপ্রসাদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন। জওহরলালও আর অতখানি আমাদের মন প্রাণকে আকর্ষণ করে না এখন। নেতাজীকে নিয়ে যত বই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে, গান্ধী নেহরুকে নিয়ে মনে হয় অত বই এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। নেতাজী আমাদের কাছে এখনো জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তাঁর আই. এন. এ. ফৌজের কীর্তি-কাহিনীই নেতাজীকে বিশ্ব তথা ভারতে অমর করে রেখেছে। গান্ধীজীকে নেতাজী যেমন জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন গান্ধীজীও নেতাজীকে "প্যাট্রিয়ট অব প্যাট্রিয়টস" বলে সম্বোধন করেছেন। আগেই উল্লেখিত হয়েছে হিটলারই নেতাজীকে বার্লিনে যাবার সুযোগ দিয়ে নেতাজীকে তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী জাপানে এসে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

নেতাজীর ন্যায় হিটলারের মৃত্যু রহস্যও যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সে কথাও বলা যাবে না। বেশ কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে রাশিয়া থেকে হিটলারের মৃতদেহের কফিন দেখানো হচ্ছিল। রাশিয়ানরা দাবী করছে মার্শাল জুখব যখন হিটলারের বাঙ্কার দখল করলেন তখন তিনিই হিটলারের অর্ধদগ্ধ দেহ আবিষ্কার করেন এবং সেটা রাশিয়াতে নিয়ে যান। এখন বক্তব্য হচ্ছে হিটলারের তো অনেকগুলি ডাবলস ছিল। যাদের দেখলে অবিকল হিটলার বলে মনে হতো। খুব কাছে থেকে সুনিপুণ চোখ দিয়ে না দেখলে ডাবলসের সঙ্গে হিটলারের পার্থক্য বুঝা অসম্ভব ছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক আরভিং ওয়ালেস (Irving Wallace) "The Seventh Secret" নামক একটি বই লিখেছেন। তাতে তিনি কিছুটা গবেষণামূলক এবং কিছুটা কল্পনাশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিটলার ও ইভার জীবনের বিশেষ কিছু কথার উল্লেখ করেছেন। ওয়ালেস দেখিয়েছেন যে লেনিনগ্রাদ-হারমিটেজ মিউজিয়মের কিউরেটর নিকোলস কিরভব হিটলারের আঁকা একটা বিল্ডিং-এর তৈলচিত্র জর্জিভরিকি নামক একজন জাহাজের স্টুয়ার্ড-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। তৈলচিত্রটি পরীক্ষা করে জানা গেছে এটা সম্ভবত ১৯৫২ সালের আঁকা।

ওয়ালেস আরো উল্লেখ করেছেন যে, সে সময় অক্সফোর্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক স্যার হ্যারিসন এ্যাশক্রফট হিটলারের প্রামাণ্য জীবনী লেখার রসদ সংগ্রহের জন্য পশ্চিম বার্লিনে গিয়েছিলেন। সেখানে এক গুরুতর ট্রাক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা এমিলি এ্যাশক্রফট এ কাজে হাত দেন। তাঁকে তার জন্য পশ্চিম বার্লিনে যেতে হয়। কিরভবও সে সময় পশ্চিম বার্লিনে যান। হিটলারের আঁকা তৈলচিত্রের রহস্য সন্ধানে।

এমিলি এ্যাশক্রফট, কিরভব, টোভা (ইজরাইলের) ও রেক্স ফসটার হিটলালের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে একসঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা নানান তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারেন যে হিটলার ১৯৪৫ সালে বাঙ্কারে আত্মহত্যা

করে মারা যাননি। যোশেফ স্তালিনও নাকি বিশ্বাস করতেন, যুদ্ধে পরাজয়ের পরমুহূর্তেই হিটলার সাবমেরিন করে পালিয়ে যান। জেনারেল আইজেনহাওয়ারও সাংবাদিকদের বলেছিলেন হিটলার অক্ষত অবস্থায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাও তাই বিশ্বাস করত। "Josef Stalin himself always believed that Hitler had escaped in a Submarine, possibly to Japan. General Eisenhower told reporters that there was reason to believe Hitler had slipped away unharmed. British intelligence often maintained that a Hitler's double had been incinerated in the chancellery garden." The Seventh Secret—Irving Wallace, p.—77. আর ফায়ার বাঙ্কার থেকে পাওয়া হাড়, মাথার খুলি এবং চোয়ালের হাড় পরীক্ষা করে রাশিয়ার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পরস্পর বিরোধী রিপোর্ট দিয়েছে বলে মনে হয়েছে।

হিটলারের ডেন্টিস্ট ডঃ থিয়েল এমিলি এ্যাশক্রফটকে বলেছেন যে রাশিয়ানরা হিটলারের দাঁতের যে নমুনা পেয়েছে তা হিটলারের নয়। এমন কি হিটলারের বা ইভার অর্ধদগ্ধ মৃতদেহে চামড়া বলতে কিছু ছিল না। তাই রাশিয়ানদের পক্ষে হিটলারের হাতের ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ডঃ থিয়েল এমিলিকে আরও বললেন যে রাশিয়ানরা হিটলার বলে যাকে সনাক্ত করেছিল সে হচ্ছে ডুপ্লিকেট হিটলার।

কিরভব, এমিলি এ্যাশক্রফট, টোভা ও রেক্স ফসটার বিভিন্নভাবে কঠোর পরিশ্রমের পর ইভার (হিটলারের স্ত্রী) কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ইভা বা হিটলার কেউ ১৯৪৫ সালে মারা যাননি। ইভাকে 'সোডিয়াম পেন্টোথল' জোর করে খাওয়ানো হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ইভা সব গোপন কথা বলে দেন। ইভা বলেন যে হিটলার মারা যান যেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয় সেদিন। আর তাঁদের এক কন্যা ছিল তার নাম ক্লারা। তার বিয়েও হয়েছিল ফেইবিগ নামক একজন জার্মান যুবকের সঙ্গে। সে পটাসিয়াম সাইনায়ট খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। যে মুহূর্তে সে জানতে পারল যে সে হিটলারের মেয়ে তখনই সে আত্মহত্যা করল।

আর ১৯৪৫ সালে বাঙ্কারে যে বিশেষ ক্যাপসুল খেয়ে মরেছিল সে ইভার ডুপ্লিকেট হান্না ওয়ালড, আর তাঁর স্বামীর ডুপ্লিকেট ছিল মুলার। যিনি বার্লিন অলিম্পিকের সময় হিটলারের ডুপ্লিকেট হিসেবে পুরস্কার ইত্যাদিও বিতরণ করেছেন। কিরভব, এমিলি, টোভা, রেক্স এরা এ সমস্ত কথা শুনে বিস্মিত। বিস্ময়ের ঘোরে তাঁরা তন্ময় হয়ে রয়েছেন। আর সেই ফাঁকে কোথায় চলে গেলেন ইভা। তাঁর কোন সন্ধান মিলল না। এর মধ্যেই তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে তৈলচিত্রটি হিটলারেরই আঁকা। বার্লিনে গোয়েরিঙের 'এয়ার মিনষ্ট্রি' বিল্ডিং-এর ছবি। সম্ভবত ১৯৫২ সালে কিম্বা তারপরে হিটলার এ ছবিটি এঁকেছিলেন। তাঁরা আরো আবিষ্কার করলেন হিটলার

তাঁর জীবনের বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন খুবই গোপনীয় সপ্তম বাঙ্কারে যা কেউ জানতো না।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে ওয়ালেস ছিলেন গল্পকার। গবেষণাধর্মী ও কল্পনা-মিশ্রিত চিন্তাধারা নিয়ে তাঁর 'The Seventh Secret' বইখানা লিখেছেন। বইখানা পড়তে পড়তে মনে হবে তিনি একটি সত্যের সন্ধানে গবেষণাধর্মী চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। হ্যানরি এ্যাশক্রফট, এমিলি এ্যাশক্রফট, নিকোলাস কিরভব, টোভা, রেক্স ফষ্টার—এঁদের অস্তিত্ব আছে কিনা জানা মুস্কিল। আরভিং ওয়ালেসও এখন ইহলোকে নেই। তবে তাঁর লেখা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "Master story-teller Irving Wallace shatters the myth of those lost, mad days of Nazi Germany and builds a staggering adventure around one of the most terrifying mysteries of all time !......"30th April 1945, Adolf Hitler and Eva Braun commit suicide in an underground bunker as the Russians close in on central Berlin. That was the official version. But now, startling facts are being unearthed."

হিটলারের জীবনে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে ওয়ালেসের এ লেখা অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবে কল্পনাশ্রিত বলে মনে হতে পারে কেন না হিটলার সম্পর্কে এ ধরনের তথ্য এর আগে কোন বইতে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যা সম্পর্কে এখন আর কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এমিলির কি স্বার্থ থাকতে পারে আশি বছর বয়সে ভিয়েনায় একাকীত্বের মধ্যে দিন কাটিয়েও নেতাজীকে তাঁর বৈধ স্বামীরূপে স্বীকার করে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে যাবেন ? আর অনীতা এরকম উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা (বর্তমানে জার্মানবাসিনী) সম্ভ্রান্ত মেয়ে বিশ্বের কাছে টেলিভিশনের পর্দায় ধরা দিয়ে নেতাজীকে বাবা বলে সম্বোধন করেছেন—তা কি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ? তাঁরা মা-মেয়ে তো ভারতের বা বসু পরিবারের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশী নন। তাহলে নেহরু ও প্যাটেল কর্তৃক offer দেওয়া দু'লাখ টাকা এমিলি প্রত্যাখ্যান করতেন না। তখন এমিলি খুবই দৈন্যদশায় দিনযাপন করছিলেন।

নেতাজী ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী। ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রাণপুরুষ। সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল একটাই। "মানবধর্ম"। মানবধর্মই ছিল তাঁর চলার পথের পাথেয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই তিনি নরনারায়ণ মনে করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্মের আলাদা কোন গুরুত্ব ছিল না। সব ধর্মকেই তিনি সমান চোখে দেখেছেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস, ভালবাসা এবং উদারতা দিয়ে প্রত্যেক মানুষে মানুষে প্রেমের সেতুবন্ধন করতে চেয়েছিলেন। সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক অখণ্ড জাতীয় ঐক্য। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আকবর শা, আবাদ খান সাহায্য না করলে তাঁর পক্ষে কাবুল হয়ে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হতো কি? ভগতরাম তলোয়ার, উত্তমচাঁদ, কুয়ারোনি নেতাজীকে বার্লিনে পাঠাবার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু নেতাজীকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে আকবর শা'র কৃতিত্ব সর্বাধিক বলে মনে হয়। আর জার্মানী থেকে জাপানে আসার সময় সাবমেরিনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনীয়ার আবিদ হাসান। তিনি হায়দ্রাবাদের নবাব পরিবারের ছেলে, জার্মানীতে ছিলেন। নেতাজীর ডাকে সবকিছু ত্যাগ করে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর সেনানীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল হিন্দু ও শিখ। মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম। তবে অফিসারদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলিম। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের অধিবাসী। তবে হিন্দু, শিখ, মুসলিম, ইশাইদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা। ভারতের জাতীয়তাবাদের ঐক্য প্রত্যয় তাদের পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই মুসলিম অফিসারদের অধীনে কাজ করতে বা যুদ্ধ করতে হিন্দু বা শিখ সেনারা কোন সময় আপত্তি তোলেনি।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দুটি ডিভিশনের অধিনায়ক ছিলেন এম. জেড কিয়ানী ও আজিজ আহম্মদ। ইম্ফলের কাছে মৌরাঙের মুক্তাঞ্চলে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছিল। এখানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কর্ণেল সৌকতুল্লা। নেতাজীর আর একজন বিশ্বস্ত ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর নাম রসিদ আলি। এই রসিদ আলিকে নিয়ে জিন্না সাম্প্রদায়িক খেলায় মেতে উঠেছিলেন ১৯৪৫-৪৬ সালে। জিন্নার প্রচেষ্টা জনরোষে ভেস্তে যায়। এ ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল গিলানী, কর্ণেল হুসেন ও হবিবুর রহমান প্রমুখ। হবিবুর রহমান ছিলেন নেতাজীর শেষ বিমান যাত্রার সঙ্গী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বস্তরের সেনা ও সেনানায়কদের সমস্ত ধর্ম ও প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে রেখে নেতাজী তাঁদের ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ কেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০ লক্ষ ভারতীয়দের মনে তিনিই জাতীয় ঐক্যের বীজ বপন করেছিলেন। জিন্না হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের বীজ রোপণ করেছিলেন ভারতের মাটিতে সে বীজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও নিয়ে গিয়ে পুঁতে দিল জিন্নার অন্তরঙ্গ সুহৃদবৃন্দ। নেতাজীর জাতীয় ঐক্যের মন্ত্র জিন্নার প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিল। সিঙ্গাপুরে চেট্টিয়ার গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ মন্দিরে নেতাজী তাঁর সহকর্মী মুসলিম, শিখ প্রমুখ সব সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এই হলেন নেতাজী, ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রাণপুরুষ।

গান্ধীজী ভারতবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'তোমরা সুভাষের দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসরণ কর।' গান্ধীজী অকপটে স্বীকার

করেছেন যে, "The hypnotism of Netaji has cast its spell on us." ভারতের বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্কটমোচনে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন নেভাতে নেতাজীর মতো একজন সর্বগুণান্বিত বিরাট মাপের নেতার আগমন একান্তভাবে প্রয়োজন। নেতাজীর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান যেভাবে তাদের সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে একই পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতে তা নজিরবিহীন। গান্ধীজী তাই বলেছেন, "The greatest and the lasting act of Netaji was that he abolished all distinctions of caste and class. He was not a Bengalee. He was Indian first and last. What is more he fired all under him with the same zeal so that they forget in his presence all distinctions and acted as one man." অথচ এই আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক অফিসারদের সম্পর্কে আমাদের তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের অভিমত হচ্ছে তাঁরা ছিলেন দেশদ্রোহী। তাঁরা যাতে কোন সরকারি কাজে যোগদান করতে না পারে এসব কংগ্রেস নেতারা তার জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছেন। ভারতের তদানীন্তন হোম মিনিস্টার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মন্তব্য এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। "Sardar Patel, India's first Home Minister, explained to me in 1950 that he had been very careful indeed not to reinstate any of the officers who had gone over to Subhas Bose's I. N. A.

He also saw to it that they did not thrive in politics In Pakistan, by contrast no stigma was attached to I.N.A. and I was later to meet high ranking officers who had been in I.N.A."

Reporting India : Toya Zinkin, p. 14-15.

এ হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত I.N.A-র অফিসারদের প্রতি প্যাটেল-নেহরুর মনোভাব। পাকিস্তান কিন্তু I.N.A.-র অফিসারদের বিরুদ্ধে এরূপ কোন মনোভাব প্রকাশ করেনি। হবিবুর রহমান প্রমুখ আই. এন এ -র অনেক অফিসার ভারত ভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান।

আর নেতাজীকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার ষড়যন্ত্রে নেমেছিলেন আমাদের ব্রিটিশ তল্পীবাহক কিছু কিছু ভারতীয় নেতা। নেতাজীকে সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ মেলে পরবর্তী পৃষ্ঠার সার্কুলারে—

Confidential

Sub : Photos

M. 155211 : 1
H. Q. Bombay Sub-area
Colba, Bombay 6
11th Feb 1949

It is recommended that photos of Netaji Subhas Chandra Bose be not displayed at prominent places in Unit Line Canteens, Quarters Guard or Recreation Rooms."

Sd/- Major General Staff
P. N, Khanduari
Tel. 35081. Extn. 41

ক্যানটিন হল, কোয়ার্টার্স গার্ড বা রিক্রিয়েশন রুমে নেতাজীর ছবি রাখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর চেয়ে দুঃখের আর লজ্জার কি হতে পারে? তবে এত চেষ্টা সত্বেও নেতাজীকে কি ভারতবাসীর মন থেকে মুছে দিতে পেরেছে? নেতাজীর স্মৃতি আমাদের মনে জাগরিত হয়ে আছে তবে আমরা তো তাঁর মতাদর্শ মেনে চলার চেষ্টা করি না। যার ফল আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি অণুপরমাণুতে অনুভূত হচ্ছে।

নেতাজী ভারতবর্ষের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের চরিত্র মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাঁর কাছে পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় গান্ধীজীকে কঠোর আঘাত করেছিল। গান্ধীজী তাঁর সে দুঃখ গোপন না রেখে বেলেছিলেন যে, "Pattabhi Sitaramaiya's defeat is my defeat." এরপর থেকে সুভাষের পক্ষে বেশিদিন গান্ধীজীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। গান্ধীজীর সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করল।

ক্ষোভে দুঃখে কোলকাতা মনুমেণ্টের পাদদেশে এক জনসভায় তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "Life under existing circumstances is intolerable for me. In this mortal world everything perishes and will perish, but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea but that idea will incarnate itself thousands of life after his death."

নেতাজীর মত মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন লোকের মনে এরকম হতাশা সত্যি বিস্ময়কর। এমন এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নেতাজীকে সে সময় পড়তে হয়েছিল যার জন্য তাঁকে এরকম মন্তব্য করতে হয়েছে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর জীবনাদর্শ ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে নতুন আলোর পথ দেখাবে। ভারতবাসী

তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। নেতাজীর আশা যে পূরণ হয়েছে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা কিন্তু তা প্রমাণ করে না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সব স্তরেই আজ ভারতের দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নেতাজীর আদর্শ, সংহতিবোধ প্রভৃতি ভারতবাসীর জীবনাদর্শ হয়ে উঠবে কিনা ভাবীকাল তা প্রমাণ করবে। নেতাজী ভারতভূমিকে ভগবানের বড় আদরের দেশ বলে মনে করতেন।

তিনি তাঁর মা প্রভাবতীদেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্রা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতাররূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।"

হৃদয়ের কত গভীরে দেশমাতৃকা ভারতবর্ষের স্থান ছিল নেতাজীর তা তাঁর উপরের ভক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। তাই তো ভারতমাতার দুঃখ মোচনে হতাশ হয়ে তিনি একসময়ে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছেন। কিট্টী কুর্তীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, "My second and last request to you is that you should not interfere forcibly with my fast, but should permit me to approach me end peacefully."

নেতাজী শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তাঁর মধ্যে সাহিত্য ও কাব্যিক প্রতিভার পরিস্ফূরণ ঘটেছিল। তাঁর ইংরেজী ও বাংলা উভয় বিষয়ে সমান দক্ষতা ছিল।

হিটলারও কিন্তু রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তাঁর মধ্যেও কাব্যিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল। অল্পবয়সে তিনি তাঁর প্রেমিকা স্টেফনিকে উদ্দেশ্য করে অনেক কবিতা লিখেছেন। সেগুলো 'প্রেমিকস্তোত্র' বা "Hymn to the beloved" নামে খ্যাত। হিটলারের বন্ধু অগাস্ট কুবাইজেক-এর লেখা থেকে এ সমস্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নেতাজী একসময়ে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দুঃখমোচনে অপারগ হয়ে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিলেন। হিটলারকেও দেখা যায় একসময়ে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হয়ে আশা-ভরসাহীন জীবন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। চেয়েছিলেন সংসার জীবনের সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হতে। তাই তিনি 'বেনিডিক্টাইন মনেস্টারী'তে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তখন হিটলার ছিলেন ভিয়েনাতে। অসহনীয় কষ্টে তিনি দিন যাপন করতেন।

হিটলার জার্মানীকে তাঁর হৃদয়ের অতি গভীরে স্থান দিয়েছিলেন। নিজের মাতৃভূমি না হলেও জার্মানী ছিল তাঁর কাছে মাতৃভূমির চেয়েও মহান ও সমৃদ্ধ।

তাই-তো তিনি তাঁর মাতৃভূমি অষ্ট্রীয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

নেতাজী ও হিটলার দু'জনই ছিলেন প্রচণ্ড রকমের দৃঢ়চেতা মানুষ। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে তাঁরাও এক এক সময় হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এ থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে মানুষ যত বড় মাপেরই হউন না কেন প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তিনি যেতে পারেন না।

হিটলার ছিলেন নেতাজীর ঠিক বিপরীত চরিত্রের লোক। তাঁর মধ্যে মায়া দয়া বা মানবতাবোধের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টাণ্ট কোন ধর্মমতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বে। আর ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক। নেতাজীও জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন তবে তা মানবতাবিবর্জিত নয়। হিটলার প্রচার করতেন, "Every living religion must be inspired by the national spirit ; nations are the thoughts of God. The German of course, are the chosen people, the German nation presumably is the highest idea of God."

নর্ডিক জাতি বা খাঁটি আর্যজাতির বংশধর হচ্ছে জার্মানরা। তিনি মনে করতেন জার্মানরা হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাত। তাদের এ পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে নীচজাতির ওপর রাজত্ব করার জন্য। হিটলার ছিলেন নীৎশে ও রোজেনবার্গের শিষ্য। যাঁদের কাছে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কোন গুরুত্ব নেই। ভালো-মন্দ কিছুই বিচার বিবেচনা না করে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রেই তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। "Hitler calls upon the German people to rise above the concepts of good and evil." এই মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হিটলার ইহুদী নিধনে মেতে উঠেছিলেন। রাশিয়ানদেরও তিনি নীচ জাতির বংশধর বলে মনে করতেন। মিত্রশক্তির মধ্যে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের প্রতি তাঁর ছিল দুর্বলতা।

ইংলণ্ডকে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতির দেশ বলে মনে করতেন। ডানকার্কের ঘটনা ইংলণ্ডের উপর হিটলারের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এ ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

"The superiority of Nordic races was mania with him, on account of that he was in favour of conserving the Nordic Power."—N. G. Ganpuley.

এরকম সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নেতাজীকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী আজন্ম বিপ্লবী। আই. সি. এস.-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রবেশ করলেন রাজনীতিতে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য করলেন আত্মবলিদান। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সার্বিক মঙ্গলবিধানই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। প্রথম জীবনে তিনি হিটলারের মতো চিত্রশিল্পী হতে চাননি। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে পঙ্কিলতা ছিল না। তবে তিনি ক্ষাত্রবীর্যে উজ্জীবিত হয়ে ম্রীয়মান ভারতবাসীর বুকে শক্তি ও

সাহস যোগাতে এগিয়ে এসেছিলেন অস্ত্রাঘাতে যাতে তারা ব্রিটিশ শক্তিকে ধরাশায়ী করতে পারে। ভারতবাসীর হাতে তিনি ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করার জন্য অস্ত্র দেবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন : কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হলো না।

হিটলার কিন্তু প্রথম জীবনে রাজনীতিবিদ হতে চাননি। চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হতে। তুলির অপূর্ব টানে বিচিত্র বর্ণের ছবি এঁকে তিনি মানুষের মন রাঙাতে চেয়েছিলেন। নানান ঘাত প্রতিঘাতে প্রয়োজনীয় প্রথাগত শিক্ষার অভাবে তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি। বাঁচার তাগিদে অদৃষ্টের অমোঘ বিধানে তিনি রাজনীতিকে তাঁর জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করলেন। হয়ে গেলেন জার্মানীর মতো এক সুশিক্ষিত রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা। জার্মানীর দুঃখ মোচনের জন্য শত্রু দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রেরণায় হাতে তুলে নিলেন বেয়নেট। তাঁর বেয়নেটের আঘাতে বিশ্ব উঠল কেঁপে। কয়েক কোটি লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। রাজনৈতিক ভুল ও বিচার বিভ্রমাত্মক পদক্ষেপের জন্য তিনি নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর বেয়নেট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল শত্রুর অস্ত্রাঘাতে। তাঁর স্বপ্নের হাজার বছরের তৃতীয় রাইখ ধ্বসে পড়ল। অভীষ্ট সিদ্ধ হলো না তাঁর। নেতাজীরও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। বুকে অসহনীয় জ্বালা নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন সে খবর এখনো অজানা !

গ্রন্থপঞ্জী

1. Mein Kampf — *Adolf Hitler*
2. Study in Tyranny — *Alan Bullock*
3. Rise and Fall of Third Reich — *William Shirer*
4. One Man Against Europe — *Konrad Heiden*
5. Face of the Third Reich — *Joacim C. Fest.*
6. The Last Days of Hitler — *H. R. Trevor Roper*
7. Acquaintiances — *Arnold Toynnbee*
8. Fascism — *Edited by Walter Laqueur*
9. I Knew Hitler — *Kurt G. W. Ludecke*
10. Hitler the Pawn — *Rudolf Olden*
11. Hitler — *J. P. Stern*
12. The Origins of the Second World War — *A. J. P. Taylor*
13. Europe : Grandeur and Decline — *A. J. P. Taylor*
14. Brighter Than a Thousand Suns — *Robert Jungk*
15 Hitler's War Directives (1939-1945) — *Edited by H. R. Trevor Roper*
16. Milestones of History — *Vol. VI—Standard Literature*
17. I Was Hitler's Maid — *Polin Koler*
18 Cancer Word — *Alexander Isayevich Solzhenitsyn*
19. A Short History of the World — *H. G. Wells*
20. Ciano's Diary (1939-1943) — *Edited with an Introduction Malcolm Muggeridge*
21. Subject India *Henry Noel Brailsford*

22. My Country Right or Left 1940-1943 Volume II — *George Orwell*
23. Hitler (A Pictorial Biography) — *Hoffman*
24. Great Contemporaries — *Winston Churchill*
25. Hitler and Stalin : Parallel Lives — *Alan Bullock*
26. Adolf Hitler — *James Bunting*
27. Archipelag Gularg — *A. I. Solzhenitsin*
28. Hitler — *Alan Wykes*
29. The God that Failed — *Edited by Richard Crossman : M.P.*
30. The Struggle for Mastery in Europe — *A. J. P. Taylor*
31. The Seventh Secret — *Irving Wallace*
32. The Lost Hero — *Mihir Bose*
33. D. Day — *Lauran Paine*
34. Fascism — *M. N. Roy*
35. Fundamantal Questions of Indian Revolution — *Subhas Chandra Bose*
36. The New Standard Encyclopaedia — *Standard Literature*
37. A Naval History of Malta — *Peter Elliot*
38 Conversations with Stalin — *Milovan Djilas*
39. Netaji (A Pictorical Biography) — *Ananda Publishers*
40. The Blenheim Edition of Second World War — *Winston S. Churchill*
41. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) — অমলেশ ত্রিপাঠী
42. সমগ্র রচনাবলী — সুভাষচন্দ্র বসু
43. তাইহোকু থেকে ভারতে — শ্রীঅভিজিৎ
44. সুভাষ ঘরে ফিরে নাই — শ্যামল বসু
45. আমি সুভাষ বলছি — শৈলেশ দে
46. নেতাজীর সহধর্মিণী — শেখর বসু

47. জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী — এ. এম. নায়ার-এর স্মৃতিকথা
48. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস — বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
49. স্তালিন যুগ — আনা লুইস স্ট্রং
50. শতাব্দীর জার্মানী—সাহিত্য ও সংস্কৃতি — প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ
51. রাশিয়ার চিঠি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
52. নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য — নারায়ণ সান্যাল
53. দুই ইউরোপের দিনলিপি — বিক্রমন নায়ার
54. আমি নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গী ছিলাম — ভগতরাম তলোয়ার
55. আমি রাসবিহারীকে দেখেছি — নারায়ণ সান্যাল
56. চরম মুহূর্তে নেতাজী — অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী
57. সৌলমারীর সাধু কি নেতাজী ? — অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী